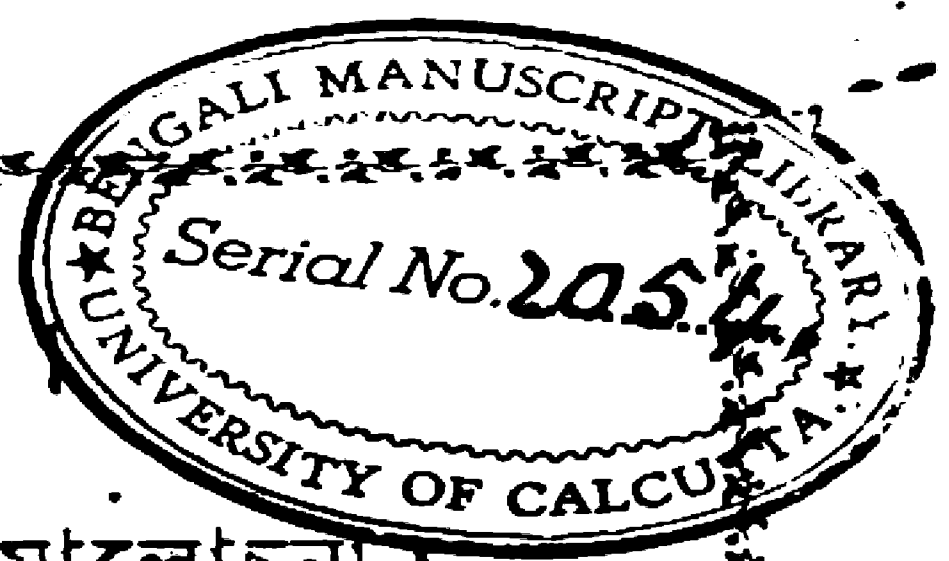


ম. ন. ১৩৩

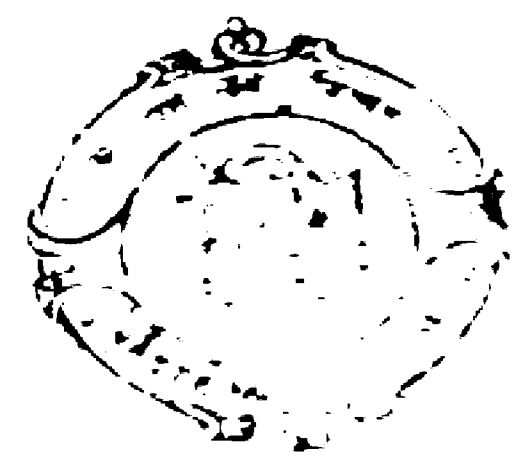


নবপ্রভা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

তৃতীয় খণ্ড।

১৩০৯ সাল্কন - ১৩১০ ম. ব।



শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম, এ; বি. এল,

ও

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি, এল সম্পাদিত।

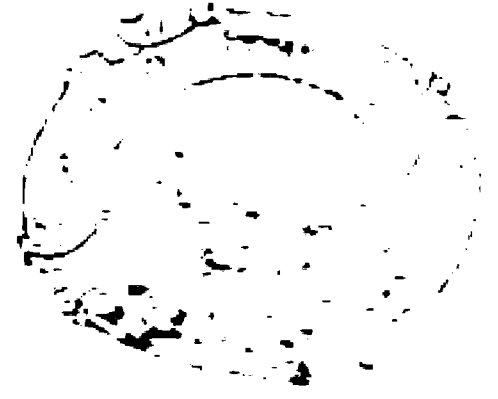


কলিকাতা।

ভবানীপুর, ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, ইহাতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সর্বত্র ২।০ আড়াই টাকা।

নবপ্রভা



বর্ষসূচী ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অধম (কবিতা)—শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী	...	৪০৭
২। অপূর্ণ ব্রজস্রনা (কাব্য)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল	...	৪৮
৩। আইনে জমিদারদিগের অস্থবিধা—শ্রীশুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি এল,	...	২৮
৪। আমি কে?—শ্রীবিবেকদাস দাস বি এ,	...	১৪৮
৫। আরতি (সমালোচনা)—শ্রীসমালোচক	...	১০৮
৬। স্বদেশ ও তৎ সাময়িক বৃত্তান্ত—পণ্ডিত শ্রীকেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ	...	৩৮৭
৭। একধানি উইল নাম—শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত	...	৩৫৫
৮। কংগ্রেস—শ্রীনৃ উত্তমানন্দ স্বামী বক্তৃতা	...	৪৮৩
৯। কংগ্রেস ও দরবার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ বি এল,	...	১১৩
১০। কাটোরার পথে (সভা পত্র)—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	...	৩৯৬, ৪৭১, ৫০০
১১। কালিন্দীকুল (কবিতা)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	...	৪৫০
১২। কুস্তমেল	...	১২১
১৩। খুঁহুর মৃত্যু (কবিতা)	...	২৭৪
১৪। গীতার আবিষ্কার (হাসির গান)—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় এম, এ, এন আর এ এস,	...	৪২
১৫। গৌরঙ্গ (সমালোচনা)—শ্রীসমালোচক	...	২২৩, ৪১০
১৬। ছবি (কবিতা)—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়, এম এ	...	১৩৮, ৩৭৮
১৭। ছান্দোগ্যোপনিষৎ—পণ্ডিত শ্রীহর্নাচরণ বেদান্ত—সাংখ্যাতীর্থ	...	১২৫
১৮। জগদগুরু নিও—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়	...	২৫০
১৯। জনসুস্থ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	...	১৫২
২০। দেশভেদে আচার ভেদ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	...	১৪৫
২১। দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ—৪৮, ৮০, ১১২, ১৪৪, ১২৩, ২৬৬, ৩৩৭, ৩৮৬, ৪৩৩, ৪৮২, ৫২৬	...	২৮৪
২২। বিজ্ঞান বাবুর হাসির গান ও তাহার স্বরলিপি	...	২৮৪
২৩। ধর্ম্মকথা—শ্রীবিবেকদাস দাস, বি এ	...	৩৩২
২৪। ধর্ম্মপুজা—শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত	...	১৩
২৫। নবজীবন (গল্প)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু	...	৭১
২৬। নবপ্রভার নববর্ষ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম এ বি এল	...	১
২৭। পঞ্চায়ৎ - শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায়	...	২২২
২৮। পুরাণের রচনা কাল—শ্রীবিজ্ঞয়চন্দ্র মজুমদার, বি এল	...	১০
২৯। প্রবাসী (কবিতা)—৮ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	...	২৭
৩০। প্রবাসী (কবিতা)—শ্রীমতী মোহিনী দেবী	...	১২০
৩১। প্রভাবতীর ছানাবড়া (কবিতা)—শ্রাবদাচরণ মিত্র, এম এ, সি এস	...	১৫৭
৩২। বঙ্গের শেখবীর (সমালোচনা)—শ্রীস্বভদ্রাকিশোর ভট্টাচার্য	...	৩৪৮, ৪৭৫
৩৩। বড়বাটি নবকে প্রহ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল	...	৪২০
৩৪। বঙ্গ পঞ্চানন—পণ্ডিত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি	...	১১৩
৩৫। বঙ্গ—শ্রীশুরেন্দ্রলাল রায় বি, এল,	...	৩৭

৩৬।	বিজ্ঞানমার্কসী—পণ্ডিত শ্রীঅনুসূচকচন্দ্র কাশ্যপীর্ষ	...	...	৩১২
৩৭।	বিজ্ঞানতা (কবিতা)—শ্রীঅনন্যনাথ	...	...	৫৮
৩৮।	বিজ্ঞানী আনন্দময়ী—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মোহন রায়	...	...	১২৫
৩৯।	বিদ্যায় বিপদ—শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় বি এল, ...	...	...	৩৮
৪০।	বিধবা বিবাহ—পণ্ডিত শ্রীকেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ	...	...	৩০৭
৪১।	বিপদের প্রতি (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ বি এল	...	...	৪৩৫
৪২।	ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র—শ্রীমৎ উক্তমানন্দ স্বামীর বহুত!	...	...	১৭৮
৪৩।	ভিটোরিয়া ও ভারতবর্ষ—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন (বারিষ্টার)	...	৮৭, ৩২৫, ৪৩৮	
৪৪।	ভীমরতি—পণ্ডিত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি	...	...	৩৪৫
৪৫।	ভৌতিক প্রব—শ্রীশ্রীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ	...	...	৬০
৪৬।	মল্ল (কবিতা)—শ্রীগিরিচাঁদুনার বহু	...	...	১৫৯
৪৭।	মহাভারত ও রামায়ণ—শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	৪২১
৪৮।	মাই বাই—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	...	...	১৭১, ২০১
৪৯।	মানব জীবনে দর্শনের উপযোগিতা—শ্রীবারাণসী বাসী মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল	...	...	২৭৮
৫০।	মায়া (উপক্ৰাস)—	৩২, ২৭, ১৪০, ২৩০, ২৮৮, ৩৬৪, ৪১৫, ৪৫১, ৫০৬		
৫১।	মেঘদূত—শ্রীমন্মোহন চক্রবর্তী, এম এ বি এল এম আর এ এন	৮১, ৪০২ ৪৬৭, ৫০৩		
৫২।	মেঘদূত (কবিতা) শ্রীযোজেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	...	১৬৭
৫৩।	মোহ (কবিতা)—শ্রীমতী মোহিনী দেবী	...	...	২৪২
৫৪।	রাজা বল্লভ সেন—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	...	...	৫০, ২৬৭
৫৫।	রক্তে ধর্ম্মপূরা (প্রতিবাদ)—পণ্ডিত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি	...	...	২২
৫৬।	শান্তি—পণ্ডিত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি	...	...	৫১৭
৫৭।	শ্রদ্ধা মাহাত্ম্য—	ঐ	...	২০৭
৫৮।	শ্রীমতীর নিবেদন (কবিতা)—শ্রীঅন্তোভব বন্দোপাধ্যায় এম এ, বি এল	...	...	২৬৫
৫৯।	সমালোচনা	...	...	১০৪, ১৬৮, ৩৭৯,
৬০।	সাময়িক সংবাদ	...	...	৪৮১, ৫২৫
৬১।	সাহিত্য দরবার	...	২৫৫, ৩১১, ৩৮৩, ৪২৬, ৪৭৮, ৫২১	
৬২।	স্বপ্ন—শ্রীবিজয়চন্দ্র সমুদ্রদার বি এল	...	...	৭৭
৬৩।	স্বপ্ন (কবিতা)—শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী	...	...	৪৭০
৬৪।	স্বরলিপি—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, এম এ	...	...	৪০৭
৬৫।	স্বামী শ্রীর বিবাহে সোলে নিপত্তি (কবিতা)—শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ	...	...	৪৩৫
৬৬।	হিন্দু এবং জরোদশ লিও—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম এ, বি এল	...	...	৩৬১
৬৭।	হিন্দু বিধবার একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র—শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রয় ১৩২, ২১৮	...	...	
৬৮।	হেমচন্দ্র (কবিতা)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল	...	...	২৪৫
৬৯।	হোমায়ি (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল	...	...	১২০

আছেন সেখানে আমাকে লইয়া যাও। তিনি কোথায়? এ জীবনে কি তাহার সাক্ষাৎ পাঠিব না? বিষয়-বাসনা-তাপে কি বাবজীবন দগ্ধ হইবে? তাহার প্রেমে এ দগ্ধ প্রাণ কি শীতল হইবে না? ঐ যে কোকিলের ঝঙ্কারের মধ্যে হৃদয়েশ্বরের আহ্বান শুনিতোঁছি। প্রাণনাথের পুণ্যমন্দিরে কবে যাঠিতে পারিব? বহুদূরে যে সেই মন্দির। রিপু-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে ক্ষুদ্র জীবনতরী ভাসমান—সাগর পার হইয়া সুদূরস্থিত বিশ্বনাথের মন্দিরে যাঠিতে পারিবে কি? বসন্তে, আশা দেবী, অরুণ হসিত শৈলশিখর হঠতে স্মিতবদনে বলিতেছেন—“অগ্রসর হও, ভয় নাট;” প্রীতি দেবী, কুসুমিত-তরুলতা-শোভিত উপত্যকা হঠতে বলিতেছেন, “ভয় নাট, অগ্রসর হও।”

এই যে বৎসর বৎসর বসন্ত পুনরাগত হয়, মৃতপ্রায় প্রকৃতিকে পুনর্জীবিত করে, তাহাতে কেমন একটা আশা হয়—আত্মা ইহলোকে জীবনের ঋতুপর্ষায় সমাপ্ত করিয়া, পরলোকে অভিনব বসন্তে, স্বর্গীয় কোকিলের ঝঙ্কারে, জাগ্রত হইবে,—অভিনব উৎসাহ, নবীন প্রীতি, নূতন শোভার মধ্যে, আবার নূতন তীর্থযাত্রা আবিস্কৃত হইবে। ইহলোকে যে জীবনে ঋতুপর্ষায় বারম্বার দেখিতে পাঠি। এষ্ট শোক তাপ, এবং অশ্রুপর্ষণ, এই অবসাদ—তাহার পর আবার উৎসাহ, আবার হর্ষ, আবার আশা, আবার প্রীতি। এই জীবনেই কত বার শোকে বা হ্রেষে বা নৈরাশ্রে মরিলাম; কতবার আশায় বা প্রীতিতে বা ভক্তিতে বাঁচিলাম। দুঃখ ও সুখ, হ্রেষ ও প্রীতি, মৃত্যু ও জীবন, শীত ও বসন্ত, মর্ত্যে চক্রবৎ ঘুরিতেছে। কিন্তু সময়ের সহিত একটা পরিবর্তমান উদ্দেশ্য, একটা পরিবর্তমান উন্নতি চলিতেছে। এষ্ট উন্নতির মূল আশা। আশার ভিতর দুইটি বস্তু আছে; একটা ইচ্ছা, আর একটা বিশ্বাস;—সুখী বা ভাল হইবার ইচ্ছা, সুখী বা ভাল হইতে পারিব এষ্ট বিশ্বাস। স্মৃতি ভূতকাল ও বর্তমানকে সংবদ্ধ করে, আশা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুখময় সূত্র দ্বারা গ্রথিত করে। আশাতে আর একটা দ্রব্য আছে। তাহা কল্পনা।—ভবিষ্যতে যে যে সুখ হইতে পারে, আশা তাহা কল্পনা করে, কল্পনা করিয়া সেই সুখ অমুভব ও উপভোগ করে। তাই কবি বলিয়াছেন—

What future bliss he gives not thee to know,

But gives that hope to be thy blessing now.

স্মৃতি যেমন ভূতকালকে বর্তমানে নিহিত করে, আশা তেমনি ভবিষ্যৎকে বর্তমানের কোড়ে আনিয়া দেয়। কিন্তু, স্মৃতি নির্বিশেষে সুখ দুঃখ দুইই আন-

মন করে ; আশা কেবল সুখমাত্র চয়ন করে, দুঃখকে তাগ করে । আশার এমনি মোহিনী শক্তি,—যে বাস্তবিক উপভুক্ত সুখ হইতেও প্রত্যাশিত উপভোগ্য সুখ অধিকতর রমণীয় ! ঐ যে শারদীয়া পূজা আসিতেছে, পূজার সময় বাজী বাইব, পিতা মাতার চরণধূলি লইব, পতিপ্রেম সোহাগিনীর প্রেমরঞ্জিত হস্ত দেখিব, প্রাণাদিক পুত্রকে কোলে লইব—কত আশা, কত সুখ ! পূজা আসিল, বাজী বাইলাম—পিতামাতা, পত্নী পুত্র, সব দেখিলাম—সুখ বটে । কিন্তু যত সুখ আশা করিয়াছিলাম, যেন তত সুখ পাইলাম না । ঐ যে যুবা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে, কত আশা করিতেছে—“বি এল দিব, উকীল হইব, টাকা করিব, মস্ত বাড়ী করিব, যুড়ি গাড়ি করিব, আমার বৈঠকখানা প্রতিদিন লোকে গম্ গম্ করিবে, প্রেমসীকে স্বর্ণ-হীরক-মণ্ডিত করিব”—ইত্যাদি কত আশায় এক্ষণে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছে । কিন্তু যখন সে উকীল হইল, প্রকাণ্ড বাড়ী করিল, ওয়েলার ঘোড়ার জুড়ি হাঁকাইল, পত্নীর দেহ সোণা আর হীরায় ঢাকিয়া দিল—তখন আর তাহার তেমন সুখ হইল না ! যোদ্ধা নিভৃত কক্ষে ভাবী সংগ্রামের ধারা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এক দিন তিনি রণ-বিজয়ী হইয়া দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন অথবা রাজা হইবেন, দেশের সমুদয় লোক তখন তাঁহার নিকট নতশির হইবে, রাজলক্ষ্মী তখন তাঁহার গৃহলক্ষ্মী হইবেন—এইরূপ কত আশা করিতেছেন । জীবনে সবই ঘটিল । কই, আশাতে যত সুখ পাইয়াছিলেন, ঘটনাতে তাহা পাইলেন না । তাই নেপোলিয়নের জীবনে উপরিউক্ত সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্য যখন সবই ঘটয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যখন অজ্ঞাত নগণ্য ব্যক্তি ছিলাম, আমার হীন বাসাবাটীর একটা ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বসিয়া, আমার ভাবী কার্য্যপ্রণালীর ধারাপাত করিতাম, এবং ভাবী জীবন আশার তুলিতে অঙ্কিত করিতাম—আমার জীবনের মধ্যে সেই সময় সর্বাপেক্ষা সুখময় । বাস্তবিক উপভুক্ত সুখের অপেক্ষা আশা-কল্পিত উপভোগ্য সুখ অধিকতর মনোহর । বাহা দূরে তাহা-চিন্তহারী । তাই আশার কবি বলিয়াছেন—*'Tis distance lends enchantment to the view.* সুন্দরী ঈশ্বর-দ্রোহী ব্যক্তিগণ ইহাকে “আশার ছলনা” বলিয়া ঈশ্বরকে নিন্দা করেন । সুন্দরী ব্যক্তিগণ বলেন, এই আশার মধ্যে মানবজীবনতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে । এই আশা-পুষ্প অমরত্ব বীজের পূর্বসূচনা ; মানুষের জীবন বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে, ইহলোকে পরিসমাপ্ত নহে, এই পরমার্থতত্ত্বের মহান্ সঙ্গীত আশা মধুর-

নবপ্রভা ।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩০৯ সাল ।

[১ম সংখ্যা ।

“নবপ্রভা”র নব বর্ষ ।

আশা ও প্রীতি ।

“আদর্শ—প্রীতি ; উপায়—চেষ্টা, অত্যাশা, নিভৃত-চিন্তা ও সাধুসঙ্গ ;

আশা—ভগবদমুগ্ধ ও আশ্বাস অমরত্ব” .

“The Law of Love is the Law of Life”

“নব বৎসরে, কুহ কুহ করে, কে ডাকেরে ।”

আবার বসন্ত আসিল—আশার ও প্রীতির সম্ভার লইয়া, পুলকিত বদনে আমাদের নিকট আসিল—তাহার কোকিলের কুহ কুহ প্রণয় সঙ্গীত, তাহার কিশলয়-শোভিত তরুণাখা, তাহার চুতমঞ্জরী, তাহার প্রাণারাম মলয়-মারুত । সহস্র স্মৃতি জাগাইয়া, পুরাতন জীবনকে নূতন করিয়া, কঠিন বাস্তব জগতের নধো কোমল স্বাপ্নিক রাজ্যের মধুরিমা বিস্তার করিয়া—হে ঋতুরাজ--তুমি কিসের সুসংবাদ প্রচার করিবার জন্য—আমার নিকট আসিলে । তুমি, শীতের সঙ্কোচ দূর করিয়া, ক্লান্ত জীবনের বিষয় বাসনা, বিবাদ বিসম্বাদ, ঘেঘ ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা নীচতা, হুঁচিস্তা হুংখ, তাবৎ তাড়াইয়া দিয়া, কবিত্বের, সৌন্দর্য্যের, দেবত্বের, প্রীতির, আশার মনোমোহন মেলা ধুলিলে । গতবৎসরে যেমন প্রীতি-ভরে দেখা দিয়াছিলে, বিংশতি বৎসর পূর্বে যেমন সম্মুখে আমাকে আনিজন করিয়াছিলে,—তাহারও পূর্বে, নবযৌবনের অরুণোদয়ে যেমন একটা নূতন শোভার জগৎ আমার চক্ষের সন্মুখে ধরিয়াছিলে, যেমন একটা মধুর কি-জানি-কিরূপ মিলনের আশা দিয়াছিলে,—প্রাণে প্রাণে গিশাইয়া, হৃদয়ের তন্ত্রী সহিত

হৃদয়ের তন্ত্রী বাজাইয়া, কেমন একটা মধুর সঙ্গীত শুনাইবার আশা দিয়াছিলে—
 অদ্য বহুকাল পরেও—তেমনি একটা মধুর স্নেহ, মধুর শোভা, মধুর সঙ্গীতের,
 মধুর প্রীতির আশ্বাস দিতেছ । আজি যে তেমনি মিলনের দৈববাণী শুনিতেছি ।
 তবে, এক্ষণে একটীতে একটীতে মিলনের পরিবর্তে, একের সহিত বিশ্বের
 মিলনের আশা দিতেছ । পূর্বেও যে পথ দেখাইয়াছিলে, এক্ষণে সেই
 পথ—তবে, এক্ষণে সেই পথ আর পূর্বের ত্রায় সংকীর্ণ নহে, প্রীতি-
 রাজবস্ত্র দেখিতে পাঠিতেছি—প্রশস্ত, উদার । এখন বসন্তানিলের সহিত
 প্রাণ বিশ্বপ্রেমের আকাশে উড়িতে চাহে, স্বার্থপরতা পিঞ্জরটা ভাঙ্গিয়া জীবন-
 বিহঙ্গ স্বর্গের দিকে ছুটিতে চাহে । মুক্ত হইবার চেষ্টা এত দিন নিষ্ফল হইল,
 তথাপি এই বাসন্তী দেবী আমার আত্মাকে বলিতেছেন, “হতাশ্বাস হইও না” ।
 কোকিলের কুহরবে মনে হইতেছে, বিশ্বজগৎকে বিশ্বপতিকে একদিন প্রাণের
 সহিত ভালবাসিতে পারিব ; প্রাণস্বিনী যেমন তাহার প্রাণনাথের হৃদয়ে বিলীন
 হইয়া যায়, তেমনি একদিন বিশ্বপতির হৃদয়ে বিলীন হইয়া আনন্দময় হইতে
 পারিব । কোকিল কুহনে বিরহিনীর প্রাণ যেমন পতির উদ্দেশে উড়ু উড়ু করে,
 তেমনি কোকিলের এই কুহরবে বুঝি আজি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথের উদ্দেশে
 প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতেছে—

মহাকবি গাইয়াছেন—

পরহুত ! মছর-পলাবিণিকস্তী
 গন্দন বণ-স্বচ্ছন্দ-ভগন্তী
 ক্ষত পঠ পিঅঅম সা মছ দিট্টা,
 তা আঅকুথহি মছ পরপুট্ট ॥

পরভূতে মধুরপ্রলাপিনি ! কাস্তা নন্দনবনে স্বচ্ছন্দং ভ্রমন্তী । যদি ত্বয়া
 প্রিয়তমা সা মম দৃষ্টা, তদাচক্ষু মহুং । অর্থাৎ “হে মিষ্টভাষিণী কোকিল !
 আমার প্রিয়তমাকে ভ্রমণ করিতে যদি দেখিয়া থাক আমাকে বল ।” আমিও
 বলি, হে কলকষ্ঠ কোকিল ! আমার প্রিয়তমকে কোথায় তুমি দেখিয়াছ ?
 নন্দনকাননে, না বৈকুণ্ঠে—আমাকে বল ।

হে কোকিল ! “হ্যাং কামিনো মদনদূতীমুদাহরন্তি”—কামিজনেরা
 তোমাকে মদনের দূতী স্বরূপ বলিয়া থাকে । কিন্তু, অদ্য এই পবিত্র বসন্তে,
 তোমাকে ভগবানের দূত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । তাই বলি, মাং নয়াণ্ড
 মূহুভাষিণি যত্র মে পরমেশ্বরঃ । হে মূহুভাষিণি যেখানে আমার পরমেশ্বর

প্রথমে এই অপূর্ণ প্রীতি-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। অনুসন্ধান করিলে, এই প্রবৃত্তির মূলে এখানেও হয়ত স্বার্থ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, প্রীতিতে জননী মনুষ্যজাতির শিক্ষাগুরু হইলেন। সংপ্রবৃত্তি হউক, আর অসংপ্রবৃত্তি হউক, বোধ হয় উভয়ই সংক্রামক। প্রথমে জনক সুস্বাদু কোমল শিশুমাংস নাখে মাখেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, জননী শিশু সন্তান লুকাইয়া রাখিত। ক্রমে ক্রমে জননীর দৃষ্টান্তে হয়ত জনকের ভক্ষণ স্পৃহা কমিতে লাগিল। আর, জনক দেখিল, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, অনেক সময় সাহায্য করে, প্রীতিকর কার্য্য করে। তখন পুত্রের প্রতি শনৈঃ শনৈঃ প্রীতি সঞ্চার হইতে লাগিল।

মানুষ যেমন দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে লাগিল, তেমনি বুঝিতে পারিতে লাগিল, নিজের দলের মধ্যে, পরস্পরের উপকার করাতে প্রত্যেকের সুবিধা আছে। আনি যখন বিপদে পড়িলাম, আর এক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিয়া আমাকে উদ্ধার করিল। তেমনি সে যখন বিপদে পড়িল, আমি তাহাকে সাহায্য করিয়া উদ্ধার করিলাম। উভয়ে বুঝিলাম, পরস্পরের উপকারে প্রত্যেকেরই সুবিধা। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের উপকার করিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা ক্রমে অভ্যাসগুণে একটা প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইল। * তখন মনুষ্য নিজের সুখ হইবে বলিয়া, অন্যের উপকার করে না, অভ্যাসবশতঃ বা অভ্যাসজাত প্রবৃত্তিবশে অন্যের উপকার করে। তখন, যে সুখ মূলে আত্মমুখী ছিল, তাহা পরমুখী হইল, যাহা “ইগোয়িস্টিক” ছিল, তাহা “আন্টেয়িস্টিক” হইল। তখন প্রীতির জন্ম হইল। তখন জীব অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, অন্যের সুখে নিজের সুখ। তখন নীতির আবির্ভাব হইল; কর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল মন্দ প্রভেদ জ্ঞান জন্মিল। নীতি আরও উন্নত হইলে প্রীতিতে পরিণত হয়। নীতির বিষয়, অন্যের প্রতি আমার কর্তব্য ও অকর্তব্য।—প্রীতির বিষয়ও তাহাই। তবে নীতিতে আনন্দ থাকিতেও পারে, আনন্দ নাও থাকিতে পারে। যখন নীতি আনন্দের সহিত সম্মিলিত, তখন তাহা প্রীতি। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে আহাৰ দিলে, যদি তাহা তোমার ত্যাগ স্বীকার বোধ হইল, আনন্দ বোধ হইল না, কেবল কর্তব্য বলিয়া তুমি নীরস হৃদয়ে তাহা করিলে, তাহা নীতি, কিন্তু প্রীতি নহে। তুমি যদি দয়া-বিগলিত, আনন্দ-উচ্ছলিত হৃদয়ে সেই কাজ কর, তাহা হইলে তাহা প্রীতি। নীতি এই প্রীতির অন্তর্গত।

* Mutual Aid as a Factor in Evolution. By Prince Kropotkin.

সভা সমাজ যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতেছে তাহার মূল-কারণ পুলিশ বা আদালত নহে । তাহার কারণ নীতি বা প্রীতি । যদি এই নীতি ও প্রীতি সমাজে না থাকিত, লোকে পরস্পরকে একটুও না ভালবাসিত কেবল হিংসা করিত, তাহা হইলে আইন আদালতের কাজ দিয়াও কেহ যাঁতত না, আইন আদালতের সৃষ্টিই হইত না । তবে আইন আদালত কি নীতি বা প্রীতির চিহ্ন ? হাঁ, একপক্ষে । অধিকাংশ লোকের নীতি বা প্রীতির বিরুদ্ধে, নানাংশ ব্যক্তিগণের অনীতি বা অপ্রীতি যে কার্য্য করিবার সম্ভাবনা, তাহারই নিবারণ করিবার জন্য আইন আদালত । প্রীতি বা নীতি বলে—“পরস্পর অপহরণ করা দূরে থাকুক, যাহার অভাব তাহাকে দান কর ।” অপ্রীতি এই কথা বুঝে না, সে সুবিধা পাউলোই, দরিদ্রেরই হউক, ধনীরই হউক, পরস্পর আত্মসাৎ করিবে । তাই প্রীতি বা নীতি, তাহা নিবারণের জন্য, আইন, আদালত, প্রহরী সংস্থাপন করিল । প্রীতি ও নীতি যত উন্নত হইবে যত বিস্তৃত হইবে, ততই শাসনের প্রয়োজন কমিয়া যাউবে ।

আমরা রাজাকে বা গবর্ণমেন্টকে সমাজের শৃঙ্খলার রক্ষক মনে করি । হর্ষ অজ্ঞানব্যক্তিগণ রাজার অভাবে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, সমাজের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে ; এ কথা সত্য । কিন্তু স্মরণে দেখিলে, ধর্ম্মপ্রচারকগণই, প্রীতিবর্দ্ধকগণই সমাজরক্ষক । তাঁহারা বন্দুক বা তরবারি দ্বারা শত্রু নাশ করেন না । তাঁহারা ঘৃণা হিংসা লোভ প্রভৃতি অসংযত রিপুগণকে নাশ করেন, বিশৃঙ্খলার মূল কারণকে নষ্ট করেন, এবং সমাজে প্রীতি-সাম্রাজ্য শনৈঃ শনৈঃ সংস্থাপিত করেন । ইহলোকে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মুখে, সমাজতত্ত্ববাদীদিগের মুখে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের কথা যে শুনা যায় তাহা এই প্রীতির সাম্রাজ্য । ইহা সংস্থাপিত হইলে, গবর্ণমেন্ট, পুলিশ আইন, আদালতের প্রয়োজন থাকে না । হার্কট স্পেন্সারের জ্ঞান গভীর তত্ত্বদর্শী ও আশা করেন, মানবজাতি এই অভ্যুৎকৃষ্ট অবস্থাতে একদিন উন্নত হইবে ।

এই প্রীতিবিস্তারই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, নীতির উৎকর্ষ, মনুষ্যের ক্রমবিকাশের লক্ষ্য । এই প্রীতি-রাজ্য সংস্থাপনের জন্য সমুদায় মানবজাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে । জ্ঞানিগণ এক্ষণে বুঝিতেছেন যে এই প্রীতির অভাবে “সভ্যতা” সভ্যতা নহে, চাকচিক্যময় বর্করতা মাত্র । আমরা প্রথমে ইংরাজি পড়িয়া রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফকে, কামান ও বন্দুককে এবং রূপা বাহু জাঁকজমককে সভ্যতা বলিয়া ভাবিয়াছিলাম । কিছুদিন পরেই এই ভ্রম গেল । আমি একদিন বকিম বাবুর

ফাল্গুন, ১৩০৯।]

‘নবপ্রভা’র নব বর্ষ।

৫

স্বরে দিবানিশি গান করিতেছে। বিশ্ব হৃদয়ে জীবন নাকি অনন্ত, তাই আশাও মানব হৃদয়ে অনন্ত। তাই তব্ধ কবি বলিয়াছেন,—

Hope springs eternal in the human breast ;
Man never is, but always to be blest.
The soul uneasy and confined, from home,
Rests and expatiates in a life to come.

আশা অনন্ত উন্নতির মূল। বাহ্য আছে তাহাতে মানুষ যদি সন্তুষ্ট থাকিত—তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থায় বাইবে এই আশা যদি না করিত—তাহা হইলে মানুষের উন্নতি হইত না ; পশুগণ যেমন উন্নতির চেষ্টা না করিয়া এক অবস্থায় চিরকাল রহিয়াছে, মানুষও তেমনি চিরকাল একই অবস্থায় পশুর মত থাকিত। তাহা হইলে মানুষ দ্বিপদ পশু হইত। আশা মনুষ্যত্বের চিহ্ন ও উচ্চ অধিকার। আশা মনের স্বাস্থ্য,—নৈরাশ্র ও ভয় মনের ব্যাধি। আশা হৃদয়কে উৎসাহে বিক্ষারিত করে, দেহে, শিরায়, শ্বাস্যুতে বল সঞ্চার করে ; নৈরাশ্র ও ভয় দেহকে দুর্বল ও অবসন্ন করে। আশার এমনি মহতী শক্তি যে বিনা চিকিৎসায় কত রোগীকে রোগমুক্ত করে : নৈরাশ্র ও ভয় এমনি অনিষ্টজনক যে সুস্থ ব্যক্তিকেও রোগী করে। হৃৎকের দ্বিপ্রহরা ঘোরা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে, আশাই মনুষ্য হৃদয়কক্ষের একমাত্র দীপ। আশা পরাজয়ের মধ্যেও জয়, দারিদ্র্যের মধ্যেও ধন, রোগের মধ্যেও স্বাস্থ্য, বিচ্ছেদের মধ্যেও মিলন, মৃত্যুর মধ্যেও জীবন, বন্ধনের মধ্যেও মুক্তি। বাহ্য আশা নাই সে দৃঢ় কাষ্ঠ, সে জীবন্মৃত, সে জীবিতাবস্থায় শ্মশানে চিতাশারী হইয়া আস্তে আস্তে পুড়িতেছে। হে ভগবন্ ! যতদিন জীবন থাকে, ততদিন যেন আশা থাকে।

সংসারে যে সকল মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাহ্যরা মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সকলেই আশার বরপুত্র। মিলটাউডিস ও ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও গ্যারিসন, কন্সকিউস্কো (Kosciusko) ও কশুট (Kossuth), —বুদ্ধদেব ও খৃষ্ট—সকলেই আশার পুত্র ! আর প্লেটো, আর মূর—আর রবার্ট ওয়েন, ডে সেন নিমঃ (Saint Simon), ফুরিয়ে (Fourier) মার্ক্স (Marx) স্পেন্সার—রস্কিন, টলষ্টয়, জোলা—ইহারা সকলেই আশার সন্তান : প্লেটোর “রিপাব্লিক” ও মূরের “ইউটোপিয়া,” তাহাদিগের আদর্শ সমাজের আশা। ফুরিয়ে, রস্কিন প্রভৃতি মহাপুরুষগণের গ্রন্থ ও জীবন অনাহার-দারিদ্র্য-নাশী সমাজতন্ত্র স্থাপনের মহতী আশা, প্রীতিতে অনুপ্রাণিত।

আশা যেমন সুখ ও দুঃখের মধ্যে দুঃখ ত্যাগ করিয়া, সুখই নির্বাচন করিয়া লয়, প্রীতি তেমনি স্বার্থপরসুখ ও পরার্থপর সুখের, নিজের সুখ ও পরের সুখের মধ্যে, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া, পরের সুখ মনোনয়ন ও অনুধাবন করে, এবং অবশেষে পরকে সুখী করিয়া নিজেও সুখী হয় । প্রীতি তর্ক করে না, লাভ-লাভ গণনা করে না, হিতবাদ বা সুখবাদ বা নীতিবাদ কিছুই বিচার করে না, সে কেবল ভালবাসে, আর যাহাকে ভালবাসে তাহাকে সুখী করিয়া সুখী হয় । প্রীতি যেমন সম্বন্ধিত হয়, তেমনি সে অধিক লোককে ভালবাসে, তখন সে কেবল পত্নী পুত্র কিম্বা পিতা মাতা ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিয়া পরিতৃপ্ত থাকে না, সে পরিবারের বাহিরে যায়—যেখানে দুঃখ দেখে সেখানেই তাহার সান্ত্বনার কোমল কর প্রসারণ করে । সে যখন খুব পরিবর্তিত হয়, তখন সে সকলকেই সুখী করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে । সমুদয় মনুষ্যের ক্রমবিকাশ, সমুদয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এই প্রীতির বিকাশ । জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৃদয়, হৃদয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রীতি । সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উঠিয়াছিল । কৰ্ম্ম দ্বারা অনবরত হৃদয় মন্থন করিয়া প্রীতি উৎপন্ন হয় । প্রীতি অমৃত, ইহাতে অমরত্ব লাভ হয় । বিবর্তবাদ বা পরিণামবাদ মতে যেমন নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমবিকাশসূত্রে উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হয়, তেমনি হৃদয়ের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ও ক্রমবিকাশে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রীতির উৎপত্তি হয় । মানুষ অসভ্য অবস্থায় কেবল নিজের সুখ চাহে, বাহাতে নিজের সুখের বাধা হয়, তাহাতেই ক্রুদ্ধ হয়, তাহাটী নাশ করিতে চাহে । যাহাকে নাশ করিলে নিজের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে নির্বিকারচিত্তে নাশ করে । একজন অসভ্যের ক্ষুধা হইল । নিকটে আর কিছু নাই, কেবল তাহার মাংসল জীবী উপস্থিত ছিল । বর্ষা দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল । তাহার মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল । সেখানে একজন ইংরাজ দাঁড়াইয়া এত ভীষণ বাপার দেখিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া সেটী জীবাশ্মক অসভ্য ব্যক্তিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাত, অসভ্য ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে বলিল “উত্তম, মাংস উত্তম” । এখানে, এই বর্কর ব্যক্তির প্রীতির এমন অভাব, যে সে পত্নী বুকে না, পুত্র বুকে না, বুকে আপনাকে, বুকে কেবল আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিকৃষ্ট সুখ । কোন কোন পশু-জননী নিজের সন্তান ভক্ষণ করিয়া ফেলে । উল্লিখিত অসভ্য ব্যক্তি পশু হইতে অধিক দূরে নাই । সমুদয় মনুষ্যজাত এককালে এই শোচনীয় বর্কর অবস্থায় ছিল । তাহার পর কৰ্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে প্রীতির উন্মেষ হইয়াছে । অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যের মধ্যে জননী-হৃদয়ে

ফাল্গুন, ১৩০২ ।

‘নবপ্রভা’র নব বর্ষ ।

৯

বহুসংখ্যার বানায় সন্মিলন পর বসিয়া আছি । সেখানে বঙ্কিম বাবু, কবি হেম বাবু, ডাক্তার ৮ বিহারী লাল ভাট্টা মহাশয় ছিলেন । কথায় কথায় বঙ্কিম বাবু বলিলেন England is not civilised—ইংলণ্ড সভ্য হয় নাই । আমি সহসা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না । কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বুঝিলাম । বাঙ্গলার প্রধান ঔপন্যাসিক বাহা তখন বলিয়াছিলেন, বিংশতি বৎসর পরে (১৯০০) ফরাসির প্রধান ঔপন্যাসিক (Zola) New York World নামক পত্রে তাহা লিখিয়াছিলেন ।—“Civilized ? Not Yet !” অর্থাৎ ইউরোপ এবং মার্কিন এখনও সভ্য হয় নাই । কারণ এখনও তথাকথিত সভ্য জগতে অনেক পরিমাণে প্রীতির অভাব দেখা যাউতেছে । বস্তুত, সভ্যতাই বল, ধন্যই বল, মনুষ্যের চরম উন্নতিই বল, সবটাই এই ক্ষুদ্র কথা “প্রীতি”র অন্তর্গত ।

যে প্রীতি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও উৎকর্ষ, “নবপ্রভা”রও তাহাই উদ্দেশ্য, তাহাই আদর্শ । মানব-প্রীতি বিষয় ষাঁহার চিন্তা করেন, নিজের সামর্থ্যানুসারে এক একটা পন্থা উদ্ভাবন করিবার, এক দিকে অগ্রসর হইবার, চেষ্টা করেন । নবপ্রভাও তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুসারে একটা পথে চলিতে চাহে । নবপ্রভা এক্ষণে একটা “প্রীতির আশ্রম” স্থাপন করিতে চাহে । কিরূপে এ অধম জন সেই স্বর্গের স্বপ্ন, বর্ণনা করিবে । পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ঋষি-লেখক থাকেন, তিনি আসুন, তিনি এই পবিত্র প্রীতির আশ্রম বর্ণনা করুন, কেমন করিয়া ইহা স্থাপন করিতে হইবে, আমাদিগকে উপদেশ দিন, এবং এই সদহু-ষ্ঠানে আমাদিগকে সাহায্য করুন । আমি এই “প্রীতির আশ্রম” স্বপ্নে দেখি- যাছি, কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে বা কার্য্য পরিণত করিতে অদ্যাপি অসমর্থ । তবে আমার ক্ষুদ্র দরিদ্র শক্তিতে যতদূর পারি তাহা বারাস্তরে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব । এক্ষণে, নবপ্রভার পাঠকগণ ! নবপ্রভার তৃতীয় বর্ষারম্ভে, আপনাদিগকে আশা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করি । নবপ্রভার পাঠিকাগণ ! আপনাদিগকে আশা ও ভক্তির সহিত অভিবাদন করি । আমরা ও আপনারা সকলেই এক তীর্থের যাত্রী—আবার এক সঙ্গে, নববর্ষে, তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করি ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ।

পুরাণের রচনাকাল ।

বৈদিক যুগে যে পুরাণেতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি কিকিরপ ছিল তাহা হয়ত জানিবার কোন উপায় নাই । নূতন মহাভারতকার প্রণেতা অনুক্রমণিকার লিখিয়াছেন যে পুরাণ, আখ্যায়িকা, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট হইল । বৈদিক যুগের সাহিত্যে যে সকল আখ্যায়িকা বা আখ্যায়িকার অংশ পাওয়া যায়, মহাভারতের আখ্যাত কথা, কোথাও তাহার অনুরূপ, এবং কোথাও বা তাহা পরিবর্তিত, বা পরিবর্তিতভাবে দেখিতে পাই । সংক্ষিপ্ত হউক, বিক্ষিপ্ত হউক, বা প্রক্ষিপ্ত হউক, পুরাণ বলিয়া এ কালে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেইগুলি দেশমধ্যে পুরাণ বলিয়া মান্য । এই পুরাণগুলির আখ্যায়িকার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার অনেক প্রভেদ আছে ; কিন্তু পৌরাণিক কথা বলিতে গেলে দেশের লোকে এই পুরাণের কথাই বুঝিয়া থাকে । আলঙ্কারিক যুগের কবিগণ এই পুরাণগুলির আখ্যায়িকাট উপভুক্ত করিতেন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্য কর্ম্ম এইগুলিই অবলম্বিত হইতেছে । প্রাচীনকালে পুরাণের অস্তিত্ব যে ভাবেই থাকুক, এই প্রচলিত পুরাণগুলি যে কোন্ সময়ে রচিত, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব ।

হরিবংশকে যদি পুরাণ বলা না যায়, তাহা হইলে ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে এ কালের প্রচলিত কোন একখানি পুরাণও যে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

সুবঙ্কর, বাসবদত্তা এবং বাণভট্টের কাদম্বরীতে হরিবংশ এবং বায়ুপুরাণের নাম পাওয়া যায় । সুবঙ্কু ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, এবং বাণভট্টের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বায়ুপুরাণ তৎপরে আরও পরিবর্তিত হইয়াছে কি না, জানি না ; কিন্তু ওখানি যে নূনকল্পে ষষ্ঠ শতাব্দীর পুরাণ, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না । সম্ভবতঃ কালিদাসের কুমারসম্ভব, বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকার অনুবর্তী । কোন গ্রন্থে নাম উল্লেখ নাই বলিয়া যে পুরাণগুলি ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপরেবর্তী সময়ের গ্রন্থ নহে, এ যুক্তি অবলম্বন করা বড় নিরাপদ নহে । উইলসন্ সাহেব এবং কতিপয় ইংরাজ পণ্ডিত, প্রায়শঃ ঐ প্রকার যুক্তির বলে পুরাণগুলির রচনাকাল যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই প্রমাদক মনে হইয়াছে ।

ব্রহ্মপুরাণ এবং স্বন্দপুরাণের সম্বন্ধে এ কথা বলা যাউতে পারে, যে ঐ দুই-খানি ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা, কারণ উহাতে উৎকলের তাঁপের কথা এবং হগরাথ দেবের বিষয় উল্লিখিত আছে । কিম্বা কোন্ প্রমাণের বলে, শ্রীমদ্ভাগবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ হইল, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িল, তাহা বুঝির অগম্য । বঙ্গদেশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং রাণী ভবানীর সভায় শ্রীমদ্ভাগবত লইয়া যে সকল তর্ক উঠিয়াছিল, তাহার মূলে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ; সে কথা বড় সুবিধাজনক নহে । নোপদেব যে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পর ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাট ; কথাটা নিতান্ত অসার । পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তের পূর্বে রচিত । অল্প তর্ক পরিভাগ করিয়া কেবল রাধার আবির্ভাব দেখিয়াও এ কথা স্বীকার করিতে হয় । জয়দেবের গীতগোবিন্দ, দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ ; ঐ গ্রন্থের অষ্টমঙ্কা রাধা । রাধার সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, কদাপি সর্বলোকভোগ্য গীতগোবিন্দ রচিত হইতে পারিত না । দ্বারা নগরাধিপতি বাকুপতি রাজের একখানি দানপত্র, ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারির ষষ্ঠভাগে মুদ্রিত আছে, ঐ দানপত্রের তারিখ ১০৩১ সংবৎ অর্থাৎ ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে । ঐ দান পত্রে “তৎ-রাধা বিরহাতুরং মুররিপোবেল্লৎ-বপুঃ পাতু বঃ” দেখিতে পাই । তাহা হইলে রাধা ঠাকুরাণীর বয়স বড় কম নহে । অস্তিতঃ পক্ষে ইহার ৫০ বৎসর পূর্বে তাহার সৃষ্টি না হইয়া থাকিলে, এরূপভাবে উল্লেখ পাওয়া যাউত না । ব্রহ্মবৈবর্তেই যদি রাধার জন্ম, তাহা হইলে ঐ পুরাণ কদাচ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভের পরবর্তী হইতে পারে না ।

রাধার জন্ম যখন নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ভাগবতের পরে, তখন কোনপ্রকারে ঐ পুরাণকে ৯ম শতাব্দীর পরবর্তী করা যায় না । শ্রীমদ্ভাগবতের মতো এমন কি আভ্যন্তরিক কারণ পাওয়া গিয়াছে জানি না, যাহা দ্বারা ঐ পুরাণ মুসলমানদিগের আগমনের সময়ের পরবর্তী বলিয়া কীর্ষিত হইয়াছে । বরং আমি বাহ্য দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থ মুসলমানদিগের আগমনের বহুপূর্ববর্তী বলিয়া মনে হইয়াছে । কলি অবতার সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ের পুরাণে লিখিত হইয়াছে, যে ঠাকুর স্বেচ্ছগণের সংহারের জন্য আবির্ভূত হইবেন । তদবলম্বনে গীতগোবিন্দেও দেখিতে পাঠ, “স্বেচ্ছনিবহ নিধনে কলরুসি করবালং” । কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে ভারতবর্ষীয় রাজাগণ যখন দক্ষার মত পরস্পরের

প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিবেন, তখনই কঙ্কির আবির্ভাব হইবে।—১ স্বক্কের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে :—

অথাসৌ যুগসঙ্কায়ানং দম্মা প্রায়েষু রাজসু

জনিতা বিষ্ণু যশসো নাম্মা কক্কিজ্জগৎপতিঃ ।

ষাদশ স্বক্কে এই কথা আরও বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। সেখানে লিখিত হইয়াছে, যে যখন দেশীয় লোক নাস্তিক হইয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র উপবীত ধারাই চিহ্নিত হইবে, শূদ্রেরা রাজা হইবে, তখনই কঙ্কি অবতার হইবেন। যদি মুসলমানদিগের কথা পুরাণকর্তার স্বপ্নেও জানা থাকিত, তাহা হইলে কদাচ সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। ভবিষ্যৎ রাজবংশের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মেকলে যে অষ্ট যবন (শবরগণ) রাজত্ব করিবে, সে কথা আছে। কিন্তু অষ্ট যবনের পরাভবের পর উৎকলে হিন্দু প্রভাব বিস্তারের কথা নাই। কাজেই এই সময়টা বড় জোর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ। শ্রীমদ্ভাগবত সে বিষ্ণুপুরাণের পরবর্তী তাহা নিঃসন্দেহ। বিষ্ণুপুরাণে যখন ঐ অষ্ট যবনের মেকলে রাজত্ব করিবার কথা আছে তখন ঐ গ্রন্থ ৮ম শতাব্দীর বলিয়াই অনুমান করা সম্ভব। সে হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবত সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর পুরাণ। এ গণনার ইংরাজ-পণ্ডিতগণের এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার ৪০০ বৎসরের প্রভেদ পাড়াইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে দেখাইবার জন্ত, নারায়ণের ২৪টি অবতারের কথা আছে। হয়ত এটা বুদ্ধের ২৪ জন্মের কথার সহিত প্রতিযোগিতা। লিঙ্গপুরাণে আবার শিবকে কৃষ্ণের উপর আসন দিতে গিয়া, তাঁহার ২৮ অবতার কল্পিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ লিঙ্গপুরাণ দশম শতাব্দীর গ্রন্থ।

চণ্ডী ও তুর্গা যে ভাগবতের পূর্বে পূজিত হইতেছিলেন তাহা ভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত মনে হয়, যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীর শেষভাগের গ্রন্থ। ৮ম শতাব্দীর প্রথমেও যে চণ্ডী অনার্যের দেবী, তাহা ৭ম বৎ ৮ম শতাব্দীর কবিগণের রচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে অল্প প্রাচ্যে বিশেষ কথা লিখিয়াছি। এখানে বলিয়া রাখি যে মহাভারতের যে দুইটি অধ্যায়ে তুর্গাস্তব পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত। যে কেহ মহাভারত পড়িলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মহাভারতের

কুত্রাপি ছুর্গার নাম নাট, বা মাধায়া নাট ; অথচ ষাঁহাদের মাধায়া বিশেষ-
ভাবে বর্ণিত, সে সকল দেবতা ছাড়া, মহা নিতান্ত অপ্রয়োজনে ছুর্গা ও
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

পদ্মপুরাণে, কালিদাস বর্ণিত ধ্রুবংশের বিবরণ এবং শকুন্তলা উপাখ্যান
দেখিতে পাওয়া যায় । এই পুরাণে এবং মৎস্য পুরাণে বিক্রমাদিত্য রাজার
কথাও পাওয়া যায় । সম্ভবতঃ এই দুইখানি বিষ্ণুপুরাণের সমসাময়িক, অথবা
কিঞ্চিৎ পরবর্তী ।

ভবিষ্য পুরাণ, বায়ুপুরাণের মত প্রাচীন বলিয়াই স্বীকৃত ; সেইজন্য এ
বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না । দেখা গেল যে প্রধান
প্রধান পুরাণগুলির একখানিও ১০ম শতাব্দীর পরবর্তী নহে । অতীত পুরাণ-
গুলি যে মুসলমান রাজত্বকালে রচিত তাহাতে আমার সন্দেহ হয় নাট ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

ধর্মপূজা ।

(১)

রাঢ়ে ।

এ পূজা কাহার ?

এ পর্য্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর তালিকার যত নাম উঠিয়াছে, ধূপ দীপ গন্ধপুষ্প
নৈবেদ্যাদি দ্বারা ষাঁহাদের অর্চনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের
মধ্যে যে সকলেই সমান শক্তিসম্পন্ন, মর্ত্যবাসীগণের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ,
মানাপমান ইত্যাদি ঐহিক ব্যাপারের কর্তৃত্বাধিকারী বা ধর্মার্থ কামমোক্ষাদির
প্রদাতা বিধাতা তাহা নহে—তাহাদিগকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে
পাঠি : প্রথম শ্রেণীতে আছেন পাঁচটি—শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, এবং বিষ্ণু ।
ইহারা সাধক দ্বারা “একমেবাদ্বিতীয়ং” জ্ঞানে পূজিত ও উপাসিত । ইহারা
চতুর্দশ দানে সমর্থ ; সাধককে ইহকালে অতুল ঐশ্বর্য্যে সুখী ও সম্পন্ন করিতে
এবং পরকালে স্বর্গবাসে সুখী করিতে, এমন কি অবস্থা বিশেষে মুক্তি দান
পদার্থ ও ত্রিতাপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন । ইহারা হিন্দুর গুরুদত্ত দীক্ষার
দেবতা ! ঐহিক ঐশ্বর্য্য এবং পারলৌকিক মোক্ষ ইহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্র

ভাগবতী—মনে করিলেই দিতে পারেন । এই পাঁচটি দেবতা ভিন্ন, আর কাহার ঈদৃশী ক্ষমতা নাই । •একজ্ঞ দেবতা মধ্যে ইঁহাদিগের আসন সর্বোচ্চে—হিন্দুর যাগযজ্ঞ, বিবাহ, অন্নাদান, পূজা, হোম ও শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কার্যে সর্বোচ্চে ইঁহাদিগের পূজা করিতে হয়, গণেশাদি পঞ্চদেবতা বলিতে এই পাঁচটি দেবতা-কেই বুঝায় । ইঁহারা ভিন্ন হিন্দুর উপাস্ত দেবতা আর নাই—এবং ইঁহাদের উপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকও হিন্দুর মধ্যে আর নাই । হিন্দু এই পাঁচটির অন্ততম দেবতাকে অভীষ্ট জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন । গুরু শিষ্যকে তাহার কুলপ্রথানুসারে তত্তৎ দেবতার মন্ত্র দান করেন । শিষ্য সেই গুরুমন্ত্র পাঠিয়া সাধনা দ্বারা সার্থক হইলেন ।

কিন্তু ধর্ম্যযোগী গৃহী ইষ্টদেবতাকে “একমেবাদিতীয়াং” জ্ঞানে উপাসনা করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চোপাসকেই গৃহস্থাত্ম্যে থাকিয়া শাক্ত নির্দিষ্ট পূজা হোম যাগযজ্ঞ দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ে সর্বদা প্রস্তুত, অত্যাশ্রয় পস্থা অপেক্ষা গৃহীর পক্ষে ইহাই সুপ্রশস্ত, ও সুগম । কারণ তাহাতে মানব পরকালে স্বর্গবাসে সক্ষম হয়, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞানে সংসারী হিন্দু ধর্ম্যযোগেই সমধিক আস্থাবান । দুর্গোৎসব কালের অশ্বমেধের তুল্য কলপ্রদ—ইহা শুনিয়া বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণবের মন স্থির থাকিতে পারে না—মা মহামায়ার ত্রীপাদপদ্মে বিশ্বদল গঙ্গোদক দিবার জন্ত শরদাগমে লালায়িত হয় । তিনি শারদীর মহাপূজা উপলক্ষে তিন দিন শূদ্রভজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি নানা জাতীয় লোককে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া চিত্তের প্রফুল্লতা লাভ করেন,—পরকালের কথা পরকালে কিন্তু ইহকালে তদ্বারা যে সুখটুকু ভোগে আইসে তাহাও নিতান্ত অল্প নহে । এই হিসাবেই রাস, দোল, রথ-যাত্রাদির উৎসবে শক্তিসাধক নিকৎসাহ নহেন ।

তদতিরিক্ত কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি সৌর, কি শৈব, কি গাণপত্য পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া প্রশমনার্থ সবিভূমণ্ডল মধ্যবর্তী সহস্রশীর্ষ পুরুষের উদ্দেশে সচন্দন তুলসীদল অর্পণ করিয়া থাকেন, কালীঘাটে দেবীমাহাত্ম্যপাঠ করাটতেও ক্ষান্ত নহেন, মহাভ্রাতি ধ্বাস্তারি দিবাকরকে অর্ঘ্যদানে তুষ্ট করেন । ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর দেবতা, ইঁহাদের সম্বন্ধে পৃথক কথা । আবার সর্পভীতি নিবারণের জন্ত বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার মনসা দেবীকে স্মরণ করিতে হয়, অপুত্র-কতা দোষের পরিহার জন্ত দেবসেনাপতি ষড়নেনের আশ্রয় গ্রহণ, পুত্রকন্তা দিগের জ্ঞানের অমুরোধে বাগ্‌দেবীর করুণা ভিক্ষা, দুসন্ধ্যা হুবেলা উদর পরি-

তোষার্গ ধনদার প্রসন্নতা প্রার্থনা না করিলেই চলে না । তাহার উপর পরি-
জনগণের মধ্যে কাহার বসন্ত হইলে শীতলাদেবীর পূজা, শীতলাষ্টক পাঠ না
করিয়া কে ক্ষান্ত থাকিতে পারে—আবার স্মৃতিকামাশায়ী শিশুর কল্যাণ
কামনার্থে গৃহী হইয়া কে ষষ্টি দেবীর অবমাননা করেন? এতক্রমে নানা কার্যের,
নানা অনুরোধের জন্য হিন্দু অসংখ্য বা তেত্রিশকোটি দেবতাকে মানিয়া চলেন ।
উপবিষ্ট পক্ষ দেবতা বাদে সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন ।
কাবণ বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না । প্রথম শ্রেণীর দেবতাদিগের সহিত ইহ
কাল ও পরকালের, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতাগণের সহিত কেবলমাত্র ইহকালের
সম্বন্ধ । হিন্দু শাস্ত্রকার কোনমতে দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কুষ্ঠিত নহেন—
• আকাশে আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক পাল, মর্তে বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান
বিষ্ণুর দশাবতার, মহাশক্তির দশমহাবিদ্যা নবর্গাদি মূর্তি, কত নাম করিব;
তেত্রিশকোটি দেবতা বাধির মধ্যে যাহার মহত্ব একরূপ মহাবাধির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা ধর্মরাজ, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রকার দেব দেবীর তালিকা ভুক্ত করেন নাই
কিন্তু বঙ্গীয় কবি বিপুল বিস্তৃত গ্রন্থে বাহার মহিমা বর্ণন করিয়া ফুরাইতে
পারেন না—যাহার নাম শুনিতে রাজবাসী হিন্দুব অস্তুরাশ্রয় কাঁপিয়া উঠে,
যে গ্রামে ধর্মঠাকুর আছেন, সেই গ্রামবাসীগণ ধর্মের পূজা মহোৎসবে ঐকান্তি-
কতা সহকারে যোগ দিয়া থাকেন, ধর্মের নামে সহস্রবার দণ্ডবৎ প্রণত হইবেন,
শাস্ত্রকারের কপা ধবেন না, অবনত মস্তকে ধর্মরাজের চরণাবিন্দ ছন্দে ধারণ
করেন—এ দেবতা কে? এ পূজাই বা কাহার—ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে স্বতঃই
চিন্তা আকৃষ্ট হয় না কি?

দেবতার ধ্যানমন্ত্রে তাঁহাকে অনেকটা চিনিতে পারা যায়, কেন না, ধ্যান
মন্ত্রে তাঁহার আকার অবয়ব, ক্রিয়া, কর্তৃত্ব, মহিমা মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত থাকে ।
অতএব অন্যান্য বিষয় আলোচনার পূর্বে আমরা ধর্মঠাকুরের ধ্যান মন্ত্রটি
দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করিব । তৎসৌকর্য্যার্থে এ স্থলে ধ্যানমন্ত্রটির
পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন,—

বস্ত্রাস্ত্রো নাদি মধো ন চ করচরণো নাস্তি কারো নিনাদঃ ।

নাকারো নৈব রূপঃ ন চ ভব মরণে নাস্তি জন্মানি যন্ত ॥

যোগীন্দ্রে ধ্যানগমাং সকল জনময়ং সর্বলোটেককনাথং ।

ভক্তজনাং কামপূরং সুরনরবরদং চিত্তয়েৎ শূন্যমূর্তিং ॥

যাহার আদি অস্ত্র মধ্য নাহি, শব্দ নাহি, আকার নাহি, বর্ণ নাহি, মরণ ভয়

নাই, এবং জন্মও নাই । যিনি যোগীন্দ্রগণের ধ্যানগম্য, সৰ্ব্বজীবে অবস্থিতি করেন, স্বৰ্গমর্ত্যপাতালাদি বহু লোকের নাথ, ভক্তগণের কামনা পূৰ্ণকারী, সুরেনরগণের বরদাতা, এসম্প্রকার শূন্যমূৰ্ত্তিঃ চিত্ত' কর ।

ধ্যানমন্ত্ৰের অৰ্গ পরিগ্রহ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বা শ্বেত পীত নীল লোহিতাদি বর্ণ বিশিষ্ট কোন সাকার মূৰ্ত্তির ধ্যান নহে—ধ্যানমন্ত্ৰে স্পষ্টই বলা হইয়াছে “শূন্যমূৰ্ত্তি” । অতএব ইহা নিরাকার, পরব্রহ্মের ধ্যান—একপ ধ্যান-মন্ত্ৰ হিন্দুর কোন দেবতার নাই । ইহাতে পৌত্তলিকতার কোন সংশয় আইসে না । “শূন্য বাহার মূৰ্ত্তি, সৰ্ব্বজীবে যিনি সমান ভাবে অবস্থিতি করেন, এই ধ্যান তাহার । তাঁহাকে চক্ষে দেখিবার নহে, শ্রোত্র দ্বারা শুনিবারও নহে, অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের ইনি প্রত্যক্ষ যোগাও নহেন । ধ্যান অনুসারে ধর্ম্মরাজ নিরাকার ব্রহ্ম ।

এই সংস্কৃত ধ্যান ধর্ম্মপূজার প্রধান অবলম্বন । আমরা ধর্ম্মপূজার প্রধান কেন্দ্র হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট, দিগড়া, দৌলংপুর, বেঙ্গাই, শম্ভা প্রভৃতি স্থানে অন্তঃসন্ধান জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত সংস্কৃত ধ্যানটী ধর্ম্মপূজার অবশ্য ব্যবহার্য্য, নিত্য পূজার শেষে অন্যান্য দেবতার স্তব পাঠের ন্যায় রমাই পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গলা কবিতাগুলিও অবশ্য পাঠ্য । উহা ধর্ম্মের কাহিনী বলিয়া খ্যাত ; যে সকল ধর্ম্ম পণ্ডিত নিরক্ষর, তাহারাও এ সকল কাহিনী পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে, বাহারা তাহাও অভ্যাস করিতে না পারে তাহারা কেবল “ধর্ম্মায় নমঃ” বলিয়া জল পুষ্প দ্বারা পূজা শেষ করে । বস্তুগত্যা উপরিউক্ত সংস্কৃত ধ্যান বাতীত ধর্ম্মের পূজা হয় না । এই ধ্যানমন্ত্ৰ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আধুনিক রচনা নহে । ইহা সঙ্গত ও সম্ভবপরও হইতে পারে না, কারণ বঙ্গীয় ধর্ম্মপুরাণ লেখকেরা ধর্ম্ম ঠাকুরকে গুলকান্তি, গুলবস্ত্রধারী বলিয়া বর্ণন' করিয়াছেন, তাহা হইলে ধ্যানমন্ত্ৰও তদনুযায়ী হইত । পৌত্তলিক পুরোহিত কর্তৃক একপ উচ্চ ভাবের এবং উচ্চ আদর্শের ধ্যানমন্ত্ৰ রচনা সম্ভবপর নহে । ধর্ম্মপূজার প্রথমাবস্থাতেই যে এই ধ্যানমন্ত্ৰ রচিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমান ও সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় । হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতির মূলে নিরাকার ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই ছিল না, পশ্চাৎ সাধকের ধারণাশক্তির স্বকৃত্যপ্রযুক্ত উপাসনা-কার্য্যের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছিল ।

“উপাসনার্থ সাধুনাং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা ।”

ধর্মরাজের ধ্যানমগ্ন দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে ধর্মরাজ ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র, তাহা না হইলে কখন ধ্যানমগ্নে তাঁহাকে নিরাকার নন্দা হইত না । কালক্রমে সাধকের শূণ্য মূর্তির অনাস্রুতা প্রবৃত্ত তাঁহার রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকিবে ।

ধ্যান মধ্যে বাহা বুঝা গেল দেখা যাউক তদতিরিক্ত তাঁহার নামের কোন সার্থকতা আছে কি না । ধর্মরাজ যদি দেব দেবীর তালিকায় থাকিতেন তাহা হইলে সহজেই তাঁহার তত্ত্ববোধ সুবিধাজনক হইত, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকার আমাদিগকে অন্ধতমসে ফেলিয়া গিয়াছেন । সর্বশক্তের অর্থ পরিগ্রহার্থ কোষকার-গণের সাহায্য গুলভ—তাঁহাদের মধ্যে অমরসিংহট সমধিক প্রসিদ্ধ । তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

সর্বজ্ঞঃ স্রুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ ।

সমস্তভদ্রো ভগবান্মার জিল্লোক জিজ্ঞিনঃ ॥

ষড়ভিজ্ঞো, দশবলোহুদ্রবাদৌ বিনায়কঃ ।

মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তথঃ ॥

স। শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌকোদনিষ্ঠ সঃ ।

গৌতমশ্রী বজ্রশ্রী মারাদেবীসুতশ্রী সঃ ॥

ধর্মরাজের নামবাচক শব্দ—সর্বজ্ঞ, স্রুগত, বুদ্ধ, তথাগত (বেক্রপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইরূপে যিনি আগত) সমস্ত ভদ্র (সমস্ত = সমস্ত বিষয়ে + ভদ্র = ভাগ্যবস্ত, (বুদ্ধ) ভগবৎ (ষড়ৈশ্বর্যবান) মারজিৎ (মার = কাম + জিৎ = যে জয় করে, বুদ্ধ ও শৈব) লোকজিৎ (লোক = জগৎ + জিৎ = জয় করে যে, বুদ্ধ) জিন (জি = জয় করা + নক, তপঃপ্রভাবে যিনি বিশ্বকে জয় করেন) ষড়ভিজ্ঞ (ছয়টি বিদ্যায় অভিজ্ঞ যিনি, ১ । দিব্যচক্ষু শ্রোত্র, ২ । পরচিন্তাজ্ঞান, ৩ । পুরুষজ্ঞানস্বরূপ, ৪ । আত্মজ্ঞান, ৫ । বিষয়গতি অর্থাৎ আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি এবং ৬ । কার্যব্যুৎপত্তি অর্থাৎ দেহের যন্ত্রের সংস্থাপিত জ্ঞান ক্ষমতা এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, বুদ্ধ, দশবল (দশটি বল বিশিষ্ট) অহুদ্রবাদিন্ (অহুদ্রবাদী) বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, মুনি । তিনিই শাক্যসিংহ, শাক্য মুনি সর্বার্থ সিদ্ধ, শৌকোদনি (শুকোদনের পুত্র) গৌতম, অর্কবজ্র এবং মারাদেবীর পুত্র ।

ধর্মরাজ বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শুকোদনের পুত্র, মারাদেবীর পুত্র

ইত্যাদি পরিচয়ে আমরা বুঝিতেছি যে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবটো ধর্মরাজ । অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য । বুদ্ধদেব খ্রীষ্টীয় শকের পূর্ববর্তী ষষ্ঠ শতাব্দীতে অন্তার হইয়াছিলেন । বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫২ বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইলেন । মতান্তরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে । যাহাই হউক, যে প্রকারেই হউক চৌদ্দ শত বৎসর ধর্মরাজ বুদ্ধদেব বলিয়া পরিগৃহীত—বড় কমদিনের কথা নহে ।

প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন বুদ্ধদেব ঈশ্বরে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, এইজন্য হিন্দু পৌরাণিকেরা তাঁহাকে নাস্তিকাবতার বলিয়া গিয়াছেন । প্রবাদ এইরূপ যে অমরসিংহ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি বুদ্ধদেবের “অদ্বৈতবাদী” অন্যতম আখ্যা মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন । অদ্বৈতবাদী বলিতে সেকালে যেন বুদ্ধদেবকেই বুঝাইত । আর মনে হয় তাঁহার পূর্বে অদ্বৈতবাদী আর কেহ ছিলেন না । সে যাহাই হউক, বুদ্ধদেবের একেশ্বরবাদিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা অমরসিংহের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহি, তবে একটা সুবুদ্ধির কথা বলি এই যে—সে মনস্বী মহাপুরুষ ঐহিক সুখসম্পদ, রাজ্য ধন ভূগবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে ও তাপত্রয় জনিত জীবের দুঃখ দূরীকরণের উপায় চিন্তায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি ইঞ্জিয়নিগ্রহ দ্বারা সংযত—বিষয় বাসনা পরিশূন্যতা ও পরার্থ চিন্তা হেতু নিকাম যিনি সর্বার্থসিদ্ধি নামে পরিচিত তাহার জ্ঞান নিশ্চল ও নিশ্চল মনে যে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি হয় নাই, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত । সত্য বটে তিনি ঈশ্বরের প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠানের আতিরিক্ত তাঁহার অন্য প্রকারে উপাসনার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া ঈশ্বর যে নাই এ কথাও কোথাও কোনপ্রকারে ঘোষণা করিয়া যান নাই । যখন তিনি নির্বাণরূপ পরমপদ প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ এবং জন্মজন্মান্তরের সাধনায় যে পরম “বুদ্ধপদ” প্রাপ্তির ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মপদ—নির্বাণলাভ হইলে আর পুনঃ পুনঃ জননো জঠর যাতনা সহ্য করিতে হয় না, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয়ে দগ্ধ হইবার ভয় থাকে না,—তাঁহার তখনকার অবস্থা—গিরি নদীর জায়, শত শত কোণ ভ্রমণে সহস্র সহস্র জনপদ অতিক্রমে তিনি মহাসমুদ্রের অঙ্গীভূত । তখন তিনি দেবগণের দেবতারূপে সূর্যমান, তখন আর তাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য থাকে না—অগাধ, অনন্ত তখন আর তাঁহার জন্মজরা মরণাদি কোথায়,? তাই বুদ্ধকে তাঁহার উপাসকেরা

ফাল্গুন, ১৩০১ ।]

ধর্মপূজা ।

১৯

পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন,—আমরা গ্রন্থাস্তর হইতে বুদ্ধদেবের অপর একটি ধ্যান মন্ত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা দ্বারা কুত্ৰাপি ধর্মরাজের পূজা হইয়া থাকে কি না বলিতে পারি না ।

শাস্তং সদা প্রাণীদধাতিভীতং বৃহজ্জটাজ্জট ধরোত্তমাসং ।

তনুল্লসদ্ গৈরিক গৌরবজ্জং যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেরং ॥

এখন বলি হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুদ্ধদেবকে পরব্রহ্মের অবতার স্বীকার করিয়াও কেন তাঁহাকে ধর্মরাজরূপে পূজা করিতে উদাসীন অবলম্বন করিয়াছেন, নানা পুরাণ নানা উপপুরাণ মধ্যে নানা দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিলেও ধর্মরাজের পূজার কথা উল্লেখ করেন নাই ।

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ শীর্ষস্থানীয়, হিন্দু ধর্ম হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া, তাহাতে ব্রাহ্মণ বাহ্য করিবেন তাহাই হইবে । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের নিকট যেন দেবতার দেবত্বও অকিঞ্চিংকর তদপ্রতিপাদনার্থ পরব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে কোমলভের সঙ্গে ভৃগুমুনির পদচিহ্নকে দেদীপ্যমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ভাবিয়া দেখুন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কত চেষ্টা, কত যত্ন, কত অমূল্যত্ব, কত আড়ম্বর—সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে যিনি আঘাত করিতে প্রস্তুত তাঁহাকে ব্রাহ্মণ নিমিষে নষ্ট করিতে পারিলে ছাড়েন না, ছাড়িবেনই বা কেন—এ হেন জাতিত্ব গৌরবকে আহত দেখিয়া কে নিশ্চিন্ততা অবলম্বন করিতে পারে—শুধু গৌরব নহে, তাহার নহিত অন্য স্বার্থেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই এমনও নহে ! বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু ঠাকুর যদি জনদ গম্ভীর শব্দে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রতিকূলে কোন ঘোষণা করেন, তাহা হইলে তাহাও ব্রাহ্মণের নিকট আদর পায় না, হয়ত তিনি বলিবেন—উহা বৈকুণ্ঠাগত বিষ্ণুশ্বর নহে, না হয় লিখিবেন, সত্য ত্রেতা স্বাপর কলির কতক অংশে বিষ্ণুর ভীমরতি হইয়াছে, তাই আজি তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, অথবা তিনি দস্তাপহারী—ব্রাহ্মণকে যে সম্মান দিয়াছিলেন, তাহা পুনর্গ্রহণ-প্রয়াসী ।

বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, নীচ শূদ্র আচণ্ডালকে পৌরহিত্যাদিকার অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে হ্রস্ববহু আঘাত করিয়া গিয়াছেন,—সরল, শুদ্ধ ও সঙ্কলিতহীন যে কোন জাতি পুরোহিত হইবে ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পক্ষে আর কি অধিক মর্ম্মস্তুদ হইতে পারে । ধর্ম-চর্চার সকলেরই সমানাধিকার—ইহা ব্রাহ্মণের প্রাণে কোন মতেই সহ্য হইতে পারে না । যে ধর্মে শূদ্র ও অস্বাজাতিমের পৌরহিত্যে অধিকার জন্মিল সে

ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের সহায়ত্ব প্রত্যাশা আকাশকুসুমের ন্যায় । যে ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, আচঙাল শূদ্রের যে ধর্ম্মচর্চায় সমান অধিকার তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে পতিত ধর্ম্ম—আচঙাল শূদ্রে ধর্ম্মপূজার অধিকার গাইয়া একবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, হিন্দুসমাজে কি বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিল, ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষা ভার হইয়া উঠিল—হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি চঞ্চল হইল—জুঁগি জোঙ্গা ডোম আর ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত স্বীকার করিল না—পিতৃমাতৃ শ্রাধে, পুত্রকন্যাদির বিবাহ অন্নাদিতে, দোল দুর্গোৎসবে আপনারাই পৌরহিত্য করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে নবশাকাদি শূদ্রের প্রতিও সন্মেলনের সঙ্কল্প না হইতে পারিলে কেন ? যে অত্যন্ত কাল মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা ভাবিলে মনে হয় যেন ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্তের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল—ব্রাহ্মণের অসম্ভব আধিপত্য অনেকেরই পক্ষে অসম্মত হইয়া উঠিয়াছিল, যেন তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য ব্রাহ্মণের সকলেরই একপ্রাণতা জন্মিয়াছিল । বুদ্ধদেব যেখানেই আপন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন সেখানেই দলে দলে তাঁহার অনুচর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় অসাধারণ পুষ্টলাভ করে—সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের উপযুক্ত কর্ণধার ছিলেন না । উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ব্রাহ্মণগণ ধারপরনাই স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেকেরই বিরাগভাজন হইলেন, নতুবা বৈশাখী সন্ধ্যা সমুখিত বাত্যা বিতাড়িত তৃণপুঞ্জের স্থায় হিন্দুর হিন্দু উড়িয়া যাইবে কেন—হিন্দুধর্ম্ম সমূলে কম্পিত হইবেই বা কেন—একমাত্র জাতিভেদের অতিকূলতা করিয়া বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের বিবেচভাজন হইয়াছিলেন—সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে অচিরকাল মধ্যেই তিনি সধর্ম্মীর দল পুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের সহায় হইয়া স্বয়ং তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা না হইলে হয়ত তিনি এতদিন একটা হিন্দুধর্ম্মদেষ্টা দানব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন ।

বৌদ্ধরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে অভক্তি করিতেন না—কখন কাহার বৃত্তিচ্ছেদও করেন না—প্রত্যুত ভূমিদান দ্বারা তাহারা বাহাতে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি দ্বারা নিরুদ্ধে কালব্যাপন করিতে পারিতেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, হিন্দু-ধর্ম্মানুসৃত ক্রিয়াকলাপেও তাহাদের অনাস্তা ছিল না, অদ্যাপি বৌদ্ধরাজগণের প্রদত্ত ভূমিদান বিষয়ক যে কয়খানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । গোড়ের বৌদ্ধরাজ মহীপাল দেব মহাবিশুব সংক্রান্তিতে গঙ্গানানরূপ পুণ্যকার্যের আনুসঙ্গিক কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে

এবং পালবংশীয় অশ্রুতম বৌদ্ধ নরপতি মদনপাল স্বীয় মতিবীর বাসপ্রোক্ত মহাভারত শ্রবণের দক্ষিণাস্বরূপ তৎপাঠক বটেশ্বর স্বামী ব্রাহ্মণকেও ভূনিদান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা আরও একটি তথ্য অবগত হওয়া যায়—প্রাচীন বৌদ্ধগণ অহিন্দু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না—হিন্দুধর্মের পুরাণাদি পাঠে তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, হিন্দুর অমুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের অবজ্ঞা ছিল না। অধুনা ঐচ্ছিকতঃ সম্প্রদায়িক বৈষম্যবাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও যেমন তাহারা হিন্দু বলিয়া চলিয়া যাঠিতেছেন, তৎকালে ভারতীয় বৌদ্ধগণও তদ্রূপে হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত হয়েন নাই। ইহাও আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের কোণল, স্বার্থহানির শঙ্কায় তাহারা বৌদ্ধদিগকে হাতছাড়া করিতে পারেন নাই। কিন্তু মনে মনে সাধারণ বৌদ্ধ ও ভিক্ষুকগণের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার না করিলে বৌদ্ধরাজ্যের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইতে হইত, বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি হিন্দুসম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে হিন্দু সম্প্রদায় একবারে হীনবল হইয়া পড়িত—কালে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া আসিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম পুনর্গ্রহণেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবার আশা ছিল—নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, অগ্রপশ্চাত্ত্যববেচনা করিয়া তৎকালিক হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকে দলছাড়া হইতে দেন নাই। বর্তমান এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্য ছিল, প্রমার প্রতিপত্তির একটানা স্রোত বহিয়াছিল, তত দিন এইরূপেই ঘটয়া গিয়াছিল, কিরূপে কোন সময়ে কি ভাবে সেই একটানা স্রোতের ভাটা আরম্ভ হয় তাহা ধর্মপূজার ইতিহাসের সহিত আলোচিত হইবে।

ফলতঃ ধর্মরাজ্যরূপেও যদিও এ দেশে অদ্যাপি বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত বুদ্ধোপাসক কেহই নাই। এদেশের ধর্মপণ্ডিতেরা কেহই ধর্মবৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত নহে, ধর্মরাজকে অভীষ্ট দেবতারূপে পরলোকের পবিত্রাভা বলিয়া স্বীকার করে না—তাহাদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, হিন্দুর পূর্ব কথিত পঞ্চোপাসকেব অনাতম। ফল কথা তাহা না হইলেও ধর্মপূজা দ্বারা এখনও যে এ দেশে বুদ্ধপূজা প্রচলিত আছে তাহা সহস্রবার স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মগাজন যে বৌদ্ধোৎসবের রূপান্তর তাহাও অস্বীকার করা যায় না—এদেশে যদিও এখন প্রকৃত বৌদ্ধ নাই কিন্তু বুদ্ধপূজা আছে।

শ্রীঅধিকাচরণ গুপ্ত ।

রাঢ়ে ধর্মপূজা ।

(প্রতিবাদ)

সর্বত্র ধর্মপূজা হয় । (কেবল রাঢ়ে নহে ।)

“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” ।

কেহ ভাবিবেন লেখক ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ প্রস্তাব লিখিতেছেন, তাহা নহে । এখন কতকগুলি লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া সর্বদাই এবং সর্বপ্রকার কথাবার্তার লেখাপড়ার ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন তাঁহারা দাস্তিকতার সহিত কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য লোপ হইবে বলিয়াই তাঁহারা শূদ্রজাতিকে দাসত্বে চির-নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে তাহাদিগের চক্ষু-কন্মীলন হইয়াছে, সুতরাং আর এখন ব্রাহ্মণকে গুরু বলা বিধেয় নহে । এতাদৃশী স্পর্ধা করিয়া থাকেন, যেন সত্য সত্য পাশ্চাত্যশিক্ষার বলে ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ ও অবঃকৃত করিয়াছেন । তাহারই প্রমাণ দর্শাইবার জন্য সেদিন “রাঢ়ে ধর্মপূজা” এই শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যের বিলোপ এবং অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন । ফল কথা ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে বিষয়াসক্ত নতুবা তাঁহাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের নিকটও স্পর্ধাপূর্বক কে যাইতে সমর্থ তাহা বলিতে পারি না । নিস্পৃহ ব্রাহ্মণের ক্ষমশীলতার অদ্যাপি কেহ সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা এখনও কেহ বলিতে সমর্থ নহেন । তথাপি “রাঢ়ে ধর্মপূজা”র লেখক কহেন “ধর্মপূজাটি ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন । ধর্মপূজা শূদ্রেরই আরম্ভ, অনুষ্ঠিত, উপক্রান্ত এবং প্রতিষ্ঠিত, শূদ্রযাজী পুরো-হিতেরা শেষে শূদ্রের নিকট হইতে ছলে, বলে, কলে, কোশলে “ধর্মপূজাটি” সংগ্রহ করিয়াছেন । শূদ্রের এ বিষয়ে যে একাধিপত্য আছে তাহার প্রমাণ দর্শাইবার জন্য শূকর বলির উল্লেখ করিয়াছেন । ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত ধর্মপূজার পদ্ধতি হইলে উহাতে কখনই শূকর বলির ব্যবস্থা থাকিত না ।

এই কথাটিই লেখকের প্রধান অবলম্বন । সুতরাং সাধারণে মনে করে কথাটি প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য । বাস্তবিকই তাহাই কি ঠিক—তাহা নহে । ধর্মপূজা যে সর্বত্র হয় এবং ব্রাহ্মণেরাষ্ট যে তাহার অনুষ্ঠানকর্তা ও সংস্থাপক তাহাই দেখান কর্তব্য । শূকর বলির এক কথাতেই মীমাংসিত হইবে । যথা—মহুঘা-

ফাল্গুন, ১৩০৯ । ।

রাঢ়ে ধর্মপূজা ।

৩

মাত্রেই ধর্মবুদ্ধিতে স্বীয় স্বীয় ভোজ্য জন্য ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করেন না । আর্ঘ্যজ্ঞাতির কথা সুদূরপরাহত, অথ জ্ঞাতির কথা বলি । খৃষ্টানগণ মদ্যাদি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া সেবন করেন । মুসলমানেরা কুকুটাদির মাংস তাহাদিগের কোরাণের বিধি অনুসারে ঈশ্বরে নিবেদন করিয়া থাকেন । অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য ইতর লোকেও ঈশ্বর মানেন এবং খাদ্য বস্তু ঈশ্বরে সমর্পণ না করিলে যে উহা অখাদ্য হয়, এ বোধ অনায়াসসিদ্ধ, কাজে কাজেই “ধর্মপূজায়” হলে, বাগ্‌দো, ডোম জাতি যে ধর্মপূজায় শূকর বলি না দিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না । মদ্য তাহাদিগের একান্ত হৃদ্য ও ক্লান্তি বিনাশক । শূকর তাহাদিগের নিত্যস্ত মনোরম খাদ্য বস্তু, তাহারা অসুরবিশেষ, অসুরেরা ভোজন না করিতে পারেন এমন বস্তুই অশ্বসিদ্ধ ! কুকুরা কুকুর পিষ্টক খায়, চীনেরা বিড়াল খাইয়া পরমানন্দিত হয় । কোড়া জাতির সর্পের মস্তক ছেদন করিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্বক ভোজন করিয়া থাকে । সুতরাং ইহারা ধর্মবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে যাহা উৎসর্গ করে তদ্বিষয়ে কে প্রতিবন্ধকতা করিতে সমর্থ । এবং বাধা দিবারই বা প্রয়োজন কি ? প্রতিবন্ধকতা করাই দোষ ।

আর্ঘ্যদিগের ধর্মশাস্ত্রে বলে, ফল পুষ্প পত্র মৎস্ত মাংসাদি যাহা ভোজনার্থে প্রয়োজন তৎসমস্তই ঈশ্বরে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয় ।
যথা—বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

“পত্রং পুষ্পং ফলং ভোজ্যমন্নপানাদামৌষধং ।

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত বদাহারায় কল্পিতং ॥”

অনিবেদিত বস্তু খাইলে বিষ্ঠা ভোজন তুলা, যথা—

মৎস্তশৃঙ্গে—

অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্তমাংসাদিকঞ্চযৎ ।

অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং বদ্বিক্ষেণ নিবেদিতং ॥

বিষ্ণোরিতি দেবতামাত্রোপলক্ষণং

যথা অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামবাক্যং

যদন্নং পুরুষো রাজং শুদন্নাস্তস্মৈ দেবতাঃ ।

একণে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করা যাউক আর গৌরচন্দ্রিকা অথবা ভণিতায় প্রয়োজন আবশ্যক করে না । ধর্মের পূজা গর্হিত । যথা—

ধর্মরাজ স্বতঃসিদ্ধদেবতাও বটে এবং কখনও যম কখনও শিব কখন নারায়ণ রূপে বর্ণিত ও পূজিত হইয়া থাকেন ।

আমাদিগের দেশে ধর্মের মহিমা এত প্রবল যে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না । সুতরাং বরখা আড়ম্বর না করিয়া কেবল দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে যে, সর্বদাই সর্বত্র ধর্মের পূজা হইয়া থাকে । যথা লোকে ধর্ম্মমা, ধর্ম্মবাপ, ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মকন্তা পাতাইয়া থাকে । সে সম্পর্কে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র অনুভব হয় না, উভয়পক্ষে ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় উভয়েই আবদ্ধ । ঔরস পুত্র কন্তার সহিত ধর্ম্মপুত্র বা কন্তার কিঞ্চিৎমাত্র ইতর বিশেষ দেখা যায় না । ধর্ম্মপিতা, ধর্ম্মমাতা, ধর্ম্মভ্রাতা এবং ধর্ম্মবন্ধু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবন্ধনে ইহলোক ও পরলোকের সহায় ।

ধর্ম্মের পূজার প্রভাবে ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের প্রাপ্তি এবং পরকালে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । তদনুসারে প্রত্যাহ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয় । পঞ্চ মহাযজ্ঞের বেদাধ্যাপনকে ঋষি যজ্ঞ কহে, পিতৃযজ্ঞ শব্দে তর্পণ, ও শ্রাদ্ধাদি হোমের নাম দেবযজ্ঞ । প্রাণিগণের আহারদানকে ভূতযজ্ঞ কহা যায় । অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ শব্দে নির্দেশ করে । গৃহস্থ মাত্রকে প্রত্যাহ এই পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয় । এক্ষণে যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপন না করাইতে পারেন তিনি অস্তুতঃ তিন বেদের তিনটি শৃঙ্খল আবৃত্তি করিয়া থাকেন । পিতৃলোকের তর্পণে বমতর্পণে স্পষ্টেই ধর্ম্মের নামে অগ্রে জলাঞ্জলি দিতে হয় । ইহা বিজ্ঞাতি ও শূদ্র সকলেই করিয়া থাকেন । যথা—

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চাস্তকায়চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায়চ ।

ওড়ম্বরায় দম্নায় নীলায় পরমিষ্ঠিনে ॥

বকোদরায় চিত্তায় চিত্রশুণ্ডায় বৈ নমঃ ॥

এখানে ধর্ম্ম যমরূপে সর্বদাই সর্বলোকে পূজিত ।

লোকে কোন প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা সম্পাদনে ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে ; স্থল বিশেষে ও কার্য বিশেষে ধর্ম্মের উদ্দেশে প্রকৃতপক্ষে ঘটস্থাপন ও যথাবিধি পূজা পূর্বক প্রতিজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে । কোথাও বা তাহার অনুকূলে কেবল প্রতিজ্ঞা বাক্যে সত্যের দোহার (অর্থাৎ সারবস্তা) প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত করা হয় । প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তিবর্গ ধর্ম্মবন্ধন হইবে অর্থাৎ সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে পরিচূত না হয়েন এই জন্ত সর্বদা ধর্ম্মের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । ইহা পূজার অঙ্গ ও প্রকার ভেদ মাত্র ।

ধর্ম্মরাজ লিঙ্গরূপী, ধর্ম্মরাজ নারায়ণ শিলারূপী, ধর্ম্মরাজ অশ্বখবৃক্ষরূপী

ফাল্গুন, ১৩০৯।]

রাঢ়ে ধর্মপূজা।

২৫

সুতরাং তাঁহার পূজা চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে স্থানভেদে শিবের গাজনে প্রসিদ্ধ—উত্তর অঞ্চলে শিবলিঙ্গে ধর্মের পূজা ও গাজন (অর্গাং সন্নাসীর গজ্জন) হয়।

দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে নারায়ণ শিলায় ও অশ্বখবৃক্ষে ধর্মের পূজা ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

অনুত্র মৃশিলা, দাক্ষ ও ঘটাদিতে উপাসকের ইচ্ছা বশতঃ ধর্মরাজ যথাবিধি পূজিত হইয়া থাকেন। এতদ্বশে চৈত্র সংক্রান্তি অক্ষয় তৃতীয়া অথবা বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঘটের ব্রত হইয়া থাকে। তাহাতে যে মন্ত্র আছে তাহা শূদ্রের রচিত নহে সুতরাং ধর্মপূজা শূদ্রের অনুষ্ঠিত হইয়া কদাপি বলা যায় না।

নারদীয় পুরাণে এবং বায়ুপুরাণে শ্বেতবরাহ কল্পে গয়া মাহাত্ম্যে যাহা লিখিত আছে তদৃষ্টে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে গয়াশ্রদ্ধে অগ্রে ধর্মের পূজা করিতে হয়। ধর্মরাজ শালগ্রাম শিলায় অশ্বখ বৃক্ষে এবং রুদ্ররূপে অবস্থিত আছেন। প্রমাণ যথা—

ধর্ম ধর্মেশ্বরংনম্রা মহারোষিতকুম্মমেৎ।

চন্দ্রলায় বৃক্ষায় সর্বদা স্থিতিহেতবে।

বোধিসত্ত্বা যজ্ঞায় অশ্বখায় নমোনমঃ।

সপ্তম অধ্যায় ৩০ শ্লোক।

গয়া শ্রদ্ধাকালেই ধর্মরাজ ও যমরাজ পৃথকরূপে পূজিত হইয়া থাকেন যথা।

ততো যমবলিং দদ্যাৎ মন্ত্ৰেণানেন সংযতঃ।

যমরাজ ধর্মরাজে নিশ্চলার্গং হি সংযতো ॥

তাভ্যাং বলিং প্রদাশ্চামি পিতৃণাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।

৭অ ৪২ শ্লোক।

এই সকল পৌরাণিক জাজ্ঞনামান প্রমাণ সত্ত্বেও কি শূদ্রবর্ণ কহিবেন, ধর্মপূজা শূদ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত। যদি বর্ণেন বনুন, পাঠকগণ উহার বিচার করিবেন। ব্রাহ্মণের অপ্রাপ্তি স্থলে শূদ্রেরা স্বয়ং পূজা করিয়া থাকে। ছলে, ডোম, মুদ্গাকরস প্রভৃতি অস্ত্রাজ জাতির পুরোহিত নাই। সুতরাং তাহারা স্বয়ং পূজা করে। তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদিগের স্বরূপ যোগ্যতা স্বীকৃত হইবে? ঐ সকল নীচ ইতর ও অস্ত্রাজ জাতির উদরান্নের সহায় শীতলা দেবী, মনসা দেবী। তাই বলিয়া কি উহাদিগকে ব্রাহ্মণের পথ প্রদর্শক ও উপদেশক বলা যাইবে? কদাচ না। মনসা পৌরাণিক দেবতা

ছলে বাগ্দৌ ডোমের মস্তিষ্ক সম্ভূত। নহে । মহাভারতের আন্তিক পর্ব দেখ ।
যথা—

আন্তিকস্ত মূনেমাতা ভগিনৌ বাসুকে স্তথা ।

জরৎকার মূনেঃপত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে ॥

(বসন্ত) শীতলা, ওলাউঠা প্রভৃতি মহামারী সমুদয় রোগে প্রকৃতির পূজা হইয়া থাকে । সুতরাং ঐ সকল পূজার প্রকরণ ও পদ্ধতি ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত, শূদ্রের আবিষ্কৃত নহে । মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য দেখ । প্রমাণ—

উপসর্গান শেষাংস্ত মহামারী সমুদ্ভবান্ ।

তথাক্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শমযেন্নম ॥

যয়া তয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎ পাতান্তি যোজগৎ ।

স্পষ্ট প্রমাণ পাইবে । উপসংহারে দেখাইতে পারি যে যেখানে যেখানে ধর্মপূজা হয় প্রায়ই অশ্বখ বৃক্ষমূলে হইয়া থাকে তথায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান । বাহাদিগের পুরোহিত নাই তাহার স্বয়ং পূজা নির্বাহ করে । তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ মনে করিব ।

মহাকালীর পূজার বলিদানে সলোম অস্থি দিবার বিধি আছে । ঐরূপ সন্ধির বলিদানের ব্যবস্থা দেখিলে বোধ হইবে কোন দম্ম বা রাক্ষস কর্তৃক বলিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । কারণ মহাকালীর বলিদানে নরমাংস, মহিষ মাংস, উষ্ট্র মাংস, মার্কজার মাংস, মেঘ ও ভাগ মাংস প্রশস্ত । প্রমাণ যথা কপূরাদি স্তবে “সলোমাস্থি সৈবরংপলনমপি মার্কজার মসিতে পরং চৌষ্ট্রং মেঘং নরমহিষয়ো-
শ্চাগমপি বা । বলিস্তে পূজায়াং মপি—বিতরতাং মর্ত্যবসতাং সতাং সিদ্ধিঃ সর্বা প্রতিপদমপূর্বা প্রভাত” ॥ এই প্রমাণ দ্বারা কিাবলি কালিকাপূজার পদ্ধতি হয় যবনের, না হয় চীন পণ্ডিতের অথবা রাক্ষসের লিখিত । কারণ উষ্ট্র মাংস, মার্কজার মাংস এবং মহিষের মাংস যথাক্রমে যবন, চীন ও নেপোলীয়-
দিগের খাদ্য বলিতে হয় । বাস্তবিক কি তাই । তাহা নহে । ইহা আধ্যাত্মিক-
ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে । নচেৎ আর্য্যজ্ঞাতির তান্ত্রিকতার ঐ অর্থাপত্তি ঘটে । ঐ ভয়টী বলি যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ছয় রিপুকে গণিতে হইবে । যে উপাসক ষড়্‌রিপুকে বলি দিবে অর্থাৎ জয় করিতে পারিবে তাহার সাধুজনের সর্বপ্রকার সিদ্ধি অনায়াসে সাধ্য ।

ধর্মের পূজা রাঢ়দেশে শূদ্রে সংস্থাপন করিয়াছেন এ কথার উত্তর দিবার আবশ্যক না থাকিলেও উহা কেবল এক দেশ ব্যাপক বলিয়াই এ কথার উত্তর

দেওয়া নিতান্ত উচিত। ধর্মের পূজা কোন স্থান হইতেই লুপ্ত হয় নাই। কি তান্ত্রিক, কি বৈদিক কি পৌরাণিক সর্বত্র সর্বাগ্রে ধর্মের পূজা দেখা যায়। তান্ত্রিক যথা—

ধর্মায়নমঃ জ্ঞানায়নমঃ বৈরাগ্যায়নমঃ। ঐশ্বর্যায়নমঃ ইত্যাদি ক্রমেণ দশোপচারৈঃ, পঞ্চোপচারৈঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং ভাবে কেবলম্ জলেন।

কিন্তু সর্বত্র প্রণবাদিন মোহাস্তেন পূজয়েৎ।

ধর্মঘট পূজার মন্ত্রের একদেশ এখানে দেখান গেল। যথা—

এষ ধর্ম ঘটোদন্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।

অশ্রু প্রদানাং সকলানামসমস্ত মনোরথাঃ॥

ওঁ পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।

পানীয়শ্চ প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতুসাম্বতৌ।

ধর্মাদিকরণে বিচারপতির নাম ধর্মাবতার। তদনুসারে বিচার কর্তাকে ধর্মের স্বরূপ জ্ঞান করিতে হয়। বিচারাসনে আসীন ব্যক্তি স্বভাতি বিজাতি ভেদ রহিত জ্ঞানে মাননীয়। বয়োবৃদ্ধ বা কনিষ্ঠদ্বৈত বিচারকের ধর্মাবতারের কিঞ্চিৎমাত্র হানি দেখা যায় না। অতএব বলি সর্বত্রই ধর্মের পূজা অর্থাৎ সম্মান হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতেছি—“মহাজমো যেন গতঃ স পশ্চাঃ।

শ্রীলালমোহন শর্মা।

প্রবাসী।

চলে ছিন্ন ববে, জীবন প্রভাতে,
বাহিয়া শীতল পথ;
নবীন পথিক, যেতেছি প্রবাসে,
ছিল কত মনোরথ।
বুকে ছিল বল, পথের লাগিয়া,
সম্বল আছিল সাথে,
হরবে চাহিয়া তোমারে দেখেছি
চলিতে চলিতে পথে।
পাইরাছি সাড়া যখনই ডেকেছি,
উছলি উঠেছে প্রাণ;

উৎসাহে পথ চলেছি বিগণ
লভেছি নুতন জ্ঞান।
আজিকে হৃদয়ে কত বার ডাকি
কোথা তুমি, কোথা তুমি;
তবু ঘুরে কিরি, লক্ষ্য হারিয়ে,
অজানিত বনতুমি।
আর তো তোমারে পাই না দেখিতে,
হৃদয়ে মিলাল গেঁহ,
প্রবাসে আমারে, পাঠায়ে একেলা,
আর কি দেখে না কেহ।

আগে কত বার, বিষাদের মাঝে,
তোমারে পেরেছি কাছে ;
আকুল হৃদয়ে, ডেকেছি যখন,
জেনেছি সাধনা আছে ।
ছিল না যখন, হৃদয়ের ভার .
বিশ্বাস আছিল বুকে,
তখন বারেক, দেখিনিক' রেয়ে,
চলিয়াছি কোন মুখে ।
এবে নু'য়ে পড়ে, গুরুতর ভারে
বিশ্বাস বিহীন কায়া,
আস্র পথে আর, ফিরিতে পারি না,
কোথায় শীতল ছায়া ।
কত ছিল কাজ, কি হ'ল সাধনা,
কি ফল লভিছু হেথা,

বড় সাধ ছিল আপনা সঁপিতে,
যুচাতে পরের বাধা ।
বুধায় ভ্রমিছু, মিলিল না হায়,
কোথায় সে লক্ষ্য স্থল ;
শুধু দেহ ক্ষয়, পুরিল না আশা,
প্রয়াস হ'ল বিকল ।
ছিল কত কাজ, কি হ'ল সাধনা,
কি ফল লভিছু ঘুরে,
যা ছিল সম্বল, হারিয়ে ফেলেছি,
কেমনে বাইব ফিরে ।
হৃদুর প্রবাসে, লক্ষ্য হারিয়ে,
ভ্রমিছে তনয় তব,
দেখাইবে পথ নিয়ে যাও সাথে
আত্মক জীবন নব ।
৮ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ।*

আইনে জমিদারদিগের অসুবিধা ।

[নবপ্রভার পাঠকগণ ! অবশ্য অনুষ্টুপ করিয়াছেন দীন হীন প্রজাপুঞ্জের সহিত নবপ্রভার পরিচালকদিগের গভীর সহানুভূতি, এবং তাহাদিগের অবস্থার উন্নতিকল্পে সহৃদয় ব্যক্তিগণ বাহাতে সচেष्ट হন তজ্জন্তু প্রয়াসী । আমরাদিগের বিবেচনায় এমন উপায় আছে বাহাতে জমিদার ও প্রজার উভয়েরই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে । কিন্তু আইনে জমিদারদিগের যে সকল অসুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করা উচিত এবং তাহার হেতু ও পরিণাম ও প্রতিকার কি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক । নঃ প্রঃ সঃ]

বাঙ্গালা দেশে মহানুভব কর্ণওয়ালিসের যত্নে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল । ভূমির রাজস্ব চির কালের জন্য স্থিরীকৃত •

* এই ক্ষুদ্র কবিতাটি চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকের লেখা । তাহার জনৈক আত্মীয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন—“বালকটি ছুরারোগ্য ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারি পাঁচ মাস শয্যাগত ছিল এবং সেই অবস্থাতেই অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিল ; তাহার লিখিবার শক্তি ছিল না ; মুখে মুখে বলিত এবং তাহার ভগিনী লিখিয়া লইত । বিগত ১৩০৮ সালে ৯ই শ্রাব্দ সে তাহার আত্মীয়বর্গকে শোকসাগরে ডাসাইয়া চলিয়া গিয়াছে ।” মৃত্যুর দুই মাস পূর্বে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল ।

নঃ প্রঃ সঃ

হইল। গবর্ণমেন্ট কেবল প্রজাবর্গের হিতের জন্য আবশ্যক মত আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন এই প্রকার ব্যবস্থা থাকিল। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত জমিদারদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ প্রায় রহিল। জমিদার ইচ্ছামত প্রজাপত্তন, প্রজা উচ্ছেদ ইত্যাদি সর্ববিধ ক্ষমতাই পরিচালনা করিতে পারিতেন। তবে চুক্তি অনুসারে ভূম্যধিকারী এবং প্রজা উভয়েই প্রচলিত আইন অনুসারে বাধ্য ছিলেন। তৎপর ১৮৫৯ সালে ১০ আইন প্রচলিত হইল; জমিদারদিগের ক্ষমতা ও হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। রাহগ্রাস আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলা কোমিসনের ১৮৬৯ সালের ৮ আইন, এবং টাণ্ডিয়া কোমিসনের ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের দ্বারা জমিদারদিগের ক্ষমতা শতেনঃ শতেনঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করা হইল। ভবিষ্যতে জমিদারদিগের ক্ষমতার পূর্ণগ্রাস হইবে কি না জানি না।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই প্রকার প্রতীয়মান হয় যে জমিদারগণ ভূমির প্রকৃত নিবৃত্ত স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এইক্ষণ সে কথা লুপ্ত প্রায়। পূর্বে জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে প্রজার সহিত এই প্রকার চুক্তি করিতে পারিতেন যে ১৩ বৎসরের জন্য প্রজা জমীতে কৃষিকার্য্য করিয়া জমী পরিত্যাগ করিবে অথবা জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। কিন্তু এইক্ষণ আর সে বন্দোবস্ত করা চলে না। (ক) এ প্রকার চুক্তি করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে। ভূস্বামী ও প্রজা, সরল চিন্তে সরল বিশ্বাসে, স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছামত চুক্তি করিলেও সকল চুক্তি আইন অনুসারে গ্রাহ্য নহে। দেখুন,—

(১) বাকী করের সুদ সম্বন্ধে পূর্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজা ইচ্ছামত চুক্তি করিতে পারিতেন। ১৮৮৫ সালের পূর্বের যে সকল চুক্তি আছে তাহা এইক্ষণও আইন অনুসারে বলবৎ আছে। কিন্তু ১৮৮৫ সালের পর শতকরা ১২ টাকার অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য করা চলে না। (খ)

(২) দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার কর উভয়পক্ষ স্বাধীন ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিলেও টাকায় দুই আনার অতিরিক্ত ধার্য্য হইতে পারে না। (গ)

(৩) জমিদারের জমী কোন ব্যক্তি অন্তায় পূর্বক দখল করিয়া লইয়া কোন কৃষি-প্রজা পত্তন করিলে, জমিদার বেদখলের বাবদ ডিক্রী করিয়া জমী পুনরায়

(ক) Bengal Tenancy Act s. 178 sub-sec. (3)

(খ) Bengal Tenancy Act s. 178 sub-sec. cl. (h)

(গ) Bengal Tenancy Act s. 29

উদ্ধার করিলে, উক্ত কৃষি-প্রজা সরলমনে বেদখলিকারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া থাকিলে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না । (ঘ)

(৪) আংশিক মালেক যদি কৃষি-প্রজা অর্থাৎ রাইয়তের বিক্রমে বাকী করের ডিক্রী পান, তাহা বাকী করের ডিক্রীর তুল্য গণ্য হইবে না ; দেন ডিক্রীর তুল্য বিবেচিত হইবে । এবং বাকীর মহাল ক্রোক বিক্রয় হইতে পারে না । অপিচ যদি দেশাচার প্রথা অনুসারে কৃষি প্রজার স্বস্থ বিক্রয়োপযুক্ত না হয় তবে আংশিক মালেকের ডিক্রীতে আদৌ বিক্রয় হইবে না । সুতরাং আংশিক মালেকের বাকী করের ডিক্রীর টাকা আদায় হইবার কোন উপায় নাট । (ঙ)

(৫) কোন ক্যামিস মোরসি জমা বিক্রয় হইলে মালেকের কি দাখিল করিবার নিয়ম আছে । এবং মালেককে নোটিস দিবার বিধান আছে : কিন্তু মালেক যদি প্রকৃতপক্ষে নোটিস না পান, এবং সরলমনে পুরাতন প্রজার নামে বাকী করের মোকদমা করেন, এবং বিক্রয়ের বিষয় অবগত না থাকা প্রমাণও করেন তথাপি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না । অবগত থাকুন আর না থাকুন নূতন প্রজার নামে নালিশ করিতে হইবে । (চ)

(৬) জমিদার বাকী বকেয়া সহ কোন নূতন জমিদারী ক্রয় করেন তবে পুরাতন বাকী কর অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট প্রাপ্য বাকী কর আদায় করিতে হইলে বাঙ্গালা খাজানা আইনানুযায়ী ডিক্রীর যে সকল সুবিধা তাহা পান না এবস্থিধ ডিক্রী দেন ডিক্রী তুল্য জ্ঞান হইবে । এবং ঐ সকল বাকী কর আদায় করিতে হইলে খাজনা আইনের লিখিত ৪ বৎসরে তামাদির বিধান খাটিবে না ; সাধারণ তামাদির ৩ বৎসরের তামাদির নিয়ম খাটিবে ।

(৭) আংশিক মালেক একক করবৃদ্ধি কিম্বা উচ্ছেদ কিম্বা জমি পরিমাণ করিবার নালিশ করিতে অনুপযুক্ত । যদি অন্যান্য সরিক প্রজার সহিত এক-যোগে এই প্রকার নালিশ করিবার বাধা জন্মায় তথাপি যে সরিক এই প্রকার নালিশ করিবার ইচ্ছুক তিনি তাহা করিতে পারিবেন না । (ছ)

(ঘ) I. L. R. 20 Cal. 708 (F. B.)

(ঙ) Cal. weekly note 521.

(চ) I. L. R. 19 Cal. 774.

(ছ) Bengal Tenancy Acts 180.

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অনেক অসুবিধা জমিদারদিগের হইয়াছে । উল্লি-
ত কয়েকটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

এ সকল অসুবিধা সম্বন্ধে জমিদারগণ আপনাদিগকে একপ্রকার সংরক্ষণ
করিয়া আসিতেছেন : কিন্তু বাকী কর আদায়ের এইক্ষণ যে প্রকার বিধি আছে
তাহাতে জমিদারদিগের যে বিষম অসুবিধা হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত । কোন
একটী বাকী করের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহা নিষ্পত্তি হইতে বহু বিলম্ব
হয় । এবং নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল ও হাইকোর্টে কোন কোন স্থলে দ্বিতীয়
আপীল উপস্থিত করা বাইতে পারে । এই প্রকারে সামান্য একটী করের
মোকদ্দমা করিলে ২।৩ বৎসর চলিয়া যায় । কিন্তু আমরা মনে করি যে এ সম্বন্ধে
যদি আইন পরিবর্তন করা যায় তবে প্রজা ভূম্যধিকারী কাহারও অসুবিধা হয়
না । ১৮১৯ সালের ৮ কাহুনে যে প্রকারে পত্তনি খাজনা আদায় করিবার নিয়ম
আছে, এই প্রকার নিয়ম কোন কোন রকম বাকী করের মোকদ্দমায় অনায়াসে
করা বাইতে পারে । যে সকল প্রজার সহিত লিখিত চুক্তি আছে এবং যে
সকল প্রজার বিরুদ্ধে আদালতের ডিক্রী আছে সেই সকল প্রজার বিরুদ্ধে ১৮১৯
সালের ৮ আইনে বিধান মত করাদায়ের নিয়ম করিলে কাহারও যে কোন
প্রকার অসুবিধা হয় এমনত বোধ হয় না । * এ সম্বন্ধে কেহ এ প্রকার প্রতিবাদ
করিতে পারেন যে এ প্রকার আদায়ের বিধান হইলে অনেক মিথ্যা দাবী
উপস্থিত হইবে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন সম্ভব কিম্বা কোনই আশঙ্কা

* এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই কথা বলা বাইতে পারে যে পত্তনিদারগণ প্রায়ই সম্মতিসম্পন্ন
শিক্ষিত লোক । তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই এক এক জন মোক্তার বা উকীল আছে ।
তাহারা অষ্টমের দায় হইতে বখাকালে সকলকে মুক্ত করে । গ্রন্থি অশিক্ষিত প্রজার এরূপ
মোক্তার নাই । তাহার পর পত্তনিদারগণ একপ্রকার জরিদার । তাহাদিগের জমা বৃদ্ধি হয় না,
এবং তাহারা খাজনা দিলে জমিদারগণ তাহাদিগের উপর কোন প্রকার প্রভুত্ব করিতে পারেন
না । এরূপ স্থলে তাহারা অষ্টমের একটা মাত্র অসুবিধা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারেন । গ্রন্থি
প্রজার নিরিখ বৃদ্ধি হইতে পারে, জমী জরীপ করিয়া জমা বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং তাহাদিগের
উচ্ছেদ হইতে পারে । তাহার উপর যদি সরাসরি বিচার মতে তাহাদের জমী বিক্রয় হইয়া যায়,
তাহা হইলে বেচারী সব বড়ই বিপদে পড়ে । ভয়সা করি অষ্টমের প্রবন্ধ লেখক এই আপত্তির
মীমাংসা করিবেন । জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে বর্তমানেও অনেক স্থলে পত্তনি বন্দোবস্ত করিতে
পারেন । কিন্তু প্রজাকে পত্তনির সুবিধা দিতে চাহেন না বলিয়াই পত্তনি বন্দোবস্ত করেন না ।
প্রজা পত্তনির সুবিধা পাইবে না, কেবল সরাসরি নীলামের অসুবিধা ভোগ করিবে এই প্রস্তাবে
কথঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা ঘোষ ঘটে কি না আইনজ্ঞ প্রবন্ধলেখক বিবেচনা করুন ।

নাই । ১৮১৯ সালের ৮ কানুন অনুযায়ী যে জমিদারেরা কর আদায় করেন তাহাতে প্রায় কখনই দেখা যায় না যে মিথ্যা দাবী করিয়া কোন জমিদার করাদায়ের প্রার্থনা করিয়াছেন । সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রকার আশঙ্কা দেখা যায় না । এবং এই সকল আশঙ্কা থাকিলে বরং এষ্ট প্রকার কোন বিধান করা চলে যে কোন মিথ্যা দাবী করা প্রমাণ হইলে মালেক দাবীর চতু-
গুণ কিম্বা সম্পত্তির মূল্যের চতুগুণ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন । এবং
খরিদদার খরিদের টাকা ও তাহার সুদ ও শতকরা পাঁচ টাকা ক্ষতিপূরণ পাঠিলে
নীলাম রহিত করিবার জন্য প্রজা প্রার্থনা করিতে পারিবেক ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন ।

মায়া ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

Awake ! what, ho ! Brabantio ! thieves ! thieves ! thieves !
Look to your house, your daughter and your bags,
Thieves ! thieves !

Shakspeare.

রাত্রি ষ্ট প্রহর । কৃষ্ণাচতুর্দশী । তাহার উপর আকাশে মেঘ হইয়াছে
—ঘোর অন্ধকার । চতুর্দিক নিস্তব্ধ । শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে গৃহস্থগণ
সুশুপ্ত । কিন্তু হারাধন, কুমুদিনী ও মায়া এখনও নিদ্রা যায় নাই । আশ্বন
পাঠক পাঠিকে, সেই কৃষককুটীরে গভীর রজনীতে কি কথাবার্তা হইতেছে,
আমরা শুনি ।

হারাধন বলিল—“বোমা, দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে দেহপাত কোরো না ।
আমি কি নিশ্চিন্ত আছি ? মহেশ আমার একমাত্র পুত্র, আমার এই বুড়ো
বয়সে সেই একমাত্র আশা ভরসা—সে আমার অন্ধের বষ্টি । তার মামলা ভাল
কোরে চালিয়ে তাকে খালাস করিবার জন্য, যেমন ক’রে পারি টাকা কৰ্জ্জ
করবোই । আমি প্রত্যহ দুয়ার দুয়ার ঘুরছি । একটা মহাজন আজ বলেছে
টাকা কৰ্জ্জ দেবে । জমী জমা, ঘর বাড়ী, সব বন্ধক দিয়ে তার কাছে টাকা
নেব—কা’লই টাকা পাব । তুমি অত অধীর হয়ো না, মা ! শ্রীহরি কি
আমাদের পানে একবারেই মুখ তুলে তাকাবেন না ?

মায়া । বৌ বলছে, তার যা কিছু গয়না আছে, কালকেট তুমি সব বিক্রয় করে, দাদাকে খালাস কোরে আন ।

বৌ (কুমুদিনী) অতি মৃদু করণস্বরে বলিল—“আমার হাতের লোহা গাছটা, আর পরনের সাড়ীপানা বাদে, আমার যা কিছু গয়না সাড়ী আছে—কালটে আপনি সব বেচে, যা কিছু টাকা পান উকোল বাবুদের পার ধরে দিয়ে, তাঁকে খালাস কোরে নিয়ে আসুন ।

হারাদন । মা ! তোমার গয়না কই আর ? সুতীর কাপড় যা আছে, তাতে কটা টাকা হ’বে । খুনী মামলা চালান কি অল্প টাকার কাজ ?

কুমুদিনী । আমার এত গয়না, এত কাপড়, —তা বেচে কি কতক টাকা হবে না ?

হারাদন । মা তুমি কি ভুলে গিয়েছ ? নায়েবের অত্যাচার জুন্মে যখনই কোন গরিব প্রজা বিপদে পড়েছে, মহেশ তাকে রক্ষা করবার জন্য, তার নিজের যা ছিল, ঘরে যা ছিল, অবশেষে তোমার গয়না ও কাপড় সবই বিক্রয় কোরেছে ।

কুমুদিনী । আমি জানি আমার স্বামী দেবতা । তাই তিনি নিজের যা ছিল—আমার গয়না কাপড়—সেও ত তাঁরই—অন্যকে বাঁচাবার জন্য সব বেচে ফেলেছেন—আমার সম্মতি লওয়া কোন আবশ্যক ছিল না, তবু আমার মত ল’য়ে বিক্রি করেছেন । তাতে আমি দুঃখ করি না—আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম । কিন্তু যিনি অন্যকে রক্ষা ক’রেছেন, তাঁকে আমরা এখন কেমন ক’রে রক্ষা করবো ?” এই বলিয়া কুমুদিনী আবার কাঁদিতে লাগিল ।

মায়াও চোপের জল পড়িতেছে, তবু মায়া যেন একটু ধীর ও বিজ্ঞতাবধারণ করিয়া বলিল ;—“বৌ কাঁদিস্নে” । তাহার পর হারাদনের দিকে ফিরিয়া বলিল—“বাবা, আমি তোমাকে টাকা এনে দিব, তুমি ভেব না ।”

হারাদন । কেমন কোরে, মা ?

মায়া । তাঁতিবৌ গাঙ্গুলিদের বাড়ী দাসীপনা ক’রে টাকা করেছে—সে আমাকে বলেছে । আমি দাদাকে খালাস ক’রবার জন্য কারো বাড়ী দাসীপনা করব । কাল, বাবা, তুমি আমাকে কারো বাড়ী দাসী ক’রে রেখে দিয়ে এস । —কিন্তু বাবা, রাত্রিতে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—এই বলিয়া মায়া হারাদনের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল । হারাদনেরও চক্ষু ভিজিয়া গেল ।

হারাদন বলিল—“মায়া, বলিস কি ? তুই কচি মেয়ে, তুই কি দাসীপনা করতে পারিস ? এই বুড়ো বয়সে, —মহেশ ছেলে, তার উপরে, তোকে না দেখলে যে আমি ম’রে যাব ।

মায়া । না, বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাবো না ।

কুমুদিনী । আমি ত আর কচি মেয়ে নই । আমি ত দাসীপনা ক’রে উকীল মোক্তারের খরচের জন্ত, মামলা খরচের জন্ত যে কর্ত্ত্ব হবে, তা শোধ করবো ।

হারাদন । হা হরি ! হারাদনের বেটার বৌ কি না আজি দাসীপনা করেন ? আমি বেঁচে থাকতে তার এই খোয়ার হবে ? না, মা ! আর—তোমার এই বয়স, এই রূপ তোমাকে পরের বাড়ীতে রাখাও যা আর বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া তা । আর, চাকরী ! মহেশ যে বড়ই ঘৃণা করে । সে ত বেটা ছেলে । তবু সে কথায় কথায় বলতো—“আমি মরিতে পারি, কিন্তু কারো চাকুরি করিতে পারি নে ।” হায় বিধাতা, তুমি আমার কপালে কি এই লিখেছিলে ? ছেলের ছেল—ছেলের বৌর দাসীপনা ? না, তা হবে না, বৌমা তা কখন হবে না ।

সেই আঁধার রজনীতে, সেই নিস্তব্ধ গৃহে, নীরবে তিন জনেরই অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল । ক্ষণকাল পবে হারাদন আবার বলিল—“তোরা কাঁদিস না । কাল বাডী বাঁধা দিয়ে, গরু ও লাঙ্গল বেচে, ঘটি বাটি যা আছে, সব বেচে, টাকা মোগাড় করবো । করবোই ।

মায়া । হাঁ বাবা, দাদা যাতে খ’লাস হয়, তাই কর ।

হারাদন । বিজোহী প্রজারা চাঁদা তুলে মোকদ্দমা চালাতে আরম্ভ করেছে । এক সন্ন্যাসী ঠাকুর খবর দিয়েছেন—তোমরা তা জান—এক জন ভাল মোক্তার আর একজন ভাল উকীল দেওয়া হয়েছে । কিন্তু অন্যের টাকার ওপর, বৌমা তোমারও যেমন ভরসা হয় না, আমারও তেমনি ভরসা হয় না ।

কুমুদিনী । ভরসা করি কেমন ক’রে ? প্রজারা যে সব বড় গরিব । তাদের মধ্যে অনেকে নিজেই খেতে পাচ্ছে না । অন্যের জন্ত কেমন ক’রে টাকা দেবে ।

মায়া । প্রজারা এত গরীব কেন ?

হারাদন কল্লার কপা লক্ষা না করিয়া বলিল—“সন্ন্যাসী ঠাকুর কালকে

ফাল্গুন, ১৩০২।]

মায়া।

৩৫

আমায় বল্লেন যে তিনি শীঘ্র মহেশকে খালাস করবার জন্য প্রবোধ বাবুর নিকট যাবেন।”

কুমুদিনী ও মায়া সন্ন্যাসী ঠাকুর কি যাবেন? কবে?

হারাদন। বোধ করি, কা’ল কি পরশু।

মায়া। “আমাদের আর ভয় নাই। সে সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় ভাল। এক দিন দাদার সঙ্গে এসেছিলেন—তুমি দেখনি? আমি দেখিছি। বাবা! আর আমাদের ভয় নাই। দাদা নিশ্চিতই খালাস হবে। আমার ঠিক বোধ হচ্ছে।” বলিতে বলিতে মায়ার বিষন্ন মুখকমল যেন আশার কিরণে একটু প্রফুল্ল হইল। এমন সময় দূরে প্রিং প্রিং প্রিং করিয়া কি শব্দ হইল, যেন একতারা বাজিতেছে। সঙ্গে একটা গান শুনা যাইতে লাগিল,—অতি করুণ স্বরে কে গাহিছে,—

শ্রাম স্তম্ভর নটবর মজায় কুলবালারে,
কুঞ্জ কুটীরে ধীরে ধীরে ল’য়ে যায় গোপীরে।
আগ্নান নাহিক ঘরে, রাধার হরণ তরে
পাঠাইল রসরাজ দূতী বিশাখারে—
ওরে—সে বিধি বিষম—ভুজঙ্গীরে ॥

হারাদন একজন ভক্ত বৈষ্ণব। প্রথমে এই গান শুনিয়া তাহার মন যেন একটু প্রশান্ত হইল। কুমুদিনী ও মায়া সেই দুরাগত করুণ গীতি শুনিল। হারাদন যখন গানের শব্দগুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তখন সে শিহরিয়া উঠিল। কুমুদিনীও চমকিয়া উঠিল।—

হারাদন জিজ্ঞাসা করিল—“মা কিছু বুঝিয়াছ কি?”

কুমুদিনী—বোধ হচ্ছে, বিপদের উপর আবার বিপদ; আর কিছু বুঝি নাই।

হারাদন। হাঁ। “আগ্নান” মানে আমাদের মহেশ। “রাধিকা”—অর্থাৎ তুমি। নটবর, আমাদের নায়েব নটবর। বিশাখা, সেই সর্বনামী বিসি, যে তোমার কাছে আজ আসিয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া কুমুদিনী ভরে কাঁপিয়া উঠিল। মায়া কিছুই বুঝিল না—একবার তাহার বাবার দিকে, একবার বৌর দিকে ফাল ফাল করিয়া তাকাইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত বুঝিল—“ব্যাপারটা ভাল নহে।”

হারাদন বলিল—“বৌ মা! এখন উপায় কি করি? কা’লই আমরা প্রবোধ

বাবুর জমিদারিতে পালাইয়া যাউব । কাল খুব ভোরে উঠে আমরা পালাব ।

কুমুদিনী । আমিও আপনাকে বরাবরই বলছি, তাঁকেও কতবার বলেছি—
“এবোধ বাবুর জমীতে না পালালে আমাদের ধন মান প্রাণ জাতি কিছুই থাকবে না ।” কিন্তু এ অভাগিনীর কথা তিনিও শুনেন না, আপনিও শুনেন না ।

হারাধন । “মহেশকে খালাস করবার জন্য বাড়ী বাধা দিয়ে টাকা কৰ্জ্জ করবো, তাই এখানে কদিন আছি”—

এমন সময় একটা শীশ দেওয়ার শব্দের মত কেমন একটা অশ্রুতপূৰ্ব্ব শব্দ হঠল । তিন জনেই কাণ পাতিয়া থাকিল । কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দরজায় খুন্খুন্ খট্ খট্—খটাস্ শব্দ হইল । তাহার পর বন্ বন্ বনাৎ শব্দ । উঠানে ছপ্দাপ্ মাহুষের পা’র শব্দ শুনা গেল । হারাধন বলিল—“কেও ?” বাহিরে গম্ভীর চাপা স্বরে উত্তর হঠল—“চুপবহ” ।

হারাধন তখন মৃদুস্বরে ভাড়াভাড়ি বলিল—“বোমা ! পালাও, পালাও, খিড়্‌কির ছয়ার দিয়া কানাচ দিয়া—শীঘ্র পালাও” । কুমুদিনী পিছনের ছয়ার দিয়া পালাইল । মায়া তাহার বাবার গলা ভড়াইয়া আবার কাঁদিতে লাগিল । এমন সময় ঘরের সম্মুখের ছয়ারে কে সজোরে পদাঘাত করিল, ছয়ারের খিল ভাঙ্গিয়া, ছয়ার খুলিয়া গেল । একজন লাঠিয়াল আসিয়া খপ্ করিয়া হারাধনের গলা ধরিল, আর একজন বলিল “বল্ বেটা বুড়ো, “তোমার বেটার বৌ কোথা ?” হারাধন বলিল,—“বোমা রান্নাঘরে ।” দুইজন লাঠিয়াল সে দিকে ছুটিল সেখানে পাইল না, তাহারা সমুদয় ঘর পাতি পাতি করিয়া খুজিতে লাগিল । একজন বলিল “ভাগ গিয়া” । এ দিকে অন্ধকারে কানাচ দিয়া পালাইতে গিয়া কুমুদিনী একটা বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর পড়িয়া গেল । তাহাতে একটা শব্দ হইল । কয়েকজন লাঠিয়াল সেইদিকে ছুটিল । কিন্তু সেখানে আত্ম বাগান—ঘোর অন্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইল না । কুমুদিনী ক্ষণকাল পরে উঠিয়া সেই অন্ধকারেই আবার ছুটিল । এবার বৃক্ষের শাখায় কপালে দাক্ষণ আঘাত লাগিল কুমুদ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল । ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা হইল । তখন উপুড় হইয়া শুইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া চুপ করিয়া শুঠয়া রহিল । ভয়ে আঁতে আঁতে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, কিন্তু বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল । হতভাগিনী কুমুদিনী যেখানে ছুতলে মৃত্তিকাশায়িনী সেই-

এক একজন লাঠিয়াল একটা লঠন লঠিয়া খুঁজিতে আসিল—ক্রমে তাহারই দিকে আসিতে লাগিল ।

কুমুদিনী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল । লাঠিয়াল দেখিল, কুমুদিনীর কপাল হঠতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে, কাপড় আলু খালু ও ধূলায় ধূসরিত, চক্ষু অশ্রুবিপ্লুত । কুমুদিনী গলায় বস্ত্র দিয়া হাত মোড় করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—“আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমাকে বাপ বলিলাম, দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা কর” ।—সেই গৌরবাস্তি অশ্রুবিপ্লুত বিশাল নয়না, ভীতি-বিধূ-নিত-হৃদয়া, বিপন্ন কৌণাসী কৃতাজ্ঞা লগ্নীকৃতবাসা, বিধুরা কৃষকবধূকে দেখিয়া ঐ লাঠিয়াল স্তম্ভিত হইল । লাঠিয়াল বুঝা ক্ষত্রিয় । ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক উদারতা তাহার হৃদয়ে অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই ।—অসাহায়া অবলার প্রতি অত্যাচার করা লজ্জার বিষয় সে অনুভব করিল ।—সে বলিল “মা, তুমি পালাও, আমি তোমাকে ধরিব না” । এমন সময় রহিমবক্স নামক একজন পেয়াদা সেখানে আসিয়া পড়িল, বলিল—“বাহবা—তোম কারস। নেমকহা-রাম ছায়া” এই বলিয়া সে লাফাইয়া কুমুদিনীর হাত ধরিল । কুমুদিনী ঝাট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লঠিয়া আবার পলাইবার চেষ্টা করিল । তখন রহিমবক্স তাহার অঞ্চল ধরিল আর একজন লাঠিয়াল সঙ্গে কুমুদিনীর হাত ধরিয়া থাকিল রহিমবক্স বস্ত্র দ্বারা কুমুদিনীর মৃণাল-কোমল-ভুজদ্বয় বঁধিতে লাগিল । তখন কুমুদিনী উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া কাঁদিয়া বলিল,—“প্রাণনাথ, তুমি এখন কোথায়—তুমি একবার আসিয়া দেখ, তোমার কুমুদের কি দুর্গতি হইতেছে” । তখন একজন লাঠিয়াল “চুপ” বলিয়া কুমুদিনীর মুখ বঁধিয়া ফেলিল ; আর, একজন তাহার পা বঁধিল, এবং তোলা তোলা করিয়া একস্থানি পাক্ষিতে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া পাক্ষির ছয়ার বন্ধ করিয়া দিল । বেহারারা পাক্ষী তুলিল । লাঠিয়ালগণ পাক্ষীর অগ্রে পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে সঙ্গে সঙ্গে চলিল ।

এ দিকে, হারাধনকে যখন লাঠিয়ালগণ ধরিল, হারাধন বুঝিল, আর আশা নাই । সে ভাবিল “আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, তবে, হে হরি ! বোমাকে রক্ষা কর, তাহার ধন্য রক্ষা কর ।” হারাধন পরম ভক্ত ।—সে এই মহাবিপ-
ত্রিতে, চক্ষু মুদিয়া মধুহৃদনকে ডাকিতে লাগিল । একজন লাঠিয়াল হারাধনকে
পীঠমোড়া করিয়া বঁধিল । আর একজন লাঠিয়াল হারাধনের পৃষ্ঠে খুব জোরে
দুই বা লাঠি মারিল । হারাধন যেমন “বাবারে”, বলিয়া চীৎকার করিয়াছে,

অমনি একজন পামর তাহার মুখের ভিতর কাপড় পুরিয়া দিল, মুখ বাধিল, বাধিল, গলার সহিত হাঁটু বাধিল—বাধনের উপর বাধন দিয়া হারাধনকে এই মাংসপিণ্ডের মত করিয়া ফেলিল। আবার মারিতে লাগিল। তাহার পর বন্ধকে একখানি ডুলির মধ্যে ফেলিল। বাহকগণ ডুলি লইয়া পাকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে চলিল বীর মহেশ ! তুমি এক্ষণ কোথায়। তুমি প্রজাবর্গকে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলে। অদ্য, তোমার বন্ধ সাধু পিতা, তোমার যুবতী পতিব্রতা ভায়া, কোথায় কি অবস্থায় চলিল !

মায়া কি হইল ? যখন হারাধনকে দারুণ আঘাত করিয়া মুখের ভিতর কাপড় শুঁজিয়া তাহাকে বাধিয়া একটা মাংসদলার মত করিয়া ফেলিল, এবং আবার মারিতে লাগিল, তখন মায়া মূর্ছা গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, বালিকার জ্ঞান হইল, তখন ঘর অন্ধকার, বাডী নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র বায়ু হুন্ হুন্ হুন্ করিয়া বহিতেছে। খোলা দরজা ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া পড়িতেছে। মায়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল—

“বাবা—বো—দাদা—ও বাবা, ও বো তোমরা কোথায় ? আমার যে বড় ভয় করছে—বাবা—বাবা—বাবা :” হায় ! সেই নির্জন অন্ধকার বাটীতে সেই ভয়ানক শোকাক্ত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে এমন কোন লোক ছিল না। কেহ শুনিতে পাঠিল না, তাহাকে সাহায্য করিতে বা সাহস দিতে কেহ আসিল না,—শোকে ও ভয়ে মায়া আবার মূচ্ছিত হইল।*

বিদ্যায় বিপদ ।

(Herbert Spencer's "Facts and Comments". Guggau's "Education and Heredity," Contemporary Series, Nineteenth Century February, 1903.

আত্মশিক্ষায় আত্মোন্নতি ;—শিক্ষার নিষ্ফলতা,—পাণ্ডিত্য-বিহীন বিস্মার্ক (Bismarck) ও লিনকন (Lincoln), পণ্ডিত গ্যাড্‌স্টোন (Gladstone) ; পলিটিক্যাল ইকনমির (Political Economy) অনাদর, কবডেন্ ও রিকার্ডো) ;—শিক্ষা—সঙ্কোচ

* এই উপস্থানে যেমন একটা ছবুড় নায়েবের কার্যাবলী বর্ণিত হইতেছে পরে একটা সচ্ছন্দ্র নায়েবের ব্যবহারও বিবৃত হইবে। সুতরাং কাহারও রাগ করিবার কারণ নাই।

শিক্ষা-বিস্তার ;—শিক্ষাবিস্তারে ইংলণ্ডের শোচনীয় পরি-
 হরেজের নৈতিক অবনতি, কলুষিত রুচি ও মিথ্যা প্রিয়তা ;
 পরীক্ষার কুফলে গাইয়ের (Guyau) মত ;—গনুষাত্মের অভাব ;
 —চৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন, বিদ্যালাগর, ভূদেব, বঙ্কিম,
 প্যারিচরণ, রামতনু ;—বঙ্গদেশের শোচনীয় অবস্থা, থিয়েটার
 যাত্রা ; সংবাদপত্র ; অধিকারভেদে শিক্ষাভেদ ও শিক্ষাবিস্তারে
 হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মত ; “অগির
 নিগাই চরিত” ও “কৃষ্ণ চরিত”, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ;
 —সন্ন্যাসী-শিক্ষক ।

আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতি লন্ডন একটা তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, বিলাতের
 সংবাদ ও মাসিকপত্রে এ বিষয়ের চর্চা চলিতেছে । এখানেও তাহার ঢেউ
 আসিয়া গািয়াছে । বেনসনের স্কুলমাষ্টার (Mr. Benson's School-
 master), সার্ হেনরি লজের (Sir Henry Lodge) প্রবন্ধ এবং উইলিংগের
 বাদ-প্রতিবাদ এবং সার্ জন গর্স্টের (Sir John Gorst) অভিমত এবং
 বিলাতেও এডুকেশন বিল লন্ডন সমালোচনা চলিতেছে । এখানেও বিশ্ববিদ্যা-
 লয়ের সংস্কার বিষয়ে সভা-সমিতি বহুতার খুব ধুম চলিয়াছিল ; তাহার জের
 এখনও মিটে নাই —অনেকের বিশ্বাস যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের এত
 দুর্গতি ; দেশের অধিকাংশ লোক এখনও পর্যাস্ত নিরক্ষর ; শিক্ষার অভাবেই
 আমাদের দেশের এত অভাব । শিক্ষা সুবিস্তৃত হইলে, দেশের ধন উছলিয়া
 উঠিবে ; আবার ভারতভূমি স্বর্ণকিরিটিনী হইবে ; নীতির বিস্তার হইবে ;
 লোকের মন ভাল হইবে । লোকে ভালমন্দ বিচার করিতে শিখিবে । সুতরাং
 গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোল, নগরে নগরে পুস্তক পড়িবার সুবন্দোবস্ত করিয়া
 দাও, বিলাতেও ছাত্র স্কুল কলেজের আধিক্য শুক, তাহা হইলেই সুখের,
 সুমতির, স্বর্গের দ্বার উদঘাটিত হইবে ।

আমরা বলি, বিলাতের শিক্ষাপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ করিলে, দেশের পক্ষে
 যে বড় মঙ্গল হইবে তাহা বোধ হয় না । বিলাতের চিন্তানীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা
 বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ঠিক নহে এবং তাহার সংস্কার
 প্রয়োজন । গত ফেব্রুয়ারি মাসে নাইনটিন্থ সেন্টুরি (Nineteenth
 Century) শিক্ষার অগ্রপকারিতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা

চূষক করিলে এই দাঁড়ায় যে শিক্ষাবিস্তারে নৈতিক আবিলতা বাড়িয়াছে, চিন্তাশীলতা কমিয়াছে। যে বিলাতী-স্কুল-কলেজ লইয়া, রালে এবং লর্ড কর্জন একেবারে মোহ-মুগ্ধ, সেট বিদ্যালয় সমূহ সম্পর্কে উক্ত মাসিক যথেষ্ট আক্ষেপোক্তি বর্তমান।

বিলাতের অধিনায়ক বা শাসনকর্তারা তাহাদিগের ভাবী উন্নতি বা গৌরবের জন্য স্কুলকলেজে নিকট বিশেষ খুণী নহেন। ক্রমওয়েল (Cromwell) চাষাব কাজ করিতেন, যোকা ক্লাইব্ এবং রাজনীতিজ্ঞ হেষ্টিংস কেদারী ছিলেন, চেম্বারলেন্ বাণিজ্যের জন্য শিক্ষিত হইয়াছিলেন, লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer—ভারতের ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব Baring) যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রিন্স বিস্মার্ক (Prince Bismarck) আইন পদোচ্চায় হইবার “ফেল্” হন; বেন্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ (Benjamin Franklin) ছাপার কাজ করিতেন; জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington) জরিপ করিতেন, হার্সেল (Sir William Herschell) গায়ক ছিলেন, ফারাডে (Faraday) পুস্তক বাধিতেন, তুলাবস্তু আবিষ্কার আর্করাইট্ (Arkrigh) নাপিত ছিলেন, স্পেন্সার (Herbert Spencer) ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, এডামস্মিথ পাদরী ছিলেন এবং এডিসন্ (Edison) সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। এভ্রাহাম লিন্কন (Abraham Lincoln) স্বকিঞ্চিৎ লেখা পড়া করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড (President Garfield) নাবিকের কাজ করিতেন, কার্ণেজী (Andrew Carnegie) ফ্যাক্টোরিতে সামান্ত কাজ করিতেন। স্কট্ Sir Walter Scott) উকীলের মুহুরি ছিলেন, ম্যাক্সিম (Sir Hiram Maxim) একট নিশ্চয়ণ কার্যো ব্যাপৃত ছিলেন এবং রথচাঠিন্ড্ ফেরিওয়ালা ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপরোক্ত অসাধারণ ব্যক্তিগণ নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক।

সভাজাতির বুদ্ধকৌশল, রণপাণ্ডিত্য, শারীরিক শক্তি অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক নিপুণতার উপরই বেশী নির্ভর করে, এই একটা সিদ্ধান্ত ইউরোপে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই রণপাণ্ডিত্যের সহায়তা করিবার জন্য, ইংলণ্ডে স্টাফ্ কলেজের (Staff College) সৃষ্টি। কিন্তু গত বোয়ার সমরে এই স্টাফ্ কলেজের পরীক্ষার্থীর্ণ ও বিশিষ্ট গৌরবান্বিত ছাত্রেরা, অসভ্য বোয়ারের সঠিক নিশানায় যেক্রপ বেঠিক এবং ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত না থাকিতে পারে। লর্ড রবার্টস্ এবং লর্ড কিচনার প্রভৃতি বাহারা

প্রভৃতি বাহারা ট্রাক্ কলেজের বড় ধার ধারেন না, তাহারাই বোয়ারদিগের অব্যর্থ সন্ধান তিষ্ঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

এই প্রকার দেখিয়া শুনিয়া নাটনটিন্‌চ্ চেনচুবী লেখক বলিতেছেন-- In view of these examples and many more which are less familiar it is not to be wondered at that thoughtful men begin to question the efficacy of education altogether."

কেহ যেন মনে না করেন যে উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যালিঙ্গার নিন্দা করা হইয়াছে । যে বিদ্যা পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, যে শিক্ষার চিন্তা পরিচালিত না হয়, যে শিক্ষা ওজন না করিয়া দেওয়া এবং ওজন না করিয়া লওয়া হয়, কেবলমাত্র তাহারই কথা বল হইতেছে । বিদ্যান্ ও জ্ঞানী এক কথা নহে । বিদ্যা পরিপাক না হইলে, কেবল পীড়া উৎপাদন করে । তাই গেটে (Goethe) বলিয়াছেন যে "the greater the knowledge the greater the doubt." পুস্তক-কোটেরা হাজলিটের (Hazlitt) বাক্য সম্ভ্রমণ করিয়া দেয়—"the most learned are the most narrow-minded"—যে পাণ্ডিত্য সত্তোর পথ দেখাইতে অক্ষম এবং কার্যের পরিসর উন্মুখ না করিয়া, আপনাতাই অসাড় নির্জীবভাবে আবদ্ধ থাকে, সে বিদ্যালিঙ্গা নিতান্তই নিষ্ফল সন্দেহ নাষ্ট । আজকাল বিলাতের দুই প্রধান কন্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, চেম্বারলেন্ ও লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) বিশেষ পাণ্ডিত্য বলিয়া প্রখ্যাত নহেন । তাহার দিনরাত্র নাক মুখ শুষ্কিয়া পুস্তকের মধ্যে পাড়িয়া থাকেন না এবং নিঃপক্ষ সমর্থনের জন্য পুস্তক বা পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করেন না । গ্লাড্‌ষ্টোন পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য অনেক সময় কার্যসিদ্ধির পক্ষে বাধাত ঘটাইত । তিনি সকল সময় প্রত্যেক প্রশ্নের দুই দিক দেখিতে গিয়া, কাগ্যস্থলের খেঁই হারাইয়া ফেলতেন—"Mr. Gladstone's unwieldy store of book-knowledge was a millstone round his neck." তাই বেকন বলিয়াছেন—"It is not so important to know what might be said as what ought to be done." সংসারে বাহারা কৃতী বলিয়া প্রতিপন্ন, তাহার প্রায়ই পাণ্ডিত্যবিবর্জিত । "The two greatest statesmen of modern times, Bismarck and Abraham Lincoln might be called uncultured" । ইংরেজ রাজস্ব অমার্জিত অষ্টম হেনরী, এলিজাবেথ এবং ক্রমওয়েল দেশের বড়

কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শতাংশের একাংশও প্রথম জেমস্ (“wisest fool in Christendom”) কিম্বা দ্বিতীয় চার্লস্ (“who has said a foolish thing and never did a wise one”), করিয়া যাউতে পারেন না। যাহারা পলিটিক্যাল ইকনমির (Political Economy) কুটকচণে প্রবৃত্ত লইয়া বাস্তব কার্যকালে তাহারা প্রায়ই বিপর্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। কবডেন্ (Mr. Cobden) দেউলিয়া হইয়া গেলেন এবং Ricardo) দালালী না করিলে অন্নভাবে মারা যাউতেন। তাই কেহ কেহ এখনও বলিয়া থাকেন “It is strange how few business men of the first rank have a good word to say of political economy.”—অর্থোপার্জন করিতে হইলে, কারনেগীর (Andrew Carnegi) উপদেশ বাক্য যে বিশেষ ফলপ্রসূ সে বিষয় সন্দেহ নাই ;—“Start young and broom in hand.”

আমাদের দেশের মত বিলাতে শিক্ষা সঙ্গীর্ণ-পরিসর নহে। কুলি, দরওয়ান, গাড়োয়ান, স্টেটমজুর পর্য্যন্ত লেখা পড়া জানে ; গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী ; খুব ভাল পুস্তকও চারি পাঁচ আনার পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেক গৃহে দুচারিটা কেতাবের আলমারি বা বুকসেল্ফও নিদামান।—শিক্ষার এ প্রকার বিস্তারেও জ্ঞান, বিবেচনা, বুদ্ধি, নীতি বাড়িয়া যায় নাই। বিলাতের লোক একটা না একটা দলভুক্ত ; কিন্তু যদি তথাকথিত কোন শিক্ষিত ইংরেজকে জিজ্ঞাসা কর, “ও বাপু, তুমি যে Little Englander বা Imperialist ইহার কারণ বলিতে পার” তাহা হইলে সে কিছুক্ষণ হতাশভাবে তাকাইয়া মন্তক কণ্ঠস্বন করিয়া নিকট হইবে —বাকৃত্য নিরন্তর নিনাদে এবং সংবাদ পত্রাদির জর চাকের গোলমালে, তাহাদের যত্নক্ষে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে এবং চিন্তা-বিহীন অতিরিক্ত অধ্যয়নে বিবেচনাশক্তি এমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা যে নিজে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের পথ বা কর্তব্য আবিষ্কার করিয়া লইবে তাহার আর ঘোঁ না। বিলাতেও সাধারণ শিক্ষিত লোক (average-man) আমাদের জন্ত পড়িয়া থাকে, জ্ঞানলাভের জন্ত নহে। সুতরাং ইংরেজ সংবাদপত্র খুন, বাতিচারে অতিরঞ্জিত এবং মাসিকপত্রগুলি পাপময় আসক্তির কলঙ্কময় চিত্রে লোকের মন দূষিত করিয়া থাকে ; বিলাতী সাধারণ শিক্ষিত সমাজে, ভাণ্ডার জিনিষের আদর ক্রমেই কমিয়া যাউতেছে। থিয়েটারের অবস্থাও শোচনীয় ; একখানি ভাল নাটক অভিনীত হইলে লোকে অধীর হইয়া পড়ে

এবং উচ্চদরের সঙ্গীতও ভালবাসে না; হাসির গানেরই ভাড়া মিরট বেশী
নাগর; এই সম্পর্কে নাইটিন্‌ট্‌ সেন্‌চুরীর প্রবন্ধ হাতে কিকিং উদ্ধৃত হউল;

“The average man reads not for information but for amusement. Divorces, murders &c. are the most popular items. In spite of the universal education of the people, the stage is steadily degenerating. The masses are no longer able to follow a drama, notwithstanding universal education and can only concentrate their minds sufficiently to follow performance of the scraps style, composed of comic songs, ballets and buffoonery.—The brain of the people has evidently not been sharpened but been dulled and softened by too much reading. Whatever the gospel may be, if there is money enough to drum it loudly and continuously into the public the public is sure to adopt it.”

ব্রিটিশ রাজ্যে, ১৫০ বৎসর পূর্বে সভ্যতার প্রতি যে আদর বা অনাদর ছিল, সর্বাধিগম্য শিক্ষার বিস্তারে তাহার তারতম্য হয় নাই। ডক্টর জনসনের (Dr. Johnson) সময়, যে প্রকার মিথ্যা কথা মিথ্যা লেখা প্রচলিত ছিল আজ দেড় শত বৎসরের শিক্ষা-বাহুল্যে তাহা দূর করিতে পারে নাই। স্পেন্সার তাহার অমূল্য গ্রন্থে (p. 62 Facts and Comments) বিলাতে অসভ্য প্রচারের কথা এইরূপ বলিতেছেন :—

“A century and a half seems to have made little difference. Day by day the reports of the South African War have been full of fictions, exaggerations, garblings; much has been falsified much suppressed.”

ভারতের শিক্ষাপ্রণালী যে হাঁচে ঢালা হইয়াছে এবং এখনও পর্যন্ত সেই হাঁচে স্থলিষ্ট রাখিবার জন্য যে প্রকার বিপুল চেষ্টা চলিতেছে তাহা একেবারে ঠংরেজী, এবং উহা ঠংরেজের দেশেও সফল প্রসব করে নাই ও করিতেছে না। আবার ঠংরেজ ও হিন্দুতে, প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে, যে একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই এবং ফলাফল বিবেচনা না করিয়া চরম বিলাতী অনুকরণে আমাদের জাতিটাকে “বিলাতী বাদরে” পরিণত করিতে প্রয়াসী হই, এবং কার্যকালে, বুঝিয়া সুঝিয়াও, একটা সমীচীন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাস্থের কথা—“That civilization ought to be carried on its original line of civilization” কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই না।

একটু অনুধাবন করিলেই দৃষ্ট হইবে, বিলাতী শিক্ষা সভ্যতার নকল করিতে গিয়া আমাদের গতিটা, সমুখ দিকে না হইয়া ক্রমেই পিছন দিকেই হইতেছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে ঠংরেজি স্কুল কলেজের বাহুল্য, উপাধিধারী এবং পাঠার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা দেশের, নিজের বা পরিবারবর্গের

বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছে না। মধ্যবিত্ত “ভদ্রলোকের” সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। প্রচলিত শিক্ষার শুণে বিলাস বাসনা বা কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। একপাত্তা ই রাজী পড়িয়াছে, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা চাড়া, সে সর্বপ্রকার কার্যিক পরিশ্রম ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিতেছে। ভদ্রলোকের আয় গড়পড়তা ২৫০০ টাকার উর্দ্ধ হইবে না। এই আয়ের ভিতর ৩.৪টা ছেলে মেয়ে মানুষ করিতে হইবে, মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। এদিকে ইংরেজি শিক্ষার খরচও যথেষ্ট। তার উপর এই উচ্চশ্রেণী প্রদেশে বেলা সাড়ে দশটা হতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত, বিদ্যালয়ে, ছেলেদের, বন্দী কয়েদীর মত আবদ্ধ থাকিতে হয়, এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বাৎসরিক বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পরীক্ষার যাক, স্বাস্থ্য যাক, বুদ্ধি যাক, স্কুলের শিক্ষক হতে গৃহের কর্তাঠাকুরাণী পর্য্যন্ত ছেলেকে কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, কেবল “পড় পড় পড়;” যেন পরীক্ষাফলের উপরই আমাদের এই ঘোর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই নিম্নত নিনাদিত “পড় পড় পড়” তাড়নে ছেলেরা বাস্তবিকই মাটিতে একেবারে ছবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে। দেশের স্বার্থহীনতা, ম্যালেরিয়া প্লেগ-পীড়ার প্রকোপের সহিত রামায়ণ মহাভারত বর্জিত ইংরেজী পুস্তকের গুরুভার আরও গুরুতর হইতেছে। যেন একটা অন্ধ বিশ্ব স পুস্তক সংস্কার বুদ্ধির সহিত জ্ঞান, চিন্তাশীলতা প্রমাত ফুটি উঠিবে। যতদিন প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলে উপাদি লাভ-লালসা আমাদের দেশ হইতে নিকাসিত না হইবে ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই এ বিষয় একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল :—

“We all know the feeling of intellectual relief after an examination. * * * An examination for most pupils is nothing but permission to forget. A diploma is often permission to become ignorant again” (Guyau's Education and Heredity p. 172).

বাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারে প্রবৃত্ত না হইয়া, লর্ড কর্জ্জন এগুলিকে সমূলে বিনাশ করিতেন তাহা হইলেও বড় বেশী অমঙ্গল হইত এমন বোধ হয় না।

দেশের দশজন উপযুক্তরূপ শিক্ষিত হইলে যে উপকার মঙ্গল ও সুখ হয় তাহা হাজার জন অর্ধশিক্ষিতের দ্বারা কখনই হইতে পারে না। একা রামমোহন রায় স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকার প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, একা

সাগর দেশের যে কলাগণ বিধান করিয়া গিয়াছেন, একা ভূদেব দেশীয় লোকের মতিগতি যে সুপথে চালিত করিয়া গিয়াছেন, একা বাকিম সাহিত্যের যে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, এক রামতনু বা প্যারিচরণ ছাত্রগণের যে কলাগণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দশ হাজার অধ্ব-শিক্ষিতের সম্মিলিত শক্তিতে হইতে পারিত না। আমাদের উপাদক্ষিত শিক্ষিত সম্প্রদায় যে কতদূর নিষ্কর্জীব ও অসাড়, তাহাদের রীতি নীতি ও এমন 'নয়স্বরে গা ঢালিয়া দিয়াছে যে "পাশব অত্যাচারের" কালিমাময় কাঁড়নো না থাকিলে সংবাদপত্র বকাই না; থিয়েটারে গণিকার হাবভাব নাচগান না থাকিলে লোক হয় না। যে সুমধুর সুপবিত্র যাত্রা পশ্চকাতনো সংযুক্ত হইয়া এক হাজার দেড় হাজার লোককে অতি সামান্য পরচে বা এক রকম বে-খরচার অমোদ আনন্দ অন্তরণ করিত সেই যাত্রার আদর তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমেই কমিয়া যাচ্ছে। এখন বলমবিলাস বারাজনাসমাকুল থিয়েটার মুজরা মাফল বাগানপাটি পাঠলে, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, আজকালকার—কেলুয়াভূনুখা বর্জিত স্মার্কিত সুমধুর তানবর কঙ্কারত যাত্রা শুনেতে বিশেষ উৎসুক নহেন।

আগে ভাইএ ভাইএ বিবাদে কণা পুনা বাঁঠত; টংরেজী শিক্ষার মহাশয়ী শক্তির স্তোনে এখন মা ছেঁকেছে বিবাদ শুরু হইয়াছে। এখন তথা কথিত শিক্ষিত সমাজ তথাকথিত শিক্ষিতা স্ত্রী লহরী বেহাণী ও ব্যতবাস্ত; জননীর মেহের উপর নজর করিবার আর অবসর নাই। আর যদি সত্যনিষ্ঠার কথা বল উহা এখন মুমূর্ষু অবস্থায় গঙ্গালাভের প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেশ কাল পাত্র উপেক্ষা করিয়া শিক্ষার অনিয়মিত সম্প্রসারণ ক্ষতিজনক ইহা বহুদর্শন—হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য। চামার, চণ্ডাল, তেলী তামিলা, ধোপা, ছুতোর, কামার, চাষা, সোণারদেনে, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকলেই একই স্কুল কলেজে, এটি বিষয় একই রসায়ন বিজ্ঞান বা বাইরণ শেলী-ওয়ার্ডনুওয়ার্থ পড়িবে, এটি যে একটা চলিত কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—এটি চপল সিদ্ধান্তটি দেশের সুখস্বাস্থ্য বিধায়ক নহে বরং সমূহ আশঙ্কাজনক, একটু তলিরা দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। অধিকারভেদে শিক্ষাভেদ ইহা হিন্দুদিগের আশু-বাক্য। বাহাদের নৈতিক বল কম, তাহাদের বুদ্ধির তেজ প্রগর করিয়া নিলে সমাজের পক্ষে অন্তত। ইহা অবিদিত নহে সাধারণ জনগণের চিন্তে দেবতাবের অপেক্ষা পশিব শক্তির প্রভাব প্রবলতর। এই

শরতানের ভাব বাহাতে কম হয়, তাহা না করিয়া যদি কথঞ্চিৎ লেখা পড়া শেখান যায় (যাহাকে ইংরাজিতে three R's.—reading, writing, arithmetic বলে) তাহাতে ইষ্টে না ইষ্টেই তৎকাল সমস্ত অনিষ্ট ইষ্ট হইতে পারে । জীলোকের স্বকুমার ভাববৈলী বুদ্ধি কম ভবিষ্যতের দৃষ্টি ক্ষীণ, স্মরণ নৈতিক বলও কম ; স্মরণ আমাদেব দেশের জীলোককে রামায়ণ মহাভারত না পড়িতে দিয়া স্বকুমার ভাবগুলির পরিবর্তন না করিয়া যদি পূর্কালেই Mill গণিত, কিম্বা “অমিয় নিমাই চরিত” না পড়িতে দিয়া “কৃষ্ণচরিত বা গোতমের জায়শাস্ত্র পড়ান হয়, তাহা হইলে জীলোকের দয়া দাক্ষিণ্য তিরোহিত হইয়া ক্রমে তৎস্থানে ফাজলিম, জাঠামি, তাচ্ছলা, উদাস্ত, বিলাস আসিয়া অধিকার করিবে ; এই সব কথাগুলি হিন্দুর আশু বাক্য হইলেও ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গে ইংরেজি নাজির সমর্পিত না হইলে গ্রাহ্য হইবে না । স্মরণঃ এস্থলে বয়োবদ্ধ জ্ঞানবদ্ধ হার্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি উদ্ধৃত হইল—

“Unquestionably, in average human beings the lower emotions are more powerful than the higher. Hence education, adding to the force of all the emotions, increases the relative predominance of the lower, and the restraints which the higher impose are more apt to be broken through. There is a greater liability to social perturbations and disasters— * * * Beyond all doubt, the growth of intellectualization in advance of moralization has done enormous mischief.” Vide Herbert Spencer's “Facts and Comments” p. 66.

শিক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হইলেই জাতিবিশেষের উন্নতি হাউট বা ফালুসের মতন উর্দ্ধগামী হয় না । শিক্ষা সঙ্কীর্ণবৃত্তে ভ্রাম্যমান হইলেও, যদি উহা জন কয়েক মানুষের মতন মানুষ তৈয়ারি করিতে পারে ; যদি জন কয়েকেরও, চিন্তা জ্ঞান ভক্তি, একাগ্র এবং ঘনীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল । গৃহে কতকগুলি অসাড় নিশ্চেষ্ট লোক ক্ষীণ নাড়ী লইয়া ধুক্ ধুক্ করিলে, তাহারা যেমন গৃহস্থামীর কোন উপকারেই লাঞ্জে না এবং তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে এবং পাড়াপাশীরও কোন কাজে আঁইসে না, তেমনি অর্ধ শিক্ষিত, বহুসংখ্যক হইলেও দেশের কোন মঙ্গল বা সুখ বিধান করিতে পারে না । তাই মনস্তর গাঠন বলিতেছেন—

“There is great importance of the correlation between intensity of life and its expansion towards others,” Education and Heredity (contemporary Science Series) p. 181.

ভাবে ভাবে ঘনীভূত ভক্তিতে ভক্তিতে ঘনীভূত চৈতন্য হাজার হাজার

ব মনুষ্য মনুষ্য ও উদ্ধার করিলেন ; আর আজ সহস্র ক্ষণভক্তি বৈষ্ণব
কি হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন

বিশিষ্ট প্রতিভাশালী অধ্যাপকের গুণেই অধুন। জাশ্মানী সভ্যজগতে সর্ব
শ্রেষ্ঠ জাশ্মানীর প্রধান যোদ্ধা ও সেনাপতি মলটকে (Moltke) সামরিক
ছাত্রগণকে রণ বদ্যায় শিক্ষা দিতেন অধ্যাপক সক্রেটিস (Socrates) এবং
পাইথাগোরাসের (Pythagoras) অধ্যাপনার গুণে প্লেটো (Plato) এবং
প্লেটোর শিক্ষা ফলে এরিস্টটল (Aristotle) । ফ্রেডরিক (Fredrick the
Great) নেপোলিয়ন এবং নেলসন্ তাহাদিগের সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে
শিক্ষা দিতেন । জাম্বেন লিবেগের (Liebeg) শিক্ষাগুণে জাশ্মানীর রসায়ন-
বিদ্যা, এবং সিমেন্সের (Siemens) পাণ্ডিত্যফলে তড়ৎবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক
জগতে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—

“Men of great ability are raised not by the superficial education of
the many but by the intensive culture of the few and Germany's successes
in science and industry are traceable to the intensive, not to the
extensive education that has been provided by her.”

আমাদের দেশের প্রধান অভাব ভাল শিক্ষকের । বিলাত হইতে যাহারা
কলেজের অধ্যাপক মনোনীত হইয়া এখানে আসেন, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি
পাণ্ডিত্য স্বৎসামান্য । পাইওনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশ, এখানকার ইংরেজী-
অধ্যাপকেরা ইটন, রগবি, হারে (Eton, Rugby and Harrow) স্কুলের
প্রধান শিক্ষক বা দ্বিতীয় শিক্ষক হইতেও নিকৃষ্টতম । আমাদের দেশের
যাহারা ভাল লোক তাহারা প্রায়ই অধ্যাপনে নিযুক্ত নহেন । এমন অবস্থায়,
আমাদের শিক্ষার, কল যে নিতান্ত শোচনীয় হইবে, ইহাতে আর বাঁচজ কি ।

আমরা চাই স্বার্থত্যাগী হৃদয়বান পাণ্ডিত্যবান শিক্ষক সামান্য, যাহারা,
সাহিত্যের সৌন্দর্যময় ব্যাখ্যায় এবং সঙ্গীতময় আবৃত্তিতে, ছাত্রগণের হৃদয়
ভিগদীনের শোভাবৈভবে আকৃষ্ট করিতে পারবেন ; যাহারা বিজ্ঞানের জীবন্ত
উপদেশে, ছাত্রগণের চিন্তা ও জ্ঞান উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইবেন ; যাহারা
নিজের ত্যাগগৌরবান্বিত ক্ষুদ্রপূর্ণ চারিত্র্যমাহাত্ম্যে ছাত্রগণের চিন্তা তেজ পাক্তি
সত্যনিষ্ঠার অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইবেন । আমাদের দেশের শুভার্থগণের
আন্তরিক প্রার্থনা যদি এই দিকে চালিত হয়, তাহা হইলে সরস্বতী সুপ্রসন্না
হইবেন, নচেৎ নহে ।

শ্রীহরেকৃষ্ণলাল রায় ।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

মাঘ, ১৩০৯ ।

১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী । 'ষ্টেট অব কল-
ম্বিয়া' পত্রের সম্পাদক সাউথ কারোলিনা
লেক টেনাট গভর্নর কর্তৃক গুলি দ্বারা হত হন ।
...সম্মতিক ডিউক অব কনট চাকদার। পরিদর্শন
করেন ।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী । জর্জ ও'হাজ
'পাহুর' ভিনজুইলার মানকালোর দুর্গোপরি
ভীষণ গোলাবর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু পরা-
জিত হয় ।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী । মার্কিন টেলি-
গ্রাফ দ্বারা ভারত সম্রাট এডবার্ড এবং আমে-
রিকা-প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টে স্ব স্ব সাম্রাজ্য স্থান
হইতে বার্তা প্রেরণ করেন ।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী । মরক্কোর গুল-
ভানের সহিত ফেজনগরের সম্মিলিত গ্রামবাসী-
গণের যুদ্ধ হয় কিন্তু বিজ্রোভীপণ পরাজিত হয় ।
...সিং রালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস
চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন । ...জর্জ ও'হাজ 'পাহুর'
পুনর্বার মানকালোর দুর্গ আক্রমণ করে ।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী । মিল্লীর দরবার
হইতে লর্ড কর্জেন কলিকাতায় আগমন করেন ।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী । ভারত সেনা-
পতি লর্ড কিচনার কলিকাতায় আগমন করেন ।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী । বড়লাট বাগ-
জুরের আগাসভবন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানু-
য়ারী লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক নির্মাণ কার্য
সম্পন্ন হয় । ২০০ সালে উহার শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার
গতর্ম্মেন্ট হাউসে "শত বার্ষিকী নাট" হয় ।

১০ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী । সপ্তম এড-
বার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে কলিকাতায়
মহোৎসব হয় ।

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী । কাউন্ট বল-
ট্রেম পুনরায় জর্জ ও'হাজ মন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভাপতি
হইতে নির্বাচিত হন । ...মুলতানের সৈন্ত
মরক্কো সিংহাসনের শিখা দাবীকারীর সৈন্তকে
পরাজিত করে । এবং অনেক বন্দী ও হত করে ।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী । বড় লাট

লর্ড কর্জেন কর্তৃক নূতন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী
প্রতিষ্ঠা হয় । ...ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার
অধিবেশনে কয়েকটি নূতন বিলের প্রস্তাব হয় ।

১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী । ইন্সোরেব
হোলকার নরপতি রাবসিংহাসন ত্যাগ করিয়া-
ছেন । অন্তিতে পাণ্ডুর দ্বার শারীরিক অসুস্থতা
উহার রাজ্য ত্যাগের কারণ । উহার দত্তক-পুত্র
বালাসাহেব সিংহাসনে প্রারোহণ করিয়াছেন ।

১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী । পারস্যের
সাহকে অর্ডার অব দি গার্টার উপাধিতে ইংরাজ
গতর্ম্মেন্ট কর্তৃক অলঙ্কৃত করা হয় । ...সম্রাট
৭ম এডবার্ডের পীড়ার সংবাদ আসে ।

২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী । রুসিয়া ও
পারস্য বাণিজ্য সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হয় ।
উভাতে পারস্যে আমদানী ও রপ্তানীর শুল্ক
সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন বন্দোবস্ত হয় ।

২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী । ভিন জুইলার
পুনঃ বিজ্রোহ হইবার সূচনা হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ
নিবারিত হয় । কামাত গুরার নিকটে বিজ্রোভী-
গণ পরাজিত হয় এবং বন্দী হয় ।

২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী । মিঃ সিসিল
আর্থর প্রিংরাইন রুসিয়ার ইংরাজের দৌতকার্যে
নিযুক্ত হন । ...সম্রাটের পীড়ার আরোগ্য সংবাদ
পাওয়া যায় ।

২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী । সম্রাটের ব্যব-
স্থাপক সভার অধিবেশন হয় । ...আল' পাসি
ভারতবর্ষের অন্তর সেক্রেটারী অব ষ্টেট নিযুক্ত
হইয়াছেন ।

২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী । বর্তমান
মহারাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুরের অভি-
ষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ।

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী । মার্কসনীর টাউন
প্রিন্স বাডিচার দাবি পত্রীকে ডাইভোস
করিয়াছেন ।

২৮শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী । ভায়েনা
নগরে অশান্তির আশঙ্কা অনুভূত হয় । বল-
গেদ্রিয়া ও তুরস্ক সৈন্তে যুদ্ধ হয় ।

কলিকাতা ২৫নং হাটবাগান ষ্ট্রিট ডবলবার্ডার হস্তে, সাহাল এন্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত ও
ভবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রিট হইতে শ্রীরঞ্জনলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

নবপ্রভা ।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, চৈত্র, ১৩০৯ সাল ।

[২য় সংখ্যা ।

গীতার আবিষ্কার ।

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কচ্ছে নিবারাতি
বলছে নোরা ভণ্ড ভীক মিথ্যাবাদী জাতি,
হতাশভাবে তপ্তাপোষে পড়লাম গিয়ে শুয়ে
ছুইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত হয়ে,
ভাবছি এটার মুখের মত জ্বার দেবো কি তা
ঠেকনো হাত এক বইয়ের উপর তুলে দেখি গীতা

ওমা ! তুলে দেখি গীতা ।

লাফিয়ে উঠলাম তপ্তার উপর মাটামতাবে-সোজা
ছটকে পড়ল মাথাথেকে অপমানের বোঝা,
নিন্দা যদি কর এবার কর কি তা জানি
অমনি চাঁদের চোখের উপর ধর গীতাখানি,
এখন বটে অপমানটা—কচ্ছে সবাই বড়
তবু একবার চক্রবদন গীতাখানি পড়

একবার গীতাখানি পড় ।

সকালবেলায় আপিস গিয়ে গাধার মত খাটি
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা ছাখানি চাটি,
বাসায় ফিরি—বন্ধুবর্গ জড় হলে' খালি
ধানের অগ্নে ভরণ পোষণ তাঁদের পাড়ি গালি,

একা যখন—(হায়রে গলায় জোটে নাও দড়ি)

তস্থাপোষের উপর বোসে কোসে গীতা পড়ি

ওগো কোসে গীতা পাড় ।

দোখ যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি,

অমনি প্রাণের ভয়ে ওগো বাবা বনে ডাকি,

উর্দ্ধ্বাসে একেবারে—যেন বাঘে খেলে—

চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে

কোনরূপে বাড়ী পঁউছে ঘরে দিবে চাবি

মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাব

তখন গীতার কথা ভাব ।

গীতার জোরে সচ্ছে ঘূঁষ সচ্ছে কাহুটিটে

গীতার জোরে পেটে না খাই সয়ে বাচ্ছে পীঠে,

করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যা মকদ্দমা,

সয়ে যাবে—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা ;

গীতার মত নাটক শাস্ত্র—গীতার পুণ্যে বাঁচি,

বৈচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় মরে' আছি

বাবা গীতায় মরে আছি ।

শ্রীবিজ্ঞানলাল রায় ।

রাজা বল্লাল সেন ।

(প্রথম প্রস্তাব)

সুবিখ্যাত আদিশূর, লক্ষ্মণ সেন এবং বল্লালসেন এই হিন্দু নরপতিত্রয়ের সহিত বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বেক্রপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বোধ হয় অন্ত কোনও হিন্দু নরপতির সহিত তাহার অর্ধেকও নাই । বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানগণ, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা দলপতি রায়, রাজা ঘনশ্যাম পাল, রাজা বসন্ত রায় প্রভৃতির নাম বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু আদিশূর, লক্ষ্মণসেন অথবা বল্লালসেনের নাম কখনই ভুলিবার নহে । বঙ্গদেশের ইতিহাস হইতে এই তিনজনের নাম অঙ্কহিত করিলে, বাঙ্গালার ইতিহাসের অর্ধেকটা

উড়িয়া যায় । বঙ্গের শূর বংশ বা সেন বংশের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এতদেশে আদৌ ব্রাহ্মণ ছিল না, একথা নিবেকবিহীন প্রলাপীর অভিমত বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু তাহা ভুলেও পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে আদিশূরই সর্ব প্রথমে নূতন ও স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন । আদিশূরের রাজত্বের পূর্বে এদেশে হিন্দু সমাজ ছিল এবং হিন্দুসমাজগিরোমণি ব্রাহ্মণদিগের বসতিও ছিল, কিন্তু নানা কারণে আদিশূর পশ্চিম প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ আনাটয়া এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ও সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । বঙ্গের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের টাঁহাটাই পুরুষপুরুষ ; বৈদিক অথবা অল্প শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের আদি নিবাসী । আদিশূরের শাসনকালের পূর্বে বঙ্গ ব্রাহ্মণ-বসতি ছিল না এবং আদিশূরই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালী জাতিকে ব্রাহ্মণের মুখ দেখাইয়াছিলেন, এই ধারণা ভ্রমাত্মক ; ব্রাহ্মণ ছিল না বলিলেই স্বীকার করিতে হয় আদিশূরের পূর্বে এদেশে হিন্দুসমাজ ছিল না !! কারণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব বর্তমান প্রবন্ধভুক্ত প্রসঙ্গ সমূহের সহিত আদিশূরের সম্পর্ক খুব কম, এজন্য এই অবাস্তব কথার প্রমাণ সহ উল্লেখ করা গেল না । রাজা লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন ; রাজা লক্ষ্মণ অত্যন্ত ধার্মিক এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহারই শাসন সময়ে এদেশে যবন প্রভৃৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তিনি সহজ বিশ্বাসী এবং সরল প্রকৃতিক ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের কথায় বিনা যুক্তি পাঠানকে বাঙ্গালা দেশ অর্পণ করিয়াছিলেন । কেহ কেহ এই কথার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননা করিয়া থাকেন । রাজা বল্লাল সেন, এই প্রবন্ধের সর্বপ্রধান কৈন্দ্রিক মূর্তি (Central Figure), সুতরাং বল্লালের প্রকৃতি ও চরিত্র বর্ণনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

বল্লাল সেন বঙ্গ দেশীয় হিন্দুর জাতিভেদ প্রথার বিশ্লেষণ করিয়া কোলৌত্ত ও মৌলিকা প্রথার প্রবর্তন করেন ; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের এই কোলৌত্ত প্রথা বাঙ্গালার ঘোরতর অবনতির মূলভূত কারণ । কোলৌত্ত প্রথার পক্ষসমর্থন কারীরা বতই ইহার প্রশংসা করুন—ইহার উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য বতই প্রমাণ, তর্ক বা বিতর্ক উত্থাপন করুন—এই প্রথা যে অতীব অনিষ্ট-কর, ইহা ক্রম সত্য : বাঙ্গালার বহুবিবাহের ইহাই মূল ; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের দরিদ্রতা, অকালে অন্নবরষ বালিকাদিগের বৈধব্য দশা, জীজাতির মধ্যে ঘোরতর

ক্লেশ ও অশুবিধা, অসমঞ্জস বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, অসামান্যিক বিবাহ, উচ্চ বংশের লোপ, অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, বাভিচার, গার্হস্থ্য বিবাদ, প্রভৃতির ইহাই মূলীভূত কারণ।— রাজা বল্লাল সেন আদিশূরের পৌত্র এবং লক্ষ্মণ সেনের পুত্র । তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন, তিনি এক সময়ে আমাদের দেশের রাজা ছিলেন । ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই রাজার প্রকৃতি, স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে ; সেই আকাঙ্ক্ষার কিস্তি পরিমাণে পরিভূক্ত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এষ্ট প্রবন্ধে আমি যে সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই—(১) বল্লাল সেনের বর্ষ (২) বল্লালের জাতি (৩) তাঁহার বাসস্থান (৪) তাঁহা কর্তৃক কোলৌস্ত ও মৌলিক্য প্রথার প্রবর্তনের কারণ (৫) বহুসংখ্যক হিন্দু জাতির প্রতি বল্লালের ব্যবহার এবং (৬) বল্লালের প্রকৃতি, স্বভাব ও নৈতিক চরিত্র । “সত্যং পরং ধীমতি” ইহাই আমাদের অবলম্বন ; সত্য অপেক্ষা প্রেচ্ছিতর কিছুই নাই । সুতরাং প্রত্যেক সত্যসম্বৃত্ত প্রমাণ অতি সাবধানতার সহিত আমি প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি ; বাহা অসত্য বা অপ্রামাণিক তাহার আদৌ আশ্রয় অবলম্বন করি নাই ।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অন্ধকারপূর্ণ অননুসন্ধান গর্ভে নিহিত, সুতরাং বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রম স্বীকার না করিলে ঐতিহাসিক সত্যের সহজে আবিষ্কার করা যায় না । বল্লাল সেন নিজে তাঁহার জীবনচরিত্র লিখিয়া বান নাই সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকদিগের গ্রন্থ, রচনাবলী, শ্লোকসংগ্রহ (Anthology), জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কিম্বদন্তী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের আবিষ্কৃত অশুশাসন পত্র প্রস্তরফলক প্রভৃতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য । বল্লালের জীবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে যে সকল পণ্ডিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত জীবন-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই— ১) পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত “শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত্র” (২) শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট বিরচিত “বল্লাল চরিতম্” (৩) শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত্রের পরিশিষ্ট (৪) শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালকাহিনী (৫) কলিকাতার চিনেগাজারের নাথবাবুদিগের কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিত্র, এবং

(৬) শরণ দত্ত রচিত “বল্লাল চরিত্রম্” । শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বিভূতি মহাশয় তাঁহার “সুবর্ণ বণিক” নামক পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন “আসিয়াটিক সোসাইটি ও সংস্কৃত কলেজে যে দুইখানি হস্তলিপি গ্রন্থ ছিল তাহা এক্ষণে আর তথ্য নাই” । ঢাকা কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক (বেদান্তবাদক) পণ্ডিত রমানাথ ঘোষ, সরস্বতী, এন, এ, পূর্ববঙ্গে গোপতি ভট্ট কৃত বল্লাল চরিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন । চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাবু নিমাইচাঁদ শীল এবং (তাঁহার ভগিনীপতি) সুবিখ্যাত রেভারেন্ড লালবিহারী দে মহাশয়গণ “বল্লাল চরিত্র” হইতে অনেক প্রমাণ তাঁহাদিগের “সুবর্ণ বণিক জাতির ঐতিবৃত্ত” নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন । শরণ দত্ত বল্লাল সেনের সমসাময়িক ছিলেন । পণ্ডিত হরপ্রসাদ তাঁহার প্রকাশিত “আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত্র” পুস্তকের ইংরাজি ভূমিকায় লিখিয়াছেন “Saran Datta, the author of the treatise entitled Vallal Charita, was a contemporary of Vallal. That Saran was a contemporary of Vallal Sen appears from the third verse of Jaidev's immortal lyrics, Gita Govinda, in which verse five great poets are mentioned, namely, Jaidev, Umapati, Govardhana, Dhoyi and Saran. We also know Saran from an Anthology by Batu Dass, the son of a general of Laksman Sen, written in 1205 A. C.” “শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রি মহাশয় লিখিয়াছেন “All these facts show conclusively that the materials used by Ananda Bhatta were contemporary with the Sen dynasty. His book is a historical record of the leading events of Vallal's reign.” এতদ্বারা যদ্বন্দন কৃত “মূল চাকুর” এবং “বৈদ্যকুলজী” গ্রন্থদ্বয়েও বল্লাল সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে, সুতরাং আমরা এত কয়েকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বল্লালের বংশ ও চরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেছি ।

বিস্ময় ও বিবাদের বিষয় এই যে, এতগুলি প্রাচীন ও প্রখ্যাত গ্রন্থ বর্তমান থাকিতেও, বল্লালের ধর্ম, বর্ণ এবং জন্মস্থান সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্ধিহান । তিনি প্রকৃতরূপে কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি হিন্দুজাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার আদি নিবাস কোথায় ছিল, ইহা

লঠিয়া বঙ্গদেশের লেখকসমাজে প্রভূত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও উহার সুস্পষ্ট যীমাংসা হয় নাই । বোয়ালিয়া তমোয় যন্ত্রে মুদ্রিত, পণ্ডিত গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রণীত এবং ডাক্তার রামদাস সেন কর্তৃক সমালোচিত “লঘুভারত অথবা কলৌতিহাস” গ্রন্থে উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহুল তর্ক ও প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বল্লাল সেন বৈদ্য ছিলেন ; ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেনবংশকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং বর্তমানকালের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বল্লালকে কায়স্থজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন । বল্লালের প্রকৃত বর্ণ কি তাহা নিরাকরণ করিবার পক্ষে তাঁহার ধর্ম কি ছিল তাহা জানা আবশ্যক । এই ক্ষণে রাজা বল্লাল সেনের ধর্ম লঠিয়াই প্রথমে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি । কেহ কেহ বলেন, বল্লাল বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম পরায়ণ ছিলেন ; কেহ কেহ বলিয়াছেন, বল্লাল প্রথমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া শেষে তাহা পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তর্কের কথায় সময় নষ্ট না করিয়া, আমরা সংক্ষেপে এতমাত্র বলিতে চচ্ছা করি যে, আমরা তৃতীয় মতের পরিপোষক : আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, রাজা বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগপূর্বক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন । এই প্রবন্ধ আদ্যস্ত পাঠ করিলে এ কথার অনেক প্রমাণ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সর্বপ্রধানাধ্যাপক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত “শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত” গ্রন্থের টংরাজি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—Bhatta pada, a learned Hindoo Ascetic—well known as Bhatta Sinha Giri—was the author of the Vyasa Purna which is reproduced *in extenso* by Ananda Bhatta. It was Bhatta Sinha Giri who converted Vallal to Saivaism. অর্থাৎ ভট্ট সিংহ গিরি নামে জনৈক সদ্ধিনান সন্ন্যাসী, রাজা বল্লাল কে শৈবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । অনেকে বৈষ্ণব বা সৌরমত পরিত্যাগ করিয়া শৈব বা তান্ত্রিক হইলেন, একথা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মত উভয়ই হিন্দুধর্মাস্তর্গত ; এম্মলে Conversion শব্দ “মতাস্তর” নহে, “ধর্মাস্তর” অর্থে । তাহাকে বুঝিতে হইবে, কারণ সন্ন্যাসীরা বিশেষতঃ বেদান্তবাদী “গিরি” শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান । ইতিয়াইছেন, হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকভাবের অসুসন্ধান জন্ম আন্দোলন করেন নাই । বাবু মধুসূদন

সরকার (“নব্যভারত”, ২০ পৃষ্ঠা, ৮ম সংখ্যায়) লিখিয়াছেন “রাজা বিক্রম-
দিত্যের সভার জায় বল্লাল সেনের সভাসদ মধ্যে দুইটি দল ছিল—হিন্দু ও
বৌদ্ধ । শূদ্ৰদিগকে সম্মানিত করায় এবং জাতিভেদ অমান্য করিয়া অতীব
নীচ জাতীয়া কল্লার পাণিগ্রহণ করায়, বল্লালকে বৌদ্ধমতাবলম্বী অথবা বৌদ্ধ
মত সমর্থক বলিয়াই বোধ হয় ।” রাজা বল্লাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন
আরোহণ করেন, ঐ সময়ে, এ দেশে বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রচারক, বৌদ্ধ মঠ,
বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রভৃতির প্রভূত প্রভুত্ব ও প্রভাব বিকীর্ণ ছিল । “The Pal kings
favoured Buddhism. It was not persecuted by the Sena
dynasty. The Buddhism which now assumed (Hindoo) Tan-
tric phase became greatly honoured and followed by the
people of Bengal.”—

Traces of Buddhism in Bengal.—(A paper published by
Government. 9, 9, 1901).

এতদ্ভিন্ন ইহাও বলা বাইতে পারে যে, বল্লালের চারিত কাহিনীকারগণ
তাহার বাল্যজীবনে এমন কোনও কথাই লেখেন নাই, বাহাতে তাহাকে প্রকৃষ্ট
হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায় । ব্রাহ্মণাদ্যাপকেরা লেখনী ধারণ করিয়াই গ্রন্থের
মঙ্গলাচরণ পূর্বক, রাজার স্বধন্যপ্রয়তা, দেবদেবী ভক্তি, পূজা, উপাসনা, দান
প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, বল্লাল সম্বন্ধে সে সকল কথা কিছুই নাই,
বরং বাহা আছে তাহাতে বল্লালকে অহিন্দু (বৌদ্ধ) বলিয়াই গণ্য করা বাইতে
পারে । পরিণামে তিনি পিতার তিরস্কারে এবং সমাজের ভয়ে বহুল কুক্রিয়া
পরিত্যাগপূর্বক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায় । সে
সকল কথা পরে বর্ণনা করিব ।

এক্ষণে আমরা রাজা বল্লাল সেনের বর্ণাশ্রম লইয়া বিচার করিতে বাসনা
করি । পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে তিনি ক্ষত্রিয়
অথবা বৈদ্য অথবা কায়স্থ এই তিন জাতির মধ্যে কোনও একটি জাতির
অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন । আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তিনি
কায়স্থ বংশসমুদ্ভূত ছিলেন । আমাদের অভিমত সমর্থনার্থ নিম্নে কয়েকটি
প্রমাণ দিলাম । এই প্রমাণ মালার, তাহাকে প্রথমে ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য অপ্রতি-
পন্ন করিয়া, পরিণামে কায়স্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ।

১ম প্রমাণ ।—মহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি

হিন্দুশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের যে সমস্ত উপাধি আছে, তাহা প্রধানতঃ এই—আহবী, সামন্ত, নজ্জী, ভূমিপঃ, অজ্জী, সমরী, কেশরী, বস্মণঃ, সিংহ, লালা, রক্ষী, কিরীটী নাযক, অধিনায়ক এবং অগ্রণী । পাঠক মহাশয় দেখিলেন, ঠেহার মধ্যে “সেন” উপাধি কোথাও নাই । আদিশূর সেন, লক্ষণ সেন, বল্লাল সেন, ঠেহার সকলেই “সেন” উপাধিদারী ; সেন কখনও ক্ষত্রিয়ের উপাধি ছিল না এবং এখনও নাই । হিন্দুরা প্রথমেই নাম ক্ষিত্বাসা করিয়া মানুষের ধর্ম ঠিক করিয়া লয়—যথা, কৈলাসচন্দ্র (হিন্দুর নাম), মঠনুদ্দীন (মুসলমানের নাম), উটলিয়ম পিটার (খৃষ্টানের নাম) ; তাহার পরে উপাধি দ্বারা জাতির পরিচয় হয়—যথা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের, বসু কারন্তের ইত্যাদি : এস্তো সেন উপাধি দ্বারা রাজা বল্লালের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না । আমরা পুরাণে কোনও ক্ষত্রিয় রাজার বংশগত “সেন” উপাধি দেখি নাই ।

দ্বিতীয় প্রমাণ ।—প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে আদিশূর সেন, শূরবংশ সম্বন্ধিত । “শূর” শব্দ পুংলিঙ্গ, শূর + অন = শূর । ঠেহার অর্থ বীর, সাহসী, শালব্রক্ষ, সিংহ, সূর্য্য, চিত্রকব্রক্ষ, মসূর ডাউল, ইত্যাদি । শৌর্য্যশালী বা বীর্য্যবান ব্যক্তি মাত্রেই শূর উপাধিলাভের যোগ্য, সুতরাং শূর কোনও ধর্মগত বা জাতিগত উপাধি নহে । বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ নামক মৈথিলী ব্রাহ্মণ “শূর” বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম ছিল—শূর, কিন্তু তাহা নাম মাত্র, উপাধি নহে । আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ মহাশয়েরা শূরবংশের স্বতন্ত্র কর্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু শূরবংশ বলিয়া এদেশে কোনও রাজবংশ ছিল না, সেন ও শূর একই বংশ, ঐ বংশের আদি বলিয়া এবং প্রত্নতত্ত্ব শৌর্য্যবীর্য্যশালী বলিয়া রাজা আদিত্য সেন (আদিশূরের আদি নাম) আদিশূর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন । শূর বা সেন, ক্ষত্রিয় জাতি ব্যঞ্জক উপাধি নহে, ইহা ক্ষত্রিয়ের সাহস বা বীরত্বব্যঞ্জক উপাধি হইতে পারে কিন্তু এতদ্বারা ক্ষত্রিয় বংশের পরিচয় পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কোনও ক্ষত্রিয় গৃহস্থ শূর উপাধিতে আজিও খ্যাত হয় নাই, সুতরাং বল্লালসেন শূর বংশোৎপন্ন হইলেও ক্ষত্রিয় নহেন ।

তৃতীয় প্রমাণ ।—কোনও ক্ষত্রিয় রাজবংশে আদিশূর, লক্ষণ সেন বা বল্লাল সেনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই । কোনও ক্ষত্রিয় কত্থাকে বল্লাল বিবাহ করেন নাই । প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজবংশের মধ্যে, কোনও স্বজাতীয় রাজার অনুরোধ রক্ষা করিয়া “ভাষ্যপত্র” প্রেরণের সময় তৎসহ

একাধিক দাসী উপচৌকন স্বরূপে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। প্রাচীন লেখকেরা ভাষা পত্রের বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজা আদিশূর যখন কনোজের ক্ষত্রিয় রাজার নিকট হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য অনুরোধ করেন, কান্ধকুজের রাজা তৎক্ষণে বে ভাষাপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে দাসী প্রেরণের কোনও কথা নাষ্ট। স্বজাতীয় রাজা হইলে এই অনুরোধ রক্ষার সময়ে, কান্ধকুজাধিপতি ইহা কখনই বিস্মৃত হইতেন না এবং বল্লাল চরিত্রের প্রণেতাগণ তাহা উহা করিতেন না। রাজা আদিশূর যদি ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা হইলে বহুপুরাকালীয় এই সামাজিক সম্মানে বঞ্চিত হইয়া তিনি কখনই নিরস্ত থাকিতেন না। কিন্তু নিরস্ত থাকা দূরে থাকুক, তিনি কান্ধকুজাধিপতির নিকটে ভূয়ো ভূয়ো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

৪র্থ প্রমাণ।—রাজা আদিশূর, রাজা লক্ষ্মণ সেন ও রাজা বল্লাল সেন এমন কোনও কৰ্ম্ম করেন নাই বাহাতে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্মান করা যায়, তাঁহাদের ক্রিয়া সমূহ অ-ক্ষত্রিয় জনোচিত বলিয়াই গণ্য করা বাইতে পারে। পুরাণাদিতে দেখা যায়, যখন যে রাজা হইয়াছে অমনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। উড়িষ্যায় এখনও খণ্ডায়দ নামক কৃষক জাতির প্রাচীন রাজার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, ত্রিবাঙ্কুরের রাজবংশে ক্ষত্রিয় গোণিতের একবিন্দু র্ত্তমান না থাকিলেও তাঁহার ধন ও প্রভুত্ব জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য!! বিষ্ণুপুরাণে, মৌর্য রাজাগণ শূদ্র হইয়াও ক্ষত্রিয়; নীচ শকবংশোদ্ভূত নরপতিবৃন্দ এবং সৌরাষ্ট্রের অধম অস্ত্যজ জাতিও রাজা হইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু এস্থলে “ক্ষত্রিয়” শব্দ জাতিত্ব বাচক নহে, পদব্যঞ্জক মাত্র। বল্লাল সেন ধর্ম্মতঃ, কৰ্ম্মতঃ এবং জন্মতঃ অ-ক্ষত্রিয়। আবু রায় ও বাবু রায় নামে বর্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজাদিগের বঙ্গদেশের আগমনের পূর্বে বঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা ছিল না, শূর বা সেন বংশ ক্ষত্রিয় হইল কিরূপে?

৫ম প্রমাণ।—রাজা বল্লাল সেন বৈদ্য বংশসম্ভূত হইলে, নানা শ্রেণীর হিন্দু জাতিকে সম্মানিত করিয়া, নিজের জাতিকে হীনপদস্থ করিয়া বাইতেন কেন? একটা “সেন” উপাধি থাকিলেই “নিশ্চয়ই বৈদ্য জাতির লোক” এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মিক। যদি অনুস্মরণ থাকিলেই সংস্কৃত হয় তাহা হইলেই সেন উপাধি থাকিলেই বৈদ্য হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু “সেন” কি অন্ত্যান্ত বহল জাতির উপাধি নহে? বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে রাজা বল্লালের ব্যবহার তাঁহার অবৈদ্যত্বেরই পরিচায়ক।

৬ষ্ঠ প্রমাণ । —বঙ্গদেশ ভিন্ন বৈদ্য বলিয়া কোনও হিন্দুজাতির অস্তিত্ব নাই । যেমন ডাক্তার বলিলে, ইংরাজি মতের সর্ব জাতীয় চিকিৎসকে বুঝায়, বৈদ্য বলিলে ভারতের সর্বত্র তাহাই বুঝাইয়া থাকে । মালাবার উপকূলে অতীব অধম এবং অস্পৃশ্য জাতিরাও বৈদ্যের কার্য্য করে এবং অনেক প্রদেশের ব্রাহ্মণেরাও বৈদ্য বলিয়া প্রখ্যাত । আসামের “রাজ বড়ুয়া” নামে ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই বৈদ্যগিরি করিয়া থাকে । ধনেশ মিশ্র (ব্রাহ্মণের) শিষ্য বোপদেব নামক এক পণ্ডিত, বৈদ্যের কন্ম করিতেন—

“বিদ্বন্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিবন্ধেণব স্মৃণুনা ।”

তিনি ভিষক কেশবের সন্তান । সেন বংশ কোনও বৈদ্যরাজবংশ হইতে উৎপন্ন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই ; বঙ্গের বৈদ্য বা বৈদ্যরাজী ব্রাহ্মণেরা যে সকল প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা অতীব দুর্বল ।

৭ম প্রমাণ । —ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, আচার্য্য কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহু গ্রন্থালোচনা, বহু অনুশাসন পত্রের বিশ্লেষণ এবং বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বল্লাল সেন বৈদ্য ছিলেন না ।

৮ম প্রমাণ । —সেন বংশের পূর্বে বা পরে বাঙ্গালার বা ভারতের ইতিহাসে কোনও বৈদ্য জাতীয় রাজার নাম পাই না । বৈদ্যেরা কোনও সময়ে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ নাই । বৈদ্যেরা ক্ষত্রিয় নহে এবং ক্ষত্রিয়েরাও বৈদ্য নহে, বৈদ্যের ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রবিরোধী ।

রাজা বল্লাল সেন যে কায়স্থ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে পরবর্তী প্রস্তাবে কয়েকটি প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করা যাইবে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ।

বিজনতা ।

(হামির কবিতা)

শুণ শুণ করি উষার সমীরে
কিরিছেন কবির,
বিজনের ভাব আগে অন্তরে
বিজনতা মনোহর !

চৈত্র, ১৩০৯ ।

বিজ্ঞানতা ।

৫৯

শিরায় শিরায় বিজ্ঞানের ভাব
হয়ে এল ঘনীভূত ;
ফিরিলেন কবি নিজ নিকেতনে
ভাবভরে অভিভূত ।

বিজ্ঞান সে গেহ সাক্ষান যতনে ;
অমুচর প্রতিদিন—
গুচার টেবিলে দোয়াত, কলম,
খাতা, নিব, আলপিন্ ।

পশিলা সে ঘরে ভাবভরে কবি
আপনি পড়িল দ্বার :
বন্ধ করিয়া গবাক্ষচয়
রচিল অন্ধকার ।

মানসে বাহিরে সম বিজ্ঞানতা
কবিতা মানাবে ভাল ;
কর পরশনে বাধা সৌদামিনী
নীরবে ধরিল আলো ।

হেরিলেন কবি চেয়ারে বিছান
সাধের আসনখানি ;
পূর্ণ হৃদয়ে লইয়া লেখনী
বসিলা চেয়ার টানি ।

কে জানে তখন কিসের কাকনী
কোথা হ'তে পশে কাণে ;
আসনে আসীন ফিরিলেন কবি
আঁখি চারিধার পানে ।

‘মিয়’ ‘মিয়’ করি বাড়িছে সে রব—
কবির নিরুপায় ।
এত যতনের ঘন বিজ্ঞানতা
বুঝিবে ভাঙিয়া যায় ।

কবি

টিপিলেন ছোরে ডাকের ঘণ্টা—

ঝন্ ঝন্ বাজে খালি—

ত্রস্ত হইয়া ঢোকে অমুচর

আস্তে ডয়ার ঠেলি ।

কহিগেন কবি— “চৈচায় যে মেনী

কোথা—দাও দূর ক’রে,”

খুঁজিয়া তাহারে পেলেন না কোথাও

হায়, বত অমুচরে ।

পামে না মেনীর চিৎকার তবু

বিজনতা ভেঙে গেল ;

হাররে ভাবের বিজন কবিত—

‘তির পিত নাহি ভেল’ ।

‘অকস্মাৎ তোর!’ বলি কবির

যেমন দাঁড়ান রেগে,—

আসনের নীচে ছিল পোষা মেনী—

অমনি ছুটিল বেগে ।

শ্রীরসময় গাহ! ।

ভৌতিক-তত্ত্ব ।

প্রথম প্রস্তাব ।

MIRACLE বা অলৌকিক ঘটনা ।

ইংরাজি ভাষায় অলৌকিক কার্য্য Miracle নামে অভিহিত হইয়াছে । David Hume ডেভিড হিউম প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে A miracle is a violation of the laws of nature অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা বলিতে প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য বুঝাইয়া থাকে ; তাহার ভূত বিশ্বাস করেন না এবং প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মের বিপর্য্যয়ে যে কখন কোন কার্য্য হইতে পারে একথাও স্বীকার করেন না ।

প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া কোন অলৌকিক ঘটনা অবিশ্বাস করিতে গেলে বেন প্রকৃতির নিয়ম তাঁহাদের জানিতে বা শিখিতে কিছুই বাকি নাহি, তাঁহারা সমস্তই জানিয়াছেন এবং সমস্তই বুঝিয়াছেন ইহাই অনুমান বা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু এষ্ট অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত কাল হইতে কার্য করিয়া আসিতেছে। এষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আদিভৌতিক, আদিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক যে সমস্ত কার্য প্রতি নিয়ত সংঘটিত হইতেছে, তাহার কোন একটীর বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা যে কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ জীব তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের বিদ্যার গরিমা, বুদ্ধির গরিমা এবং জ্ঞানের গরিমা বুচিয়া যায় ; আমাদের মনের অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়—আমরা লেখাপড়া শিখিয়া বতই কেন উন্নতি সাধন করিয়া থাকি না, এখনও অনেক বিষয় যে আমাদের শিখিবার এবং অনেক বিষয় জানিবার আছে তাহা উপলব্ধি করা যায় ।

প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য হওয়া অতিশয় অসম্ভব ; আকাশমার্গে ঢেলা নিক্ষেপ করিলে ঢেলাটি কিয়দূর উর্দ্ধে উঠিয়া মাধ্যাকর্ষণ বলে পুনরায় ভূপতিত হয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু যোগবলে হউক বা অন্য কোন অনির্কটনীয় শক্তি প্রভাবে হউক, মানুষ মাটিতে না পড়িয়া অনায়াসে শূণ্যগর্ভে বসিয়া থাকিতে পারে একথা প্রাচীন আর্য্যগণের স্বকপোল কল্পিত অলৌকিক কথা বলিয়া যদি কাহারও মনে অবিশ্বাস হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা কলিকাতায় প্রফেসর বোসের সার্কস ঘাইতে অনুরোধ করি, সেখানে প্রতি রাতে একটি জ্বীলোককে দুইটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দুইখানি হাত আশ্রয় করিয়া শূণ্যের উপর দাঁড় করাইয়া রাখা হইতেছে, তারপর একটি কাষ্ঠ দণ্ড অপসারিত করিয়া লইলেও জ্বীলোকটি অপর কাষ্ঠদণ্ড আশ্রয় করিয়া তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতেছে, অবশেষে তাঁহার শরীরখানি একদিকে টানিয়া দেওয়া হইতেছে এবং তাহার দেহ ষষ্টি মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে প্রতিহত করিয়া মাটির সহিত সমান্তরালভাবে শূণ্যের উপর অবস্থিতি করিতেছে । অগ্নি স্পর্শ করিলে হাত পুড়িয়া যায়, কিন্তু কয়েক বৎসর অতীত হইল, কাশিতে জনস্তু অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া মানুষ অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিয়াছে ; দীর্ঘকাল অনশনে থাকিলে প্রাণনাশ হয়, কিন্তু কোন একজন মহাযোগীকে ভূগর্ভে প্রোথিত করত তাহার উপর চাস দিয়া ফসল বুনান হইয়াছিল, ফসল সুপক হইলে তাহা কর্তন করিয়া লইয়া দীর্ঘকাল

পরে মৃত্তিকা খনন করতঃ সেই মহাপুরুষকে উত্তোলন করিলে তখনও তাঁহাকে জীবিত থাকিতে দেখার কথা শুনা গিয়াছে ।

প্রমাণ স্বরূপ মৃত মহাত্মা রামমোহন রায় প্রকাশিত ১৭৬৮ শকের ৪৪ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

“রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবনেতে একজন বোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন । তিনি বথেক্কান পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন । জেনেরল বেঙ্কর নামক একজন করানীশ ঠাহার প্রতি সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা জন্য তাঁহাকে মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপিত করেন, এবং তিনিও কাপ্তেন ওয়েড্ সাহেব তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্থান কালে দৃষ্টি করেন । তাহার এই সংক্ষেপ বিবরণ যথা ; একদা সেই বোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকা রক্ত এবং মুখ ভিন্ন অস্ত্র অস্ত্র শরীর হ'র মধুচ্ছিন্ন অর্গাৎ মোম দ্বারা বদ্ধ করিলেন, এবং এক পটের গোণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা বাবর্তন পূর্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন । তদনন্তর সেই গোণীর মুখ বন্ধন পূর্বক তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করিয়া তাঁহার লোকেয়া তাহা সিন্দুক মধ্যে স্থাপন পূর্বক বদ্ধ করিলেক, এবং সেই সিন্দুক মৃত্তিকা মধ্যে রক্ষা করিয়া তত্পরি যব বপন করিলেক । তাহার রক্ষণ জন্য সেই স্থানে রক্ষক স্থাপিত হয় । দশ মাস পর্য্যন্ত সেই বোগী মৃত্তিকা মধ্যে মগ্ন ছিলেন, ইতিমধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ জন্য দুইবার সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং দুই বারই তাঁহাকে সমানরূপ অচেতন দেখেন । দশমাস পূর্ণ হইলে যখন তাঁহাকে উত্তোলন করা যায়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল । তাঁহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্মরক্ত অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল । তদনন্তর প্রথমতঃ তাঁহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং তাঁহাকে উষ্ণ জলে স্নান করাষ্টলে দুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্ববৎ সুস্থ হইলেন । যৎকালে তিনি পৃথিবী মধ্যে প্রোথিত থাকেন, তখন তাঁহার নখ কেশ প্রভৃতি বৃদ্ধি হয় না । তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিত কালে পরমানন্দে মগ্ন থাকেন ।”

W. G. Osborne's Court and Camp of Runjeit Sing p. 124 .

প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হওয়া অসম্ভব হইলেও, শূন্য গর্ভে বসিয়া থাকা, অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া যাতায়াত করা, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অনশনে

মাটির তলায় জীবিত অবস্থায় বাস করা প্রভৃতি যে কয়টি উদাহরণ আমরা দিরাছি তাহাতে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে ; এই ভিত্তিতে আমাদের জানিবার ও শিখিবার এখনও অনেক বিষয় বাকী আছে ।

ভগবানের ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে বা কোন অদৃশ্য জ্ঞানময় পুরুষের মধ্যস্থতায় অনেক সময়ই অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে । পাঠক যদি কখন তারকেশ্বর বা বৈদ্যনাথ মন্দিরে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই দেখিয়াছেন কত শত শূল, কুঠ, মহাব্যাধি প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি একমনে একপ্রাণে দেবাদি দেবের অমুগ্রহ প্রার্থনায় সেখানে পড়িয়া আছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতজন মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেছে ।

বৈদ্যনাথের মন্দিরে কাহারও রোগমুক্ত হওয়ার কথা অনেকটাই হ্রত মনে মনে হাসিবেন এবং আমাদের এত প্রবন্ধটি পাঠ করাও হ্রত এইখানেই বন্ধ করিয়া দিবেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে বা কোন অদৃষ্ট জ্ঞানময় পুরুষের মধ্যস্থতায় যে কেবল আমাদের দেশেই এপ্রকার অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, ইউরোপেও এক সময়ে এপ্রকার কার্য হওয়ার কথা শুনা গিয়াছে । আমরা David Hume সাহেবের পুস্তকেই দেখিতে পাই ফ্রান্সে মেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত Abbi Paris আবি পারিসের একটি পবিত্র সমাধি মন্দির ছিল ; সেখানে অল্প ব্যক্তি যাওয়া চক্ষু পাইয়াছে, বাকীর শ্রবণশক্তি লাভ করিয়াছে এবং কঠিন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ মনে এবং স্বচ্ছন্দ শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছে । David Hume সাহেব আপন পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন—

"Many of the miracles were immediatly proved upon the spot before judges of unquestioned integrity attested by witnesses of credit and distinction in a learned age and on the most eminent theatre that is now in the world."

পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত স্থানে এবং শিক্ষিত যুগে উক্ত সমাধি মন্দিরের অনেক অলৌকিক ঘটনা তত্তৎকালে গং এবং চরিত্রবান বিচারকের সম্মুখে সম্ভ্রান্ত এবং নিষ্ঠাবান সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে ।

হিউম সাহেব আরও বলিয়াছেন এই সমস্ত ঘটনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই সমস্ত

কাম্য প্রতারণা মূলক বিবেচনা করতঃ মন্দিরটাকে একদা লে নষ্ট করিবার জন্য বন্ধপরিষদ হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরে এষ্ট অলৌকিক ঘটনা সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার উপর প্রত্যক্ষ করিতে আর কাহারও সাহস হয় নাট :

হিউম সাহেব Miracle অলৌকিক ঘটনার একজন ঘোর বিরুদ্ধবাদী ; তিনি নিজ পুস্তকে এত কথা স্বীকার করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—

What have we to oppose to such a cloud of witnesses, but the absolute impossibility or miraculous nature of the events which they relate ? And this, surely, in the eyes of all reasonable people will alone be regarded as a sufficient refutation."

অর্থাৎ এষ্ট সমস্ত ঘটনা ঘোর অসম্ভব এবং নিতান্ত অলৌকিক ভিন্ন এষ্ট সকল সাক্ষী প্রমাণের বিরুদ্ধে আমরা আর কি বলিব ? সাক্ষী প্রমাণ থাকিলেও অলৌকিক এবং অসম্ভব বলিয়া তিনি এই সমস্ত ঘটনা অবিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন ।

হিউম সাহেব যাহাই বলুন প্যারিস পালিরামেণ্টের ভদ্র Mons Montejeron একজন চরিত্রবান এবং স্বনামধাত ব্যক্তি ছিলেন ; তাহার পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারি—

ফ্রান্সে সে সময়ে বহু rector ধর্মবাজক এবং clergy ছিলেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে এষ্ট সমস্ত ঘটনা সপ্রমাণ করিয়াছেন ; Cardinal Novelles একজন সংচরিত সাধু পুরুষ এবং Duc de Chatellon ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ডিউক ও পীয়ার, তাহারা উভয়েই উক্ত সমাধি মন্দিরের অলৌকিক প্রমাণ করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে সাক্ষী দিয়াছেন ; অবশেষে Mons. Herault একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং তীক্ষ্ণদর্শী বিচারকের উপর এষ্ট সকল বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য ভার দেওয়া হইলে, তিনিও দেখিয়া শুনিয়া এবং সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া মন্দিরের নিকট পরাস্তব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । ফ্রান্সের রাণী এ সকল কোন কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পূর্বোক্ত ঘটনা পরীক্ষা করিবার জন্য আপন ডাক্তারকে পাঠাইয়া দেন—ডাক্তার যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করেন, তখন একজন ঘোর নাস্তিক, কিন্তু মন্দিরে বাইরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনের বিধেবভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল এবং নাস্তিক হইতে আন্তিক ভাবে তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল ।

চৈত্র, ১৩০৯ ।]

ভৌতিক-তত্ত্ব ।

৬৫

Mons. Montegeon লিখিত পুস্তক হইতে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এই সমাধি মন্দিরের বিষয় শেষ করিব :—Mada moiselle Coirin নামক একটি স্ত্রীলোকের নাম শুনে একটি ক্ষত হওয়ার একাদিক্রমে বার বৎসর কাল তাহাকে অতি দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল । অনেক বড় বড় ডাক্তারে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন কিন্তু কোনই ফল হয় না, অবশেষে তাহার স্তনটী বক্ষস্থল হইতে পসিয়া পড়ে । মনুষ্যের চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়া এবং যন্ত্রণার কাতর হইয়া কইরিণ অবশেষে এই সমাধি মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার যে কেবল ক্ষত আরোগ্য হইয়াছিল, তাহা নহে, ভগবানের কৃপায় তাহার স্তনটী পুনর্গঠিত হইয়া পূর্বে যেমন ছিল, সেই আকার ধারণ করিয়াছিল ।

কইরিণের আরোগ্যসংবাদ রাজ্যমধ্যে বিস্তার হইয়া পড়িল ; যে সকল ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহারা একথা শুনিলেন কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । কইরিণের পিতা এবং তাহার দুই ভ্রাতা ফ্রান্সের রাজ-সংসারে উচ্চপদে চাকুরি করিতেন, তাহার কইরিণকে পারিশে আনাইলেন এবং রাজবৈদ্যের দ্বারা পরীক্ষা করাষ্টলেন—রাজবৈদ্য M. Gunlard, M. Souchay, Surgeon to the Prince of Conte, Segulier, Surgeon of the hospital of Nouterre, M. Deshieres, Surgeon to Duches of Berry, M. Hequet. one of the most celebrated Surgeons in France. এই সমস্ত প্রধান প্রধান ডাক্তার এবং অস্ত্রান্ত্র পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক কইরিণকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অলস অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে । বিক্রমবাদীরা এ সম্বন্ধে কি বলিবেন জানি না কিন্তু ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কিছুই দর্শান যাইতে পারে না ।

অলৌকিক ঘটনায় তোমার আমার অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল ধর্ম্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেন্টীস, প্লুটার্ক, সেন্ট আগষ্টীন প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিতগণের জীবন বা ইতিহাস পাঠ করিলে তাহারা যে Miracle বা অলৌকিক ঘটনা সমস্ত বিশ্বাস করিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রাচীন আর্থা যুনি ঋষিগণ মোগযুক্ত অবস্থায় অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া

গিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীস এবং প্রাচীন রোম যখন সভ্যতার ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে সময়ে সেট দেশের লোক অলৌকিক ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । লুণার এবং কলভিনের জায় ধর্মপ্রচারকগণ ইহার অনুকূলে সাক্ষী দিয়াছেন । Sir Mathew Hale এবং তাঁহার পূর্বে ইংলণ্ডে যে সকল দার্শনিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে প্রমাণাদি লইয়া অবশেষে সেট সমস্ত প্রমাণ অশ্বত্থনীয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন ।

কোন ঘটনা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করার পূর্বে আমাদের জ্ঞান কতটুকু এবং বিদ্যা ও বুদ্ধিই বা কতটুকু তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত । সহস্রাব্দিক বৎসর কি তদূর্দ্ধকাল পূর্বে যে সকল বিষয় ঘোর তমসাজ্বর ছিল, তাহা এক্ষণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ; পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যে সকল তত্ত্ব মনে ধারণাও করিতে পারেন নাই তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে । গ্যালিলিও যখন ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত করিবার কথা প্রথম প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া তিনি পাগল হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ফাটকে দেওয়া হইয়াছিল ; রেলগাড়ি বা টেলিগ্রাফের কথা যখন প্রথম উঠে তখন অসম্ভব ব্যাপার বিবেচনা করিয়া লোকে কতই না উপহাস করিয়াছিল, আবার এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে mesmeric করিয়া অক্লেশে অস্ত্র চিকিৎসা করিবার কথা উত্থাপিত হইলে স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কি সম্ভব বলিয়া চিকিৎসক মহলে একটা মহা হাঁসির রোল পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কালে ছোট বড় নানা প্রকার ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে ; রেল গাড়িতে চড়িয়া লোকে ছয় মাসের পথ সামান্য দিনে বাতায়ত করিতেছে, তারযোগে লোকে বাড়ী বসিয়া পৃথিবীর সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং রোগীর শরীরের উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করতঃ কঠিন কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা অক্লেশে এবং অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে ।

এ জগতে সম্ভব কি এবং অসম্ভবই বা কি তাহা আমরা কিছুই বুঝি না । এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, ইহার কার্য্যও অনন্ত এবং যে শক্তি প্রভাবে এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাও অনন্ত : আমরা যে সময় প্রথম জ্ঞান উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহার সহিত যে কালে প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না । আমাদের জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল ; আমরা পূর্বে যাহা জানিতাম না এক্ষণে তাহা জানিয়াছি, এবং এক্ষণে যাহা জানি না বা বুঝিতে

ধারণাও করিতে পারি না, কালে তাহা হয়ত বুঝিব ও জানিব । শতাব্দিক বৎসর পূর্বে বাহা অসম্ভব বলিয়া লোকে অবিশ্বাস করিয়াছে, কালে তাহাই সম্ভবে পরিণত হইয়াছে । এই জন্ত বলিতেছি মানুষ দুই চারি হাজার বৎসরে সামান্য বে একটু জ্ঞান উপার্জন করিয়াছে তাহাই চরম বিবেচনা করতঃ প্রকৃতির নিয়ম আর তাহার জানিবার বা শিখিবার কিছুই বাকী নাই ভাবিয়া অঃঙ্কারে ক্ষীত হইয়া কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিলে তাহা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করা কোন লোকেরই উচিত হয় না ।*

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।

বসন্তে ।

আবার আশ্র মঞ্জরী ভ্রমর-ঝঙ্কার, কুচিরভার বসন্ত আসিল । আবার চারুতর মোহন মাধব সপুষ্পফ্রমে, সপদা সলিলে, সুগন্ধি পবনে, রমা দিবসে, সুধা-প্রদোষে উপস্থিত হইল । আবার সুমন্দ স্নিগ্ধ মলয়ানিল বহিল । পিককুল আবার উৎফুল্ল-আনন্দে গাইয়া উঠিল । কত গাভে, কত শোভায়, কত সুগন্ধে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল ।

যে বসন্ত ঘোবনে কত স্বপ্নময় আশা, কত অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, কত ভবিষ্যৎ সুখের আভাস লইয়া আসিত, আজ প্রৌঢ়ে তাহা বিষাদময় নিষ্ফলতা শুষ্ক নিশ্চিন্ততা, কঠোর তাক্ষিল্য লইয়া উপস্থিত ।—পূর্বে যে বসন্তে সকলই আনন্দ-ময়, মঙ্গলময়, সুখময় বোধ হইত, আজ পরিণত বয়সে দেখি—আনন্দের চেয়ে নিরানন্দ বেশী—সুখের চেয়ে দুঃখ অধিক, আশার অপেক্ষা নৈরাশ্র ঘনীভূত । ঘোবন-শিহরিত-বসন্তে,—বর্ত্তমানে চঞ্চল উদ্গমে সুপ্রশস্ত আনন্দ, ভবিষ্যতে অসৌম্য আশা ও নির্ভরতা ;—আজ প্রবৃদ্ধ-সৈত্য-সঙ্কুচিত মধুমাसे বহু-আয়াস-লব্ধ-বাহিত বর্ত্তমান অভূত, জীবন কঠোর শুষ্ক—আত্মনিবদ্ধ কর্তব্য-গ্রস্থিতে সুশ্লিষ্ট । পূর্বে যে বাসন্তী সুষমা ললনা-লীলাময়ী-ব্রৌড়ায়, তরল হাস্যময়ীর প্রকম্পনে, আশঙ্কাসূত্র সখায় ছড়াইয়া পড়িত, আজি তথাকথিত ‘সুখ-বসন্ত’ বহু ভারপ্রপীড়িত-পুত্রকণাদায়গ্রস্ত নিতান্ত গদ্যময় পরিশিষ্টে পরিসমাপ্ত ।

* এই প্রবন্ধের লিখিত অধিকাংশ উদাহরণ এবং ইংরাজি quotations সমস্ত ডার্কিন সখা, ডার্কিন সমকক্ষ ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace DCL, LL.D FRS) প্রণীত Miracle and Modern Spiritualism নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে ।

নিজের নিষ্ফল পরিণাম, নিজের ক্ষুদ্রশক্তি, নিজের অসীম দুর্বলতা, বহুশতনাশি আপাততঃ রমণীয় পাপচিন্তা এবং স্বার্থক্ষুন্ন ভোগসমষ্টির উদ্ভূত নিশ্বাস আজ বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যাকে আরও বেশ বিহ্বলতর করিয়া তুলিতেছে ।

* * * * *

গ্রীষ্মের কার্য্যময় উত্তাপ, বর্ষার কৃপাবারিধারা, শরতের সুনির্মল শান্তি, হেমন্তের স্বর্ণময় সমৃদ্ধি, শীতের সঞ্চিত শক্তি একাধারে মিলিত হইয়া পূর্ণাবয়ব, পূর্ণাশক্তিতে, পূর্ণানন্দে বসন্ত উপস্থিত ।—মানুষের দুঃখকষ্ট—যতই সুবিধুত হউক না কেন, নৈরাশ্র যতই গভীরতর হউক না কেন, দুঃখের গীতিকবিতা-কাব্য যতই মিষ্ট মধুর লাগুক না কেন, নোন্দর্য্যের সার্থকতা আছে । তোমার হৃদৃষ্টের ঘটনাসমষ্টি এমন হইতে পারে যে আর মানুষের পানে তাকাইতে টেক্ষা করে না । যদি তুমি আমি প্রকৃতিস্থ হইতাম, যদি মানুষ এত অধঃপাতে না ষাইত, তাহা হইলে প্রকৃতি সুন্দরীর এত প্রয়োজন হইত না । আমাদের মন যদি বসন্তের আকাশের মতন সম্প্রশান্ত উদার হইত, যদি আমাদের চিন্তা মলয়ামাক্রান্তবৎ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সুখদা হইত, যদি আমাদের কার্য্য বসন্ত-কুসুমের স্তায় সুগন্ধ বিতরণ করিত, যদি আমাদের কথাবার্ত্তা পিককোকিল-কুজিত কণ্ঠের স্তায় সহজ সরল অকপট হইত, তাহা হইলে বসন্তের শোভা-ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করিতে পারিতাম ।

* * * * *

—আমরা জীবনে, কত সময়ই না একটু মিষ্ট কথার স্রব, সুমিষ্ট ব্যবহারের স্রব, এতটুকু সহানুভূতির স্রব লালারিত, এবং না পাইলে কতই না ক্ষুণ্ণ হই এবং পুণ্য কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টায়, প্রতি পদবিক্ষেপে, কত বাধাই না পাইয়া থাকি এবং সহানুভূতি-অভাবে কত সময়ই না ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়ি ।—বখন এই প্রকার নৈরাশ্র-সংশয়-শঙ্কায় উদ্ভ্রান্ত হই, তখন ঘরের বাহিরে, লোকসমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই—দেখি উপরে গ্রহ-তারকাভূষিত নভোমণ্ডল,—চক্ৰমা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজের সুধা ধারা জ্যোৎস্না ঢালিতেছে, বাতাস কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া আপনার সুখের হিম্মোলে চলিয়া বাইতেছে ; নীচে, পুণ্যশ্লোকা জাহ্নবী, নিজমনে পরোপকার ব্রতে কুলুকুনুনাদে আপনার গন্তব্যপথ ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে ; চতুর্দিকে বিহঙ্গকুল প্রতিদান তুচ্ছ করিয়া আপনার মধুর-কণ্ঠে স্বাক্ষর দিতেছে ।—কোথা হইতে কে যেন সেই নৈশ আকাশ মণ্ডিত করিয়া আমার সংশয় সমাকুল

চৈত্র, ১৩০৯ ।

বসন্তে ।

৬৯

জীবন কর্তব্য-প্রশ্নের উত্তর দিল ;—“তুমি আমাদিগের মতন হও ; আমরা যেমন সহানুভূতি মেহ প্রশংসা অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত আছি, তুমিও তেমনি নিজের কর্তব্য করিয়া যাও ; অন্তের কার্য, অন্তের কর্তব্য, অন্তের কূট মংলব লইয়া ব্যস্ত থাকিও না ; নিজেকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া, নিজের শক্তি ওজন করিয়া, এদিক-ওদিক না তাকাইয়া, নিজের অভীষ্ট সুসিদ্ধ কর” । সেই দিন, সেই বসন্তের মধুর রজনী বড়ই আশ্বাসের বাণী বণিয়া গেল ।

* * * * *

নাতিদূরে গঙ্গা প্রবহমানা । নদীতটে চন্দ্রকিরণ প্রোজ্জ্বল অশ্বথ বৃক্ষ । নভোদেশে পূর্ণশশী । এই সকলের উপর বসন্তের শ্রীশোভা সৌন্দর্য্য ।—ভগবান্ নিজের বিভূতি বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন—“অহম্ ঋতুনাং কুসুমাকরঃ” আমি ঋতুদিগের মধ্যে পুষ্পত অভিরাম বসন্ত ; “অশ্বথঃ সৰ্ববৃক্ষাণাং” আমি সৰ্ববৃক্ষগণের মধ্যে ছায়ামকুল নিত্যস্থ আরামদায়ী—বহুবিধ ভূপ্তিবিধায়ক অশ্বথ বৃক্ষ ; “নক্ষত্রাণামহং শশী” নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্রস্বরূপ এবং “শ্রোত-সাক্ষীস্মি জাহ্নবী” প্রবাহদিগের মধ্যে জাহ্নবী ।—মানুষের মন সততই চঞ্চল, নিজের আত্মনিহিত ভগবদৈশ্বর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ এবং স্বভাবতঃ বাহিরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট । মানবেন্দ্রিয় দ্বার বহিষ্কল্প ; তাই ঈশ্বর সৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্য ভগবান এই সৌন্দর্য্যের সুমোহন সমাবেশ করিয়াছেন । উপরি উক্ত ভগবদ্বাক্য বুঝিয়া চলিলে বাহিরের সৌন্দর্য্য ভিতরকে সুন্দর করিবে এবং ভক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে । তাই, গীতার দশম অধ্যায়ে আরও পরিষ্কাররূপে বুদ্ধান হইয়াছে যে,

“যদ্বদ্বিভূমিতং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মন ভেজোহংশ সত্ত্ববম্ ॥”

অর্থাৎ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যবৃত্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার ভেজোংশযুত বলিয়া জানিও ।—এই প্রকারে ভাবিতে, অনুভব করিতে শিখিলে, বাহার বেটুকু সৌন্দর্য্য-শোভা কাঙ্ক্ষিত তেজ আছে, তাহাকে ভক্তি সম্মান করিতে শিখিলে ; তখন আমাদের প্রীতি, আনন্দ বৃদ্ধি হইবে এবং দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে ।

* * * * *

নবদ্বীপে আজ দোলপূর্ণিমা ।—অখণ্ডমণ্ডল শতদা বিখণ্ডিত হইয়া, নবদ্বীপের রাস্তা—ঘাটে, মাঠে, প্রাসাদে, মন্দিরে, মঠে, টোলে, চতুপাঠীতে,

বৈষ্ণবের আখড়ায়, যুবকের মুখে, সুন্দরীর অঙ্গসৌষ্ঠবে, প্রোড়ের দেহে, স্থবিরের বিকলাঙ্গে, সোধে, জাহ্নবীজীবনে, শতধা প্রতিফলিত হঠতেছে । গঙ্গাজলাঙ্গীর সম্মিলিত শ্রামল বারিরাশি আলিঙ্গিত তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে । দক্ষিণে হাওয়া স্থনিয়া স্থনিয়া আশ্বাসবাণী বহিয়া যাঠতেছে । নদীতটস্থ বায়ু মুখরিত অপপেলন কিশলয় শোভিত তরুলাজি জাহ্নবীকে সাদরে আহ্বান করিতেছে ? কোকিল কুহরে কুহরে সঙ্গীত কাঁপাইয়া হৃদয়তন্ত্রীকে প্রীতির, আনন্দের, উল্লাসের স্বাক্ষর দিতেছে, এবের হৃদয় অল্প হৃদয়ে মিলাইয়া দিতেছে । এই শুভ মুহূর্তে মধুর মৃদঙ্গে মুগ্ধাঙ্গিণী হরিনামের হরিসঙ্কীৰ্ত্তন নিকটবর্তী হটল । চক্ষু জলে ভিজিয়া গেল ; শরীর বিবশ হইয়া উঠিল । হরিসঙ্কীৰ্ত্তন নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল, আর আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম । কত কথা মনে হটল, ভাবিলাম নবদ্বীপের পূৰ্ব্ব গৌরব আর তাহার বর্তমান বিলুপ্ত-বিভব । ভাবিলাম, বঙ্গের গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে তো, সে নবদ্বীপ, যদি তাকাইবার কোন স্থান থাকে তো সে নবদ্বীপ । বঙ্গ কেন, সমগ্র ভারতে, জ্ঞান ও ভক্তির গঙ্গাধমুনা সঙ্গম যদি কোন স্থান থাকে তো সে নবদ্বীপ । এই সরস্বতীর পাদপীঠ নবদ্বীপে জ্ঞানচর্চা তর্কসিদ্ধান্ত-স্মৃতি-জ্ঞানের বিশ্লেষণ, সার্বভৌম-বাসুদেবে, কৃষ্ণাণ্ড বুদ্ধি রঘুসিংহ জগদীশ গদাধরে এবং কঠোর নীতিনিয়ামক স্মার্ত্তরত্ননন্দনে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গে ও তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয়—অষ্টদ্বৈত নিত্যানন্দে প্রীতি প্রেম ও আশার রাজ্য দিক্দিগন্তে বিকশিত হইয়াছিল ।

* * * * *

পবিত্রচেতা অষ্টদ্বৈতাচার্য্যভক্ত প্রমুখের কাতর বাণী প্রার্থনা ফলে, শতসহস্র কঠোর গগনভেদী হরিশ্বনির ভিতর, এই মনোহর অভিরাম বসন্তে, এই পূত-দোল পূর্ণিমায়, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম । বে আসক্তি, অমুরাগ প্রেম, শ্রাম-শ্রীকৃষ্ণ নবযৌবনসম্পন্ন-ললিত-ললাময়ী উদ্ভাসিত সুন্দরী প্রকৃতির মধ্য দিয়া অঙ্কুরিত ও সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিজের ভুবনমোহন সুঠাম স্বর্ণকমল গৌররূপে, ততোধিক তাঁহার নিফলক শুদ্ধচরিত্রে এবং সর্বাপেক্ষা তাঁহার সর্বসংক্রামক ভুবনবিজয়ী হৃদ্যমবন্তাসম বিপুল প্রেমে, উদ্বোধিত করিয়া, নরনারীর মন সুধা সিঞ্চিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন । হায়, আজ সেট চরিত্র-গরিমা, সেট বজ্রাদপি-কঠোর চরিত্র-নীতি, সেট বিবেচশূন্যতা, সেট অশুভকামনা কোথায় ? সেট অপরিসীম অপ্রমেয় প্রেমরাশি, সেট

কুসুমাদপি-মুহূ-কোমল ভালবাসা কোথায় ! সেই কোপিনধারী,
সন্ন্যাসী-সর্বভাগী-গৌরান্দের তাগ-স্বাকার কোথায় !—

* * * * *

ভগবানের রাজ্যে আশা নাই একথা বলিব না । যতদিন বাঁচিয়া থাকিব
ততদিন আশা ছাড়িব না ? শতবার পড়িয়া বাইব শতবার উঠিতে চেষ্টা করিব ।
প্রাণের সঙ্কল্প, যেখানে প্রত্যাশিত মেহের পরিবর্তে অপ্রীতি-তাচ্ছিল্য পাইয়াছি
—সেখানে প্রীতি বিলাইব । আমাদের হতভাগ্য দেশে, অভাব বিদ্যার নহে,
বুদ্ধির নহে ; অভাব প্রীতির । ইহা কম আক্ষেপের কথা নহে যে এই গৌরান্দের
দেশে, তাঁহার প্রেমজল ধৌত বঙ্গে, এত রেবারেঘি. এত ঘেঘহিংসা, এত
ঠেলাঠেলি ।—

* * * * *

এই প্রীতির পথ সুপ্রশস্ত করিবার জন্য এই ফুলভরা, আশাভরা বসন্তে
“নবপ্রভা”র জন্ম । “নবপ্রভা” যাহাদের হস্তে যত্ন তাঁহারা নিতান্ত ক্ষীণমতি,
ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণশক্তি । ভক্তগণের পদরেণুর আশায় “নবপ্রভা” এতদিন বাঁচিয়া
আছে ।—“নবপ্রভা” প্রার্থনা করিতেছে—হে ফুলভরা, আশাভরা বসন্ত, তুমি
“বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়” হও, আর “নবপ্রভা” যেন এই বহুজন হিতের
বহুজন সুখের সহায়তা করে ।

শ্রীচরিত্রলাল রায় ।

নব-জীবন ।

(গল্প)

১

লজ্জার মাথা খাইরা এক দিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মপুত্র তীরে দাঁড়াইয়া সুরমার
হাত ধরিয়া কম্পিত স্বরে ডাকিলাম “সুরমা” ?

আমার বাল্য সহচরী—একান্ত শুভানুধ্যায়িণী—আমার কবিতার একমাত্র
admirer সুরমা উত্তর দিন “কি বলছো বিনয়” ?

আমি বলিলাম “সুরমা, আজ হইতে আর পাঁচটা বছর আমার জন্য অপেক্ষা
করিবে কি ? এত দিন যখন বিবাহ কর নাই—আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা
কর তাহার পর বিবাহ করিও ।”

সুরমা বলিল “বিনয় আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইতে তোমায় অনুরোধ করিতে পারি না । ভেবে দেখ, এক জনকে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া সহ সঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করিয়াছি । আমাকে তোমার প্রণয়চিন্তা হইতে দূর করিয়া দাও । বিবাহ না করিলে কি ভালবাসা যায় না ? আমাকে ছোট বোন বলিয়া স্নেহ কর না কেন ? আমি তোমারই জন্ত চিরকুমারী থাকিব । তোমার জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব—প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তোমার হিত কামনা করিব—তোমার সুখে হাসিব, দুঃখে কাঁদিব । সম্পদে বিপদে ছোট বোনটির মত তোমার সাথে সাথে প্রতি নিয়ত ছায়াব মত থাকিব । মাহাকে বিবাহ করিয়াছি তাহাকে হৃদয়ের সমুদয় প্রেমটুকু অর্পণ করিছি ফেল । অহরহঃ ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম পালন কর—পরিণামে সুখ ও শান্তি পাইবে । তখন তোমার সাধের সুরমাকে স্নেহের ছোট বোনটিকে অধিক সুন্দর দেখিতে পাইবে ।” সুরমার কথায় আমার মনে যেন কিঞ্চিৎ অশান্তি ভরা শান্তি আসিল—আলোর আঁধারে মিশিয়া একটু যেন আলোক রশ্মি হৃদয়কন্দরে প্রতিভাত হইল, অতীত অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাউলাম । একেবারে আঁধারে ডুবিয়াছি—বর্তমান-জীবনে একবিন্দু আলোক নাহি—সবই ঘোর অন্ধকার । সুরমার কথা শুনিয়া যেন গাণেব মনো নিমেষের তরে সোদামিনীর খেলা হইল : অতীত দেখিলাম । উঃ কি মহাভুল করিয়াছি । প্রেমলতা কে—অভাগিনী প্রেমলতাকে আমি ধর্মত বিবাহ করিয়া কি ভীষণ ভুল করিয়াছি । তাহাকে সুখী করিতে পারিলাম না নিজেও সুখী হইতে পারিলাম না । সুরমার চিন্তা আমাকে অকালে মৃত্যুতে আনিয়া দিতেছে । সুরমা বিদুষী এবং সাতিশয় বুদ্ধিমতী । সুরমা আমাপেক্ষা অনেক জ্ঞান অর্জন করিয়াছে—আমাপেক্ষা অধিক পাঠ করিয়াছে । আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও বলিলাম :—

“সুরমা তোমার কথা সত্য । কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি কৈ ? সত্য বটে, এক্ষণ অবস্থায় তোমার চিন্তা করা মধ্যপাপ, কিন্তু আমার বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি তর্ক সবই তোমার চিন্তা আসিয়া পরাস্ত করিয়া ফেলে । আরও আকুল হইয়া যাউ । কত দিন তোমাকে ভুলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রেমকে ভালবাসিতে বাউ কিন্তু সুরমা—তোমার ছবি আসিয়া মধ্যবর্তিনী হইয়া আমার ভালবাসাকে দূরে ফেলিয়া দেয় । প্রেমকে আলিঙ্গন করিতে বাইয়া তোমার ছবি মাঝে দাঁড়াইয়া আমাদের দুজনাতে ছদিকৈ ফেলিয়া দেয় । সুরমা, এক্ষণ অবস্থায় কি করিতে বল ? তোমার ভাবনা আমাকে অকাল বার্কিকা আনিয়া

চৈত্র, ১৩০১ ।

নব-জীবন ।

৭৩

দিয়াছে । আশা উদ্যম গতপ্রায়, চিন্তায় চিন্তায় আমি জরাগ্রস্ত হইয়াছি । আজ তোমায় ছাড়িব না—তুমিই বল আমি কি করিব ? আমার অবস্থা বেক্রপ সঙ্কটাপন্ন তাহাতে আমার মরণ ভাল ।”

সুরমা কঁাদিয়া ফেলিল । ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বেড়াইতে বাঠিয়া একটি উচ্চ স্থানের উপর আমরা পাশাপাশি বসিয়াছিলাম । সুরমাকে কঁাদিতে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম । আমিও তাহার স্বক্কেদে মাতা রাখিয়া কঁাদিতে লাগিলাম । অবশেষে কঁাদিতে কঁাদিতে সুরমা বলিল “তার চেয়ে আমার মরা ভাল । আমি মরিলে সংসার হইতে আমার স্মৃতি চলিয়া যাইবে । তুমি ও প্রেম স্মৃতি থাকিবে ।”

আমি বলিলাম, “সুরমা, সংসার হইতে তোমার স্মৃতি চলিয়া যাইতে পারে সত্য কিন্তু আমার মন্য হইতে তোমায় স্মৃতি যাইবে কেমনে ? আকাশে শত সহস্র তারকা প্রতাহত উঠিয়া থাকে । কিন্তু আজ যে নীহারিকাকে দেখিলাম কাল তাহাকে চিনিতে পারিব না । তাই বলিয়া কি চাঁদকে কেহ কখন ভুলিতে পারে ? তুমি মরিলে আমার প্রাণ আরও আকুল হইবে—আরও অধীর হইব ।”

সুরমা বিষাদ কণ্ঠে বলিল, “তবে কি হবে ?”

উভয়েই নির্ঝাক ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অধিক হইল । ডিক্রগড় অভি-গামী জাহাজের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমাদের চৈতন্য হইল । পশ্চিমধো কোন কথাই হইল না । বাটী ফিরিয়া আসিলাম ।

২

উক্ত ঘটনার পর চয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । সুরমা বিলাত হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া কলিকাতা মহানগরীতে বেশ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছে । এক্ষণে তাহার মাসিক আয় সহস্র মুদ্রা । আমার বিদ্যার দোড়ে আমি কোন একটি বেসরকারী অফিসে কুড়ি টাকা বেতনের মুহুরীর কাজ করিতেছি । আমি যে কলিকাতায় থাকি সে তাহা জানিত না । অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল কিন্তু আমার তথ্য সে জানিতে পারি নাই । সে তখনও কুমারী ছিল । আমিও তাহার স্মৃতি বুকে পুরিয়া প্রতি মুহূর্ত কাটাষ্টয়া আসিতেছি । শরীর মনের অবস্থা পত্নীপ্রাণের বহু পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার মত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে । বন জঙ্গলে ভরা এবং বক্ষের উপর কত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । আমাকে তাহা অবস্থাপন্ন দেখিয়া পতিব্রতা স্বাধী প্রেমলতা ভাবিয়া ভাবিয়া ভগ্ন অট্টালিকা

পাশে মলিন পর্ণ কুটারের লুপ্তপ্রায় চিহ্নের মত কোন প্রকারে খাড়া রাখিয়াছে । দিন দিন সে মরণের দ্বার দেশে ঘাটয়া উপস্থিত প্রায় হইতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে ভীষণ ব্যাধি আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল । প্রেমের সেট অবস্থা দেখিয়া আমার চেতনা হইল । কিন্তু করিব কি ? গরীব কেবাণী আমি । বিশ মুদ্রা মাসিক আয়ে কেমন করিয়া সুচিকিৎসা করাষ্ট ? তাহার জন্য আকুল হইয়া গেলাম ।

ঠিক এই সময়ে কোন খবরের কাগজে পড়িলাম কোন কুমারী দাস গুপ্তা লণ্ডন মহানগরী হইতে এম ডি পাশ করিয়া * * * নং লোয়ার সার্কুলার রোডে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন । তাহার অতি দয়ালু শরীর, গরীবদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন । সংবাদপত্রে ইহা পাঠ করিয়া কুমারী দাস গুপ্তার সন্ধানে চলিলাম । অফিস হইতে সাড়ে চারটার সময় ফিরিয়া সেই শত তালি দেওয়া কাপড় পরিয়াই লোয়ার সার্কুলার রোডে চলিলাম । পায়ে জুতা নাষ্ট । জুতা কিনিবার সামর্থ্য আমার কোথায় ? মাথায় দীর্ঘ কেশ তৈলাভাবে জটা পড়িয়াছে । মনে নিরাশ হইয়া চলিলাম । কি জানি কুমারী দাস গুপ্তার দ্বারপাল আমার এ হেন বেশ দেখিয়া গৃহস্থামিনীর সহিত দেখা করিতে না দেয় । ভগবানের নাম করিয়া জানবাজারের খোলার বাটী হইতে রওনা হইলাম । রাত্রি প্রায় আটটার সময় কুমারী দাস গুপ্তার বাটীতে পৌঁছিলাম । দ্বারপালের নিকট তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বেচারী বেন একেবারে মাটির মানুষের মত আমাকে লইয়া বসিবার ঘরে রাখিয়া আসিল । যথা সময়ে একটা আয়া আসিয়া অতি বিনীত ভাবে আমাকে জানাঠয়া গেল যে মেম সাহেব খানায় বসিয়াছেন আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন । আমি গৃহস্থামিনীর বন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভগবানের প্রেমের কথা ভাবিতেছি এমন সময়ে কুমারী দাস গুপ্তা ঘরে আসিয়াই আমাকে কর- মর্দন করিলে । আমি কুমারী দাস গুপ্তার মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া পড়িলাম !

কুমারী দাস গুপ্তা আশ্চর্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কি হইয়াছে ?” আমার মুখের কথা সরিল না । অনেক কষ্টে ক্রুদ্ধভাবে “সুরমা” বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলাম । কুমারী দাস গুপ্তা আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া “কে বিনয় নাকি !” বলিয়াই চৌৎকার । পরে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ক্রন্দন ।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে সুরমা বলিল “চল বিনয়, উপরে চল ।
প্রেম কোথায় ? সে কেমন আছে ?”

আমি কঁাদিতে কঁাদিতে বলিলাম “সুরমা এখন বসিবার সময় নাট । চল
একবার প্রেমকে দেখিয়া আসিবে । বোধ হয় সে আর বাঁচিবে না ?”

সুরমা আমাকে ডাকিল, গাড়ী তৈয়ারী করিবার হুকুম দিয়া সেই বেষ্টে
বাহির হইল । গাড়ী আসিলে আমি জানবাজার ঘাটেতে হটনে বলিয়া উভয়ে
গাড়ীতে উঠিলাম । গাড়ীতে বসিয়া সে আমাদের সব কথা শুনিла । আমাদের
ইতিবৃত্ত শুনিয়া সে কঁাদিতেছিল । সময়ে বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম । গাড়ী
হইতে নামিয়া সুরমা ধারে আঘাত করিতে লাগিল । প্রেমলতা অতি কষ্টে
দ্বার খুলিয়া দিল । সুরমা তাহাকে কোলে লইয়া বলিল “দিদি—প্রেম—
আমি তোমার সুরমা ।” তার পর তাহাকে বুকে লইয়া বার বার চুম্বন করিতে
লাগিল । এ মিলনের আনন্দ প্রায় আধ ঘণ্টা গেল । সুরমা ঘরের ও
আসবাবের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল । আমাকে ডাকিয়া বলিল
“বিনয় আমাকে ভালবাস—আমার একটি অনুরোধ রাখিলে কি ?”

আমি “কি সুরমা ?” সুরমা বলিল “এ বাড়ী এখনই ছাড়িতে হইবে ।
বাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া আমার সঙ্গে আমার
বাটীতে চল ।”

আমি বলিলাম “সুরমা, প্রেমকে লইয়া যাও তাহাকে তোমার হাতে
সঁপিয়া দিলাম—আমি এখানে থাকি ।”

সুরমা বলিল “বিন্ সেট ব্রহ্মপুত্রতীরের কথা স্মরণ কর । আমি তোমাকে
ভালবাসি, প্রেমও বাসে । দুই বোনে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিব । আমি
তোমার ছোট বোন । আমার কথা রাখিবে না নাকি ? দিদি প্রেম আমি
তোমার ছোট বোনটী । আমার আর কে আছে ? তোমরাই দুজনে আমার
জীবনেরই সুখ ও শান্তি । যাবে নাকি বোন ?”

প্রেম ও আমি সুরমার বিষাদমাখা কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম
না । আমি বলিলাম “চল সুরমা—তোমারই কাছে যাবো ।”

প্রেমও বলিল—“সুরমা—দিদি চল্ তোঁর কাছে যাইয়া—তোঁর হাতে
আমার স্বামীকে সঁপিয়া মরিব ।”

সব ঠিক ঠাক । আমরা সুরমার কাছে আসিলাম । তিন মাস পরে প্রেম
একটু আরোগ্য হইল ।

৩

প্রেম । “দিদি, আমার কথা শোন । তুমি ঙ্কে ভালবাস—উনিও তোমাকে প্রাণ মনে ভালবাসেন । এস বোন—আমরা দুই জনে তাঁহার দাসী হইয়া সেবা করি ।”

সুরমা । “দিদি, সত্য কথা বলিতে কি তাহাতে কেহই সুখী হইতে পারিব না । বরং আরো অসুখী হইতে হইবে । স্বামীর আংশিক প্রেম জ্বীতে সহ্য করিতে পারে না” । উভয়েই চুপ । আর কেহই কোন কথা কহিল না ।

* * * * *

উহার দুই মাসে পরে প্রেমের জ্বর হইল । আরও পনের দিন গেল, রাজবন্দী দেখা দিল । তাহার পর এক মাস পরে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সুরমা ও আমাকে ডাকিয়া প্রেম বলিল, “সুরমা আমি জন্মের মত চলিলাম । স্বামীর যত টুকু ভালবাসা পাঠিয়াছি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া চলিলাম । এমন দেবতা স্বামীকে সংসারে একা ফেলিয়া বাঠিতে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয় । বোন আমার স্বামী—আমার প্রাণের দেবতা তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া নবজীবন লাভ করি । বল দিদি আমার স্বামীর হইবে কি ?” গম্ভীরস্বরে সুরমা বলিল “ প্রেম, তোমার কথা রাখিব তোমার স্বামীকে আমি লইলাম । ছোট বোন কাতর ক্লিষ্ট ভাঠয়ের সমস্ত ভার লইল । তুমি নিশ্চিন্ত থাক । তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার স্মৃতি চিহ্ন বুকে পুরিয়া তোমার স্বামীর-আমার স্নেহশীল ভাঠয়ের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইয়া রহিব । ভাঠয়ের পাশে বোন, বোনের পাশে ভাই না থাকিলে সংসারে নিঃস্বর্ণ ভালবাসা আর কোথায় বোন ?” আমিও কাঁদিয়া বলিলাম “প্রেম আজ নবজীবন লাভ হইল । তোমার মুখে ভগবানের ছবি দেখিতে পাঠেছি । কামনা ভাগ না করিলে প্রেম, পরিশুদ্ধ প্রেম, জাগিতে পারে না । ভগবান প্রেমময় । তাহাতেই জীবন মন অর্পণ করিয়া সুখে সংসারে রহিব । তোমার প্রেম ও তাঁহার প্রেম বুকে পুরিয়া “জয় প্রেমময়” বলিয়া সংসারে কাজ করিব । যাও যাও স্বর্গে যাও, আমরাও তোমার পশ্চাতে আসি-তেছি । তুমি প্রফুল্ল মনে স্বর্গধামে যাও । সুরমা আমার নায়েব পেটের ছোট বোন, সে অবশ্য আমার বন্ধ করিবে” । সকলে “জয় প্রেম ময়” বলিলাম ।

রাত্রি তিনটার সময় সত্যী সাধ্বী প্রেমলতা হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেল । মৃত্যুর মাখা সুরমার কোলে, আমি পাশে বসিয়া । সুরমা প্রেমে

আপ্নত হইয়া ভগবান উদ্দেশে বলিল : “প্রেমময়—আজ নবজীবন লাভ হইল ।
তুমি প্রেমের আধার । আমরা অন্ধ হইয়া কি না ভুল করিয়া ফেলি ।
আজ চক্ষু ফুটিল । প্রভো প্রাণে বল দাও—যেন আমরা সহোদর সহোদরা মিলিয়া
তোমার রাছো—তোমার প্রেমের রাজ্যে তোমারই প্রেম বিলাটেতে পারি ।”

৪

তিন বৎসর অতীত । “প্রেমলতা সদন” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সুরমা
মাতা হইয়া কত শত অনাথার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে । তাহার মুখে সর্বদা
প্রেমের গধুর হাসি লাগিয়া আছে । আমিও “প্রেমলতা সদনে” পুরুষ অসহায়
দিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি । অবশ্য তাহার মূলে সুরমা, প্রেমলতা
আর সর্বাদিকারণ প্রেমময় ভগবান ।

প্রাণে বড়ই শান্তি । সুরমা বোনের বন্ধে আদরে আমার নব জীবন লাভ
হইয়াছে । এখন প্রেমময় চরণ বড়ই ভালবাসি । সুরমা ও আমি একত্রে “প্রেম-
লতা সদনে” বসিয়া সেই প্রেমময়ের পদ প্রাণ ভারিয়া পূজা করিয়া কৃতার্থ হই ।
শ্রীমতীজমোহন বসু ।

সুবন্ধু ।

বাসবদত্তা ভিন্ন কবি সুবন্ধুর অল্প কোন রচনা পাওয়া যায় না । বাসবদত্তা,
প্রাচীনকালে যে প্রকার খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাতে মনে
হয় যে এখান গলকল্পিত গদ্যকানোর মধ্যে সর্বপ্রথমে রচিত । সপ্তম শতাব্দীর
প্রারম্ভে কবি বাণভট্ট গাথা লিখিয়াছেন, তাহাতেও যেন ঐ অনুমান দৃঢ়তর হয় ।
বাণভট্টের কাদম্বরী এবং হর্ষচরিত গদ্য লিখিত ; এইজন্তই তিনি হয়ত হর্ষ-
চরিতের মুখবন্ধে সর্বপ্রথমে গদ্য রচনার খ্যাতিপ্রাপ্ত সুবন্ধুর কাব্যের কথা,
এবং তৎপরে কবি হাচেন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । পাণ্ডিত মণ্ডলীর
মধ্যে হয়ত পদো ভিন্ন কাব্য রচনার প্রথা সমদিক প্রচলিত ছিল না বলিয়া,
বাসবদত্তার কথায়, কবি বাণভট্ট লিখিয়াছেন :—

কবীনাং গলকল্পো নুনং বাসবদত্তয়া

শক্তোব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কণগোচরম্ ।

ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, যে “মনোহারী” এবং “পাদবন্ধোজ্জল” “গদ্যবন্ধ” লিখিয়া-
ছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে । গদ্য রচিত বলিয়াই হয়ত
বাসবদত্তার নুতনত্ব ; নহিলে তাহার কথাভাগ অতি সংক্ষিপ্ত । রাজা চিত্তামণির
পুত্র কন্দর্প-কেতু, একদিন একটি “অষ্টাদশবর্ষদেণীয়া” অশেষ রূপলাবণ্যবতী
কুমারীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া বিরহাতুর হইয়া পড়েন । তাহাকে অনুসন্ধান

করিবার ক্ষমতা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যখন বিষ্ণুপ্রদেশে গমন করেন, তখন শুকশারির মুখে “হৃদয়ফলকে চিত্রিত প্রিয়তমার” সন্ধান পাঠিয়া, মগধদেশে গমন করেন । মগধ-রাজকুমারী বাসবদত্তাও অল্পে রাজকুমারকে দেখিয়া বিরহাতুরা ছিলেন । কন্যার অষ্টাদশ বর্ষ, বিবাহের উপযুক্ত বয়স বিবেচনা করিয়া, মগধরাজ স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিয়াছিলেন । কিন্তু রাজকুমার গোপনে অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিয়া বাসবদত্তাকে লইয়া চলিয়া গেলেন । দৈবভীষ্মপাকে বাসবদত্তা বিষ্ণুপ্রদেশে শিলাময়ী হইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজকুমারের স্পর্শে আবার মানবী হইয়া গন্ধক নিধানে বিবাহিতা হইলেন । এই গল্পটি কেবল বর্ণনার ছটায় দীর্ঘ হইয়াছে মাত্র । এই বর্ণনায় অনেকস্থলে বেশ কবিত্ব আছে বটে, কিন্তু রচনা “শ্লেষঃ প্রায়” বলিয়া, যত্নপূর্ব্বক ভাবার্গ সংগ্রহ করিতে হয় ।

এখন একবার বাসবদত্তার রচনাকাল নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিব । ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনের ক্ষমতা কাবানগের সময় নির্ণয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন ।

বাণভট্ট যে ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত হর্ষচরিত এবং হর্ষবর্দ্ধনের প্রস্তরলিপির তারিখ হইতে সর্বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে । রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন ৬০৫ খৃষ্টাব্দে কনোজের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । হর্ষচরিতে যখন সুবন্ধু কৃত বাসবদত্তার উল্লেখ এবং প্রশংসা আছে, তখন সুবন্ধু এই সময়ের পূর্ব্ববর্তী । কিন্তু কত পূর্ব্ববর্তী ?

বাসবদত্তার প্রারম্ভভাগে, বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি লোপের কথা উল্লেখ করিয়া, কবির গভীর আক্ষেপোক্তি আছে ।

স। রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কং কঃ ।

সরসৌ কীর্ত্তিশেষঃ গতবতি ভূবি বিক্রমাদিত্যে ॥

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া লই । বাসবদত্তার প্রতি কথায় বিবিধ অর্থ ধ্বনিত হয় ; কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিয়াছেন । প্রত্যেক কথায় যে শ্লেষ অথবা বিভিন্নভাব নিবিষ্ট হইবে, তাহা তিনি নিজেই অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

সরস্বতী দত্ত বর প্রসাদশত্রে সুবন্ধু সজ্জনৈক বন্ধুঃ

প্রত্যক্ষর শ্লেষময় প্রবন্ধ বিজ্ঞান বৈদগ্ধ্য নিধি নির্বন্ধঃ ।

এখন কবির আক্ষেপের কথাটার অর্থবৃত্তিতে চেষ্টা করি । বিক্রমাদিত্য রাজার কীর্ত্তি শেষ হইবার পর, সরোবর শুষ্ক হইলে যেমন তাহার রস শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীতে রসবত্তা বা বীৰ্য্যবত্তা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন অজ্ঞাত নর রাজারা (অজ্ঞাত অর্থে কন্ পতায় করিয়া নবকা সাধিত), বিরাজ করিতেছেন । এরূপ স্থলে কোন্ ব্যক্তি না আমাদের প্রতি কি ব্যবহার (দুর্ব্যবহার) করিবে ? এই গেল সোজাসুজি একটা অর্থ । সা (সেই) শব্দটিকে বিশেষণ না করিয়া, সরোবরের সহিত মিলাইবার জন্য সারস (পক্ষী) বস্তা করা বাইতে পারে, এবং নবকা (বক সমূহ) কক (পক্ষী বিশেষ) প্রভৃতি যোগ ঘটান বাইতে পারে । তাহার পর আবার রসবত্তাকে শৃঙ্গারাদি অর্থাৎ

কাব্যগুণবতা করিয়া, নবকা বিলসন্তি অর্থে, নূতন হীন কনিগণ বলিয়া অর্গ করা যাউতে পারে। নবকা লইয়া আর একটি এষ্ট অর্গ হয় যে পূর্বে নয় জন কবির খ্যাতি ছিল, এখন যাহারা আছেন তাহাদের উপর হীনার্গে ক প্রয়োগ করিতে হয়। কং কঃ লইয়াও ঐরূপ অনেক অর্গ আছে। কিন্তু সমগ্র অংশের ঢীকা করিতে গেলে পাঠকদিগের বৈরাচ্যুতি হইবে। সুবন্ধুর সময়ের অল্প পূর্বে যে বিক্রমাদিত্যের কৌলি শেন হইয়াছিল, তাহা ঐ শ্লোকের বিলসন্তি ক্রিয়াপদের বর্ত্তমান কাল প্রয়োগ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, “তিনি গেলেন, আর এখন এষ্ট দশ হইল,” বলিলে বহু পূর্ব সময়ের কথা বলিয়া মনে করা যায় না। এষ্ট বিক্রমাদিত্য যে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য, এবং তিনি যে ৫৪০ হইতে ৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা অন্য প্রবন্ধে লিখিয়াছি। হুয়েন সাং ৭ম শতাব্দীতে আসিয়া ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন, তাহা শুনিয়া গিয়াছিলেন। হুয়েন সাং একথাও বলিয়াছেন, যে বিক্রমাদিত্য হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ কবি মনোহর (তর্কে পরাজিত হইয়াই হউক অথবা নিরুক্ত হইয়াই হউক), তাহার সভা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং বিক্রমাদিত্যের পর যখন শীলাদিত্য রাজত্ব আরম্ভ করিলেন তখন মনোহরের শিষ্য বসুবন্ধু প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং হিন্দু পণ্ডিতেরা পরাজিত এবং লাজ্জিত হইয়া সভা পরিত্যাগ করেন। হুয়েন সাংয়ের গণনায় শীলাদিত্য ৫৮০ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানে বলিয়া রাখি, এষ্ট শীলাদিত্যের সহিত কনোজের শীলাদিত্যের কোন সংস্রব নাই। কনোজের শীলাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন, প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র এবং রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; এবং তাহার রাজত্ব ৬০৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ। এষ্ট দুইটি নাম লইয়া মোক্ষমূলর এবং রমেশচন্দ্র দত্ত গোলযোগ করিয়াছেন বলিয়াই একথাটা বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া দিতে হইতেছে।

বাসবদত্তার প্রারম্ভে আত্মকুলদেষী খলদিগের প্রতি যথেষ্ট ভৎসনা করা হইয়াছে; এবং তাহার পরেই আক্ষেপ করিয়া বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের শেষে অপণ্ডিতেরা পাণ্ডিত বলিয়া আদৃত হইতেছেন বলিয়া লিখিত আছে। হুয়েন সাংয়ের কণার সহিত মিলাইয়া লইলে, নিশ্চয়ই এষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে সুবন্ধু, মালবরাজ শীলাদিত্যের সভা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নচেৎ তাহার কাব্যের প্রারম্ভের শ্লোকগুলি—“প্রয়োজনমুদ্दिष्ट” লিপিত হইয়াছিল বলিতে হয়। সুবন্ধু গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের প্রতি যে বিদ্বেষ দেখা যায় তাহাতেও যেন ঐ কথাটি সূচিত হয়। শীলাদিত্যের রাজত্ব ৫৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়া থাকিলে, সুবন্ধু যে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই মালব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া লইতে হয়। একপ অবস্থায় যদি প্রায় ৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাসবদত্তার রচনা কাল নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না।

সুবন্ধু যে উজ্জয়িনী হইতে মগধরাজদিগের আশ্রয়ে গমন করেন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার কাব্যের নায়িকা মগধরাজকুমারী পাটলিপুত্র হইতে

অপহৃত। বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । গুপ্তরাজাদিগের ক্ষমতা লোপের পর, একদিকে নূতন মগধ গুপ্তদিগের রাজত্ব, এবং অন্যদিকে বর্দ্ধন রাজাদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । ৪৭০ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আদিভাবর্দ্ধন এবং প্রভাকর বর্দ্ধনকে পাঠ । সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও আশ্রয়ে থাকিয়া সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করিয়াছিলেন ।

মনোহুতের শিষ্য বসুবন্ধুর সহিত সুবন্ধুর কোন সম্পর্ক ছিল কি ? পূর্বকালে এক বংশের লোকের মধ্যে, এ প্রকার নামের মিল থাকিত । কবি খণ্ডের বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

“যদয়ং ন কুলদ্বেষী স্বকুলদ্বেষী পুনঃ পিতৃনঃ ।”

তাঁহার দ্বেষ্টা কি তবে এষ্ট বসুবন্ধু ? এ কথাটা আমার আন্দাজ মাত্র ; কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নাই ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

ফাল্গুন, ১৩০৯ ।

১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী । ব্রিটিশ, জার্মান ও ইতালীয় চুক্তিপত্রের সুসংবিদ্য ওয়াসিংটনে স্বাক্ষরিত হয় ।

২রা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী । তিন জুইলা অবরোধের নিবেদন শক্তিপূর্ণ কর্তৃক প্রচারিত হয় ।...মাসিদোনিয়া বিজোহীর নেতাপণ বন্দী হওয়ার বিজ্ঞোহি সমিত্ত হয় ।...ব্রিটিশ কর্তৃক কানোর অবরোধ সংবাদ প্রকাশিত হয় ।

৩ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী । পার্লিয়ামেন্টের পুনরধিবেশন অদ্য আরম্ভ হয় ।

৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী । . জাপানের প্রিন্স কুমাতম ৫৫ বৎসরে পরলোক গমন করেন ।

৭ই ফাল্গুন, ১৯ই ফেব্রুয়ারী । লেপ্টেন্যান্ট জেনারেল স্ত্রী এন, জি লিটলটন দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ।...নিউকাসল-অন-টাইনে Labour Committeeদিগের সমিতির অধিবেশন হয় ।

২ই ফাল্গুন, ২১ই ফেব্রুয়ারী । আমস্টার-দাম নগরে ২০,০০০ হাজার কুলি মজুর ধর্মঘট আইনের প্রতিবাদার্থে একত্রিত হয় ।

১৫ই ফাল্গুন, ২৭ই ফেব্রুয়ারী । পর্ভগীজ মন্ত্রীসভা ভঙ্গ হয় ।...ভিল জুইলার সহিত ফরাসী ও মেক্সিকানদিগের সন্ধিপত্রের সুসংবিদ্য স্বাক্ষরিত হয় ।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮ই ফেব্রুয়ারী । গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডে ভয়ানক ঝড় হওয়ার বিশেষ ক্ষতি হয় ।

২৬ই ফাল্গুন, ১০ই মার্চ । নিউ ইয়র্ক নগরে ভয়ানক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয় । অনেক লোক বিশেষ আহত হয় ।...ছোটলাট বোর্ডিগন সাহেব কটক পরিদর্শন করেন ।

২৭ই ফাল্গুন, ১১ই মার্চ । ছোটলাট বোর্ডিগন সাহেব পুরী পরিদর্শন করিলেন ।

২৯ই ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ । ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় ।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রিট ভারতসিহির-বস্ত্রে, সান্তাল এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত ও

ভবানিপুত্র ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রিট হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩১০ সাল

[৩য় সংখ্যা।

মেঘদূত।

ক। পাঠের যুক্তিযুক্ততা।

প্রথম প্রবন্ধে মেঘদূতের কত ভিন্ন পাঠ ও টীকাকারগণের মধ্যে কত পার্থক্য তাহার কিছু উদাহরণ দিয়াছি। ইহার সম্ভাব্যজনক সামঞ্জস্য করা অনেক পরিশ্রমের দরকার ও অনেক কূটতর্কের আবশ্যক। তবে মোটামুটি লেখার ক্ষমতা আমি নিম্নলিখিত পন্থা নির্দেশিত করিতেছি, বোধ হয় তাহা পাঠকের নিকট অব্যক্তিকর বলিয়া বোধ হইবে না।

পার্বাভূদয় কাব্য ধৃত পাঠ আন্দাজ ৮২০ খৃষ্টাব্দের, সূতরাং সর্বপ্রাচীন। বল্লভদেবের টীকা আন্দাজ দশম শতাব্দীর পূর্বার্ধে, সূতরাং টীকায় সর্বপ্রাচীন। মল্লিনাথের টীকা সর্বাপেক্ষা সুবিবেচিত, সূতরাং বহুপ্রাচীন না হইলেও গ্রহণীয়। এখন এই তিনটা তুলনা করিয়া মূল বাহির করিলে আসল হইতে নেহাৎ ফারাক হইবে না। যে যে শ্লোক তিনটাতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ আসল। যে যে শ্লোক তিনে পার্থক্য তাহার মধ্যে সাধারণতঃ পার্বাভূদয়, কচিং বল্লভদেব, কচিং মল্লিনাথ গৃহীত হইবে; আলঙ্কারিক বা কাব্যগত সমালোচনার সাহায্যেও বাছিয়া লইতে হইবে।

এই পন্থায় চলিলে দেখা যায় যে পার্বাভূদয় ধৃত সমস্ত ১২০টি শ্লোক মল্লিনাথ ও বল্লভদেবে বর্তমান। এতদ্ব্যতীত “অস্ত্রোবিন্দুগ্রহণ চতুরাং” প্রমুখ শ্লোক মল্লিনাথে আছে বল্লভে নাই, ও “অধরকাস্তং প্রতিমুখগতং” প্রমুখ শ্লোক বল্লভে আছে, মল্লিনাথে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকটি কাব্যগত সমালোচনার আসলের

হওয়া অসম্ভব নয় আর প্রথমটি মল্লিনাথ নিজেই একরকম প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন ; সুতরাং সৰ্ব্বশুদ্ধ ১২১ শ্লোক আসল ও তদ্ব্যতীত অপর শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, এমন অনুমান অব্যক্তিকর নহে । শ্লোকীয় পাঠে কখন কখন অল্প অল্প টীকাকার ধৃত শব্দ কাবাংত সৌন্দর্য্যের জন্য পছন্দ হইতে পারে, তখন তাহা গৃহীত হওয়া উচিত ।

বাল্মীকির শ্রীযুক্ত জীবানন্দবিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাব্যসংগ্রহ অন্তর্গত মেঘদূত প্রচলিত । তাহাকে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পরখ করিলে দেখা যায় যে মল্লিনাথীয় ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৭১, ৭৩, ৭৭, ৮০ এই সাতটি শ্লোক জীবানন্দীয় মেঘদূতে নাই, অথচ সেগুলি সম্ভবতঃ আসল শ্লোক ; ও জীবানন্দীয় ৯০ শ্লোক উপরোক্ত তিন পাঠে বা অল্প কোন টীকাকারে পাওয়া যায় না, সুতরাং সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত । এ ছাড়া মল্লিনাথের ধৃত প্রক্ষিপ্ত ২২৭ শ্লোকও তাহাতে আছে ।

খ । কাব্যে ভৌগোলিক বিবরণ ।

মেঘের কাল্পনিক গতি বর্ণন সময়ে কবি বখার্শ ভৌগোলিক বিবরণ অনেক স্থানে দিয়াছেন । পূর্বমেঘ তৎকালিক মধ্য ও উত্তর ভারতবর্ষের বিবরণে পরিপূর্ণ । তাহাদিগের বখাষথ চিহ্ন করা (identification) সমালোচকের এক প্রধান কর্তব্যকর্ম । প্রাচীন টীকাকারেরা ও উইলসন সাহেব প্রমুখ আধুনিক সমালোচকেরা এই চিহ্ন কার্য্য কতক কতক চেষ্টা করিয়াছেন । সব জায়গার যে ঠিক হইরাছে বোধ হয় না । আমার মতে বখার্শ চিহ্নতের জন্য প্রাকৃতিক ভূগোলের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক, কেন না মেঘের গতি পাহাড়, নদী অধিত্যকা প্রভৃতি দ্বারা সোজা, বা বক্র হয় । ভারতবর্ষের সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল উভয় জড়াইয়া কাব্যস্থ মেঘের নিম্নলিখিত গতি অনুভূত হয় :—

- ১ । ওয়েনগঙ্গা নদীর ড্রেনেজ বেসিন (Drainage Basin)
- ২ । রেবা বা নন্দদানদীর ড্রেনেজ বেসিন
- ৩ । দশার্ণ বা পূর্বমালবের অধিত্যকা
- ৪ । অবন্তি বা পশ্চিম মালবের অধিত্যকা
- ৫ । চর্ম্মবতী বা চম্বল নদীর ড্রেনেজ বেসিন

৬। কুরুক্ষেত্র বা পাণিপথের সমভূমি

৭। মধ্য হিমালয়গিরি পুঞ্জ

৮। কৈলাস গিরিপুঞ্জ

১। ওয়েন গঙ্গার ডে'নেজ বেসিন (Drainage Basin)

(i) “রামগিরি” (১, ১০৭ শ্লোক) ।

রামগিরিতে বক্ষ নির্বাসিত হয়, ইহা মেঘের বাত্মার আরম্ভ স্থান । মল্লিনাথের মতে রামগিরি চিত্রকূটাখ্য পর্বত । রামায়ণীয় চিত্রকূটের বথার্থ স্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে, সচরাচর ইহা আধুনিক চিত্রকূটতীরের সহিত চিহ্নিত হয় । সে তীর্থ রামগিরি হইবে না, কেননা এই চিত্রকূট নর্মদার অনেক উত্তরে, রামগিরি নর্মদার দক্ষিণে । সারোদ্ধারিণী-মতে রামগিরি দণ্ডকারণ্যে, ইহাও পরিষ্কার নহে ।

বেগলার সাহেব ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের সহিত রামগিরিকে চিহ্ন করেন (Archaeological Survey of India Vol. XIII. pp. 31-35), ও সেই চিহ্ন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বাখ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন [পৃ. ১৭, ২০] । ইহা বুদ্ধিসংগত বোধ হয় না । আত্মকূট পাহাড় ও রেবা নদী রামগিরির উত্তরে থাকা বর্ণিত হইয়াছে [শ্লোক ১৪, ১৬, ১৯] ; কিন্তু রামগড় রেবার পূর্ব, ও আসল আত্মকূটের পূর্ব ।

উইলসন সাহেব রামগিরিকে ‘রামটেক’ বলিয়া লিখিয়াছেন । তাহা বোধহয় ঠিক । “টেক” মারাঠা ভাষায় “গিরি” ; উহা নর্মদার দক্ষিণ ; ও উহা রামসীতার মন্দির প্রভৃতি নানা চিহ্নে পরিপূর্ণ (Arch. Surv. Ind. V. VII. pp. 109-115.) । এই ক্ষুদ্র গিরি আধুনিক নাগপুর সহরের ২৮ মাইল উত্তরে, ২৪°-৩৫' অক্ষাংশ, ৭৯°-৪০', দ্রাঘিমাংশ, ইহা গোদাবরীর উপনদী ওয়েন-গঙ্গার ডে'নেজ বেসিনে অবস্থিত । এইখান হইতে মধ্যভারতের অধিকাংশ একরকম আরম্ভ বলিলে হয় ।

রামগিরি হইতে নর্মদা পৌঁছবার পূর্বে মেঘকে বক্ষ বলিতেছে যে ভূমি উত্তর মুখ হইয়া বাইয়া দিগ্‌হস্তিগণের স্থল হস্ত অবলম্বন এড়াইয়া “মানকে ” আরোহণ করিবে । “কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ” (কিছুকাল পরে) পুনরপি উত্তরাগমনে আত্মকূট শিখরে বিশ্রাম কর ।

(ii) “ মাল ” (১৬ শ্লোক) ।

এই শব্দের নানা অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন, যথা “ ক্ষেত্রসমূহঃ ”, “ মালাখ্যঃ দেশঃ ”, “ বনভূমিঃ ”, “ গ্রামাস্তরাটবীঃ ” ইত্যাদি । উইলসন্ সাহেব ছত্রিশ গড়স্থ মালদা নামক স্থানের সহিত মালকে চিহ্নিত করিতে চান । কিন্তু সে রামগিরির ঢের পূর্বে, মেঘের উত্তর গতিতে কোন মতেই পড়ে না ।

মল্লিনাথ দ্বিত উৎপলমালার অর্থই ঠিক বলিয়া আমার বোধ হয় । “ মাল মূলতভূতলম্ ” । শাস্ত্রীমহাশয়ও সেট অর্থ নিয়াছেন (২১-২২পৃঃ) । ইংরাজিতে বাহাকে tableland বলে, মাল তাই । রামগিরি হইতে অধিতাকা উত্তরে উঠিয়া মধ্য মধ্য এতরকম সমতল উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে ।

(iii) “ আশ্রকূট ” (১৭ শ্লোক) ।

সংস্কৃত টীকাকারেরা ইহাকে চিহ্নিত করেন নাই । সমাসবিচ্ছেদে ও মতভেদে, মল্লিনাথের মতে “ আশ্রকূটঃ কূটেষু শিখরেষু ষষ্ঠ সঃ ” ; সারোজারিণীর মতে “ আশ্রাণাং কূটো রাশির্যত্র সঃ ” ।

উইলসন্ সাহেব আশ্রকূটকে নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্যক পাহাড়ের সহিত চিহ্নিত করেন । শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন (ব্যাক্য, পৃঃ ২৩) । ইহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না । অমরকণ্যক নর্মদার পূর্বে, রামগিরি ও মাল হইতে ঢের উত্তর পূর্বে । মেঘের গতি ঠিক উত্তর, সুতরাং অমরকণ্যক ঘাইবার কথা নয় ; দ্বিতীয়তঃ তথায় ঘাইতে হইলে তাহাকে প্রথমে নর্মদানদী পার হইতে হইবে, তাহা কবির বর্ণনার সহিত মেলে না ।

আমার মতে আশ্রকূট রামগিরি ও নর্মদার মধ্যবর্তী অধিত্যকার কোন উচ্চ শিখরের নাম । সম্ভবতঃ আশ্রবৃক্ষের প্রাচুর্য্য হেতু সেই নাম পাইয়াছিল । ওয়েনগঙ্গা উপনদী এই অধিত্যকার জল নিঃসারিত করিয়া দক্ষিণে চলিয়াছে ।

১৪ শ্লোক দিগ্‌হস্তি গণের স্থল অবলোপ এড়াইয়া ঘাইতে যক্ষ বলিয়াছে । তাহার মানে আছে । রামগিরি হইতে উত্তরে ঘাইতে হইলে মেঘের দুইদিকে উচ্চ পর্বত মালা পড়ে, ডাইনে মাণ্ডার পাহাড়সমূহ বামে পাচমারি মহাদেও পাহাড় সমূহ । সুতরাং মেঘকে ঠিক উত্তর ঘাইতে হইবে, অনেকটা ওয়েনগঙ্গার পথ ধরিয়া ঘাইতে হইবে । এই হেতু আশ্রকূট অমরকণ্যক হইতে পারে না ।

(২) রেবানদীর ডে'নেজ বেসিন্ (Drainage Basin)

(i) “ রেবা ” (১৯ শ্লোক) ।

“আম্বকুট” পার হইলে রেবানদী । রেবা নর্মদার অপর নাম । যক্ষ বলিতেছে যে “উপলবিসমে বিক্যাপাদে” রেবা “বিশৌর্ণ” হইয়া পড়িতেছে দেখিবে । বর্ণনাটা পড়িলে জ্ঞানপুর নিকটস্থ নর্মদার অবস্থা মনে পড়ে । দিক ধরিলেও প্রায় তাই । সুতরাং তত্রস্থ rapidsর সহিত চিহ্ন করা যুক্তি সম্ভব ।

শাস্ত্রে রেবার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, এমনকি গঙ্গার সহিত তুল্য পবিত্রকর রূপে বর্ণিত হইয়াছে । যথা—

গঙ্গান্নানেন যৎপুণ্যং তদ্রেবাদর্শনেন চ ॥

যথা গঙ্গা তথা রেবা তথা দেবী সরস্বতী ।

সমং পুণ্য ফলং প্রোক্তং স্নানাদর্শন চিস্তনৈঃ ॥

(ii) দশার্ণর “মার্গ” (২১ শ্লোক) ।

প্রথমে নদীর “অনুকচ্ছ” ধরিত্তা তৎপরে “দক্ষারণ্য” গণের পথ দিয়া মেঘ “দশার্ণ” যাইবে । ইহাতে বোধ হয় মেঘ প্রথমে নর্মদার ধার দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে যাইবে ; তৎপরে অনুমান আধুনিক হোসঙ্গাবাদের নিকট পুনশ্চ অরণ্যের ভিতর উত্তরাভিমুখ হইয়া দশার্ণ বা পূর্বমালব পহুঁচিবে ।

শাস্ত্রী মহাশয় মল্লিনাথের “জঙ্ঘারণেষু” পাঠ লইয়াছেন (২৬ পৃঃ), কিন্তু পার্শ্বাভ্যুদয়, বল্লভ, সারোদ্ধারিণী প্রভৃতি অধিকাংশ পাঠে “দক্ষারণেষু” আছে । ইহাই সম্ভব—কেননা গ্রীষ্মকালে বন সকল পুড়িতে থাকে বর্ষাগমে নির্দাপিত হইলে তাহা হইতে অধিকতর সুরভিজাত হয় । ব্যাকরণ হিসাবেও দোষ পড়ে, কেননা “জঙ্ঘা” রাখিলে একটা “চ” কম হয় ও উহার কর্ম অনেক দূরে থাকে । সুতরাং “দক্ষারণেষু” পাঠ গৃহীত হইয়াছে ।

যাহারা কখন ইটারনৌ হইতে ইণ্ডিয়ান মিড্‌ল্যান্ড রেলওয়ে দ্বারা ভূপাল বা ঝাঙ্গী গিয়াছেন তাঁহারা এই অরণ্য সমূহের বর্ণনা অনেকটা অনুভূত করিতে পারিবেন । মধ্যভারতের অধিত্যকাস্থ এই সব বনরাজীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্রষ্টব্য ।

(৩) দশার্ণ বা পূর্বমালবের অধিত্যকা ।

(i) “দশার্ণাঃ” (২৪ শ্লোক) ।

সংস্কৃত টীকাকারগণ ইহার স্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলেন নাই । এখন ইহা পূর্বমালবের সহিত ঠিক চিহ্ন হইয়াছে ।

দশার্ণ বহুপ্রাচীন দেশ, পরিণিত ইহার উল্লেখ আছে । কাভ্যায়ণের বাটিকাশুসারে ইহার দ্বাদশ দশ + অ + দর্গ । মহাভারত, হরিবংশ ও বৃহৎ

সংহিতায় অনেক স্থানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় । প্রাচীন কালে ইহা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল সন্দেহ নাই ।

(ii) “বিদিশা” (২৫ শ্লোক) ।

দশার্ণ দেশের “রাজধানী বিখ্যাত বিদিশা” “বেত্রবতী” নদীর তটে ছিল । সংস্কৃত টীকাকারগণ কিছু চিহ্ন করেন নাই । উইলসন্ ইহাকে আধুনিক ভিল্সা বলেন । নামের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য সত্ত্বেও ইহা আমার ঠিক বোধ হয় না । কেন না আধুনিক ভিল্সা বেত্রবতী বা বেতভানদী হইতে ৩ । ৪ মাইল দূরে, ও ইহাতে গুপ্ত সম্রাটের বা তৎপ্রাচীনতর কালের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না ।

আমার মতে বিদিশা বেশ নগরের সহিত অধিক মেলে । বেশ নগরের একধারে বেতভা নদী প্রবাহিত ; ইহা প্রাচীন কীর্তি সমূহে পরিপূর্ণ (Arch. Surv. Ind., Vol. X., pp. 36 ff.) ; ও বিদিশা হইতে “বিশা”, ও বিশা হইতে “বেশ ” অনায়াসে অপভ্রংশ দ্বারা হইতে পারে । বেশ নগরে অনেক প্রাচীন যুদ্ধাও পাওয়া গিয়াছে । ইহা স্বেচ্ছা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল । তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে বেশনগর অস্ত্যতঃ দেড়মাইল লম্বা ও এক মাইল চোড়া ছিল ।

(iii) “নীটৈঃ” (২৬ শ্লোক) ।

বিদিশার নিকটে “নীটৈঃ” নামে “গিরি” ছিল, যাহার “শিলাবেশ্ম” নাগর-গণের বিহার স্থান ছিল । এই গিরি এখনও চিহ্নিত হয় নাই । আমার মতে ইহা বেশনগর সন্নিকটবর্তী উদয়গিরি পাহাড় । এই পাহাড় বেশনগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দুই মাইলের মধ্যে ; ইহা বেশি উঁচু নহে, সর্বোচ্চ চূড়া ৩৫০ ফুট উচ্চ মাত্র, ও ইহার মাঝখানটা অনেক নিচু ; ইহা গুহার পরিপূর্ণ, ও অনেক গুহার তৈয়ারি বারান্দার চিহ্ন পাওয়া যায় ; এবং অস্ত্যতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের সময় বিশেষ ব্যবহৃত হইত, কেননা কয়েক গুহার গুপ্ত সম্রাট সমকালীয় শিলালিপি পাওয়া যায় (Arch. Surv. Ind., Vol. X, pp. 46 ff) । এই সব কারণে নীতাত্ম্য গিরি উদয় গিরি হওয়াই খুব সম্ভব ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

ঐ.ন.সাহন প্রকল্পী ।

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ।

(২)

সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ভারতের অনেক বড় বড় ইংরাজ রাজপুরুষের একরূপ নির্ভর মত প্রচারিত হইয়াছিল যে বিনা-বিচারে সমগ্র বিদ্রোহীকুল নির্মূল করাই কর্তব্য; নির্কিংশেষে ৫০। ৬০ হাজার সিপাহি ও তাহাদের সহচর-অনুসরণকে তোপে উড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের অভিপ্রায় ও রায় ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় দয়ালু বড়লাট ক্যানিং মহোদয় একাকী উক্ত পরামর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উহা কার্যে পরিণত হইতে দেন নাই। একারণ ভারতীয় ইংরাজ মহল বিজ্রপচ্ছলে তাহাকে “দয়াল ক্যানিং”* নাম প্রদান করেন। প্রাপ্তকৃত স্বৈতাস মহাপ্রভুগণকে লক্ষ্য করিয়া ক্যানিং যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত তাহার এক পত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; উহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত। ঐ পত্রের এক স্থানে স্বদেশীয়গণের জঘন্য প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রণোদিত প্রলাপ-বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া লজ্জা প্রকাশ করিতে ক্যানিং ক্রটি করেন নাই, এবং তাহাদের নিকট সদ্যবহার আশা করিতেন তাহাদিগকে পর্যাস্ত এবশ্পকার দলভুক্ত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।† পত্রের অপরাংশে একরূপও প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে অবিশ্বাস হেতু রাজকার্যে বঞ্চিত রাখিয়া ভারতসাম্রাজ্য শাসন করা ইংলণ্ডাধিপতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।‡

বড়লাট ডালহুসির সময়ে অবোধ্যাধিপতি ওয়াজেদ্দাউল-শাহ সিংহাসন-চ্যুত হইয়া কলিকাতায় আনীত হন। অনেকের মতে এই অন্তায় অত্যাচার মহাবিদ্রোহের অন্ততম কারণ। বিদ্রোহকালে অবোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজহস্তচ্যুত অরাজক অবস্থায় থাকিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরধিকৃত হয়।

* “Clemency Canning.”

† There is a rabid and indiscriminate vindictiveness, even amongst many who ought to set a better example, which it is impossible to contemplate without a feeling of shame for one's countrymen.”

‡ “It does not occur to those who talk and write most upon the matter that for the Sovereign of England to hold and govern India without employing and to a great extent trusting natives both in civil and military service, is simply impossible.”

সেই সময় ক্যানিং তৎসম্বন্ধীয় ঘোষণা প্রচার করেন । ইহাতে ভারতের পূর্বাভূতন গবর্ণর-জেনেরল এবং তখনকার বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট লর্ড এলেনবরা * অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একখানি তীব্র সমালোচনাপূর্ণ এবং ঘোরতর অসম্মতিবাক্যক গুপ্তপত্র ক্যানিং সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন । অযোধ্যা-হরণ ব্যাপার তাঁহার মনে এতই স্থায়ীত্বনিবন্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে তিনি উক্ত পত্র ভারতে পহুঁছবার তিন সপ্তাহ কাল পূর্বে এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুমোদন জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রচারিত করেন । এলেনবরার ঈদৃশ অস্থায় ব্যবহারে মহারানী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান সচিব লর্ড ডার্বিক এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করেন,—এলেনবরার স্থায় জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে রাজকার্যের সাধারণ নিয়ম অবশ্যকারে লঙ্ঘন করা যার পর নাই শোচনীয় ব্যাপার । পুনশ্চ এলেনবরা ভারতের রাজত্ববর্গকে নিজের নামে আত্মপক্ষসমর্থনার্থ রাজকার্য সম্বন্ধীয় পত্রাদি লিখেন, তাহাতে মহারানী বিশেষ ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হইয়া তাঁহার গহিত ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন । † অব্যবহিত কাল পরে লর্ড ডার্বির নিকট ভিক্টোরিয়া কর্তৃক আর একখানি পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে প্রকাশ করেন যে লর্ডক্যানিং সাহেবের বক্তব্য না শুনিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহার কার্যে দোষারোপ করা ভাল হয় নাই । উক্ত পত্রে ইহাও লিপিবদ্ধ ছিল যে অবস্থান কর্মচারিদিগের সহিত তাঁহার এরূপ পত্রাদি আদান প্রদান বিশেষ বিঘ্নজনক, ইহাতে তাহারা তাহা-দিগের উপরওয়ালাগণের কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে প্রশ্রয় পায় । তার উপর আবার উক্ত নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণের মতের উপর নির্ভর করিয়া

* Lord Ellenborough, President of the Board of Control. Secret despatch.

† “ It is a great pity that Lord Ellenborough, with his knowledge, experience, energy, and ability should be so entirely unable to submit to general rules of conduct. The Queen has been for some time alarmed at his writing letters of his own to all the most important Indian chiefs and Kings,, explaining his policy. All this renders the position of a Governor-General almost untenable; and that of the Government at Home very hazardous.”

কার্যকর। সুধানের বিপ্লবোৎপাদক ব্যাপার । † বোর্ডের অস্থায়ী সভাগণ, পার্লামেন্টে এবং লোক সাধারণ ভিক্টোরিয়ার মতেই মত দিলেন, স্তত্রাং এলেনবরা দোষ স্বীকার করতঃ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন । ¶

† “ Lord Ellenborough must be taken to have acted hastily in at once condemning Lord Canning without hearing the Governor-General on the other side. It is always dangerous to keep up a private correspondence with inferior officers, allowing them to criticise their superiors, but it is subversive of all good Government to act at once on the opinion given by inferiors.”

¶ স্বহৃদে যে এলেনবরাই অযোধ্যা হরণের বিরোধী ছিলেন, এমন নহে । ভারতে ও কয়েক জন ভাল ইংরাজ বহু পূর্ব হইতে অযোধ্যাধিপতিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া আনিতে ছিলেন । রাজা-লোনুপ কোম্পানির অনেক দিন হইতে অযোধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিরুপিত হইয়াছিল । তখনকার ইণ্ডিয়া-গেজেট নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবিষয়ে অনেক কথা আপন কাগজে প্রকাশ করেন । একদা তিনি লিখিয়াছিলেন :—

Truth must be told. The Government of Oude, administered by a half-civilised native prince, is bad. The government of the British provinces administered by civilised foreigners, is worse. It is to be hoped then we shall hear no more of usurpation as a remedy for the evils that oppress Oude. But is there no other remedy? Assuredly there is. If the Government have but the tact to abstain from personal interference and private patronage, there is now a most excellent opportunity of putting to the test of experiment a rational scheme of legislation, adapted to the circumstances of Oude. &c. &c. &c.

আর একজন ঐতিহাসিক লিখিতছেন :—

“ The truth ought never to be forgotten, which the Governor-General here so eagerly brings forward ;—That the misery, produced, by those native governments which the company upholds, is misery produced by the Company, and sheds disgrace upon the British name.”

লর্ড এলেনবরার অদৃষ্টই মন্দ । ভারতে থাকিতে সোমনাথের কবচ লইয়া এক বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন । কি জানি কোন্ কৰ্ম্মকলে সময়ে সময়ে ভারতের প্রতি তাঁহার একটু অন্তরিত্ত্ব প্রেম প্রকাশ পাইত । ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধে জয়ী হইয়া গিজনী হইতে অপহৃত কবচটির উদ্ধার করত ভারতে পুনরানয়ন করেন । এই উপলক্ষে নিজেই নামে হিন্দী ভাষাতে এক মহোদয়বাক্য ধর্মিতা দেশীয় রাজস্বের নিকট প্রেরিত হয় ; এবং বিশেষ সমারোহ সহকারে সোমনাথে কবচ পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল । দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের ইংরাজ এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া উঠেন ; স্তত্রাং কবচ আগ্রাহর্গেই থাকিয়া যায় । অদ্যপি সেইখানেই রক্ষিত ।

বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মাঝে মাঝে রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি সংস্থাপিত হইলে কোম্পানির হাত হইতে স্বয়ং ইংলণ্ডস্থানী ভারতবর্ষ শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন, এই মর্মে মিত্ররাজ্যবর্গ ও প্রজা সাধারণের জ্ঞাপনার্থ একখানি উপনোগী ঘোষণাপত্রের প্রস্তাব হয় ; এবং তাহার পাণ্ডুলিপি মহারানীর নিকট প্রেরিত হয় ; তিনি সে সময় ইউরোপীয় মহাদেশের কোন স্থানে বিরাজ করিতেছিলেন । বখোচিত মনোযোগের সহিত পাঠান্তে পাণ্ডুলিপিখানির ভাষা ও ভাব বিষয়ের গাভীর্য্যের অনুগামী হয় নাট বনিরা অমাত্য লর্ড গাম্‌স্‌বরির দ্বারা ফেরত পাঠাইয়া স্বয়ং লর্ড ডার্বিকে এইরূপ পত্র লিখেন :—ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপিতে অনেক দোষ আছে, তাহার সংশোধন আবশ্যক । বিবেচনা করা উচিত যে দশ কোটির অধিক প্রাচ্য প্রজার শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণান্তর এক জন রমণী তাহাদিগকে সিংহাসন হইতে অভিবাদন করিতেছেন । ইহাতে তাহার শাসননীতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং গৃহবিবাদজনিত ঘোরতর রক্তপাতের পর যে সকল আশ্বাসবাণী ও অঙ্গীকার প্রজাবর্গকে প্রদান করা হইতেছে তাহা ভবিষ্যতে রক্ষা করা হইবে, এরূপ কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ থাকা চাই । অবশ্যকার প্রয়োজনীয় ও মহৎ ঘোষণাপত্রে যেন দয়া দাক্ষিণ্য মহামুভবতা এবং বিভিন্ন বর্ণমতের প্রতি উদার নিরপেক্ষতার ভাব প্রফুটিত থাকে । ভারতের কৃষকায় প্রজা শ্রেণীভেদের সঙ্গে সমান স্বভেদ স্বত্ববান হইয়া কিপ্রকার উচ্চ অধিকার সমূহ ভোগ করিবে, তাহাও যেন বিশদরূপে প্রচারিত হয় ।* মহারানী অবশেষে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এই মহৎ সঙ্কল্প প্রণোদিত সুমহৎ কার্য্যের উপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করত যেন ঘোষণাপত্র সমাপ্ত করা হয় ।† ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়া এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ক পত্রখানি প্রধান মন্ত্রীকে ডাকযোগে পাঠাইয়া তাহার

* “ It should be borne in mind that it is a female sovereign who speaks to more than a hundred millions of eastern people on assuming the direct government over them, and after a bloody civil war giving them pledges which her future reign is to redeem, and explaining the principles of her government. Such a document should breathe feelings of generosity, benevolence and religious toleration, and point out the privileges which the Indians will receive in being placed on an equality with the subjects of the British Crown, and the prosperity following in the train of civilisation.”

† “ The Queen particularly wishes that the Proclamation should terminate by an invocation to Providence for its blessing on a great work for a great and good end.”

পরক্ষণেই তার দ্বারা পাণ্ডুলিপিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । পরে তাঁহার উপদেশমত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিয়া তাহাতে এই কথা করটি যোগ করিলেন, “সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদের আশাশ্রয় এবং আমাদের অনীনস্ত কর্মচারীবর্গকে বল প্রদান করুন তাহাতে আমাদের এই প্রজাহিতকামনাগুলি কার্যো পরিণত করিতে পারি ।” † এই ভাবে স্বয়ং ভিক্টোরিয়া কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঘোষণাপত্র রাজস্বাক্ষর ও মোহরে অঙ্কিত হওত ভারতবর্ষে প্রচারার্থ বড়লাট সকাশে পৌঁছিলে ক্যানিং তাহা দেশের নানা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া রাজপ্রতিনিধির পক্ষ হইতে দুই চারি কথা যোগ করত নাস্ত্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এলাহাবাদ নগর হইতে প্রকাশ করিলেন । ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে ভারতের প্রত্যেক রাজধানী ও জেলার প্রধান রাজপুরুষ কর্তৃক উহা পঠিত ও বিতরিত হয় । বাঙ্গালা ঘোষণাপত্রখানির অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া গেল । ভাষা বা বর্ণবিষ্ঠাস সম্বন্ধে দেখানে নেকপ ভুল ভ্রান্তি আসল কাগজে আছে ঠিক তদ্রূপ রাখা হইল । —

শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ঘোষণাপত্র ।

আলাহাবাদ, ১৮৫৮ সাল । ১ নভেম্বর, সোমবার ।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতী মহারানীর স্থানে আজ্ঞা পাইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারানীর অনুগ্রহশ্রুতক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের সকল রাজগণের ও সরদার সকল লোকের ও সর্বসাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছেন ।

ভারতবর্ষের সকল রাজার ও সরদার লোকের ও সর্বসাধারণ লোকের নিকট শ্রীশ্রীমতী মহারানীর এই ঘোষণাপত্র । পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলও সংযুক্ত রাজ্যের, এবং ইউরোপ ও আসিয়া ও আমেরিকা ও আমেরিকা ও অঙ্গলাশিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সংযুক্ত রাজ্যের লোকেরদের বসতিস্থানের ও সেই রাজ্যের বশতাপন্ন স্থানের মহারানী ও ধর্মরক্ষিকা শ্রীশ্রীমতী বিক্টোরিয়া ।

† “ May the God of all Power grant to us, strength to carry out these our wishes for the good of our people.”

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল দেশের কর্তৃত্ব কার্যের ভার এতৎকালপর্যন্ত আমারদের সপক্ষে কোম্পানি বাহাদুর নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন সেই ভার, পার্লামেন্টে রাজসভাগত পরমাধিক ও সাংসারিক লার্ড সাহেব ও কামন সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি ।

অতএব আমরা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সকল লোকের নিকটে জানাইতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা পূর্বোক্ত সভাগত মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি । ও উক্ত দেশের মধ্যে আমারদের যে সকল প্রজা বাস করে তাহারদিগকে এই আদেশ করি যে, তাহারা সকলেই বিশ্বস্ত হয় ও আমারদের নিকট ও আমারদের উত্তরাধিকারিদের ও আমারদের পরে যাহারা রাজত্ব পাইবেন তাঁহারদের নিকটে সত্যভক্ত হইয়া থাকে ও আমারদের উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য আমারদের নামে ও আমারদের সপক্ষে হইয়া নির্বাহ করিবার জন্ত আমরা ইহার পরে সময়ে সময়ে যাহারদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করি তাঁহারদের আজ্ঞার বশে থাকে ।

আরো আমরা আপনারদের বিশ্বাসযোগ্য ও মেহপাত্র পরিজন ও মস্ত্রী শ্রীযুত চারলস জান বৈকোন্ট কানিং সাহেবের ভক্তি গুণে ও ক্ষমতাতে ও সন্ধিবেচনাতে বিশেষগতে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাকে, অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুত বৈকোন্ট কানিং সাহেবকে, আমারদের উক্ত দেশের মধ্যে ও তদপরে আপনারদের প্রথম প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল করিয়া আমারদের নামে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য করিবার ও আমারদের নামে ও সপক্ষে সাধারণ মতে কার্য করিবার জন্ত নিযুক্ত করিলাম । কিন্তু আমারদের রাজ্যের প্রধান একু-জন সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা যে ২ আজ্ঞা ও বিধি সময়ে ২ আমারদের হইতে পাইবেন, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য করিবেন ।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও দৈন্য সম্পর্কীয় কর্মে যে সকল লোক যে ২ পদে এই ক্ষণে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলাম । কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের যে কোন বাসনা ইহার পরে প্রকাশ হয়, ও যে সকল আইন ও কাহুন ইহার পরে করা যাইবেক, তাহা বলবৎ মানিয়া তাঁহারা পদস্থ থাকিবেন ।

ভারতবর্ষীয় সকল রাজগণকে এই কথা জানাই । কোম্পানি বাহাদুরের

দ্বারা কিং তাঁহারদের দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ রাজগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা গিয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিলাম, ও তাহা অবিকলরূপে মান্য করিব, ও সেই রাজগণও তদনুসারে অবিকল আচার করেন আমাদের এই অপেক্ষা ।

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদের যত দেশ অধিকার হইয়াছে তাহার অধিক কিছু দেশ অধিকার করিতে চাহিনা । পরন্তু আমারদের যে দেশ কি স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের উদ্যোগ হইলে আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণ হয় এমনত অনুমতিও দিব না । আমরা আপনারদের স্বত্ব ও গৌরব ও সম্মান যেমন মান্য করি, তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদি মান্য করিব । আরো কোন দেশের মধ্যে শান্তি ও সুশাসন না হইলে যে উন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে পারে না, তাহা আপনারদের প্রজাগণ প্রাপ্ত হয় আমারদের এই বাসনা যেমন থাকে, তেমনি ঐ রাজগণের পক্ষেও আমারদের সেই বাসনা আছে ।

রাজধর্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ হই, তেমনি আমারদের ভারতবর্ষ দেশস্থ প্রজাদের নিকটেও বদ্ধ আছি । আর সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য বিখ্যস্ত-রূপে ও সরল মনে নির্বাহ করিব ।

খ্রীষ্টিয় ধর্ম সত্য, এই কথা আমরা দৃঢ়মতে বিশ্বাস করি ও ধর্ম্মেতে যে সান্ত্বনা পাই তাহা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করি । কিন্তু আমাদের সেই ধর্ম্মমত আমারদের কোন প্রজারদিগকে গ্রহণ করাইবার কোন ক্ষমতা স্বীকার করি না ও তাহা গ্রহণ করিতে চাহিও না । আমারদের রাজকীয় বাসনা ও ইচ্ছা এই । ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস কি ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া কোন কাহার প্রতি পক্ষপাত না হয় ও কোন কেহ ক্রোণ কি দুঃখ না পায় । কিন্তু আইন অনুসারে সকলেই তুল্যরূপে শাস্যমতে ও বিনাপক্ষপাতে রক্ষা পায় এই আমারদের বাসনা । আরো আমারদের অধীনে যাহারা কর্তৃত্বের ক্ষমতা পান, তাঁহারদের সকলকে আমরা এই দৃঢ় আজ্ঞা ও আদেশ করি যে, আমারদের প্রজারদের কোন লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাসেতে কি আরাধনাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমারদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইবেক ।

আরো আমারদের এই বাসনা । আমারদের প্রজাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্তমতে সুশিক্ষিত হইয়া ও ক্ষমতাপন্ন ও সরল ভাবাপন্ন হইয়া আমারদের

কোন সিরিস্তায় কর্ম করিতে যোগ্য হয়, তাহারা যে কোন বংশের কি ধর্মের লোক হউক তাহারদিগকে সাধারণ্যে বিনাবাধাতে ও বিনা পক্ষপাতে কর্মে নিযুক্ত করা যায় । *

ভারতবর্ষের লোকেরা পৈতৃক যে ভূসম্পত্তি অধিকার করেন তাহাতে তাহারদের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই ভাব মাথায় করি, ও ভূমি সম্পর্কে তাহাদের যে সকল স্বত্ব থাকে সেই সকল স্বত্ব আমরা রক্ষা করিতে চাহি, কিন্তু গবর্ণমেন্টের জায্য প্রাপ্য অংশ দিতে হইবেক । আর আমারদের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করিবার ও সেই আইন আমলে আনিবার কার্য্যেতে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ও ব্যবহার পূর্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্ত মতে মনোযোগ থাকে ।

ক্ষমতা পাইবার লোভেতে যে লোকেরা অমূলক জনরব প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকদিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহারদিগকে রাজবিদ্রোহ ব্যাপারে চলাইয়াছে, তাহারদের কর্মের দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল উপদ্রব ও যন্ত্রণা হইয়াছে তাহাতে আমারদের অত্যন্ত শোক হয় । সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন করিয়া আমারদের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে । যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল কিন্তু কর্তব্য কার্য্যের পথে ফিরিয়া যাইতে চাহে, তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনারদের কক্ৰণা প্রকাশ করাই আমারদের বাসনা ।

এক প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমারদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের মধ্যে আরো শীঘ্র শান্তি হয় এই অভিপ্রায়ে, আমারদের প্রতিনিধি ও গবরনর-জেনরল বাহাদুর কোন ২ নিয়ম প্রকাশ করিয়া যাহারা সম্প্রতিকার গোলযোগে আমারদের কর্তৃত্বের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছে তাহারদের অধিকাংশ লোককে সেই নিয়ম মতে ক্ষমা পাউবার আশা দিয়াছেন, ও মহা অপরাধ প্রযুক্ত যাহারদের

* That no native of the said territories, nor any natural-born subject of his Majesty resident therein, shall, by reason of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the said Company." 118 Act of 1833.

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বৃত্তীণ পার্লামেন্ট কর্তৃক এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় ; কিন্তু কোম্পানির আমলে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই । প্রিক্টোরিয়ার রাগদকালে যে টিক অঙ্গীকার মত কার্য্য হইয়াছিল, তাহাই কি প্রকার বলি যায় ?

ক্ষমা হইতে পারে না তাহারদের যে দণ্ড হইবে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন । আমাদের প্রতিনিধির ও গবরনর জেনরল বাহাদুরের সেই কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম আরও এই কথা জানাইতেছি ও ঘোষণা করিতেছি ।

ব্রিটনীয় প্রজারদিগকে হত্যা করিবার কার্য্যেতে সাক্ষ্য লিপ্ত হইবার অপরাধ তাহারদের সাব্যস্ত হইয়াছে কি হয় তাহারদের প্রতি যথায় বিচার অনুক্রমে দয়া প্রকাশ হইতে পারে না । কিন্তু তাহারদের ভিন্ন ও তাহারদের ছাড়া অন্য সকল অপরাধির প্রতি আমারদের দয়া প্রকাশ হইবেক ।

কোন লোকদিগকে হতাকারি জানিয়া বাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছে, কিম্বা রাজবিদ্রোহ ব্যাপারের সরদার কি প্রবর্তকরূপে বাহারা কন্ম করিয়াছিল তাহারদের প্রাণ রক্ষা হইবেক, এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি কিন্তু যে ভাবগতিক তাহারদিগের রাজভক্তি ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের দর নিরূপণ হইবেক । ও কুকন্নার লোকেরা অশুণক যে জনরব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা অজ্ঞানেতে ত্বরার বিশ্বাস করিয়া তাহারদের অপরাধ হইয়াছে তাহারদের প্রতি অধিকরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ হইবেক ।

অন্ত যে সকল লোক এইক্ষণে গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে অন্তর্ধারণ করিতেছে, তাহারা আপনাদের ঘরে ও কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কন্মোতে নিরিয়্যা গেলে, আমারদের বিপক্ষে ও আমারদের রাজমুকুট ও সম্রাজের বিপক্ষে তাহারদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা বিনা নিয়মে ক্ষমা করিব ও মনে তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করি । তাহারা আগামি জামুআরি মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্ব ঐ নিয়মমতে কার্য্য করে তাহারা সকলেই আমারদের এই অনুগ্রহ ও ক্ষমা পায়, আমারদের এই বাসনা ।

পরমেশ্বরের প্রসাদে যখন দেশের মধ্যে শান্তি পুনরায় স্থাপন হয়, তখন ঐ দেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কার্য্যের উৎসাহ দান করা ও সর্বসাধারণের উপকারের ও উন্নতির কার্য্যের সহায়তা করা ও ভারতবর্ষেতে আমারদের যে সকল প্রজা বাস করে তাহারদের মঙ্গলের নিমিত্তে দেশের কর্তৃত্ব কার্য্য নিকাশ করা আমারদের অত্যন্ত বাসনা । প্রজারদের উন্নতি হইলে আমারদের বল হয় । তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে আমারদের নিরাপদ হয় । তাহারা কৃতজ্ঞ হইলে আমারদের উৎকৃষ্ট পুরস্কার হয় । প্রজারদের মঙ্গলের নিমিত্তে

আমাদের এই সকল বাসনা সফল করিতে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার-
দিগকে ও আমাদের অধীন যাহারা কর্তৃত্ব কার্য করেন তাঁহাদিগকে
শক্তি দিউন। *

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঘোষণাপত্র।

বিদেশীয় ডিপার্টমেন্ট। আলাহাবাদ। ১৮৫৮। ১লা নবেম্বর। ভারতবর্ষের
ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের কর্তৃত্ব কার্যের ভার শ্রীশ্রীমতী মহারানী স্বয়ং
গ্রহণ করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীযুত
গবরনর জেনরল বাহাদুর এই সন্বাদ দিতেছেন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের
গবর্ণমেন্টের সমস্ত কার্য কেবল শ্রীশ্রীমতীর নামে করা যাইবেক।

যে বংশের কি জাতির যে সকল লোক কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্বের
অধীন থাকিয়া ইংলণ্ডের মান ও ক্ষমতার পোষকতা করিতে সাহায্য করিয়াছেন
তাঁহারা অদ্যাবধি কেবল মহারানীর চাকর হইবেন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর তাঁহাদিগকে এই আদেশ করিতেছেন।
শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ঘোষণাপত্রেতে শ্রীশ্রীমতীর অনুগ্রহচক যে বাসনা ও
ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে তাহা সকল করিবার জন্ত প্রত্যেক জন আপন ২ পদে
ও সুনোগমতে ও সর্ব মন ও শক্তির সহিত সাহায্য করুন।

শ্রীশ্রীমতী মেহ ও দয়ার বাক্য প্রয়োগে ভারতবর্ষের কোটি ২ প্রজাদিগকে
রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রানুসারে
ঐ সকল প্রজা ভক্তিভাবে আচ্ছাদিত হয় এই কার্য প্রবল করিতে শ্রীযুত
গবরনর জেনরল বাহাদুর এই ক্ষণে ও সদাসর্বক্ষণে ত্রুটি করিবেন না।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে
প্রকাশিত।

জি, এফ এডগনষ্টন

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারী।”

Printed at the Alipore Jail Press.

শ্রীচন্দ্রশেখর মেন।

মায়া ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

“Magyars ” Said Kossuth extending his hand ‘ there is the road to your peaceful homes and firesides. Yonder is the path to death ; but it is the path to duty which will you take ? Every man shall choose for himself. We want none but willing soldiers.” The great body of the army replied by shouting with one voice, “Liberty or death.”

যখন ভূভাগা হারাবন ও কুমুদিনীকে নায়েবের লাঠিরালগণ নির্দরভাবে নিপীড়ন করিতেছিল, তখন গ্রামের অনতিদূরে, পদ্মানদীতটে শ্মশানকালীর মাঠে, যাহা হইতেছিল তাহাই এখন বর্ণনা করি ।

- রজনীতে সেই স্থানে পূর্বের মত লোকারণ্য । বিদ্রোহী কৃষকগণ দলে দলে সেখানে আসিয়া সম্মিলিত, কিন্তু পূর্বের অপেক্ষা এখন তাহারা অধিকতর অসংবত—মহেশ গ্রেপ্তার হওয়াতে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কেমন একটা উন্মত্ত প্রচণ্ড ভাব প্রবেশ করিয়াছে । একগুণে তাহাদিগের মধ্যে চারিটা দল হইয়াছে ।
- ১ । কেবল মুসলমান কৃষক—তাহাদিগের নেতা মোকারিম সেখ ।
 - ২ । আর একটা দলে হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে বাহারা কতকটা ধীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান তাহারাই—তাহাদিগের নেতা যত্ন ।
 - ৩ । অপর দলের শর্দার ভীম বাগদী । এই দলের লোক সকলেই লাঠিয়াল, নীচ জাতি ।
 - ৪ । চতুর্থ দলের নেতা ষড়ানন সর্দার—ইহারা সকলে সড়কি ওয়াল ।

সেই প্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ হইলে, অনেকে চীৎকার করিল—
“মোকারিম,” “মোকারিম” । মোকারিম একজন সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান কৃষক । প্রতিদিন তাহার গৃহে ৪০ । ৫০ জন অতিথির সেবা হইত । বিনা সূদে সে দারী কৃষকগণকে কর্জ দিত । গ্রামে বিবাদ হইলে, লোকে তাহাকে শালিশ মানিত এবং সে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইত । যদিও সে মুসলমান, তথাপি সে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি বলিয়া, হিন্দুরা তাহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত । মোকারিম যেমন একদিকে দয়ালু, অন্য দিকে তেমনি সাহসী । তাহার দেহ সূঠাম, বর্ণ উজ্জল শ্যাম, তাহার বদন কৃষ্ণ শ্রবরাজি শোভিত, মোটের উপর মোকারিম সেথকে সুপুরুষ বলা যাউতে পারিত । যখন “মোকারিম,” “মোকারিম,” এই শব্দ সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে উথিত হইয়া, প্রান্তরের এক সীম হইতে অপর

সীমায় প্রতিধ্বনিত হইল, তখন মোকারিম মাঠের মধ্যবর্তী স্তূপে আরোহণ করিল। হাজার হাজার মসাল সেই কৃষ্ণাচতুর্দশীর ঘোরা রক্তনীর গাঢ় তমিস্রা বিদূরিত করিয়া দিবালোকবৎ আলোক রচনা করিয়াছিল। মোকারিমের সুন্দর মুক্তি উজ্জ্বল আলোকে বেশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মোকারিমের কটিদেশে একখানি অসি ঝুলিতেছিল। মোকারিম, মুসলমান কায়দা অনুসারে, সেই বিরাট কৃষ্ণক-মণ্ডলীকে সেলাম করিল। তাহার পর নিজের শ্মশ্রুরাজি একবার হাত দিয়া বেন সরাইল। তাহার পর মশ্মভেদী স্বরে বক্তৃতা করিল :—

“ভাই সব, মুসলমান ভাই, হিন্দুভাই—কিছুদিন আগে এইরূপে রাড্রে, আমরা সকলে জমা হইয়াছিলাম, তখন এই উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা করিয়াছিল? কে তাহার বোলচালের ভেঙ্গে আমাদের মাতাইয়াছিল? (“মহেশজি” “মহেশজি”)।

‘আজ সেই মহেশজি কোথায়? (“সে কয়েদ হইয়াছে”) সে কয়েদ হইয়াছে, আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি! আমাদের জন্ত যে ফকির হইয়াছে—গরিব রায়ত ভাইকে রক্ষা করিবার জন্ত যে অকাতরে নিজের টাকা কড়ি দিয়াছে, নিজের জেনানার গহনা কাপড় বেচিয়াছে, যে আমাদের হিতের জন্ত জমিদারের হাজার হাজার লাঠিয়ালকে তৃণজ্ঞান করিয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, কতবার বিপদে পড়িয়াছে—যে আমাদের ভালর জন্ত আমাদের খয়রিয়াতের জন্ত, তার জানটা সাঁপিরে দিয়াছে,—আজ সেই মহেশ কয়েদ—আর আমরা হাঁসছি খেলছি—কি আপশোষের বিষয়! কি সরমের কথা! তোমরা মহেশের মোকদ্দমার খরচ দিতেছ, সত্য। কিন্তু মোকদ্দমায় কি হয় বলা যায় না। যদি মহেশের ফাঁসির হুকুম হয়—তখন? আমরা বেঁচে থাকিতে মহেশ ফাঁসি যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? (সকলে—“না, না, কখনই না”) “না না” বল্ছ, এখন ফাঁসির হুকুম হবে তখন কি করিবে? (সকলে, “তখন আমরা মহেশকে ছিনিয়ে নেব”) যদি তখনই ছিনিয়ে নেবে স্থির করেছ, তবে এখনই ছিনিয়ে লওনা কেন? মহেশ যেখানে হাজতে আছে, চল, সেখানে চল, আমার সঙ্গে চল। আমরা এত জন লোক—আমরা জেল ভেঙ্গে তাকে বের করি খালাশ করবো। কোম্পানী বাহাদুরের বন্দুক আছে, কামান আছে, তা আমি জানি। কিন্তু বন্দুক কামান আমি বুঝি না। আমি বুঝি আমাদের দোস্ত, আমাদের বন্ধু, আমাদের সর্দার—মহেশ আমাদের জন্ত প্রাণ দিতে পারিত, জান দিবার জন্ত সকল সময়েই

মস্তাফিদ ছিল, আমরা কি তাহার জ্ঞান দিতে পারি না ? (সকলে “পারি পারি, কেন পারিব না” ?) বহুং আচ্ছা ।”

মুসলমানগণ হুজুর করিয়া উঠিল “আল্লা, আল্লা, হো” হিন্দুরা গর্জিল “হর, হর ।” তখন প্রভু-ভাব-অটিকার যেন সেই লোকারণ্য মথিত হইল । অনেকে লাফাইতে লাগিল, অনেকে নাচিতে লাগিল, অনেকে বুক চাপড়াইতে লাগিল । একবার “আল্লা আল্লা হো,” একবার “হর হর” নির্ঘোষ হইতে লাগিল । মুসলমান ও হিন্দু এক অপূর্ণ ভ্রাতৃতবে আবদ্ধ । মোকারিম স্তূপ হইতে নামিল । তখন ভীম বাগদী স্তূপের উপর উঠিল । ভীম দেখিতে ভীমের ছায়, যেমন দীর্ঘ তেমনই স্থল, দেহ মনীবৎ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তক দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র, কেশ হ্রস্ব, হস্ত ভীষণ গদা । ভীম বলিল :—

“মোকারিম দাদা যা বলেছে, মুইও তাই বলি । মোর লাঠির আগে সব সিপাহী ভাগবে । মোর দলে ৪০০০ হাজার বাছা বাছা লেঠিয়াল আছে । কুচ্ গুর নাই (তখন সকলে বলিল “বহুং আচ্ছা”) ।

ভীম নামিল । তখন সড়কিওয়ালদিগের দলপতি ষড়ানন সর্দার, হাতে একগাছি সড়কি লইয়া, স্তূপের উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং বলিল :—

“মোকারিম দাদা, ভীম ভাইয়ের যা মত, আমারও তাই মত । আমার দলের দুহাজার খুব ভাল সড়কিওয়াল আছে, আমাদের সড়কির সামনে কে দাঁড়াতে পারে ? বখন সন্ সন্ করে আমাদের সড়কি ছুটবে, তখন তোমরা বড় মজা দেখবে । তখন সিপাহী ভায়ালা লেজ কুড়িয়ে বন্দুক ফেলে পালাবে । (সকলে, “আর দেরি কেন, চল, চল”) ।

তখন মোকারিম আবার স্তূপে লাফাইয়া উঠিল এবং বলিল :—

• “ভাই সব, তোমরা এক টুক ছবুর কর । যহ এখনই সহর হতে ফিরে এসেছে । তোমাদিগকে কিছু বলিতে চাহে । তোমরা জ্ঞান যহ মহেশের একজন দোস্ত । যহকে মহেশ খুব ইয়াতিবার করে খুব বিশ্বাস করে” । তখন যহ চিবির উপর উঠিয়া বলিতোলাগিল :—

• “ভাই সব, গত কল্য আমাদের দলপতির ও গুরু মহেশের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলাম । (“কেমন করে” ?) প্রবোধ বাবু আমার হাতে জেলদারগা মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি দেওয়াতে, জেল দারগা মহাশয় আমাকে জেল খানায় ঢুকিতে হুকুম দিলেন । মহেশের সহিত আমার দেখা হইল । (“মহেশ কেমন আছে”) মহেশ ভাল আছে । (যহ যে মহেশের

হাতকড়ি দেখিয়াছিল তাহা বলিল না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহেশ কি বলিল”) তোমরা একটুক বৈর্য্য ধর, আমি সব বলছি। মহেশ প্রথমে বলিল:—

“আমি আমার জীবনের জন্ত কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। আমি মা কালীর পায় আমার জীবন, প্রজাদের উদ্ধারের জন্ত, সঁপে দিয়েছি। যে মরিতে ভয় পায়, তার দ্বারা কি কখন কাজ হয়? তোমায় একটা কথা বলি, বহু। তুমি চিরদিন বিশ্বাসী বহু। দেখ, একটা বিষয়ে আমি চিন্তিত। আমি এক্ষণ জেলে। নায়েব অতি পাষণ্ড। একবার আমার বৃদ্ধ পিতাঠাকুরের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তা জান। আবার করিতে পারে। আর আমার স্ত্রী—নায়েব যেমন অত্যাচারী তেমনি লম্পট। সেই চামারের কিছুই অকার্য্য নাই। সে সব কুকার্য্য করিতে পারে। (অনেকে বলিয়া উঠিল “আমরা নায়েবের মাথা ভাঙ্গিব” বহু বলিল) শুন, মহেশ যা বলিয়াছে।

“মহেশ বলিল, শুনা বহু, আমার যে সন্ন্যাসী বহু আছেন—সেবানন্দ স্বামী—তিনি আর তুমি, আমাদের পাড়ার দুর্গা গোয়ালিনীকে সঙ্গে করিয়া আমার পিতা ও স্ত্রীকে প্রবোধ বাবুর নায়েবের পরিবারের নিকট রাখিয়া আসিবে। যে দুই একদিন তাহাদিগকে সেখানে না লইয়া যাইতে পারিবে, সেই সময় কয়েক জন বিশ্বাসী ভাললোক আমার বাটীর চতুর্দিকে পাহারা রাখিবে। বিশেষ বিপদ জানিবে। (অনেকে “ঠিক ঠিক”। ভীম বলিল ‘গদাধর, তুই ২০ জন ভাল ও বিশ্বাসী লাঠিয়াল নিয়ে এখন মহেশের বাটীতে যা। সেখানে পাহারা দিন’। গদাধর ‘আচ্ছা’ বলিয়া ২০ জন লাঠিয়াল লইয়া মহেশের বাটীর দিকে চলিয়া গেল।)

“তাহার পর, মহেশ বলিল শুন বহু, কুবকেরা আমাকে বড়ই ভাল বাসে, তারা আমার বড় অনুগত। আমাকে গ্রেপ্তার করাতে তাহারা খেপিয়া উঠিতে পারে এবং হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া নিজের ক্ষতি করিতে পারে। দেখিবে, যেন তারা রাগে কুবক বিদ্রোহের আদত উদ্দেশ্যে ভুলিয়া না যায়। মোকদ্দমা যখন সম্পূর্ণ মিছা, এবং আমার পক্ষে যখন উকিল মোক্তার দিয়া তদ্বির করা হইতেছে, আর প্রবোধ বাবু যখন এই মোকদ্দমার কথা শুনিয়াছেন তখন খুব সম্ভব আমি বেকসুর খালাস হইব’। তার পর মহেশ বলিল—‘বহু, তুমি ভাল করিয়া মোকারিম দাদাকে বলিবে যেন রাগে মাতিয়া জেল ভাঙ্গিয়া আমাকে খালাস করিবার চেষ্টা না করে। একপ বেয়াইনী কাজ করিলে সরকার নাহাজুরের সঙ্গে কুমকদিগের নিবাদ বাসিবে। তাহাতে সকল দিক

নষ্ট হইবে । সরকার বাহাদুর জমীদারদিগের অশুকুল হইলে প্রজাদের আর রক্ষা নাই । সরকার বাহাদুরের সহিত লড়িবার কোন কারণ নাই ; যদি কারণ থাকিত, যদি সরকার বাহাদুরের সহিত দাঙ্গা হান্ধাম করিলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, আমি জেলে থাকিয়াও বলিতাম, “লড়”—মহেশ বলিল আমাকে যদি সরকার বাহাদুর কঁাসিও দেয়, তাহলেও তোমরা সরকার বাহাদুরের সহিত লড়িওনা ।

“তোমাদিগের মধ্যে সাহেবদিগের সহিত যে লড়িবে সে আপনার গলায় আপনি ছুরি দিবে । আমি খালাস হইলেও আমি ইংরাজদিগের সহিত লড়িব না । তোমরা যদি কোন কারণে ইংরাজদিগের সহিত লড়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের দলে আর থাকিব না । আমাকে যখন কনষ্টেবলরা ধরে, তখন আমি শিক্ষা বাজাইলে কত চাষার মরদ জুড়িত । আমাকে অনায়াসে তাহারা কনষ্টেবলদিগের হাত হইতে ছিনিয়া লইয়া বাইতে পারিত । কিন্তু পাছে আমাকে লইয়া একটা অনর্থক হান্ধামা হয়, পাছে সেই হান্ধামাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়, তাই আমি শিক্ষা বাজাই নাই, নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করি নাই । তবে যদি আমরা দেখি—সরকার বাহাদুর আমাদের গ্রায্য কথাতে কান দিলেন না, আমাদের মুখের দিকে তাকাইলেন না, জমীদারের সহায় হইলেন, জমীদারের অত্যাচারের সহায়তা করিতে লাগিলেন, তখন মহেশ সাহেবদিগের তোপের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে না । আমিও বলি তোমরা সকলে নিশ্চয় জানিও, তখন মোকারিম দাদা ও মহেশ গুরুজী, তোমাদের আগে তরওয়ার হাতে করে, তোপের গুড়ুম গুড়ুম শব্দের মধ্যে, আশুগ আশুগ গোলাবৃষ্টির মধ্যে, কামানের উপর লাফিয়ে পড়বে—(“হর হর ” “আল্লা আল্লা হো”) নিজের প্রাণ দিয়ে সাহেবদিগের বুঝিয়ে দিবে, যে কৃষাণ ভাইদের কষ্ট মিথ্যা নহে । সাহেবদিগের সেই কষ্ট সমজাইয়া দিবার জন্য এফণ ও চাষাদিগের মধ্যে মোকারিম ও মহেশের মত লোক আছে সেই আমাদের বড় ভাগ্য । মহেশ ও মোকারিম দাদা মরিতে ভয় করে না, এ কথা কে না জানে ? তবে মহেশজী বলে, মোকারিম গোচ্ছা হয়ে, কাম ভুলনা । মহেশ আমাকে বলিল—যহ—তুমি মোকারিম আর সমুদয় কৃষাণ ভাইকে বলিও যে পূর্বে যখন আমি কয়েদ হইনি, তখনও যেমন সকলে আমার কথা শুনিতে এখন, আমি জেলে, এখনও বেন ভেমনি কথা শুনে ” (সকলে “ মহেশের কথা শুনিব ” ।)

তৎপরে একজন দীর্ঘায়ত কৃণ কাশ্ম সেই স্তূপের উপর উঠিল । তাহার মাথায় শিখা, স্বক্কে উত্তরীয় । সে গ্রামের গুরু মহাশয় । তাহার নাম কালীকৃষ্ণ বসু । নায়েব তাহার একটা লাখরাজ জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিল । তাহাতে সে একদিন কিছু কড়া কড়া কথা বলিয়াছিল । তাই নায়েব হুকুম দিয়া পেরাদার দ্বারা গলায় গামছা দিয়া তাহাকে কাছারীতে আনিয়া দুই ঘা জুতা মারিয়াছিল । সেই অপমানের শোধ লইবার জন্ত কালীকৃষ্ণ বিদ্রোহিদিগের দলে মিশিয়াছিল ।

কালীকৃষ্ণ বলিল—“বাপু সব, মহেশ যা বলে তাই করাই ভাল তার আর সন্দেহ নাই । মহেশ এই কথা বলে, জমীদারকে নেয়াও, নায়েবকে শাসন কর । তা হলে লাখরাজ জমী বাজেয়াপ্ত হবে না, খাজনা বাড়িবে না, অত্যাচার হবে না, কিন্তু বাপু, এ পর্য্যন্ত নায়েবকে শাসন করবার কি করেছে ? নায়েব খুব বুক চাড়া দিয়ে, গোঁপে তা দিয়ে, রসিক নাগরটার মত হেঁসে খেলে বেড়াচ্ছে আর কাছারী গিয়ে ত পূর্বের মত ছম্ দড়াম হুকুম হাকাম দিতেছে । তার জন্ত আর কুলের বোঁরা ঘাটে ঘাইতে পারেনা, গৃহস্থের আর জাতি ধর্ম্ম থাকে না—জমী জমা ত চুলোয় ষাউক—এক্ষণ যে নিত্য ঘরের বৌ নিয়ে টানাটানি (এই শুনিয়া চামারা বলিতে লাগিল চল শালার মাথা ভাঙ্গি—সুয়ারকাবাচ্ছা,—উসকা শিরলেঙ্গ) আজগে প্রাতে আমাকে একজন বল্ছিল দাদা মহাশয়, শুনেছ নাকি আজ রাত্ৰিতেই নায়েব মহাশয় কার বৌ বার করবে, লাঠিয়াল বেহারা সব ঠিক হোয়েছে (“ গরদান লেঙ্গে, সব চলো, চলো কাছারি তরফ চল ”) । হাঁ বাপুসব, যদি কাজ করিতে চাহ, তা হলে চল কাছারি—বেটার চুলের মুটি ধরে মুখে ঘা কতক জুতা লাগালেই বেটা খুব দোরস্ত হইয়া যাইবে ।”

এমন সময়ে দূরে শৃঙ্গ নিনাদ শুনা গেল—একটি—দুটি তিনটি—মুহূর্ত্ত মধ্যে হাজার শৃঙ্গ বাজিয়া নৈশগগন ভেদ করিল । সেই মহাজনতা ব্যতাতাড়িত সিদ্ধুরঙ্গের স্রাব ছুটিল—যে দিক হইতে প্রথমে শৃঙ্গধ্বনি আসিয়াছিল, সেই দিকে সকলে ছুটিল ।

কতকদূর বাইতে বাইতে দুই জন কৃষক বেঁটো ঘোড়ায় চড়িয়া জুতবেঁগে আসিয়া খবর দিল—নায়েব হারাধন ও মহেশের স্ত্রীকে ধরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ।

ঐ কথা শুনিবামাত্র—সকলে বলিতে লাগিল “ মার মার মার মার, ” আর ছুটিতে লাগিল ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

কিছু কাল পরে কৃষকগণ কাছারী বাটীর নিকট, মার মার শব্দে আসিয়া, কাছারী ঘিরিয়া ফেলিল। কাছারী হইতে শব্দ হইল—“কোন ছায়?” বাহির হইতে উত্তর হইল—“শালা, তোমারা বাপ ছায়।” কাছারীর একটা জানালা সট করিয়া খুলিয়া ছুঁকিয়া বন্ধুকের আওয়াজ হইল। একজন মুসলমান চাষার পার গোটাকতক ছড়ড়া গুলি লাগিল—সে তাহাতে জ্বরেপ না করিয়া “আল্লা আল্লা হো” করিয়া উঠিল। আর সমুদয় মুসলমান ইরূপ গর্জন করিল।

এদিকে ষড়ানন সর্দার যেমন বন্দুকধারীকে ঘরের ও বাহিরের উজ্জল আলোকে দেখিল, অমনি একটা সড়কি, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িল। বন্দুক-ধারীর স্বল্প সড়কিতে বিদ্ধ করিল। হিন্দুরা “হর হর হর বোম” করিয়া উঠিল। এদিকে যত্ন হাঁকিল “সব আদমি বন্দুকের নিশানা হইতে সরিয়া দাঁড়াও।” সকলে জানালার মুখ হইতে সড়িয়া দাঁড়াইল। মোকারিম বলিল “ভাই ভূমি দরজা ভাঙ্গ, আর আমি মই দিয়া প্রাচীর টপকাই—আর ষড়ানন ভাই ভূমি ঘরে আগুন লাগাও। ষড়ানন সর্দারের লোক জলন্ত মশাল চালের দিকে উঁচু করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ভীম নিকটবর্তী একটা গৃহস্থের বাটা হইতে একটা বৃহৎ ঢেঁকি আনিয়া তাহার এক পাশে দুই জন আর এক পাশে দুই জন, চার জন দুই পাশে ধরিয়া “হেইয়া—নায়েবের মাথা ভাঙ্গি—হেইয়া” এইরূপ বলিতে লাগিল, আর সেই ঢেঁকি ভূমির সমস্তরাল ভাবে দরজার গায় সজোরে মারিতে লাগিল। দরজা সেকলে, শাল কাঠে বড় বড় লোহ প্রেক বিদ্ধ—কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ আঘাতে ঝন ঝন করিতে লাগিল। পরে তাহার হাঁসকল ভাঙ্গিব ভাঙ্গিব হইল, তখন ভিতরের অনেক লোক দরজা চাপিয়া ধরিয়া থাকিল। এদিকে ভীমের লোক “হেইয়া, হেইয়া” বলিয়া দরজার উপর আঘাত করিতে লাগিল—আর দরজা অধিকতর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অন্তরিকে মোকারিম একখানি মই জোগাড় করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনের উপায় করিতে লাগিল। মোকারিমের কটিদেশে তরবারি। মই দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া “আল্লা আল্লা হো” বলিয়া লাফ মারিয়া ভিতরে পড়িল। তাহাকে চারিজন লাঠিয়াল আক্রমণ করিল। কিন্তু মোকারিম অপূর্ণ কোশলে তরবারি সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং দরজা খুলিয়া দিবার

জন্ত দরজার দিকে অগ্রনর হইল । এদিকে টেকির পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাত আর সহ্য করিতে না পারিয়া দরজা ভুতলে পতিত হইল । তখন শ্রোতের জ্ঞান বিদ্রোহী ক্রমক সকল কাছারী বাটার ভিতর আসিতে লাগিল । সেখানে খুব লড়াই হইল । কিন্তু মোকারিম, ভীম ও ষড়াননের দলের লোকের রণ-কৌশলে শীঘ্রই ক্রমকদিগের জয় লাভ হইল । কাছারির পেয়াদারা সটান পালাইল ।

আমলারাও কতক কতক পালাইল : কিন্তু পেশকার আর আমিন পালাইতে পারিল না, আর ষড়ানন তাহাদিগের দুইজনকে কঁাক করিয়া ধরিল । মোকারিম ও নহু একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, হারাধন পীঠমোড়া বাধা মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । তাহার একখানি হাত আর একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে । যহু তাড়াতাড়ি বাধন খুলিল, মুখে জল দিল, বাতাস করিতে লাগিল । হারাধনের সংজ্ঞা হইল, চক্ষু মিলিল, বলিল—বা—বা—ব—হু. আমার—সময়—হয়েছে—মুখে—গঙ্গাজল দাও—“আমার জন্ত—ভেব—না । বো-মার ধর্ম—র-ফা—কর—সেখানে শীগ্গির যাও—তোমরা—মায়ী—মায়ী—হরি—হরি—” । ভক্ত নিরপরাধী হারাধন বিষ্ণুপদে আপনার পবিত্র আত্মা অর্পণ করিল ।

এদিকে কাছারী বাটার ভিতর দুই খানি ঘর ধু ধু করিয়া জলিয় উঠিল ।

সমালোচনা ।

নিয়ু ইণ্ডিয়া (New India)—ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ।

ও

বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্র নবপর্যায়)

বৈশাখের বঙ্গদর্শনে “ রাজকুটুম্ব ” নামক প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে :—

নিয়ু ইণ্ডিয়া কাগজ খানি আমরা প্রকার সহিত পাঠ করি । ইহার রচনার পাঠক ভুলাইবার বাধাবুলি ও সহজ কৌশল গুলি দেখি না । সম্পাদক যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাভীয়া আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদ সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় । তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেক দূর ছাড়িয়া মাথা তুলিয়া থাকে ।”

নিয়ু ইন্ডিয়া কাগজ খানি আমরাও আফ্লাদ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি । কিন্তু তিনি বঙ্গদর্শনের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না । তিনি বলেন জাতীয় জীবন, বিস্তারে ও জটিলতাতে, এই ৩০ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বর্তমান বঙ্গদর্শন তাহারই উচ্চতম অভিব্যক্তি । জাতীয় জীবন এই ত্রিশ বৎসরে যে রূপেই বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যমুক্ত হইয়া থাকুক, আমাদের বিশ্বাস, কি সাহিত্যে, কি ধর্মজীবনে, কি মনুষ্যত্বে, এই ত্রিশ বৎসরে জাতীয় জীবনের অনেকটা অধোগতি হইয়াছে ।—সেই অধোগতি, সেই আসন্নতা, সেই আশঙ্কতিমোহ, বর্তমান সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে । সংবাদ পত্রে—কোথায় হরিশ্চন্দ্র বা কৃষ্ণদাস পালের হিন্দু-পেটি-গ্ৰন্থ, আর কোথায় বর্তমান হিন্দু-পেটি-গ্ৰন্থ এবং অন্যান্য সংবাদপত্র ! ধর্মপ্রচারে—কোথায় যুগপ্রবর্তক কেশব, আর কোথায় তাঁহার শিষ্যগণ ! সাহিত্যে—কোথায় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম, আর কোথায় বর্তমান বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ । প্রবাসীতে জনৈক লেখক বঙ্কিম বাবুর “কমলাকান্ত” নাম লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন । তাহাতে ব্যঙ্গনিপুণ সুরসিক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার, প্রয়াগে কমলাকান্তের পিণ্ডদান হইতেছে এই মর্মে একটি অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । তাহাতে বোধ করি নকল কমলাকান্ত আর প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই । বিজয় বাবু যাহা নকল কমলাকান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন নকল বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে অনেকে তাহাই মনে করেন । রবীন্দ্র বাবু যখন কেবলমাত্র সাহিত্য সম্বন্ধে লেখেন তাঁহার প্রবন্ধ প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় । কিন্তু তিনি যখন জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন, তিনি প্রায়ই, কল্পনার তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের তীর হইতে বহুদূরে চলিয়া যান । মৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত “রাজ কুটুম্ব” নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব—

- “আমাদের অক্ষমের দুর্বলতা ইহাদের (ইংরাজদিগের) সক্ষমের দুর্বলতা” ।
- স্মরণ্যং “আমরা মাথা তুলিতে পারি । অর্থাৎ ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই । কিন্তু “অক্ষম” ও “সক্ষম” এই দুই শব্দে যে মস্ত পার্থক্য রহিয়া গেল তাহা লেখক ভুলিলেন । সক্ষমের দুর্বলতা অর্থে ক্ষমতাশালী গুণশালীর দুর্বলতা । স্মরণ্যং ইহাতে সক্ষমের গুণ এবং দুর্বলতার দোষ উভয়ই আছে—ঐ রূপে অক্ষমের দুর্বলতাতে, শক্তিহীনের দুর্বলতাতে, অক্ষমের দোষ এবং দুর্বলতার দোষ, অর্থাৎ কেবল মাত্র দোষই আছে । লেখকের কথাতাই হইল, ইংরাজের গুণও আছে দোষও আছে । আমাদের ক্ষমতা

(৩৭) নাই অথচ দোষ আছে । এক “ক্ষমতার” ভিতর অনেক গুণ থাকিল । ইংরাজ পূর্ণ জীব তাহা কেহ বলেন না । ইংরাজের অনেক গুণ আছে, দোষও আছে । এবং বর্তমান বাঙ্গালীদিগের গুণ অতিশয় কম, দোষ এবং অভাব অধিক । সুতরাং যতদিন এই অবস্থা থাকে, যতদিন দেহের শক্তি অপেক্ষা মস্তকের উপর (দোষের) বোঝা অধিক, ততদিন “আমরা মাথা তুলিতে পারি” না ।

২ । “কর্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড় নহে । *** সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্যায় ক্ষমতায় ইহাদের (সাহেবদিগের) সমান হইতে পারি” — এক “সুযোগ পাইলে” ইহার মধ্যে লেখক নিজেই আত্মোক্তি খণ্ডন করিয়াছেন । ইংরাজ বেশি বড় ; কারণ “সুযোগ” তাহারা নিজেই করিয়া লয়, আমাদিগের মত অন্তের নিকট সুযোগ পাওয়ার জন্য তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে না । “সুযোগ পাইলে” অর্থে ইংরাজের আশ্রয়ে থাকিয়া যদি আমরা সুযোগ পাই ; কারণ ইংরাজের আশ্রয়চ্যুত হইলে কৃষিয়ান বা অন্য কোন জাতি আমাদিগের পদদলিত করিবে । “ বেশী বড় নহে ” — তবে তারা আশ্রয়দাতা, আর আমরা আশ্রিত, এই বা প্রভেদ । বাঙ্গালী ভীক, রবীন্দ্র বাবু তাহার কৈফিয়ত দিতেছেন । কিন্তু ভীকতার কারণ গাছাই হউক ভীকতা ভীকতা, ভীকতা আর কিছুই নহে, ঘৃণিত শোচনীয় ।

৩ । “ আমরা একানবর্তী তাই পরম্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও ক্ষুণ্ণি পাইবার স্থান নাই । ” এ কথা অর্থোক্তিক । প্রাচীন হিন্দুগণও একানবর্তী ছিলেন, তাহাতে তাহাদের সাহস খর্ব হয় নাই । এখন হিন্দুদিগের মধ্যে রজপুত প্রভৃতি যে সকল জাতি লড়াই করে তাহারাও একানবর্তী । অধুনা আমাদিগের সমাজে “ একানবর্তী ” হইয়া থাকা ক্রমেই উঠিয়া বাইতেছে, তাহাতে সাহস বাড়িতেছে না ।

৪ । “ যদিও ইংরাজ অত্যাচারীর গারে বুধি তুলিবার মত ক্ষুণ্ণি কাহাঙ্গুর থাকে, তবে বিচারালয় আছে । ” অর্থাৎ অন্যায় বিচারে দেশীয় ব্যক্তির জেল বা গুরুদণ্ড হয় বলিয়া হিন্দু ভীক হইয়াছে । এ কথাও নিতান্ত ভ্রান্ত । সাহসের লক্ষণই এট যে ইহা মৃত্যু বা জেলকে ভয় করে না । সাহসী জাতির ভিতর, যখন কর্তব্যের ভেরী নিনাদিত হয়, বা অপমানের তক্ষুণ যখন তাড়না করে, তখন সহস্র সহস্র পুরুষের হৃদয় আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ প্রাণ দিবার জন্য লাফাইয়া উঠে । এখানেও মুসলমানদিগের মধ্যে একটু পদার্থ আছে, তাহারা মৃত্যুভয় সदा বিধ্বনিত নহে । হিন্দুদিগের মধ্যে যাহাকে আমরা

“ছোট লোক” বলি তাহাদিগের মধ্যে একজনও একটু মনুষ্যত্ব আছে । প্লেগের প্রথম উৎপাতে আমাদিগের গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে “যদি তোমাদিগের পরিবারের অঙ্গ পরীক্ষা করিবার জন্য গোরা আইসে তোমরা কি করিবে” ? সে উত্তর করিল, “আমরা মূর্থ গরিব লোক, আমরা এক গাছি করিয়া লাঠি লইয়া ঘরে থাকি । গোরা আসিলে, এক মাত্র সম্বল লাঠি । প্রাণ যতক্ষণ থাকিবে লাঠিতে যত দূর হয় তাহাই দেখিব” । আমার মনে হইল—আমরা শিক্ষিত লোকত এই মনুষ্যত্বের কথা বলিতে পারি না । আমরা প্রবন্ধ লিখিতে পারি, বক্তৃতা করিতে পারি, “এসোসিয়েশন” করিতে পারি, কংগ্রেস করিতে পারি, কিন্তু এই বিনীত অশিক্ষিত গোয়ালার ছায় নিজেদের পরিবারের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত নহি । রবীন্দ্র বাবু এই জাতীয় ভীকৃতার গভীরতম, ঘৃণাতম, অতলস্পর্শ হৃদয়কে “সহিষ্ণুতা” নাম দিয়া, কিরূপে ধর্মের নাম গ্রহণ করিতে পারেন তাহা বুঝি না ।

৫ । “আমরা যদি বখার্ব ভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্য নিজেকে হেয় বলিয়া অন্তায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন” রবীন্দ্রবাবু কি অর্থে “সহিষ্ণুতা” ব্যবহার করিয়াছেন জানি না । “সহিষ্ণু”* যদি ক্ষমাশীল অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যেখানে প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা নাই সেখানে “ক্ষমা” হইতে পারে না । যখন বাধা ও নিরুপায় হইয়া কষ্ট (বা অপমান) ভোগ (বা সহ্য) করি তাহাকে যদি একান্ত “সহিষ্ণুতা” বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু এইরূপ সহিষ্ণুতার কিছুই প্রশংসা নাই । এবস্থিৎ সহিষ্ণুতা এবং ধর্মের সহিত কোন সংস্রব নাই । রবীন্দ্র বাবু বঙ্গদর্শনে যে সকল জাতীয় প্রবন্ধাবলী লিখিতেছেন—আমাদিগের বিবেচনায়, তাহার মূল মূল ভ্রান্ত, তাহা অনেক স্থানে যুক্তি-বিকল্প ও স্বজাতিস্তুতিমোহে অভিভূত । তাহার ফল অনিষ্টজনক । তবে রবীন্দ্র বাবুর ভাষার মধুরতা ও কবিত্বে প্রবন্ধ গুলি সুপাঠ্য তাহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ! তিনি স্বদেশকে ভাল বাসেন । কিন্তু কোন কোন জননী যেমন সম্মানকে এত ভাল বাসেন যে তাহার দোষ দেখিলেও বাহিরে তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে বড়ই কষ্ট অনুভব করেন—স্বীকার করিতে পারেন না,—কেহ তাহার দোষ উল্লেখ করিলে “না না” বলিয়া উদ্বেলিত স্নেহভরে তাহাকে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরেন, মোহাগ করেন এবং

তাহার দোষকে শুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—রবীন্দ্র বাবুরও স্বদেশবৎসল কোমল হৃদয় তেমনি হতভাগ্য স্বজাতির দোষ দেখিয়া দেখে না, দোষের কথা উঠিলে, দোষকে কল্পিত :শুণের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া, তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আদর করে । যে স্নেহাবিকা হইতে এই দুর্বলতা নিঃসৃত হয় তাহা মধুর ও সহবেদনাই । তথাপি এই দুর্বলতা বর্জনীয়, কেননা সন্তান ও স্বজাতির পক্ষে এই স্নেহজাত পক্ষপাতিতা অনিষ্টজনক এবং ভাবী মঙ্গলের অন্তরায় !

নিউ ইণ্ডিয়ার ভাষার কায়দা এবং স্বজাতি-পক্ষ-সমর্থন চিত্তহারী । আমরা বারাস্তরে তাহা বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিব ।

আরতি ।

(সমালোচনা ।)

পুস্তক খানি কবিতার গুচ্ছ, ইহার প্রণেতা শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, মূল্য ১।।০ । পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই প্রমথবাবুর অন্যান্য পুস্তকের স্থায় সুন্দর ।

পুস্তকখানিতে ১২টি কবিতা আছে ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি নাতিদীর্ঘ খণ্ডকাব্য আছে । ‘গৌরাঙ্গ’ অধুনা বর্দ্ধিতাকারে ভিন্ন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে ।

আমরা পূর্বে গ্রন্থকারের “গীতিকা” সমালোচনাকালে বলিয়াছিলাম যে প্রেমবিষয়ক কবিতার বঙ্গভাষায় অত্যধিক ছড়াছড়ি, তাহার উপর এই বিষয়কে বিদেশীয় রঙে চিত্রিত করিবার প্রবৃত্তিটা ক্রমে ক্রমে এত বাড়িয়াছে যে তাহা অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আমরা দেখিয়া প্রীত হইলাম যে কবি তাঁহার কবিতা হইতে প্রেম বেচারিকে দিন কতক অব্যাহতি দিয়াছেন । অন্যান্য কবিরা উক্তরূপ প্রণালী অনুসরণ করিলে বঙ্গভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইবে ।

পুস্তকখানির প্রথম কবিতা ‘আরতি’ । কবিতাটির ভাব অতি উচ্চদরের । সমুদায় স্বরূপ—

“সেইতরে গান, জ্বালা আছে যার,
পোষা নাহি যায় বুকে ; ” (পৃঃ ৩)
লক্ষ্য হয় তার,—সুনীল আকাশ,—
সুকুমার তনুখচি ।

বিশাল বিশ্বেরে উর্দ্ধপানে টানে

তার আধিয়ারা মুছি ॥ (পৃঃ ৪)

দেখিতে দেখিতে ছড়ায় সে পড়ে

লোক-লোকান্তর ময় ;

সে যে কভু ছিল একেলার গান,

কার সাধ্য চিনে লয় । (পৃঃ ৪)

এই ত গান ! যাহাতে নিজের ব্যথা বিশ্বের মঙ্গল ; যাহা প্রকৃতির পদে
আপনার উৎসর্গ ;—

কোন নবসত্য, অপূর্ণ নির্যোষ

জাগিবে ভুবন ভরি ; (পৃঃ ৬)

এই ত গান ! যেখানে কবি অবতীর্ণ দেবতার মত, শরীরী স্বাক্ষরের মত,
বেগবতী নদীর মত নামিয়া আসেন ; যেখানে কবি এই সংসারের বিগ্রহ-
বিচারের মধ্যে শাস্তি আনেন, রোদনের মধ্যে শুভবার্তা আনেন ; যেখানে হৃদয়
ফাটিয়া গান বাহির হয় ;—সেই ত গান ! বাইরণ এইরূপ গান গাহিয়াছিলেন,
শেলি এইরূপ গান গাহিয়াছিলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এইরূপ গান গাহিয়াছিলেন ।
নহিলে “ফিরিতেছি তার পিছু পিছু, সে ত কভু নাহি চাহি ফিরে”—ইহা গান
নহে, ইহা ন্যাকামি, ইহা প্রলাপ, ইহা কবিতাদেবীর লাঞ্ছনা ! প্রেমকে একবারে
বর্জন করিতে বলি না । কিন্তু সে গান গাহিতে জানা চাই ! যাহাতে অস্তঃস্থল
আলোড়িত হয়, চক্ষে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, সে গান গাহিতে
পারো ? তবে শুনিব ! নহিলে ভারতচন্দ্রের অধর সুধা, আর অপাঙ্গ, আর
পয়োধর, এ কামের কীৰ্ত্তন শুনিতে এখন স্তব্ধ আসে ; আবার এদিকে
জাতীয় প্রেমকে ছাটকোট ধারি, চুরোট সেবী ও ‘বাই জোত’ভাবী দেখিলে
গায়ে জর আসে ।

কবি হুঃখ করিয়াছেন :—

“আদি অকৃত্রিম সে সাহস কই

এবে সঙ্গীতের মাঝে ?”

আমরাও সেই-হুঃখ করি ।

দ্বিতীয় কবিতাটি “ বর্ষমঙ্গল ” । ইহা পুরাতনের সহিত বিদায় গ্রহণ ও
নূতন কে অভ্যর্থনা । কবির অমৃতভূতির সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে ।
কিন্তু কবিতাটি অতি নিস্তেজ ।

“এস, হে নূতন

স্বর্গভ্রষ্ট আত্মার মতন !”

বড়ই নিস্তেজ

তৃতীয় কবিতার নাম ‘ছঃখের সীমানা’ । যদিও নামের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত, তথাপি কবিতাটি উত্তম ।

“ভাবিতাম আমাদেরি চাহি
ফুটে ফুল নভে উঠে তারা” ;
“একদিন চেয়ে দেখি, শেষে,
সেই ফুল, সেই তারা হাসে
সবাই জুটেছি খেলাঘরে,
সঙ্গী এক আর নাহি আসে ।” (পৃ: ২০)

এইরূপ যখন কবি বিষাদাচ্ছন্ন :—

তখন কে তুমি স্নেহভরে
ধরায় পাঠায়ে দাও আলো ;
অজ্ঞানের কক্ষে কক্ষে পশি
কে তুমি আঁধারে দীপ আলো ! (পৃ: ২১)

তখন কবি বুঝেন যে—

“আবর্তনে বিবর্তনে ঠেকি’
বিপ্লবে বিগ্রহে উঠে, পড়ি,
শৃঙ্খলাই হতেছে সূত্র
নব নব গুণ সূত্র ধরি ।”
“স্থির ইহা,—ক্রমোন্নতি পথে
উঠিতেছ অকূর্ণ জগৎ । (পৃ: ২৩)
“আমাদের আপনা বলিতে
যে যেখানে আছে বিশ্বময়,
জন্ম জন্ম আছে তারা সাথে,
নূতন আত্মীয় কেহ নয় !”

৪র্থ কবিতা “সিন্ধুর প্রতি” উক্ত । সমুদ্রই পড়ুন । আমার ভাবার্থ নিম্নলিখিত গল্পটিতে বোঝা যাইবে ! মদীয় কোন আত্মীয় কবিতা তত বুঝিতেন না ও পড়িতেনও না । তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয় হেমবাবুর ‘প্রিয়তমার প্রতি’ কবিতাটি পড়িয়াছেন কি ?” মদীয় আত্মীয় উত্তর করিলেন ‘এ কবিতা করি লিখিয়াছেন প্রিয়তমার প্রতি, আমি পড়িব কেন ? তাহা তাঁহার প্রিয়তমা পড়ুন ! আমিও সেইরূপ বলি যে এ কবিতা কবি সমুদ্রের প্রতি লিখিয়াছেন সমুদ্র পড়ুন, এবং পারেন ত বুঝুন । এ কবিতাটিতে অনেক সংস্কৃতকথা আছে

বটে, কিন্তু কবিতা অতন্ত কৃত্রিম । ইহাতে শুবক গুলির প্রারম্ভে “গর্জ্জ গর্জ্জ” “বহ বহ” “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” “ঢাল ঢাল,” “শোন শোন” “হান হান” এবং “নমো নমঃ” শব্দগুলি কেমন বিকট ঠেকে । তার পরে সমুদ্রকে “ঢালো ঢালো সুধা ধারা” এ অনুরোধ কিরূপ ? সমুদ্রকে কবি যে অসাধ্য সাধন করিতে বলিতেছেন । এ কবিতাটিতে একটা বিষম প্রয়াস ও কষ্ট করনা লক্ষিত হয় ! অনেক উপমা আছে, শব্দগাতুরী আছে, কিন্তু ভাবগুলি সেন অনেক পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আনিতে হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয় ।

“বিপত্নীক ও বিধবা” নামক কবিতাটির মর্ম্ম “পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে অবলা রমণী বলে এতই কি সয়রে ।” কবি কিন্তু বিধবাকে পুনর্বিবাহ করিতে বলিতেছেন না । তিনি বিধবার পতিপ্রাণতা বর্ণনা করিয়াছেন ।

বিপত্নীকের পুনর্বিবাহের প্রণালীটি একান্ত আকস্মিক । যেন তাহার পতন ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে । তাহা হইলে এটি গদ্যো লিখিলেই ভাল হইত । কবিতাটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ।

“আভীর দম্পতি” “ভীষ্ম” ও “রাণীর রণযাত্রা” এতিনটি কবিতা অতি উচ্চ অঙ্গের । তাহাদিগের হইতে উদ্ধৃত করা চলে না । কবিতাগুলি আমূল পড়িতে হয় । “রাণীর রণযাত্রা” কবিতাটির তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম । “ঝান্সী দিবনা ছাড়ি” এই কথাটি যেন রাণীর মর্মে মর্মে বিধিয়াছে । সমরের প্রারম্ভে রাণীর দৃঢ়তা ও স্বদেশানুরাগ, এবং সৈন্যদিগের দৃপ্ত রাজভক্তি অতি জনস্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । পড়িতে পড়িতে শরীর কণ্টকিত হয় ।

গৌরঙ্গ নামক কবিতাটি এখন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে । তাহার স্বতন্ত্র সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল ।

তবে একটা কথা বলি যে প্রমথ বাবুর ভাষা এখনও দোষবহল । তাহা কখনে বড়ই বাজে । সংস্কৃত ও গ্রাম্য কথার অসহনীয় মিলন

“রটা কবি রটা

রোজে নাই মাধবীর ছটা”

ইহা comic songএর উপযোগী, গভীর রচনার নহে । তাহার উপরে “জগময়” “নিরাময়” “অতশত” “একতরে” ইত্যাদি শব্দগুলি দেখা যাইতেছে কবির একান্তই প্রিয় । এ শব্দগুলির কলিকাতা অঞ্চলে প্রয়োগ হয় না । আর এক কথা—“অশ্রু ফাপিছে নয়নে” “জরি পুরাতন” “মর্ত্ত পদে পদে ভুগে” “সধন নয়ন জলে” কিরূপ যেমন উত্তম ব্যঙ্গন খাইতে খাইতে হঠাৎ একটা আধটা

কঙ্কর দন্তে বাণিয়া সমস্ত আহারের স্মৃতিটাই নষ্ট করে, তাহার এইরূপ পদাবলিও সেইরূপ ; ইহাও আসিয়া ফরয়ে আঘাত লাগে । তাহার ভাষাসংস্কারও একান্ত প্রয়োজনীয় ।

পুস্তকখানি উপাদেয় । প্রথম বাবু তাহার পূর্ব প্রণীত পুস্তিকাবলিতে যে ক্ষমতার আভাস দিয়াছিলেন এই পুস্তক খানিতে তাহার বিকাশ হইয়াছে । আমরা তাহাতে যেন হেম বাবুকে ফিরিয়া পাইতেছি । তাহার কবিতার উত্তরোত্তর বিকাশ হউক ।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

চৈত্র, ১৩০৯ ।

২রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ । ভারত সূত্র মিঃ কেন এর মৃত্যু হয় ।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ । ন্যাসনালিষ্ট কর্তৃক ইউরাস্তায় ভয়ানক বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ।... ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় ১৯০২৩ সালের আর বায় বিবরণী পেশ হয় ।

৬ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ । শোভাবাজারের বিপ্লবিত মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয় ।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ । বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় ।

৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ । বুলাপেন্ডায় কেস-থের মৃত্যুৎসবোপলক্ষে ছাত্রগণ কর্তৃক বিদ্রোহ হয় ।

৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ । স্থলেখক, ধর্মপ্রচারক মহাত্মা ডিন কারারের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় । ইনি ১৮৩১ সালে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন ।...ইউরাস্তায় বিদ্রোহের শাস্তি সংবাদ আসে ।

১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ । ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় লবণ করের হ্রাস ও ১০০০, হাজার টাকার আয়ের উপর আরকর নির্ধারণের আদেশ হয় ।

১৩ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ । ভারতবর্ষে দিল্লী দরবার সমাপনান্তে নানা দেশ পর্ষটন করিয়া সঙ্গীক ডিউফ অব কনট লণ্ডনে পৌছেন ।... চিত্রলে ভূমিকম্প হয় ।

১৪ই চৈত্র, ২৮শে মার্চ । বঙ্গীয় বাবস্থাপক

সভার অধিবেশন হয় । তাহাতে ১৯০৩৪ সালের বাঙ্গালার আর বায় বিবরণী পেশ হয় ।

১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ । মাসিদোনিয়া দ্বীপে ভীষণ ঝটিকা (সাইক্লোন) হয় । তাহাতে উপকূলবর্তী অনেক নগর বিধ্বস্ত হয় ।

১৬ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ । মাল্ভাজ বাবস্থাপক সভায় মাল্ভাজ আর বায় বিবরণী পেশ হয় ।... ১৪ই মার্চ তারিখে ইংরাজ কর্তৃক সকেটো অধিকৃত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় ।

১৯শে চৈত্র, ২রা এপ্রিল । মিজভিজার নিকটে তিউর্চান নগরে ভয়ানক বুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় । ইহাতে ২০০ লোক হতাহত হয় ।...ইংলণ্ডের লিসকন নগরে পৌছান এবং তথায় বিশেষ সমাদৃত হন ।

২১শে চৈত্র ৪ঠা এপ্রিল । বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় ।...ডাঃ ওয়েস কণ্টারবরির ডিন নিযুক্ত হইলেন ।

২৫শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল । সপ্তম এডবার্ড জিরাণ্টারে পৌছান । ... ৪০,০০০ কুলিমজুর রোমে ধর্ম ঘট করিয়াছে কিন্তু কোনরূপ অশান্তির সূচনা হয় নাই ।...বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয় ।

২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল । প্রিন্স ইরানুর মৃত্যু হয় ।

২৯শে চৈত্র ১২ই এপ্রিল সোমালী প্রদেশ হইতে মোল্লার পলায়ন সংবাদ আসে ।...আলজে-বিয়ার পতর্গর জেনারেল রিভরই পদত্যাগ করেন ।

নবপ্রভা ।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, জৈষ্ঠ, ১৩১০ মাল ।

[৪র্থ সংখ্যা ।

কংগ্রেস ও দরবার ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

Madras, June 9.

The Industrial Exhibition to be held in connection with the National Congress in Madras this year is receiving a good deal of influential support. Lord Ampthill, in addition to a donation of Rs. 300 already announced, is lending a collection of wood carvings. The Hon'ble Messrs. Thomson and Forbes, members of the Madras Government, have given donations, and other officials, European and native, are actively showing sympathy with the movement.

(Telegram—The Statesman, 10-6 03).

আমি কংগ্রেস ও দরবার সম্বন্ধে নবপ্রভার ২ খণ্ডে ১২শ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া আমার কংগ্রেসভূক্ত বন্ধুগণ এইবার আমার উপর বিরক্ত হন নাই, তাহাতে আমি আশ্বাসিত হইয়াছি । একখানি কংগ্রেসপোষক সংবাদপত্রের সুদক্ষ ও সুশীল সম্পাদক উক্ত প্রবন্ধকে সমধিক চিন্তাশীল ও সুবীর সমালোচনা (very thoughtful and sober criticism) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাতে আমি এই মনে করি যে, চিন্তাশীল কংগ্রেস-বান্ধীগণ, কেবলমাত্র “ভিক্ষাং দেহি” চীৎকার দ্বারা দেশের যে উন্নতি হইবে

না তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন । ইহাতে আমার মনে আশা হয় যে, যদিও আমাদের মতামত ও যুক্তি আপাততঃ কংগ্রেস পোষক বন্ধুদিগের মতামতের ও কার্যের বিরোধী হইতে পারে, তথাপি দীর্ঘভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিতেছেন ও বুঝিবেন যে আমরা কংগ্রেস-বিদেষ্টা নহি, আমরা কংগ্রেস-সংস্কার-প্রয়াসী । রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারে, দুই নোসেনাদল পরস্পরের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিল । পরে উষার উন্মেষে, উভয় পক্ষের জাহাজের মাঝুলে একই স্বজাতীয় ধ্বজা উড্ডীন দেখিতে পাইল— তখন বুঝিল, তাহারা উভয়েই একই দেশের সৈন্য, একই রাজার অধীন, একই স্বার্থে আবদ্ধ—তখন উভয় দলের সৈন্যগণ, ভ্রাতৃত্বজাতরূপে ক্ষান্ত দিয়া, পরস্পরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিল । আমরা উভয়দলই একই দেশের সৈন্য, একই জাতীয় পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান, একই স্বার্থে দৃঢ়বদ্ধ । যদি কখন আমরা পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করি, তাহা ভ্রমের অন্ধকারে ।

আমি নবপ্রভার ১ম খণ্ডের ৫৪৪ পৃঃ “কংগ্রেস (হর্ষ না বিষাদ)” নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা অতিশয় দুঃখে । স্মরণ্য তাহার ভাষা তিক্ত হইয়াছিল । আমার অনেক আত্মীয় ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করিয়া কেহ বা বিরক্ত, কেহ বা আমার ক্ষণ দুঃখিত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা আমাকে দুই একটি কঠিন কথাও বলিয়া-ছিলেন । এমন কি নবপ্রভার অন্ততর সম্পাদক—যিনি বহুকাল হইতে কংগ্রেসের একজন উৎসাহী “ডেলিগেট”—তিনিও আমার প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ; তজ্জন্ত আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যথা লাগিয়াছিল । আমি তাঁহাকে ও আমার অন্তান্ত বন্ধুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে আমি বিদ্রোহবশতঃ কিছু লিখি নাই । আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা সরল বিশ্বাস ও গভীর দুঃখের সহিত লিখিয়াছি । কংগ্রেসের একজন প্রধান-নেতা সুরেন্দ্রবাবু । তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি । তাঁহার নানাবিধ গুণে যেমন অনেকে মুগ্ধ, আমিও তেমনি মুগ্ধ, এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা আমি আমার জীবনের একটি সৌভাগ্য বিবেচনা করি । মহাত্মা দাদাভাই নায়রজির রাজ-নৈতিক প্রচার-কার্য আমি বাল্যকাল হইতে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পর্যা-বেক্ষণ করিয়া আসিতেছি । শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র । এতদ্বিধ কংগ্রেসে অনেক ভাল লেখক আছেন । তথাপি আমা-

দিগের দেশের বর্তমান সমস্যাগুলি এমন গুরুতর যে, কোনও পন্থা অবলম্বন
 করিবার পূর্বে, দেশের অবস্থা, শাসকদিগের মনের গতি, আমাদের নেতারা
 এতাবৎকাল যে পথে চলিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ
 সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা, অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, বর্তমান সময়ে
 জাতীয় কার্যের বা আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন কি না, তাহা
 স্বাধীন ও প্রশান্ত চিত্তে সকলেরই আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। দেশের
 চারি পাচ জনের হস্তে চিন্তার ভার অর্পণ করিলে আমাদের কর্তব্য কার্যের
 সাধন হইবে না। যদি আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রতিনিধি বলিয়া
 বিবেচনা করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের নিজের মতামত থাকা
 আবশ্যক। কেননা, তাঁহাদিগের নিজের মতামত নাই, প্রকৃত কথা
 বলিতে হইলে, তাঁহাদিগের কেহ প্রতিনিধি হইতে পারে না আর
 যাহারা নিজে বিচার না করিয়া অন্তের মতে চলিয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে
 তাঁহাদিগের কোনও মতামত নাই সুতরাং বর্ষে বর্ষে বিরাট্ মণ্ডপে
 সম্মিলিত হইয়া, বাগ্মীর সুললিত পদবিন্যাস-প্রবাহের উচ্চাসে গা ঢালিয়া
 দিয়া, করতালি দ্বারা কোন মন্তব্যের অনুমোদন করিবার পূর্বে, এই সকল
 বার্ষিক মন্তব্য-প্রকাশে কি ফল হইতেছে বা হইতে পারে, তাহা বিশেষ আগ্র-
 হের সহিত স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই স্থির-আলোচনায়
 এই প্রশান্ত চিন্তার আমরা যাহা বুঝিতে পারি, যে বিষয়ে আমাদের সংশয়
 হয়, তাহা আমাদের নেতাগণের নিকট সম্মুখানে নিবেদন করা উচিত—
 যদি আমরা বুঝি যে, বঙ্গুতা যতই ভাল হউক না কেন, কেবল তাহাতে
 • ভারতবাসীর মোক্ষলাভ হইবে না—কেবল সম্মিলিত স্বাধীনতাতে কোন জাতির
 • উন্নতি হয় নাই—যদি আমরা অনুভব করি আশ্চর্য্যে স্বাবলম্বনই জাতীয় উন্ন-
 তির প্রাণ—তাহা হইলে নেতাগণকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যে, আপনারা
 যদি বঙ্গুতা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন, কেবল ভিক্ষার পাণ্ডুলিপি রচনা বা স্বাক্ষর
 করিয়া স্বদেশপ্রেমিকতার কার্য সম্পাদিত হইল বিবেচনা করেন—তাহা হইলে
 আপনারা আপনার প্রতিভা, অনুকরণে বা অভিনয়-ক্রিয়ায় চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে
 যতটুকু সমর্থ হউক না কেন, আপনারা জাতীয় বিকাশের নেতা হইবার যোগ্য
 নহেন। যে প্রচণ্ড ইংরাজ শক্তি, মূর্তি গ্রহণ করিয়া দরবারে, সেদিন তোমা-
 দিগের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তির নিকট তোমাদিগের
 বাক্যবীৰ্য্য কার্য-দুর্কলাস্রক আবেদন পত্র লইয়া উপেক্ষিত ও উপহসিত ও

ঘৃণিত হইবার জন্ত যাইও না । শাসকদিগের চক্ষে আমাদের ঘৃণিত জাতীয় জীবনকে অধিকতর ঘৃণিত করিও না । কংগ্রেস, শ্রমের সহিত, অপাবসায়ের সহিত, আত্মনির্ভরের সহিত, আত্মতাগের সহিত, শূণ্যবাক্যানিনাদ পরিত্যাগ করিয়া, একবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করুক, শাসকদিগের দরবার তাহাকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবে না ।

আত্মনির্ভরের কথা কংগ্রেস এতদিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন । গত ছুট বৎসর হইতে কংগ্রেস তাহা গুণিতেছেন । আশা হয়, ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, আত্মনির্ভরের উপর দণ্ডায়মান হইবেন । এক্ষণে যেন সেই বিরাটমন্ডার সম্মিলিত হৃদয়, ধীরে ধীরে স্বাবলম্বনের দিকে চালিত হইতেছে—আন্তে আন্তে সেই বিরাটমণ্ডপে নবালোকের আভা ফুটিতেছে, অক্লণোদয়ের পূর্বে যেমন পূর্বগগন আন্তে আন্তে সিন্দুররাগে রঞ্জিত হইয়া ভাস্করের পূর্ণপ্রভার পূর্বসূচনা করে, তেমনি শিল্পকংগ্রেসে যেন পূর্ণ আত্মনির্ভরের আলোক ও পূর্ণপ্রতিভার পূর্বসূচনা যেন দেখিতেছি—এক্ষণে ইহা অক্ষুট, সত্য ; কালে যে স্বাবলম্বন মহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা, বিশাল ভারত-ভূমির উপর একদিন প্রসারিত হইয়া, তাহার তাপিত দেহ ও শ্রাণে সূক্ষীতল ছায়া দান করিবে, বুঝি বা তাহার বীজ শিল্পকংগ্রেসে বপন করা হইল । বুঝি বা স্বদেশিগণ বাহা ইংরাজ “কাপুরুষের বৃথা আর্ন্তনাদ” বলিয়া ঘৃণা করে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, নীরবে দৃঢ়চিত্তে স্বকীয় বলবিকাশের চেষ্টার জন্ত উদ্যোগী হইলেন—স্বকীয় বলবিকাশে অনশন মৃত্যু হইতে স্বদেশীর শ্রাণ রক্ষার জন্ত বন্ধপরিকর হইলেন—বুঝি বা অদঃপতিত জাতীয়জীবনে, পুনরুত্থানের উদ্দেশে, অবশেষে কার্য্যময় নবযুগের প্রবর্তন হইল ।

আমি আশা করি এক্ষণকার রাজনৈতিক কংগ্রেস, কৃষি-শিল্প-কংগ্রেসে পরিণত হইবে । এক্ষণে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইতেছে । তাহার পর কেবল পদক দিয়া প্রদর্শনী ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না । তখন পদকের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করিবেন । তখন বক্তৃতা বরন করিবার জন্ত হস্তচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ আনাইয়া দিবেন । তাহার পর, এই বস্তুগুলি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্ত, শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন ।

তৎপরে, স্বদেশের উত্তম পণ্যদ্রব্য সাচ্ছাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন । তখন কংগ্রেস একটা বিপুল মহামেলার কার্য্য

কবিবে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তাহাতে বিক্রয় হইবে । কংগ্রেসে নানাদিগদেশ হইতে সজ্জতিসম্পন্ন লোক আগমন করেন । তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে দ্রব্য ক্রয় করিবেন, তিনি স্বপ্রদেশে বা স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার প্রদেশের, বা তাঁহার গ্রামের অনেক লোক তাহা দেখিতে পাইবে । এইরূপে প্রদর্শনা একটি বিরাট বিজ্ঞাপন-বস্তুর কার্য করিবে । দ্রব্যগুলি ভাল হইলে অনেক স্থানে তাহা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা ।

প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইবে । বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট প্রश्নের দ্বারা কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল তথ্যের সমালোচনা করাইয়া, পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হইবে । এই সমালোচনাতে কার্যকুশল উদ্ভাবনা থাকিবে । প্রত্যেক জেলাতে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের জন্য একটি উপযুক্ত কর্মী প্রদর্শনীভুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে । সমুদয় বৎসর তিনি যে যে তথ্য সংগ্রহ করিবেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রদর্শনীর কমিটির হস্তে দিবেন ; কমিটি প্রত্যেক জেলার বিবরণী হইতে সারোদ্ধার করিয়া একটি সাধারণ বিবরণী, প্রদর্শনীর অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত করিবেন । এই সাধারণ বিবরণী প্রদর্শনীতে বিতরিত হইবে । এবং বাগ্মীগণ, সংগৃহীত তথ্যের মন্ত, ভারতবাসিগণের জীবনোপায়, তাহার ব্যবহার-প্রাণ-কবিত্ব, মনোমোহিনী চমৎকারিণী উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রচার করিবেন । তখন বাগ্মীগণ বিদেশীয় শাসনকর্তাদিগের শাসনপ্রণালীর দুর্বলস্থান আক্রমণ না করিয়া, স্বদেশীয়গণের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অালস্য, নিশ্চেষ্টতা আক্রমণ করিবেন, স্বদেশীয়গণের হৃদয়ে স্বাভাবিকের নূতন অদম্য অমোঘ বল, বাগ্মিতাত্ত্বিত-প্রবাহে, ঢালিয়া দিবেন ।

গবর্ণমেন্ট আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখেন আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই সে সংবাদ রাখি না । প্রত্যেক পরগণা ও গ্রাম সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট তন্ন তন্ন করিয়া যে তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, গ্রামের জমিদার এবং তহসিলদারগণও তাহার অধিকাংশই অবগত নহেন । আমি আমার অধীন একজন জমিদারি-পরিদর্শক বুদ্ধিমান কর্মচারীকে কয়েকটি গ্রামের বিষয় কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বলিয়াছিলাম । তিনি উত্তর করিলেন যে Hunter's Statistical Account নামক গ্রন্থে আপনার

প্রশ্নের অনেকগুলির উত্তর পাওয়া যাইতে পারে । আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা এই তথ্য-গুলি সংগ্রহ করিতে চাহি । একটি “তরফের” তহশীলদার সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি ঐ তরফে দ্বাদশ বৎসর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করাতে দেখিলাম যে, তিনি প্রায় কিছুই ঠিক বলিতে পারেন না । তাঁহার সঙ্গে দুইজন মাতব্বর প্রজা ছিল । তাহারা অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিল । অনেক সুশিক্ষিত জমিদার কংগ্রেস বা প্রদর্শিনীতে যোগ দিতেছেন তাহা স্মৃতির বিষয় । তাঁহারা যদি নিজের জমিদারির প্রজা, ভূমি, কসন, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি নানা বিষয় বহুজ্ঞাতব্য তথ্যসংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের মহাফেজখানায় রাখেন, এবং সংগৃহীত বিবরণী আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের জমিদারীর ও প্রজার অবনতি বা উন্নতি হইতেছে, এবং কি হইলে উন্নতি হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার চেষ্টা করেন, এবং যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা যদি প্রদর্শিনী বা কংগ্রেস কমিটির হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা দেশের অনেকটা উপকার করিতে পারেন, এবং অনেক তথ্যও সহজে সংগৃহীত হইতে পারে । কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশের প্রজাগণের, অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন লোকের, অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ । অতএব তাঁহারা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিস্তৃত বক্তৃতা করিতে বা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিপিতে সকল সময়ই প্রস্তুত । সুতরাং আমাদের স্বদেশপ্রেমিকতা অনেক সময় স্বদেশীয় অনভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত । এই অনভিজ্ঞতা দূর করা প্রদর্শিনী বা কংগ্রেসের একটি প্রধান কর্তব্য ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রাজনৈতিক কংগ্রেস ক্রমে কৃষি-শিল্প-কংগ্রেসে পরিণত হইবে । তাহার পর কৃষি শিল্প-কংগ্রেস শিল্পী-ও-কৃষক-শিক্ষা-কংগ্রেসে বিকশিত হইবে । তৎপরে কংগ্রেস দেখিবেন শিল্প ও কৃষি বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব একটু সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক । সংক্ষেপে, কংগ্রেস ক্রমে বুঝিবেন যে লোকশিক্ষা—এমন শিক্ষা যাহাতে অন্ধের চক্ষু ফুটে, শিল্পী ও কৃষক নবাবিস্কৃত বিজ্ঞানের উপকার লাভ করে, এবং সাধারণ লোকের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সুগম হয়—স্বার্থপর স্বার্থভাগ করিতে শিক্ষা করে—ভীকর সাহস হয়, দুর্ব্বলের শক্তি হয়, চরিত্র বিপুল হয়, প্রীতি বর্দ্ধিত হয়—এমন এমন লোকশিক্ষা জাতীয় জীবনের একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশা । তখন কংগ্রেস জাতীয় জ্ঞানমন্দির রূপে পরিণত হইবে ।

সে শুভদিন শীঘ্র আনয়ন করিবার জন্য, আমরাদিগের সম্মিলিত জাতীয় কার্যে যাহাতে আরও একটু সরলতা প্রবেশ করে তাহা করা আবশ্যিক । আমরা দেশের উন্নতি উন্নতি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিব ! অশচ যখনই আমরাদিগের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর একটু হাত পড়িবে, তখনই দেশের সাধারণ লোকের মঙ্গলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শাসকদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিব ? ইহাতে শাসকগণ আমরাদিগের অদেহহিতৈষিতা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন ।

“দরবার” যেমন আমরাদিগকে জড় শক্তির একটা দেদোপ্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তেমনি কংগ্রেসকে স্বার্থত্যাগের একটা জলন্ত প্রমাণ দেখাতে হইবে । দরবার, সেনা-সঙ্গিন-গোলাগুলি-জড়শক্তির মূর্তি । কংগ্রেস করুণা-দয়া-ধর্ম-স্বার্থত্যাগ সম্বলিত প্রশান্ত-ঐক্য-ধর্মশক্তির মূর্তি হইবে । শুনা যায় পরাজিত গ্রীস তাহার সাহিত্য ও শিল্পে জেতা রোমকে সভা করিয়াছিল । আমরা আশা করি, কংগ্রেস হিন্দুর পবিত্র স্বার্থত্যাগ-পরহিত-ব্রত, সদমুষ্ঠানময় ধর্ম ইংরাজকে শিখাইয়া আরও সভা, শাস্ত, ও ধর্মপরায়ণ করিবেন । তখন “কংগ্রেসে”র নিকট “দরবার” দয়াদর্শী শিক্ষা করিবে । এবং দরবারের নিকট কংগ্রেস জড়শক্তি লাভ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে । তখন জিত ও জেতা, উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখিবে । তখন জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব পবিত্র অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে ।

কংগ্রেসের ক্রমবিকাশ

১ । প্রথমে কংগ্রেস রাজনৈতিক মহাসম্মিলনী । ২ । তৎপরে জাতীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী । ৩ । তৎপরে জাতীয় জ্ঞানমন্দির । ৪ । তৎপরে জাতীয় ধর্ম মন্দির । ৫ । তৎপরে জেতা জিত, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, ইংরাজ ও ভারতবাসী, ভ্রাতৃত্বাবে সম্মিলিত হইবে ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ।

প্রবাসী ।

কে তুই রে দেবশিশু, পথ-ভ্রমে ভুলে
এসেছিলি ছাশিনীর কোলে
না মিটাতে, হৃদয়ের, অনন্ত স্নেহের ক্ষুধা
অনায়াসে ফেলে গেলি চলে ।
এখনে, যে শূন্য গৃহে, তুই সে সুন্দর মুণে,
দেখিতেছি হাসি স্নমধুর,
এখনও ভাঙ্গা প্রাণে, মিষ্ট মা মা সম্বোধনে,
ডাকিস রে অতি দূর—দূর— !
একদিনো অবতনে, কারো কাছে কোন খানে,
রাখি নাই মুহূর্তেক তরে,
আজি নিরাপদ হয়ে অনন্তেতে মিশাইয়ে,
হানিতেছ স্বরগ উপরে ।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী ।

হোমগি ।

[পূজনীয়া শ্রীমতী মোহিনী দেবীর “স্মৃতি” শীর্ষক কবিতা * পাঠ করিয়া
লিখিত । নবপ্রভা ১ম খণ্ড, ১৫২পৃঃ দ্রষ্টব্য]

কি মন্ত শুনাতে আজি, বিশ্ববিমোহিনি,
অগ্নি বাহকরী কবি ? একি শোকগাথা ?
এ তো নহে বিষ—এ যে সুখা নির্ঝরিনী
চন্দন প্রলেপে যেন জুড়াইলে ব্যথা !
দীপ্তমণি-শিখা মাঝে পড়ে গো যেমতি
পতঙ্গ অনল ভ্রমে অপূর্ণ হরষে ; •

* আত্মকলিকার কবিতা বাহা সচরাচর প্রকাশিত হয় তাহাতে কেমন এক morbid
pessimism এর ভাব আছে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, প্রাণকে অবসাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ।
শ্রীমতী মোহিনী দেবীর কবিতায় এ দোষ আদর্শে নাই । এই মন্ত ইত্যাদি শুন্দর, এত প্রীতি-
দায়িনী ।—লেখক ।

তবু নাহি হয় দগ্ধ ;—আমিও তেমতি
তোমার ও কবিতার জলন্ত পরশে !
হে সুন্দর শিকাদাত্রি ! কি অপূৰ্ণ শিকা
পাইলাম—পাইলাম দিব্যচক্ষু আজি !
(শুক্রমন্ত্রে শিষ্য যথা পেয়ে নবদীক্ষা
লভে গো দ্বিজদ্ব চাক) একি ভোজনাজী !
বুঝিয়াছি “লোলজিহ্বা দীপ্ত হঃখানল
নহে, নহে চিতা—শূল হোমাগ্নি উজ্জল !”

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

কুস্ত মেলা ।

রাশির মধ্যে কুস্তরাশি * যেমন, মেলার মধ্যে কুস্তমেলাও তরুণ ; অপচ
এতাদৃশ ভারতপ্রসিদ্ধ এই কুস্ত মেলার কথা কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায়
না । সুতরাং এ মেলার আবির্ভাব কোথা হইতে ইহা অনেকেই অবগত
নহেন । অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই প্রকাশ
করিলাম ।

১২ বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরীতীর ও অবন্তিক
এই ৪ স্থানে কুস্তমেলা হয় । কুস্তমেলার ঋতু ঋতু কোন মেলাতেই একরূপ সাধু
সমাগম হয় না । কত সাধু সন্ন্যাসী বে এই মেলাতে আসেন তাহার ইয়ত্তা
করা যায় না । একরূপ সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিয়া ইহা তাঁহাদিগেরই মেলা,
এক প্রকার সন্ন্যাসী কংগ্রেস, ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন । কেহ কেহ মনে
করেন, “ফ্রী মেসনস” (Free Masons) বেক্রপে গূঢ় ভাবে কার্য ও ব্যবস্থা করিয়া
থাকেন সমুদয় সন্ন্যাসিগণও তেমনি গূঢ়ভাবে কার্য ও ব্যবস্থা করিয়া
থাকেন । যদিও সন্ন্যাসিগণ আপাততঃ দেখিতে বিক্ষিপ্ত তথাপি তাহারা
পরস্পরের সহিত দৃঢ় সংবন্ধ । বার বৎসর অন্তর, সমুদয় সাধু-সন্ন্যাসি-সমা-
জের কিসে মঙ্গল হইতে পারে, তাহা গূঢ় ভাবে এই কুস্তমেলার আলোচিত ও
স্থিরীকৃত হয় । এই মেলায় বাইলে অনেক প্রকৃত সাধুর দর্শন পাওয়া
যায় ।

* কুস্ত রাশিতে বাহার জন্ম সে ব্যক্তি চতুর, মেধাবী, হস্তি খোটকাদি ধনসম্পন্ন হয় ।

প্রবাদ আছে যে এই মেলা সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত । যখন শঙ্করাচার্য্য দেখিলেন মানবগণ অনেকই নাস্তিক পথের পথিক হইতেছে তখন তিনি দয়াবিগলিত চিত্তে সনাতন ধর্ম্ম ও সদাচার প্রচার পূর্ব্বক বাহাতে উৎপথ প্রবৃত্ত জন সাধারণকে উদ্ধার করিতে পারেন ও নাস্তিক জনের কুতর্ক কুস্খটিকা অপসারিত করিয়া সনাতন ধর্ম্ম মার্গকে প্রকাশিত করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বহুপরিকর হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেন এবং অভিনব মত জাল ছিন্ন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন ; তৎকালে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার একছত্র আধিপত্য । তদানীং অনেকই সংসার মায়্যা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, এমন কি বহুর প্রাবনের জায় দিন দিন তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ! তাহা দেখিয়া শাস্ত্র দান্ত ধীরবুদ্ধি পরিব্রাজকাচার্য্য চিন্তা করিলেন যেক্রপ ক্রমণঃ শিষ্যবৃদ্ধি হইতেছে, ইহারা সকলে অতিথি হইলে সাধারণ গৃহস্থের কণা দূরে থাকুক, রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত সৎকার করিতে অক্ষম হইবেন, আর বাহারা সক্ষম, তাদৃশ ধনিসংখ্যাও অধিক নহে । এই-রূপ পর্যালোচনা করিয়া তিনি শিষ্যগণকে আহ্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমরা এক স্থানে থাকিও না, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচরণ কর ; তাঁহার আদেশ শ্রবণে পরমভক্ত শিষ্যবর্গ বিনয়কাতর বচনে বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু আমরা ঐ চরণে আশ্রয়মর্পণ করিয়াছি, আপনার অদর্শন হুঃখ আমাদিগের সর্ব্বথা অসহ্য হইয়া উঠিবে, অতএব আমাদিগের এক সময় নির্দেশ করুন বাহাতে আমরা সকলে সমবেত হইয়া শ্রীচরণ দর্শনে কৃতার্থ হই ।” শিষ্যবৃন্দের প্রার্থনার শ্রীমদাচার্য্য স্বামী অনুমতি করিলেন, তোমরা তিন বৎসর অন্তর সকলে একত্র সমবেত হইবে, এবং ঐ সমাগম উপলক্ষে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরী ও অবন্তিকায় কুস্তমেলা নামে এক অপূর্ব্ব সাধু সমাগম হইবে । তদবধিই ঐ পর্ব্বের প্রচলন । শঙ্করাচার্য্য সেবকগণ ঐ পর্ব্বকে কুস্তভূমিও বলিয়া থাকেন ।

প্রাচীন বিষ্ণুবাগ গ্রন্থে ইহার পৌরাণিক কথা আছে । নিম্নে তাহা উল্লেখ করিলাম ।*

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কণশৌৎপতিমুত্তমান্ ।

উত্তরে হিমবৎ পার্শ্বে ক্ষৌরোদ্রো নাম সাগরঃ ॥

* এ বিষয় সম্বন্ধে বৃদ্ধান্ত বৃন্দাবনের শ্রীভৃগুদত্ত শর্মা কৃত কুস্ত পর্ব্ব ব্যবহার আছে ।

আরকং মন্থনং তত্র দেব দানব পূর্বকৈঃ ।
 মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বাতু বাসুকিম্ ॥
 মূলে কুর্শ্বন্ত সংস্থাপ্য বিষ্ণোর্কাহু চ মন্দরম্ ।
 মধ্যমানে তদা তস্মিন্ ক্ষীরোদসাগরোত্তমে ॥
 কলসচ্চ সমুৎপন্নো ধন্বন্তরি করোল্লসন্ ।
 মুখাস্তং সুধয়া পূর্ণঃ সর্কেষাক্ষ মনোহরঃ ॥
 দৃষ্টো তু তৎক্ষণাদেব মহাবল পরাক্রমঃ ।
 জয়ন্তোহমৃতমাদায় গতো দেব প্রচোদিতঃ ।
 দেবকর্শ সমালোচ্য দৈত্যাঃ শুক্রেণসূচিতাঃ ।
 জগ্মুস্তত্পৃষ্ঠতো লগ্না ভীতঃ সোহপি পলায়িতঃ ॥

ইত্যাদি—বিষ্ণুযোগ গ্রন্থে—

বাহলা ভয়ে সমস্ত উদ্ধারে বিরত হওয়া গেল । তাৎপর্য্য এই—
 “হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র, মন্দর পর্বত লইয়া দেবদানবগণ
 সেই সমুদ্র মন্থন করিলে ধন্বন্তরি অমৃত কলস লইয়া উথিত হন ।
 ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত সেই অমৃত লইয়া পলায়নোন্মুখ হইলে দেবে দৈত্যে সংগ্রাম
 বাধে । বিবাদ করিতে করিতে সেট অমৃতকুস্ত দেবগণের হস্তচ্যুত হইয়া
 মর্ত্যালোকে পতিত হয় । যে যে স্থলে পতিত হইয়াছিল, সেট সেই স্থানে
 পর্ব হইয়া থাকে । চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি ও শনি মিলিয়া সেট কুস্ত রক্ষা করেন,
 এইজন্ত যে বৎসর সূর্য্য চন্দ্র বৃহস্পতি সংযোগ হয় সেট সেই বৎসরে সেট সেই
 নির্দিষ্ট প্রদেশে কুস্তযোগ হয় * । আমাদের বৎসরে দেবতাদিগের একদিন,
 স্তুরাং আমাদের দ্বাদশ বৎসরে দেবতাদিগের দ্বাদশ দিন হয় । অতএব ১২টি
 কুস্ত পর্বই হইয়া থাকে । তন্মধ্যে চারি স্থলে সুধাকুস্ত নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া
 পৃথিবীতে চারিটি মাত্র কুস্তযোগ হয়—ঐ গ্রন্থেই প্রমাণ মণা—

- পৃথিব্যাং কুস্তযোগস্ত চতুর্কা ভেদ উচ্যতে :
- চতুঃস্থলে নিপতনাং সুধাকুস্তস্ত ভারত ॥ ইত্যাদি
- কোন সময় হরিদ্বারে কুস্তযোগের সম্ভাবনা ?
- পদ্মিনী নীরকে। মেঘে কুস্তরাশি গতো শুক্লঃ ।
- গঙ্গা দ্বারে ভবেদ্ যোগঃ কুস্তনামা তদৌত্তমঃ ॥

* মূলে না থাকিলেও শনিও যোগকারক ইহা অনুসরণ, কারণ শনিও সুধাকলস রক্ষাকালে
 সহায় ছিলেন ।

কুস্তরাশিঃ গতে জীবে যদি মেষগেরবৌ ।

হরিদ্বারে কৃতং শ্রানং পুনরাবৃষ্টিবজ্জিতম্ ॥

সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করিলে যদি বৃহস্পতি কুস্তরাশিতে থাকেন তাহা হইলে হরিদ্বারে কুস্তযোগ হয় (বচনাস্তরে—মেঘসংক্রম দিন বলিয়া উল্লেখ আছে) ঐ যোগে তথায় গঙ্গাস্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না । হরিদ্বারের কুস্তযোগেই কুস্তরাশির কথা আছে অন্তত নাই । অনেকেই মনে করেন কুস্তযোগ কুস্তরাশিতে হয় অর্থাৎ কাঙ্ক্ষন মাসে হয়—তাহা ভ্রমসংস্কার । উল্লিখিত যোগ ১২ বৎসর অন্তরই হয় । কারণ বৃহস্পতির পুনরায় কুস্তে আসিতে ১২ বৎসরের অগ্রে হয় না । এই ১৩১০ সালে—কুস্তে বৃহস্পতি—এই চন্দ্র বৈশাখ মাসে কুস্তমেলা হরিদ্বারে হইয়া গিয়াছে ।

প্রয়াগের কুস্তমেলার কাল,—

মাঘে মেষগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ ।

অমাবস্তা বদা যোগঃ কুস্তাখ্য স্তীর্থনারকে ॥

মাঘ মাসের অমাবস্তাতে মেঘে বৃহস্পতি ও মকরে রবি ও চন্দ্র থাকিলে তীর্গশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে কুস্তমেলা হয় ।

ধারায় কুস্তমেলা কোন্ সময় হয় ?—

ধারায় (In Dhar) মেলার কাল কার্তিক মাস ; ঐ কার্তিক মাসে যে বৎসর অমাবস্তা তিথিতে কুস্তে চন্দ্র ও শনি থাকে সেই বৎসর ধারায় কুস্তযোগ ।

প্রমাণ—

ঘটে সৌরিঃ শশী সূর্য্যঃ কুহ্বাং দামোদরে বদা ।

ধারায়ান্ত তদা কুস্তো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥

গোদাবরীতে কুস্তমেলার সময়,—

রবি কর্কট রাশিস্থ হইলে (শ্রাবণ মাসে) যে বৎসর ঐ কর্কটেই বৃহস্পতি ও চন্দ্র থাকিবেন এবং ঐ যোগ যদি অমাবস্তার দিনে হয় তবেই গোদাবরীতে কুস্তযোগ হয় ।

প্রমাণ—

কর্কে শুক্র শুখা ভানু শচ্দ্র শচ্দ্র ক্ষয়শুখা ।

গোদাবরীয়াং তদা কুস্তো জায়তে হবনিমগ্নুলে ॥

এ সমস্ত প্রমাণই বিক্ষুণ্ণ প্রমাণ ।

কুস্তমেলার কুস্তরাশির যোগকারকতা (influence) কেবল হরিদ্বার ও দারিতেই আছে । সুতরাং রাশি অনুসারে মেলার নাম প্রযুক্তি ইহা বলা যায় না ; সুবাকুস্তেব নামেই হইয়াছে ইহা উপলব্ধি হয় ।

ভট্টনৈক সংস্কৃতাবাপক ।

বিদ্যুষ্ণী আনন্দময়ী । *

প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে সাক্ষরতার পূর্বে বঙ্গীয় অস্ত্রপুত্র শিকার আলোকরশ্মি স্তিমিত ছিল না । বস্তুতঃ সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইলে অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সৌমস্তিনোগণও যে পুরুষদিগের সমকক্ষভাবে সরস্বতীর প্রনাদ-লাভে সম্পূর্ণ উপযুক্তা তাহা বিদ্যুষ্ণী আনন্দময়ী দেবীর রচনা পারিপাট্য হইতেই বিশেষরূপ উপলব্ধি হয় । আনন্দময়ীর রচনার শব্দ বৈজ্ঞব ও পাণ্ডিত্য সন্দর্শনে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের “বি, এ—এম্ এ” উপাধিধারিণী মহিলাগণ অপেক্ষা কোনও অংশেই নূন বলিয়া অনুমিত হয় না : ইতিপূর্বে ‘ভারতীতে’ ও দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” আনন্দময়ীর রচনার আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে । আমি কবির পরিচয় দিয়া, তাঁহার রচনারাজি সংগ্রহ করিয়া, নিম্নতরূপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য পৈত্রিক আবাসভূমি ইটনা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক বিক্রমপুরে আগমন করেন । তিনি বিলদায়নৌয়া (রাজনগর), জপসা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া নিবাস স্থাপন করেন । ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর । যে শাখায় রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর গোপীরমণ সেন একজন সোভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন । গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম নবাব সরকারের চান্দপ্রতাপ পরগণার রাজস্ব আদায় করিতেন । কৃষ্ণরামের পুত্র রামপ্রসাদ, তৎপুত্র রামগতি আনন্দময়ী এই রামগতি সেনেরই কন্যা । আনন্দময়ীর মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী । রামগতি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ও সুকবি ছিলেন । তিনি তদীয় কন্যার শিক্ষার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

* এই প্রবন্ধটি Dacca Wellington Institute-এ পঠিত হইয়াছিল ।

১৭৫২ খৃঃ অন্ধে জঙ্গা গ্রামে রামগতি সেন এই কল্পা রত্ন লাভ করেন ।
১৭৬১ খৃঃ অন্ধে নবম বর্ষ বয়সে পরোগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীয় রূপরাম
কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম কবীন্দ্রের সঙ্গে আনন্দময়ীর শুভপরিণয় কার্য
সমাপ্ত হইয়াছে । অযোধ্যারাম সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু পক্ষীর
বিদ্যাবস্তার খ্যাতিতে তাঁহার মন নিমগ্ন হইয়াছিল । আনন্দময়ীর খুলতাত,
রামপ্রসাদের অপর পুত্র জয়নারায়ণ সেন হরিলীলা, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ
প্রণয়ন করেন । তাহাতে উল্লিখিত আছে ১৭৭২ খৃঃ অন্ধে তিনি হরিলীলা
গ্রন্থ রচনা করেন ও তদীয় বিদ্বদ্বা ভ্রাতৃপুত্রী এই গ্রন্থ রচনার তাঁহাকে বিশেষ
সাহায্য করেন ।

আনন্দময়ীর বিদ্যাবস্তা সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত আছে ;—রাজনগর
নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে
সংস্কৃত শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট
হওয়াতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী
বলিয়া মিষ্ট ভৎসনা করিতে ক্রটি করেন নাই ।

রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি
সেনের নিকট পত্র লিখেন, কিন্তু সেই সময়ে রামগতি পুরস্চরণে ব্যাপৃত থাকায়
নিজে পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ ছিলেন । আনন্দ-
ময়ীর পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল, সুতরাং আনন্দময়ীকেই
উক্ত কার্যের ভার অর্পণ করিয়া নির্ভীক রহিলেন । যথা সময়ে আনন্দময়ী
সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন । পরে রাজসভায়
এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর
বিদ্যাবস্তা কাহারো অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাপতি পণ্ডিত কৃষ্ণদেব
বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন । আনন্দময়ীর রচনা হইতে
আমরা যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব তাহাতে তাঁহাদেরও
অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ থাকিবে না ।

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী
লিখিয়া দিয়াছিলেন—

“জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম ।

ধর্মাকৃতি বৃন্দদেব কঙ্কি সে বিরাম” ॥

অতি সংক্ষেপে ভগবানের দশরূপ বর্ণনা আনন্দময়ী বাণীত অত্র কোনও কবি

করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । এই প্রসঙ্গে কথিত আছে, একদিন জয়নারায়ণ কাব্যরচনায় এরূপ দৃঢ় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে বেলা দ্বিতীয়প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তদীয় কাব্য পিপাসার বিরাম হইতেছে না দর্শন করিয়া, আনন্দময়ী খুল্লতাতকে স্নানাগার করিতে অনুরোধ করেন । জয়নারায়ণ ভ্রাতৃপুত্রীর নিকট কিছুই গোপন করিতেন না । তিনি বলিলেন, আর অতি অল্পই বাকী আছে, ভগবানের দশ অবতার সংক্ষেপে বর্ণন হইলেই উঠিতে পারি । কিন্তু ভ্রাতৃপুত্রীর একান্ত অনুরোধে নিজ সমস্ত রক্ষা করিতে পারি-
গেন না ! তিনি অবিলম্বে স্নানের জন্য চলিয়া গেলে আনন্দময়ী উপরিউক্ত দুইটি পদ যোজনা করিয়া দেন ।

আমরা ঠিকাপূর্ব্বক লিখিয়াছি যে ‘হরিলীলা’ গ্রন্থ প্রণয়নে আনন্দ-
ময়ী খুল্লতাতকে বিশেষ সহায়তা করেন ; নিম্নে ‘হরিলীলা’ হইতে
আনন্দময়ীর রচনার একটু আভাস পাঠকবর্গকে দিতেছি । সদাগর পুত্র
চন্দ্রভানের সহিত স্নেতার বাসবিবাহ উপলক্ষে কবি কি লিখিয়াছেন
দেখুন,—

“হের চৌদিকে কামিনী লক্ষ লক্ষ ।

সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥

কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজস্তি ।

হসন্তি, ঝলন্তি, জ্বলন্তি, পতন্তি ॥

কত চাক্রবক্তা, সুবেশা, সুকেশা :

সুনাশা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা ॥

কত ক্ষৌণমধ্যা, সুভাঙ্গা সুযোগ্যা ।

রতিজ্ঞা, বনীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥

দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্তহারী ।

নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা ॥

করে দোড়াদোড়ি, মদমত্ত প্রৌঢ়া !

অনুচা, বিমুচা, নবোচা, নিগুচা ॥

কেনি কামিনী কুণ্ডলে গণ্ডঘুচা ।

প্রাঙ্গুচা, সচেচা, কেহ ওষ্ঠদচা ॥

অনঙ্গাজ্জভিন্না, কত স্বর্ণ বর্ণা ।

বিকীর্ণা, বিনীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা ॥

কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে ।
 কারো হারি কুর্পা, পরিষ্রুত কক্ষে ॥
 * * * * *
 কারো বাহুবলি কারো স্বক্কেদে :
 রহিয়া সাধুবাক্য বস্ত্রে প্রকাশে ॥
 স্নকক্ষে, নিতম্বে উর হেমকুন্তে ।
 এ ভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে ॥
 তাহে দোলিতা লাফতারি ভরেতে ।
 পরে হেলি ছলি অনঙ্গ জ্বরেতে ॥
 স্নেনেত্রাকে কেহ, কেহ চক্ৰভানে ।
 করে সেক তোরে সবে সানধানে ॥
 স্নকুন্তে ঢালিছে সর্কবারি অঙ্গে ।
 ঝনৎ ঝনৎ গলৎ গলৎ পড়ে নীর অঙ্গে ॥
 সখী চক্ৰভানে বলে চাতুরীতে ।
 এ রক্তের মালা কাকের গলাতে ॥
 তুনি চাতুরী দম্পতি হেটমাথে ।
 ঢলাঢল গলাগল সখী সর্কতাতে ॥

(চক্ৰভান ও স্নেনেত্রার বাসিবিবাহ, হরিলীলা)

অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসৌগণ্যের বোধ হয় স্বভাবজ, সুতরাং এ ক্ষেত্রে রমণি-কবি বিশেষ কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না । নিম্নে আনন্দময়ীর সহজ রচনার নমুনা দিতেছি । চক্ৰভান ব্যবসায় কৰ্ম্ম উপলক্ষে ডিঙ্গা সাজাইয়া স্বপ্তরের সহিত স্বদূর প্রবাসে চলিয়া গিয়াছেন, বিরহিণী স্নেনেত্রা নানা ছন্দে বিনাইয়া বিলাপ করিতেছে । বস্তুতঃ এ চিত্রটি কবি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন । মাঝে মাঝে অশ্লীলতা-দৃষ্ট হইলেও এত মনোহর হইয়াছে যে সে অংশটুকুর কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবির কবিত্ব শক্তি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না । যে একটু অশ্লীলতার পচা দুর্গন্ধ রচনা মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে সেজন্য স্নখু আনন্দময়ী কেন, সেই যুগের কোন কবিই অধুনাতন স্বক্কেদসম্পন্ন, সমালোচকের তীব্র কসাঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই । কবি লিখিতেছেন,—

“আসি দেখহ নয়নে ।

হীন তম্বু স্নেনেত্রার তরেছে ভ্রুশে ॥

হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, কক্ষ কেশ অতি ।

ঘরে আসি দেখ নাথ এসব চূর্ণগতি ॥

রহিয়াছি চির বিরহিনী দীন মনে ।

অর্পণ করিয়া আমি তোমা পথপানে ৷

* * * *

* * * *

ভাবি যাউ বখা আচ হটরা যোগিনী :

না সহে এ দাকণ বিরহ আগুনি ॥ টকাহি

সে অঙ্গে কুঙ্কম তুমি দিয়াছ যতনে ।

সে অঙ্গে মাখিব ছাউ তোমার কারণে ॥

যে দীর্ঘ কেনেতে বেলী বাধিছ আপনি :

তাতে জটাভার করি হটব যোগিনী ॥

নীতভরে যে বুকতে লুকায়েছ নাথ ।

বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত ॥

যে কঙ্কণ করে দিয়াছিল ছুটমনে ।

সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে ॥

তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি ।

মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী ॥

তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি ॥

আর তব স্থাপ্যধন বিষম যৌবন ।

লুকাইয়া নিরা ফিরি দরিদ্র বেমন" ॥

আমাদের দেশে বিবাহাদি মঙ্গলিক কার্যে আনন্দময়ীর রচিত গান গীত চইত : গানগুলি লিপিবদ্ধ না হওয়াতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, নব্যা রমণীগণ মঙ্গলিক কার্যে আজ কাল সমস্বরে গান করিতে বড় ইচ্ছুক নহেন ; সুতরাং আনন্দময়ীর গানগুলির মর্যাদা লোপ পাইয়াছে । জপ্সা, মূলধর, পয়োগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আনন্দময়ীর রচিত গানের প্রসার প্রতিপত্তির কথা ক্রম হওয়া যায় । পাঠকগণও দেখিবেন রমণী কবির গ্রাম্যগীতিগুলি অতি উপাদেয় । অমরা নমুনা স্বরূপ গুটি ছই সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব । প্রায় সমুদয় মঙ্গলিক গান সমূহের নায়ক নায়িকাট আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও তদীয় সাধ্বী স্ত্রী সীতাদেবী । আমাদের

প্রবন্ধোন্নিখিত রমণী কবিতা এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাট।

বিবাহের গান.—

“যাত্রা করি রঘুনাথ করিলেন গমন ।
জানকী করিতে বিয়া চলেন নারায়ণ ॥
পঞ্চশঙ্ক বাদ্য বাজে জনক রাজার বাড়ী ।
রঘুনাথ করবেন বিয়া জনককুমারী ॥
সকললোক বলে ধন্ত সীতার জননী ।
তাহানে দিবেন সেবা দেব রঘুমণি ॥
নারীগণে বলেন রাণী শুন গো বচন ।
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন ॥
সীতারে সাজায় রাণী রতি করি ছর ।
কঙ্কন মেখলা দিল পঞ্চম সুপুত্র ॥
নাসায় বেশর দিল শিরে শিরোমণি ।
ঠেকীতে তরুণা যেন ধরিয়ছে ফণী ॥
তাহার পরে পরাইল তার কেজুর ।
আভরণ জলে সীতার শশী করি ছর ॥
মণিময় আভরণ পরাইল শেষে ।
রঘুনাথ বসিতে চলেন মনের হরিষে ॥
নিচিত সেউতিপুঙ্গ সীতাদেবি খিটে ।
গগনে ঠেকিয়া টৈল রামের মুকুটে ॥
বিচিত্র পঙ্কজ পুঙ্গ গন্ধ মনোহর ।
উদয়ে ফুলের জ্যোতিঃ তিনি নিশাকর ॥
পঙ্কজের দল জিনি জানকীর হাত ।
ভ্রমর গুঞ্জে পাশে হাসেন রঘুনাথ ॥
ভ্রমর বলে শশী নয়নোদয় পদ্মবর ।
শশনর টৈলে হেথা আসিত চকোর ॥
রাম নামে জানকীর বিবাহ হইল ।
কৃত্তিকা সহিতে যেন শশী লুকাইল ॥

বিবাহ হটল সীতার রাম বামে বসি ।
লাঞ্জে লুকাইল তখন শরদের শশী ॥
বিবাহ হটল সাক্ষ সজ্জ সমাপন ।
পাণিগ্রহ সাক্ষ কৈল কোণল্যানন্দন” ॥

“অপূর্ব বসন্ত ঋতু মদনের সখা ।
যাছে নব নব কুসুমের দেখা ॥
বিকসিত রসাল-মঞ্জরী নান। মতে ।
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে ।
সুবকের ভরে নত কুসুমের লতা ।
যেন গুরু কুচ ভরে নিতম্ব নিলতা ॥
পৃথিবী রজতময় হইয়াছে শিশোরে ।
কিংতুকে ভুবন পূর্ণ স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥
কুসুমের বনে কত কত অলিকুল ।
গুণ গুণ শব্দ করে গন্ধেতে আকুল ॥
মলয়কন্দর হঠতে মন্দ সমীরণ ।
বিরহিণীর সম হেতু বহে ঘন ঘন ॥
কারো হার খুলি ঘুরায় বারে বার ।
কেহ খসাইয়া পুনঃ দেয় অলঙ্কার ॥
কদলি বেদৌতে রাম জনকী আনিয়া ।
কত নাট কত জাট করে বিনাষ্টয়া ॥
সুভক্ষণে সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া রঘুপতি ।
সীতা সঙ্গে করে চলেন অতি হর্ষমতি” ॥

অন্নপ্রাশনের গীতের নমুনা.—

“ছর মাসের রঘুনাথ জননীর কোলে ।
কেলী করে দেখে রাজা মন কুতূহলে ॥
নব শশী জিনি কাস্তি বাড়ে দিন দিন ।
কতপূর্ণ শশী মুখ হেরিয়া মলিন ॥
অন্নপ্রাশনের হেতু কৈলা অনুমতি ।
আসিলেন বশিষ্ঠ ঋষি অতি হৃষ্টমতি ॥

শুভ তিথি বার আর নক্ষত্র বিহিত :
 বিচারিয়া শুভক্ষণ কহেন পুরোহিত ॥
 নানা মতে করিলেন মঙ্গল রচন ।
 নানা স্থানে নাচে গায় যত রামাগণ ॥

পাঠকগণ এষ্ট গান সমূহে আমাদের দেশাচার, জীবাচার, প্রভৃতি রীতি
 নীতির খুটিনাটির একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইবেন । শেষোক্ত সঙ্গীতটিতে
 সূর্যহং নিমন্ত্রণাদিতে প্রদত্ত শাদাদ্রবোর একটি সুদীর্ঘ তালিকাও দেওয়া
 হইয়াছে । সঙ্গীতে ছন্দঃপতন দোষ সম্বন্ধে রক্ষা করা যায় না, সুতরাং ছন্দঃ-
 পতন দোষ বাহা সঙ্গীতসমূহে পরিলক্ষিত হয় তাহা গণনীয় নহে ।

আমরা এই বিহস্য রমণী কবির রচনার তত্ত্ব ও ভাষার জোর দেখিয়া যথার্থই
 বলিতে পারি যে তিনি পাচীন কবির আমলে অতি উচ্চাঙ্গন প্রাপ্ত হইবার
 যোগ্য । জপসার ক্ষেত্রে ইহা নিতান্তই গৌরবের কথা ; আর শুধু জপসাই বা
 বলি কেন, সমস্ত বঙ্গীয় কুল ললনাগণই আনন্দময়ীকে তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়া
 ভাবিয়া গৌরব করিতে পারেন ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় ।

হিন্দু বিশ্ববার একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র ।

১ম পত্র ।

২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল ।

পরমপূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল্.

“নবপ্রভা” সম্পাদক মহাশয় সমীপে ।

সম্পাদক মহাশয় !

আজ কদিন হ'লো আমার শৈশব স্মৃৎ শ্রীমান বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
 বি. এ, আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন । সুরেন্দ্রনাথ আপনার সেই

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ । একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র । ১৩৩

পত্রের ভিতর তাহারই প্রাণাধিক পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীর লিখিত, তাহার নামিক পত্রখানিও আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন । গত চৈত্রের ২৫শে তারিখে, সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবী বালিকা বয়সে স্বামীকে চারাটয়া বিধবা হইয়াছেন । এখন সেট সংসার-জ্ঞান শূন্য বালিকার পক্ষে একাদশীতে নিরসু উপবাস করা কতদূর কষ্টকর—তাহা বুঝিতে পারিতেছেন । শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা তাহাকে পত্র লিখিয়া তাহার (সুরেন্দ্রনাথের) মত চাহিয়াছেন যে, একাদশীতে নিরসু উপবাসে অনাক্রম্য হইলে, বিধবারা ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া কঠোর একাদশীর ব্রত পালন করিলে, আমাদের দেশের ও সমাজের কোন কতি আছে কিনা এবং তাহাতে কোন পাপ স্পর্শে কি না ? সুকৃদর আপনি পত্নীর প্রশ্নের কোন সুমামাংসা করিতে না পারিয়া পত্নীর পত্রখানি সহ আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । সুরেন্দ্রনাথ ও তাহার পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণের পত্র দুটো খানি পাঠ করিয়া, আমি আমার সহজ জ্ঞান ও সরল বিশ্বাসানুসারে যে উত্তর দান করিয়াছি—এখন আমার এষ্ট কার্য্য জ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মানুমোদিত হইয়াছে কি না, তাহারই যথাযথ বিচার করিবার জন্য, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা, সুকৃদর সুরেন্দ্রনাথ,—উভয়ের পত্র দুটো খানির ও আমি সুকৃদরের পত্রের উত্তরে যথা লিখি, এবং সুকৃদর পত্নীর পত্র প্রাপ্তে তাহাকে যে উত্তর দেন,—মোট এই চারিখানি পত্রের অবিকল নকল “নবপ্রভা”র প্রকাশার্থে অদ্য আপনার সমীপে পাঠাইলাম । বিষয় গুরুতর ; সুতরাং দেশকাল ও পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া আমি আমার যে মত দিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানানুমোদিত হইয়াছে কিনা,—তাহার সম্যক বিচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । এবং আশা আছে যে, এষ্ট পত্র কয়খানি নবপ্রভার প্রকাশিত হইলে, নবপ্রভার সদাশয় পাঠক ও লেখকদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়া, যাহাতে চিরহতভাগিনী বঙ্গের বিধবাদের প্রকৃত কোন উপকার হয় তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করবেন । তবে বলিয়া রাখি যে, আমি সুকৃদরকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে নিরসু উপবাস সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ কালে, আমি শাস্ত্রালোচনা এককালীন পরিত্যাগ করিয়া, শুধু দেশ, কাল ও লোকের বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যুক্তিসম্মত মতামত প্রকাশ করিয়াছি । এখন নবপ্রভার স্বনাম খ্যাত লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্তসাংখ্যাতীর্থ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত লালমোহন

বিদ্যানিধি ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মহোদয়েরা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রদত্ত মতামত সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়া দেশের হতভাগিনী বিধবাদের প্রতি শাস্তানুমোদিত তথা দেশকালপাত্রভেদে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া হতভাগিনীদের উপকার সাধন করিতে সাধানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন,—ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা । আশা করি, আপনার নবপ্রভায় এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা যাহাতে হয়, আপনি তাহার যথোচিত চেষ্টা করিবেন । আপনার নিকট আমার অনেক আশা করিয়া থাকি বলিয়াই এ সম্বন্ধে আপনার আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য জ্ঞান করিয়া আপনারই আশ্রয় লইলাম । নিবেদনমিতি

প্রণত

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়

বেলঘরিয়া (চক্‌পাড়া)

পাটুল পোঃ, নাটোর (রাজসাহা) ।

২য় পত্র ।

স্বামী সুরেন্দ্রনাথ প্রতি শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীর পত্র ।

শিবনগর । (পাবনা ।)

২৬শে বৈশাখ, ১৩১০ ।

পরমারাধ্যাতম

শ্রীযুক্তেশ্বর সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি. এ,

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেশু ।

শতমহত্ম প্রণাম জানিবেন :—

প্রাণেশ্বর ! ক'দিন হতে আপনার পত্রের উত্তর দিব দিব মনে করিতেছি ; কিন্তু, কি ছাই লিখিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না । এখানকার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, আর একদণ্ডও আমার মন টিকিতেছে না এবং সর্বদা মনঃকটে কাল কাটাতেছি । আপনি শুনিয়াছেন যে, গত ৩রা বৈশাখ শ্রীমতী অনুপমা এই বালিকা বয়সে নুতন বেশে এখানে আসিয়াছে—শ্রীমতীকে দেখিলে বুক কাটিয়া যায় । কিন্তু কি করিব—উপায় নাই । একে

জৈষ্ঠ, ১৩১০ । একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র । ১৩৫

এই কচি বয়স, তার পর এই নূতন শোক—বিষম বৈধবা যন্ত্রণা, আর সব চাহিতে একাদশীর কঠোর নিরন্তর উপবাস, তারপর এবারকার এই কাল বৈশাখের দিন, এমন দিনে সহজ মানুষ আমরা—আমাদেরই দিন কাটে না ; আর এই সব হতভাগিনীদের দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে, একমাত্র ভুক্তভোগী ও বিনাতা ভিন্ন—কেহই জানেন না । এবারকার বৈশাখের মতন কাল বৈশাখ বুঝি জীবনে আর কখন দেখি নাট,—ঈশ্বরের নিকট জোড়হাতে প্রার্থনা করি, জীবনে আর কখন যেন এমন কাল বৈশাখের দিন দেখিতে না হয় । শ্রীমতী অমুপমা বড় কষ্টে ও বড় হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় প্রথম একাদশী কাটাইয়াছিলেন, তার পর গতকলাকার একাদশী—কলাকার একাদশীর কথা মনে করিলে এখনও বুক ফাটিয়া যায় । গতকলা সেমন প্রথর বোজ—তেমনি প্রথর গ্রীষ্ম, তারপর কঠোর উপবাস । বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে না হইতেই শ্রীমতী তৃষ্ণায় এক প্রকার জীবন্মৃতা হইলেন । আমি জীবনে অনেকের অনেক যন্ত্রণা নয়নে দেখিয়াছি ; কিন্তু, শুধু এক বিন্দু শীতল জলের জন্য অমন হৃদয়বিদারকারী অসহ্য যন্ত্রণা কখন দেখি নাট । শ্রীমতীর এই ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া মা (শান্তুড়ী ঠাকুরাণী) ও শ্রীমতীর শান্তুড়ী (তিনি গতকলা এখানে আসিয়াছেন)—উভয়েই কাঁদিয়া আকুল হইলেন । শেষ, সন্ধ্যার প্রাকালে, অমুপমার যন্ত্রণা নিজ চক্ষে দেখিতে না পারিয়া, অমুপমার সাক্ষাৎ দেবীতুল্যা স্নেহময়ী শান্তুড়ী শ্রীমতীকে ফলমূল খাটরা জলপান করিতে অমুমতি করেন—মাও এ কথায় সায় দেন । কিন্তু, ইতিমধ্যে সেট সময়ে পণ্ডিত পাড়ার আপনাদের সেই অশেষ গুণশালী পণ্ডিত কৃষ্ণকমলবিদ্যাভূষণের পুত্র পণ্ডিত নীলাঙ্গর বিদ্যালঙ্কারের দিদি কাত্যায়নী ঠাকুরকি, ঠাকুরকির ফলমূল খাটরা একাদশীর ব্রত পালনের কথা শুনিয়া মা ও ঠাকুরকির শান্তুড়ীকে কড়া কড়া দণ্ড কথা শুনাটরা চলিয়া গেলেন । তখন মনে করোঁচলাম যে, বোধ হয় এই ফণেই শেষ হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এখনও শেষ হয় নাই । কাত্যায়নী ঠাকুরকির মুখে এই কথা শুনে বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর গ্রাম মাথায় করে বসেছেন এবং আমাদেরকে একত্রে করবার জন্য বিধিমতে বদ্ধ ও চেষ্টা করিতেছেন । বিদ্যালঙ্কারের কথায় গ্রামের সকলেই আমাদের বিপক্ষে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু মাখন ঠাকুরপো আমাদের পক্ষ হ'য়ে সবার সাথে লড়িতেছেন । এ দিকে কাত্যায়নীর সেই কথা শুনে, ইচ্ছাসম্বন্ধে মা ও ঠাকুরকির শান্তুড়ী আর কোন উচ্চ বাচা করিলেন না, শুধু কাঁদিতে লাগিলেন ।

অল্প দিকে অল্পপমাও কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কিছুই গাইলেন না—কল পর্যন্ত নহে, সাবা রাত্রি কাটরাইয়া কাটাইলেন । এখন আপনার নিকট আমার একটা অনুরোধ—আপনি শক্তি ও পণ্ডিত, আপনি এত একাদশীর কোন একটা নুতন বিলি ব্যবস্থা করিতে পারেন না কি ? শুধু অল্পপমা কি ? এ সংসারে অল্পপমার মত কত হতভাগিনী বিধবাষ্ট যে এত কঠোর একাদশীর উপবাসে একবিন্দু জলেব জন্ত কঠাগত প্রাণ হইয়া অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে,—তাহার কি কোনই প্রতিকার হয় না,—কোনই কি প্রতিকার করিতে পারেন না । আগে সেকালে লোকে উপবাস করিত সত্য, কিন্তু তখন লোকের যপেটে শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল ; আর এখন দিন দিন রোগে শোকে লোক সম্পূর্ণ অশক্তি হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং পূর্বের স্থায় উপবাস করিবার শক্তি কোথায় ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—একাদশীতে নিরন্তর উপবাস না করিলেই কি ধর্ম হয় না ? এত দেখুন কাত্যায়নী ঠাকুর ঐ একাল আর সেকাল কি না করিলেন—কত ক্লমহতা না করিলেন, অথচ এত কাত্যায়নী কেবল বিদ্যালঙ্কারের কথা বিদ্যালঙ্কারের বোন আর একাদশীর উপবাস করেন (?) বলে ধর্মের ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতেছেন । তারপর এত বিদ্যালঙ্কার—তিনি পণ্ডিত, সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তের পীতি দেন, অথচ তিনি সমাজের বুকে বসিয়ে মাধি হাড়িনীকে নিয়ে কি লীলাই না করিতেছেন,—অথচ সমাজে বা দেশে ইহার কোনই প্রতিকার হয় না ; বরং এত বিদ্যালঙ্কারই সমাজের নেতা—কর্তা, যা করেন তাহাই হয় । বাহা হউক, আপনি একবার কোন ভাল পণ্ডিতের কাছেই হউক অথবা কোন প্রকৃত লেখাপড়া জানা চরিত্রবান লোকের কাছেই হউক, এ বিষয়ে কোন প্রতিকার হয় কিনা এবং বর্তমান কালে আমাদের কোন পণ অবলম্বন করা উচিত, তাহার বিলি ব্যবস্থা নিয়ে, বাহা আমাদের পক্ষে ভাল হয় করিবেন । কলতঃ আমি আমার সরল ও সহজ মেয়েলি বুদ্ধিতে বতটুকু বুঝি, তাহাতে একাদশীর উপোস করি আর না করি,—মন যদি জগদীশ্বরের চরণে অর্পণ করে, সতত ধর্মপথে রাখিতে পারি,—মনে হয়, সব চেয়ে তাহাই ভাল । আর দেখুন, সমাজে এখন সবটাই চলিতেছে—বাহার বাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাষ্ট করিতেছেন, অথচ প্রকৃত ধর্মপথাবলম্বিনী অভাগিনী বিধবাদের বেলাত সমাজের এ কঠোর শাসন কেন বুদ্ধিতে পারি না । বিদ্যালঙ্কারের ভগ্নী কাত্যায়নীর মত যাত্চািরিনী হয়ে একাদশীর উপোস করাট ভাল, না আমার

জৈষ্ঠ, ১৩১০ । একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র । ১৩৭

ঠাকুরবির মত প্রকৃত ধর্মচারিণী হইয়া একাদশীর উপবাসে অশক্ত হইলে নিরশু উপবাস না করিলেই কি মণাপাপ হয়,—একবার আপনি বিচার করিয়া দেখিবেন । আমার বাবা, কাকা উভয়েই ঠিক বিধবাদের স্তায় একাদশী করিতেন—নিত্য দিনান্তে একবার মাত্র হবিষ্যার গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহারা সততই বলিতেন যে, সমাজে বিধবাদের যেমন ভাবে চলিতে হইবে, ব্রাহ্মণকেও ঠিক তেয়ি ভাবে চলিতে হইবে, এবং তাঁহারাও ঠিক তেয়ি ভাবে শুদ্ধাচারে আপনাদের জীবন কাটাওয়া গিয়াছেন আমি আমার স্বত্তরকে স্বচক্ষে দেখি নাই, তবে লোকের মুখেই শুনে আসিতেছি যে, তিনিও ঠিক আমার বাবা ও কাকার মতন আপনার পুণ্যময় জীবন কাটাওয়া গিয়াছেন । অথচ, তাঁহারা সতত বলিতেন যে, আত্মচিন্তাশক্তি, অহিংসা ও পরোপকার সংসারে পরম ধর্ম, —ইহা অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ধর্ম জগতে আর নাই । লোকে উপোস করে ধর্ম করুক আর না করুক—একমাত্র চিন্তাশক্তি ও জয়ই ধর্মলাভের প্রথম ও প্রধান উপায়—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, অথচ, বলিতে চঃপ হয় যে সংসারে লোকের এখন আর কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নাই—এখন আত্মাঙ্গণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হিংসা, ঘেঁষ, কান, ক্রোধ, লোভ ও মোহে জড়ীভূত হইয়া আপন আপন হৃদয়পূর্ণ করিয়াছে, তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না,—ব্রাহ্মণে সতত কুকার্য ও কদাচারে রত ; অথাদ্য ভক্ষণ ও অগম্যাগমন লোকের এখন অঙ্গের ভূষণ তাহাতে আমাদের সমাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, শুধু ক্ষতি হয় অভাগিনী বিধবাদের বেলায়—এ কঠোর সমাজনীতি কেন, বুঝিতে পারি না । যাহা হউক, যাহাতে এই কঠোর সমস্তার সুমীমাংসা হয়, আপনি প্রাণপণে তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিবেন । ফলতঃ, ইহার একটা সুমীমাংসা হওয়া বড়ই প্রয়োজন ; কেন না সংসারে কাহারো গৃহেই অনাখিনী বিধবা ছাড়া নাই এবং সকলেই কিছু আপনাদের গুণধর বিদ্যালঙ্কার বা কাত্যারিনী নন যে, সব তাতেই নাক শিট্কাইবেন । এ বিষয় অধিক আর কি লিখিব, আপনার মারাই অধিক ; তবে অনুপমার যাতনা আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন না, আমা-দিগকে অহরহঃ স্বচক্ষে দেখিতে হইতেছে—ইহাই যা এখন যাহা ভাল হয় করিবেন এবং এ বিষয়ে আপনার মতামত আমাকে লিখিবেন—আপনার পত্র পাইলে, আমার আর যাহা বলিবার আছে বলিব । এখানকার আর সব মজল, কিন্তু কাহারো চিন্তেই সুখ নাই—মনে শান্তি নাই, ঘোর অশান্তিতে দিন

কাটিতেছে । আপনার শ্রীচরণের কুশল সংবাদে সুখী করিবেন । শ্রীচরণে
নিবেদন ইতি

শ্রীচরণের দাসী—সেবিকা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবী ।

(ক্রমশঃ)

ছবি ।

(বুড়োবুড়ী ।)

যাপন করি' দীর্ঘ দিনা, তুংথে সুখে একত্রে সে,—

এখন সন্ধ্যা বেলা,

—এখনো সে পরস্পরে বিভোর আছে হৃদয় দুটি,

খেলছে প্রেমের খেলা ।

কত ঝঙ্কার মধা দিয়া প্রণাহিয়া, যুগ্মতরী,

প্রকৃত প্রস্তাবে,

আজি পৌছিয়াছে শেষে দীপের উপকূলে এসে

অবিচ্ছিন্ন ভাবে ।

অক্লান্ত হয়েছিল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে,

এ প্রেম সম্বোধনে ;

নিভুতে, এক গ্রামের কোণে, শুভক্ষণে, অলক্ষিত,

দূরে উপবনে,

জ্বগেছিল সুদিনে সে ।—সূর্য্যের মধুর কিরণ গায়ে

নেগেছিল এসে ;

বহেছিল মধুর বাতাস : গেরে ছিল পাখী ; আকাশ

চেয়েছিল হেসে ।

সে তরুটি ক্রমে ক্রমে বড় হোল ; কুমুমরাশি

ছুটলো কত গাছে ;

কত শীতে, কত রৌদ্রে, কত ঝঙ্কার, এ তরুটি

আজো টিকে আছে ।

বড়ই মধুর প্রথম প্রেমের প্রথম আবেগ, প্রথম বিকাশ,

প্রথম মিলন আশা ;

বড়ই মধুর পরস্পরের চুরি করা প্রথম দৃষ্টি,
 প্রথম প্রেমের ভাষা ।
 বুড়োবুড়ির প্রেমে নাটক সে উচ্ছ্বাসটি, সে তরঙ্গ
 কল্লোল আজি যদি,
 এ প্রেম বহে সুনীল, স্বচ্ছ সমুদ্র সঙ্গমের মত,
 গভীর নিরবধি ।

৪

দুইটি হৃদয় দুইটি ইচ্ছা একটা সূত্রে চিরজীবন
 বাধা আছে যবে,
 হয়নি কভু তা'দের বিবাদ বিলাপ বিরাগ পরস্পরে,
 কে শুনেছে কবে ?
 মানুষ স্বতঃই স্বার্থমগ্ন ; নিজের সুখটি সবার চেয়ে
 নিত্য বোঝে বটে ;
 যে তার বাধা যে তার বিঘ্ন—তা অনশ্রুস্তাবী হোলেও
 তার উপরে চটে ;
 তবু দুজন পরস্পরে ভালবাসে—লুপ্ত নহে—
 গুপ্ত অনুরাগে ;
 ‘আদি ব্যাধি,’ দুঃখ, দৈন্ত, একের হোলে—হাজার হোক না—
 অস্তুর প্রাণে লাগে ।
 [বিবাদ বিরাগ (তাও সে বলি) যদি নেহাৎ আঁধার করে
 গৃহে সুখের আলো ;
 সে বিবাদ দম্পতীর মধ্যে, যতই অল্প সময় হয় সে,
 ততই সেটা ভালো ।
 রোগের প্রতি আক্রমণ, শরীরখানি, ক্রমে ক্রমে
 পড়ে অস্তিম্যে সে ;
 প্রতি ভূমিকম্প, বাড়ী দৃঢ় হলেও, ক্রমে ক্রমে
 ভেঙে পড়ে শেষে ।
 যতই বিবাদ ততই বিরাগ, যতই বিরাগ ততই প্রভেদ,
 ক্রমাগত বাড়ে ;

কখনো বা শেষে এমন অবস্থাটি এসে পড়ে
 ঐশ্বৰ্যে না সারে !]
 ছেয়ে তাদের যুগলজীবন গেছে হেন কতই বিবাদ
 বিপদ আপদরাশি
 এখনোত টিকে আছে ; হর্ষ আছে মনের ভিতর
 মুখে আছে হাসি ।

৫

তাইত বাল এ দৃশ্যটি একটি অতি মধুর বস্তু ;—
 'এ অপূৰ্ণ জুড়ী ;
 পরস্পরে বিভোর আজে। পরস্পরের হাতটি ধরে'—
 বুড়ো এবং বুড়ী ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

মায়ী ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

বিলাসভবনে ।

হে রাক্ষস ! অনন্তর হৃঃশাসন দ্রৌপদীর বসন ধারণ করিয়া—বলপূৰ্ণক
 আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । সভাপক্ষ, মহাভারত ।

Arbaces came nearer to her—his breath glowed fiercely on her cheek ; he wound his arms around her—she sprang, from his embrace. After some exchange of words he caught (again) Ione in his arms ; and, in that ferocious grasp was all the energy—less of love than of revenge. But to Ione 'dispair gave supernatural strength she again tore herself from him ;—she rushed to that part of the room by which she had entered—she half withdrew the curtain—he seized her—again she broke away from him—and fell, exhausted, and with a loud shriek,' at the base of the column which supported the head of the Egyptian goddess. *The Last Days of Pompeii* by Lord Lytton.

নটবর নায়েবের ক্ষুদ্র বাগান বাড়ী, নির্জন স্থানে, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত । প্রাচীরের ধারে সারি সারি নারিকেলের ও সুপারির গাছ আছে । প্রাচীরের বাহিরে বড় বড় আম্রবৃক্ষের বাগান । ঘরের ভিতর একটা কক্ষে আলো জলিতেছে । তাহাতে একখানি পালক রহিয়াছে । পালক ছফ্ফেননিভ শয্যায় শোভিত । পালকের পার্শ্বে একটা পাপিষ্ঠা বৃদ্ধা বসিয়া আছে । কুমুদিনী সেই খেত কোমল স্পর্শ শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে । সে এখনও সংজ্ঞাহীন । কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় ঐ বৃদ্ধা তাহার কেশ সংস্কার করিয়াছে, মুখ ও সমুদয় গাত্র মুছাইয়া দিয়াছে—একখানি শাস্তিপুরে সূত্র গুলাবর পরাইয়া দিয়াছে ।—তাহার অসংবদ্ধ ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, মস্তক ও গ্রীবা আবৃত, করিয়া মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন পূর্বক কতক উপাধানে, কতক শয্যায় বিস্তৃত হইয়াছে—বোধ হইতেছে যেন নীলনীরদমণ্ডিত চন্দ্রমা । কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে—দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী । কিন্তু মুখে বিলাসের চিহ্ন নাট । কেমন একটা পবিত্র ভাব তাহার বদন-মণ্ডলে প্রতিভাত হইয়াছে । সংজ্ঞা নাষ্ট, অথচ নগ্ন হইতে মুক্তার স্থায় অক্ষ-বিন্দু ছই একটা ঝরিতেছে । আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে । শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় কেহ পীড়ন করিলে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে,—নিদ্রিত অবস্থায় যেমন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদে তেমনি কুমুদিনী মাঝে মাঝে ফুঁপিয়া উঠিতেছে । বৃদ্ধা তাহাকে বাতাস করিতেছে । বৃদ্ধা ডাকিল “বৌ বৌ” । উত্তর নাই । আবার ডাকিল । এবার “উ”—অতি মৃদু অক্ষুট স্বরে যেন উত্তর পাওয়া গেল । একটু পরে একটা পুরুষ পার্শ্ববর্তী ঘরে প্রবেশ করিল ; সে ছয়টি ফুলিয়া কুমুদিনী বে ঘরে রহিয়াছে সেই ঘরে আসিল ।

পুরুষ বলিল—“এক্ষণে কি চৈতন্ত হয় নাই ।”

• বৃদ্ধা—“ঘুমাইতেছে বোধ হয় ।”

পুরুষ—“ডাকিয়াছিলি ?”

বৃদ্ধা—“ডাকিয়াছিলাম অনেকবার । সাড়া পাই না । একণ্ঠে যেন একবার সাড়া পাইয়াছিলাম ।”

• পুরুষ—“আচ্ছা তুই যা” । বৃদ্ধা উঠিল । পুরুষটি আস্তে আস্তে কুমুদিনীর গায় হাত দিল । গায় পুরুষের হাত পড়ায় কুমুদিনীর কেমন সংজ্ঞা হইল । কুমুদিনী বলিল “কে ?—আমি কোথায় ?”

পুরুষ বলিল—“ভয় নাই—আমরা ডাকাতের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা
করেছি—তুমি নির্বিঘ্নে এক্ষণে ঘুমাও ।” কুমুদিনী ভাল করিয়া চক্ষু মেলিল ।
দেখিল, একটা হাঁদা মিনসে খাটের উপর বসিয়া তাহার আপাদমস্তক সতৃষ্ণ-
নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে । কুমুদিনী খাটের উপর হইতে নীচে লাফাইয়া
পড়িল । যে দিকে দরজা খোলা ছিল, সেই দিকে ছুটিল, অল্প একটা কক্ষে
প্রবেশ করিল, দেখিল তাহার দরজা বন্ধ, খুলিতে পারিল না, জানালার
নিকটে গেল, তাহার গরাদে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল, অবশ্য পারিল না ।
পুরুষও “ভয় নাই, ভয় নাই” বলিয়া সেই ঘরে আসিল । কুমুদিনী আবার
সেই ঘর হইতে যে ঘরে পূর্বে ছিল সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিল । সেখানে
বন্ধা এক্ষণও দাঁড়াইয়া । কুমুদিনী বলিল—“বিশি তুই মেয়ে মানুষ, তোব
দয়া আছে—তোব পায়ে পড়ি—আমাকে বাঁচা” এই বলিয়া কঁাদিতে কঁাদিতে
সেই বন্ধার পা জড়াইয়া ধরিল ।—বিশি বলিল—“বাছা, নায়েব মহাশয় যখন
তোকে এখানে এনেছে, তখন আর কি তোকে ছেড়ে দেবে তুই নায়েব
মহাশয়ের কথা শোন, শুধে থাকবি ।” নায়েব ইতাবসরে কুমুদিনীর বাহুলতা
ধরিয়া তাহাকে তুলিল । কুমুদিনী হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইল ।
তখন নায়েব তাহাকে যে সকল পাপ কথা বলিল তাহা লিখিয়া লেখনী দূষিত
করিব না, নায়েবের নির্লজ্জ ঘৃণিত কথা শুনিয়া রাগে কুমুদিনীর গা থর থর
করিয়া কঁাপিতে লাগিল । কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিল—“পিশাচ ! দূরে
দাঁড়াইয়া থাক । কাছে আসিস্ না—তোব যদি যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছা
না থাকে, এক্ষণি আমাকে ছেড়ে দে—জানিস আমি কার স্ত্রী ?”

নায়েব । তুমি যার স্ত্রী সে এক্ষণ ছেলে । আর আমি যদি তাকে রক্ষা
না করি তার ফাঁসি হবে, জান ? তুমি যদি মহেশকে ফাঁসি হতে বাঁচাতে
চাও আমাকে সন্তুষ্ট কর । মহেশ খালাস হইবার পূর্বে আমি তোমাকে ছেড়ে
দিব । আর তোমাদের জমী জরাত, বা কেড়ে নিয়েছি, সব ফিরিয়ে দিব ।
তোমরা আবার পরমসুখে থাকবে । মহেশ কিছু জানুতে পারেন না ।”

কুমুদিনী—“পাষাণ ! তুই জানিস্ না—স্ত্রীর ধর্ম বেচে আমার স্বামী জীবন
চায় না । আমিও সতীত্ব দিয়ে তোর হাতে আমার প্রাণ বাঁচাতে চাহি না ।
তুই আমাকে মেরে ফেলতে হয়, মেরে ফেলিস । কিন্তু তুই আমাকে কখন
রাজি করিতে পারিবি না, খুব জানিস । ছুঁচো—পাজি—সঁরে দাঁড়া ।”

নায়েব তখন একটু পৈশাচিক হাস্য হাসিল । “আমি তোকে ভাল

কোরে বুঝানাম, তুই বুঝলিনি—একনি দেখবি, তুই আমার বশীভূত হোন
কি না ” তার পর বে নারকায় ভাষা বলিল তাহা লিপিব না । এ দিকে
কুমুদিনীর কোপে তাহার সৌন্দর্য্য আরও যেন বাড়িয়াছিল । স্তম্ভবস্ত্র পরি-
ধান করিয়া, সুন্দরী যুবতী শয়ন ঘরে একাকিনী—পিণ্ডাচের সম্মুখে—
হায় কে কুমুদিনীকে রক্ষা করিবে ! নরাদম জঘন্ত রিপুমদে মত্ত । সে কুমু-
দিনীর কাপড় ধরিয়া ছোরে টানিতে লাগিল । এমন সময় দূরে প্রিং প্রিং
শব্দ শুনা গেল—কে একতারা সঙ্গে গান গাইতেছে ।—

গান ।

কি কর কি কর, বশীভূত,
চাড় চাড় অঞ্চল আমার হে ।
আমি সরম ধরম, চাড়িব কেমনে,
ডুবিয়ে পাপে, কেমনে মজিব পরপুরুষে হে ॥
আমি কুলবালা, কলঙ্কের ডালা,
কণ সুখ আশে, মাথায় চাপাইত না হে ॥
কুলমান রাধি, সতী সাক্ষী থাকি,
ভঞ্জি নিতি নিজ-পতি-পদ-পঙ্কজ হে ॥
তোমার পীরিতি, তোমার আদর,
শঠরাজ, ব্রজরাজ, নটরাজ, (নটবর) চাহি না হে ॥
পরদারে কেন, মাত তুমি হেন,
হয়ে নারায়ণ, নরক গমনে কেন মতি হে ॥
সরলা অবলা আমি, ধূরত লম্পট তুমি
তুমি নহে নারায়ণ, তুমি লম্পট চূড়ামণি হে,
তুমি পামর লম্পট হে ।
ঐ দেখ গুরুজন, করিতে তোমা শাসন,
আসিছে ধৈর্যে, হুকার দিয়ে,
পালাও পালাও, পরাণ বাচাতে যদি চাক হে ॥

(ক্রমশঃ)

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

বৈশাখ, ১৩১০ ।

১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল । বিজ্ঞাপিত হয় যে ১১ই বৈশাখ বা ২৪শে এপ্রিলের পর, টাঙ্গালালে কেপ কলোনির স্রবোর উপর আর কর লাগিবে না ।...প্রকাশিত হয় যে বগদাদ রেল-কোম্পানীর কার্যনির্বাহক সভার অধিকাংশ সভাই জার্মানী ।

২রা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল । ডব্লিনে বাণিজ্য ও শিল্প সভা স্থাপনের জন্য একটি মহতী সভা হয় । আমেরিকায় যুক্ত রাজ্যের ক্যান্সাস মদ্য বিক্রয় বন্ধ রাখিতে কৃৎসংকল্প হইল ।

৩রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল । আমাদিগের সম্রাট্ মাণ্টায় পহুছান ।...ল্যাণ্ডবিল বিষয় আলোচনার্থ ডব্লিনে আইরিসদিগের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের আরম্ভ হয় ।...অপটোতে পর্ভুগীজদিগের একদল পদাতিক সৈন্য বিদ্রোহী হয় এবং সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করে ।

৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল । ডব্লিনে স্থির হয় যে আরমলওর পক্ষে স্বাধীনতাসন একান্ত আনুকূল্যক ।...চিনের নিকট হইতে আমেরিকায় ক্ষতিপূরণ রজতমুদ্রায় দিতে হইবে বলিয়া পুনর্ব্বার ঘোষিত হয় । "বাঙ্কারস কমিশন" পুনর্ব্বার তাহাতে আপত্তি করে ।

৫ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল । সম্রাট্ মাণ্টা ত্যাগ করেন ।

৬ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল । যেত কস-করস হইতে দিয়াশালাইয়ের প্রস্তুত করণ রিক্সট্যাগ দ্বারা নিবদ্ধ হয় ।

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল সম্রাট্ নেপ-লসে উপনীত হন ।...কর্নেল শরানের নিকট

হইতে সংবাদ আসে যে, সোমালী যুদ্ধযাত্রায় ইংরাজদিগের ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে । ১৮০ জন সৈন্য ও ১০ জন সেনাপতি হত হয় ।

১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল । রুবিয়ার 'চার্জি ডি গ্যাকেরারসু' প্রিন্স চিন্তাবকে জানান যে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের চুক্তি-পত্রে সহি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা মাকুরিয়া ত্যাগ করিবার জন্য আর কিছুই করিবেন না ।

১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল । তার আসে যে কর্ণেল কাব্‌সের সৈন্য নিরাপদে জেনারেল মানিংএর সহিত বোপ দিয়াছেন এবং গালি-হিতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ।

১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল । সম্রাট্ রোমের উপনীত এবং তথায়ও তাঁহার খুব আদর অভ্যর্থনা হয় ।

১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল । কানাডার আলবার্টা প্রদেশে ভূমিকম্প হয় । ৭৫টি হত এবং বিশাল ভূখণ্ড বিধ্বস্ত হয় ।

১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল । সম্রাট্ রোমনগর ত্যাগ করেন ।

১৮ই বৈশাখ, ১লা মে । ব্রিটিশ-রাজ পারীসে প্রেসিডেন্ট লুয়েট্ ও মন্ত্রিসমাজ কর্তৃক আপ্যায়িত হন ।

২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে । সম্রাট্ পারীস ত্যাগ করেন ।

২২শে বৈশাখ, ৫ই মে । সম্রাট্ পোর্ট-স্মাউথে প্রত্যাগত হন ।

২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে । চীনদেশীয় ছাত্রীগণ যুদ্ধে সেবা করিতে শিক্ষা করিবার জন্য টোকিওতে একটি সভা গঠিত করিয়াছেন ।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রিট ভারতসিহির বস্ত্রে, সান্তাল এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত ও ভবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রিট হইতে শ্রীরঞ্জনলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, আষাঢ় ১৩১০ সাল

[৪র্থ সংখ্যা।

দেশভেদে আচারভেদ।

সমাজসংস্কারকগণের কার্যক্ষেত্র বঙ্গদেশে যতদূর সুপ্রশস্ত উড়িষ্যার ততদূর নহে। পূর্বে বলিয়াছি উড়িষ্যার অনেক জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত এবং এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের যৌবনকালে বিবাহ হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। এমন কি হাটবাজার স্ত্রীজাতির এক চেটিয়া। এই সকল “হাটুয়া জাতি”র মধ্যে যৌবন বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকাতো, হাটবাজারে বে কেবল বাহিরের জিনিষের কেনা বেচা হয় এবং অন্তরের কোন কোন বস্তুর কেনা বেচা হয় না, তাহা অনুমান করা দুঃসাহসের কার্য। পাশ্চাত্য সমাজে নৃত্যগীতভোজনাদির আমন্ত্রণ সভা যেমন যুবক যুবতীর মধ্যে প্রেম বিনিময়ের প্রশস্ত ক্ষেত্র, এই সকল হাট বাজারেও সেইরূপ অনেকানেক চারি চকুর মিলন হইয়া পরিণেষে বিবাহাদি বাপার সংঘটিত হয়। সুতরাং ঐসকল হাটবাজার সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সেখানে কেহ ধান চাউল বেচিয়া ঘরে যায়, আবার কেহ বা মন-প্রাণ বেচিয়াও ঘরে ফিরে।

বেশভূষা সম্বন্ধেও উৎকল রমণীগণ কতক পরিমাণে সংস্কারপ্রাপ্ত, কিন্তু উল্টা দিকদিয়া। কথাটা একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিনাসিনী-গণ যেমন উপরের দিক হইতে কতকটা দূর পর্য্যন্ত অনাবৃত সভ্যতার অভ্যাস, উৎকলরমণীগণ নিম্নদিক হইতে কতকটা দূর (অর্থাৎ হাট পর্য্যন্ত) তজপ নগ্ন সভ্যতার অভ্যাস। এক বিষয়ে, কিন্তু উড়িয়া রমণীগণ অগ্রেই পূর্ণ সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাঁহাদের চুরুট খাওয়া—অনন্ত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে।

উড়িষ্যায় পারিবারিক সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ অনেকগুলি “ভেস্তা” হইয়াছে। “মা” নামের ছায় মধুর নাম জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ। শিশু সর্ক-প্রথমেই এই “মা” কথা বলিতে শিখে। আৰ্য্যজাতির মধ্যে এই মা-নাম কোন না কোন আকারে মাতৃসম্বন্ধ জ্ঞাপক। কিন্তু উড়িষ্যায় ইহার বাহিক্রম দেখা যায়। সেখানে “মা” হইতেছেন “বৌ”! ভগিনীকে বলে “অপা”; দাদাকে বলে “নানা”; “খুড়া” কে বলে “দাদী” বা “খুড়তা”; ভাইপোকে বলে “পুতরা”; জ্যেষ্ঠা কে বলে “জ্যেষ্ঠ পিতা” বা “জ্যেষ্ঠ পা”; বেহাই কে বলে “সম্বন্ধী”। তবে শালাকে অবশ্যই বলে “ছড়া”।

রাজাদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার উত্তরাধিকারী হয়, আর আর ছেলেরা কেবল খোরাক পোষাক পায়। রাজ্যের স্বাধিত্ব সম্বন্ধে এই নিয়মটি খুব ভাল। কিন্তু পুত্র সংখ্যা বেশী হইলেও আবার খোরাক পোষাক দিতে দিতে ছই এক পুরুষই রাজ্যক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। আমি একটা ছোট রাজাকে জানি, তাঁহার এলাকার মাত্র ২৬ খানি গ্রাম। তাঁহার বংশ বৃদ্ধিও আবার যথেষ্ট। তাঁহার পিতার আমল হইতে তাঁহার খুড়াদিগকে খোরাক পোষাক দিতে দিতে ৩৪ খানা গ্রাম বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আবার তিন পুত্র, ইহার ছই পুত্রকেও ছইখানি গ্রাম দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আবার তিন পুত্র; তাহার প্রথমটা ভবিষ্যতে রাজা হইবে, আর ছইটি অন্ততঃ ছইখানি গ্রাম খোরাক পোষাক পাইবার প্রত্যাশা করে। এই রূপে খোরাক পোষাক দিতে দিতে সেই রাজার ক্ষুদ্র “রাজ্যটা” অচিরে লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

বাজে লোকের মধ্যেও সব ছেলে সমান ভাগ পায় না। অত্যাঁচ পুত্র অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু বেশী অংশ পায়। তাহাকে “জ্যেষ্ঠাংশ” বলে। বাকী সম্পত্তি আর আর ছেলেরা সমান অংশে ভাগ করিয়া লয়। উড়িষ্যায় মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত।

উড়িষ্যায় অবস্থান কালে আমার একটা পোষা হরিণ ছিল। একদিন দেখি একটা ব্রাহ্মণ সেই মৃগশিকার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছেন। এ আবার কি ব্যাপার? অনুসন্ধান জানিলাম, হরিণ বা মৃগ হইতেছে সেই ব্রাহ্মণের “গোত্র”। অনেক জাতির এইরূপ গোত্রদ্যোতক জন্তু বা পশু (totem) আছে। বাহাদের কাণ্ডপ গোত্র, “কচ্ছপ” তাহাদের নিকট এইরূপে পূজনীয়। বাহাদের বাৎস গোত্র, গো-বৎস তাহাদের নিকট পূজনীয়। এইরূপে কোন কোন জাতির নিকট নাগ বা সর্প পূজনীয়। হুংখের বিষয় হরিণ দেবতাকে

বেরূপ প্রণাম করিতে দেখিয়াছিলাম, সর্প কিম্বা কচ্ছপ দেবতাকে সেরূপ প্রণাম করিতে দেখি নাই । এইরূপ ভক্তিপূর্বক প্রণাম পাইয়া সর্প দেবতা তাঁহার ভক্তের বিরোধে ছোদল মারিতেন কিনা, এবং কচ্ছপ দেবতা তাঁহার মন্ত্রকোপরি আরোহণ করিতেন কিনা তাহা আমার কোতূহলের বিনয় রহিয়া গিয়াছে ।

আমাদের দেশে বাহারা নাম দস্তখত করিতে পারে না, তাহাদের নাম যেমন অন্ত্র বকলম বা নিগান সহি দস্তখত করে, উড়িষ্যার ঠিক সেরূপ করে না । উড়িষ্যায় এক এক জাতির এক একটা “সগুক” বা চিহ্ন আছে । যেমন ব্রাহ্মণের “সগুক” কুলবটু (বা কুলের পুতলিকা), করণের সগুক লেখন (বা লোহার কলম), খণ্ডাইতের সগুক খণ্ডা (বা খাঁড়া), গউড়ের (গোয়ালার) সগুক “খোয়া” (বা মহনদণ্ড) ইত্যাদি । জ্বীলোক মাত্রেই সগুক “মুদি” অর্থাৎ অঙ্গুরী । সম্প্রতি প্রকাশিত আদম-সুমারি (census) রিপোর্টে গুট্ সাহেবও কতকগুলি প্রচলিত সগুকের ছবি দিয়াছেন । কোতূহলী পাঠক সেই রিপোর্টের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিবেন ।

আমাদের দেশে শাস্ত্রবিচারশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নস্তর কোটা একরকম নিত্য সহচর । উড়িষ্যায় কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ । কিন্তু এই অভাবটা তাঁহারা পানের দ্বারা স্তন সমেত আদার করিয়া ছাড়েন । “মাস্তান ব্রাহ্মণ” নামক এক শ্রেণীর তথা কথিত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের কিন্তু ধূমপান নিষিদ্ধ নহে । এই জাতিটা উড়িষ্যায় যথেষ্ট দেখা যায়—বেহারে এই শ্রেণীর নাম বোধ হয় “বাওন” । মাস্তান ব্রাহ্মণগণ বলভদ্র গোত্রী । খণ্ডাইত, চাষা ও অন্তান্ত জাতির যে উপাধি, মাস্তান ব্রাহ্মণদিগেরও সেই উপাধি । চেহারা দ্বারাও এই সকল জাতি হইতে মাস্তান ব্রাহ্মণকে বাছিয়া বাহির করা কঠিন । গলায় এক গাছ পৈতা খুলান এই মাত্র প্রভেদ । ব্যবহারেও ইহারা অন্তান্ত কৃষক শ্রেণীর ন্যায় ফসল চাষ করে, মোট বহে ইত্যাদি । কিন্তু জগন্নাথ মহাপ্রভুর অনুগ্রহে মাস্তান ব্রাহ্মণ এক বিষয়ে খুব উচ্চে উঠিয়াছে । ইহারা ই জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধন করিবার অধিকারী, স্তব্রাং পুরীতীর্থ যাত্রী মাত্রেই ইহাদের হাতে খাইতে বাধ্য । মাস্তান ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটা প্রবাদ প্রচলিত আছে । শ্রীশ্রীবলরাম ঠাকুর একদিন মদ খাইয়া নানা জাতির ঘরে ‘পশিয়া’ ছিলেন । তাঁহার গুরসে ও সেই সেই জাতির রমণীর গর্ভে যে সকল মাস্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ঠাকুরের বরে ব্রাহ্মণ

পদে উন্নীত হইল, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ জাতীয় পদবী রহিয়া গেল । আর একটা প্রবাদ এই যে পুরীর কোন এক রাজা এক মহাবক্র করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণের অনাটন হইল । তখন তিনি হুকুম দিলেন, “রাস্তায় যাহাকে পাও, তাহাকেই ধরিয়া আন ।” রাজার হুকুমে এইরূপে অনেক জাতীর লোক ধৃত হইয়া আসিল । রাজা তাহাদের প্রত্যেকের গলায় এক এক গাছ পৈতা “পকাইয়া” দিয়া, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বানাইয়া যজ্ঞ করিতে বসাইয়া দিলেন । সেই সকল কলিত ব্রাহ্মণের বংশধরই হইতেছেন মাস্তান ব্রাহ্মণ । (১)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ।

আমি কে ?

জ্ঞানিতে পাই, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ শাস্তি অথবা আতাত্তিক দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা হইতেই সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি । এই দুঃখ নিবৃত্তির মূলে “আমি কে ?” এই প্রশ্ন বর্তমান আ.ছ । দেখা যাউক এই প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা হয় । মনুষ্য যখন প্রথম চিন্তা করিতে বসে “আমি কে ?” তখন বোধ হয় আপন দেহ হইতে সে আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করে । এই জন্ত কোন কোন স্থলে “আত্মা” অর্থে “দেহ” । এই জন্তই বোধ হয় অজ্ঞান মনুষ্য দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে পারে না । এই জন্তই সাধারণ মানব দেহের সুখ দুঃখেই আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করে । দেহের হাস বৃদ্ধিতে নিজের হাস বৃদ্ধি মনে করে । ফল কথা, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দেহ ও আত্মা একই পদার্থ । কিন্তু যিনি বুঝিয়াছেন যে, দেহ ও আত্মা এক বস্তু নহে, তিনি অবশ্য “আমি কে ?” নির্ণয় করিতে যাইয়া নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই দেহ ‘আমি’ নহি । দেহ যদাপি ‘আমি’ নহি, তবে ইহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু । কিন্তু স্বতন্ত্র বস্তু

(১) উড়িষ্যার বিস্তৃত বিবরণ সংপ্রণীত ‘উড়িষ্যার চিত্র’ নামক উপন্যাসে দেখিতে পাইবেন ।
যদি ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে । —লেখক ।

হইলেও ইহার সহিত আমার জীবিতকালাবধি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ । দেহকে বাদ দিয়া আমার তিলান্বিত কালও চলে না । দেহকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা বিরাজমান আছেন । অতএব দেখা যাউক দেহ কি ? দেহের ভিত্তি চিন্তা করিতে করিতে এই স্থির হয় যে দেহ পারমাণবিক পদার্থের সমষ্টি । পঞ্চভূত তবে কি ? ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, ইহারাই পঞ্চভূত । এই পঞ্চভূত কোথা হইতে আনিল ? ইহার প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ কি না ? উত্তরে এই স্থির হয় যে, কোন অর্থে ইহার মৌলিক পদার্থ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহার মৌলিক পদার্থ নহে । অতি হৃদয় পদার্থ হইতে স্থল, ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত স্থলতর পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে । পঞ্চভূতের মূলে পঞ্চ হৃদয় ভূত, কিম্বা পঞ্চতন্মাত্র আছে । যথা, ব্যোম বা আকাশ তন্মাত্র হইতে আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু তন্মাত্র হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, অগ্নি তন্মাত্র হইতে তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ । এ স্থলে বলা আবশ্যক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ‘জল’ বা ‘বায়ু’ ইহাদের কাহাকেও মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না । রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহারা সগর্বে দেখাইয়া দেন যে Oxygen ও Hydrogen নামক গ্যাসদ্বয়ের সংযোগে জলের উৎপত্তি এবং oxygen ও nitrogen নামক বাষ্পদ্বয়ের সমবारे বায়ুর উৎপত্তি । কিন্তু হিন্দু দার্শনিকগণের পঞ্চতন্মাত্রের কথা চিন্তা করিলে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গর্ব নিতান্ত বালকোচিত মনে হয় । ফল কথা হিন্দুদিগের মতে বায়ু কিম্বা জল ইহাদের একটিও মৌলিক পদার্থ নহে, কিন্তু বায়ু ও জল তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন পদার্থ বিশেষ মাত্র । এখন ‘তন্মাত্র’ কি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । বস্তু সকলের অতি হৃদয় মৌলিক অবস্থা, বাহ্য অপেক্ষা হৃদয় অবস্থা আর ধারণা করা যায় না, তাহাই তাহাদের তন্মাত্র । শব্দ তন্মাত্র বলিতে শব্দের উচ্চ, মধ্যম, কিম্বা নিম্নাবস্থা ইহার কিছুই নহে । শব্দ তন্মাত্র উদার, মৃদার, তারার কোন অবস্থা ভেদ নহে । কিন্তু যে শব্দের উচ্চাদি কোন অবস্থা নাই, অথচ যাহার অস্তিত্ব আছে এমন শব্দকেই শব্দ তন্মাত্র বলে । তন্মাত্র, তৎ মাত্র, অর্থাৎ কেবল শব্দ মাত্র, purely abstract শব্দ, তাহার সহিত আর কোন গুণ বা অবস্থার অনুমান করিবার নাই । অনেক এই তন্মাত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহান হইতে পারেন, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে বখন কোন কোনো ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া দিবার উপায় নাই তখন অবিশ্বাসী পাঠকের সহিত আমাদের

বাদানুবাদ করা নিষ্ফল । এইরূপ পাঠকদের উদ্দেশ্য করিয়াই Madame Blavatsky তাঁহার Master দের ভাষায় বলিয়াছেন—“Let rather the planetary chains and other super and subcosmic mysteries remain a dreamland for those who can neither see, nor yet believe that others can. * এখানে বলা যাইতে পারে যে যোগীরা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তন্মাত্র সকল, এমন কি তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বিষয় সকলেরও অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন । যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম পঞ্চতন্মাত্র হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি । সে কিরূপ দেখা যাউক ।

এইবার পাঠকগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি লয় করিয়া ফেলুন । মনে করুন এই ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই সৃষ্ট হয় নাই । সকলই অন্ধকারময়, সর্বত্র নিবিড় অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার । এই ঘনান্ধকার হইতে কিরূপে সৃষ্টির আরম্ভ হইল চিন্তা করা যাউক । এই নিরবচ্ছিন্ন তমোরাশির মধ্যে কোন ভৌতিক পদার্থ ছিল না, এমন কি আকাশের অস্তিত্বও ছিল না । কিছুই ছিল না, কিন্তু সমস্তই ছিল । এই নিবিড় অন্ধকার, এই মহামেঘপ্রভা শ্যামাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রসূতি । তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টায় মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে করিতে Herbert Spencer বোধ হয় ঐরূপ একটা কিছু সত্যের অক্ষুট অভাস পাইয়া থাকিবেন । তাই বুলি বলিয়াছেন—that our harmonious universe once existed potentially as formless diffused matter and has slowly grown into its present organised state is a far more astonishing fact than would have been its formation after the artificial method vulgarly supposed ” এষ্ট অন্ধকারের মধ্যেই জগতের আদিকারণ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব নিহিত ছিল । অন্ধকার সামান্য বস্তু নহে । অন্ধকার সম্বন্ধে theosophy কি বলিতেছেন শুনুন : — “ Darkness is father—mother : Light their son, says an old Eastern proverb. Light is inconceivable except as coming from some source which is the cause of it ; and as in the instance of primordial light, that source

* আমরা এই প্রবন্ধের অনেক স্থানে ইংরেজ লেখকগণের মতাদি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি । স্থানান্তরে ইংরেজি অংশ সকলের অনুবাদ দিতে পারি নাই । ইংরেজি অনতিজ্ঞ পাঠকগণ আমাদের ক্রমা করিবেন । তাঁহারা ইংরেজি অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না । (লেখক)

is unknown, though as strongly demanded by reason and logic, therefore it is called "darkness," by us, from an intellectual point of view. * * * * * Darkness then is the eternal matrix in which the sources of light appear and disappear. * * Scientifically light is but a mode of darkness and *vice versa*. Yet both are phenomena of the same noumenon." এক্ষেপে ভ্রমোন্মী আদি কারণ হইতে কিরূপে ভূতাদির সৃষ্টি হইল দেখা যাউক । এখানে বলিয়া রাখি সুবিখ্যাত দার্শনিক Kant এর আবিষ্কৃত এবং Laplace প্রমুখ গণিতবেত্তাগণ কর্তৃক সূত্রীকৃত nebular theory কে আমরা সৃষ্টিবিষয়ক সম্পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করি না । উহাতে সৃষ্টক্রমের প্রথম কয়েকটি স্তর এক কালে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং মূল তত্ত্ব আদৌ নির্ণীত হয় নাই । তবে উহাতে আংশিক সত্য আছে, এ কথা ঠিক । শ্রীমতী Besant তাঁহার Building of the cosmos নামক সুপাঠ্য বক্তৃতার যেরূপে সৃষ্টিরহস্ত উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই বিবেচনা যোগ্য, এবং ঐ বক্তৃতা পাঠে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে । পাঠকগণ দেখিবেন উক্ত বক্তৃতার মনস্বিনী বক্ত্রী বলিয়াছেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ে Professor Crookes অনেকাংশে সত্যবধারণে সমর্থ হইয়াছেন । অস্ত্রান্ত পণ্ডিতগণের মত অনেক স্থলেই অলীক কল্পনা মাত্র । যাহা হউক, শাস্ত্রাদিপাঠে সৃষ্টিবিষয়ে আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব । অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দর্শনাদি আলোচনা করিয়া আপনাতঃ জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবেন । যাহাদের তত চেষ্টা বা অনুসন্ধান নাই, তাঁহারা বর্তমান প্রাক্কুর অস্তর্গত বিষয়গুলি স্থির চিত্তে পাঠ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না ।

আমরা বলিয়াছি সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, কেবল অনন্তব্যাপি ঘনাকার ছিল । 'কিছুই ছিল না' অর্থে ব্রহ্মাণ্ড বা সৃষ্টি ছিল না এইরূপ বুঝিতে হইবে । ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ অবশ্য বর্তমান ছিলেন । কেননা Ex nihilo nihil fit. কিছু না থাকিলে কিছুই হইতে পারে না । তবেই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্বে সেই অনাদি, অনন্ত পরম কারণ মহেশ্বর বিদ্যমান ছিলেন । তিনিই সাংখ্যিক "পুরুষ" এবং যোগীগণের পরম ব্রহ্ম । Theosophist গণ এই "পুরুষ" কে First Logos কিম্বা

অন্যত্র Unmanifested being সং অর্থাৎ pure or absolute existence বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি নিগুণ ও নিষ্ক্রিয়, যেন সুষুপ্ত । ক্রমে তাঁহাতে চৈতন্যের সঞ্চার অথবা সিসৃকার উদয় হওয়াতে তিনি ‘চিৎ’ ও ‘আনন্দ’ স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন । হিন্দু পাঠক এই সময় কারণ মনিলে নারায়ণের যোগনিদ্রাসম্ভোগ, অথবা বিকুর অনন্তধবায় শয়নের অপরূপ চিত্র মানস পটে দর্শন করুন । আমরা আর একটি অদ্বিতীয় চিত্রের কথা পরে উল্লেখ করিব । পাঠক দেখিবেন, এই দুই চিত্রে সৃষ্টিরহস্তের মূলতত্ত্ব সকল কত সুন্দর ভাবে পরিবাক্ত হইয়াছে । এই সকল চিত্রকে আমরা আধ্যাত্মিক রূপক্ আদৌ মনে করি না । সূক্ষ্মতম-লোকে ঐ সকল চিত্রের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল এবং এখনও আছে । কিন্তু সে কথা এখানে নয় । আমরা বলিতেছিলাম নিগুণ পরব্রহ্ম সিসৃক্ষ বা সগুণ হইলেন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম হইলেন । Theosophist গণ ইহাকে Second Logos, (manifest and unmanifest) বলিয়াছেন । এই Second Logosই সাংখ্যোক্ত ‘প্রকৃতি’ এবং পুরাণের মহাবিশ্ব । এ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা তদীয় শক্তি হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি । ব্রহ্মা সৃজনী, পালনী, ও সংহারিণী শক্তিকে স্থল ভাবে প্রকৃতি বলে । এই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি, এই জন্য সৃষ্টির অপর নাম কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতি । বিষ্ণুপুরাণ এই প্রকৃতির প্রধান নাম দিয়াছেন । সৃষ্টির মূলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের কার্যকারিতা আছে, এই জন্য প্রকৃতি সত্ত্বরজঃতমোময়ী । প্রকৃতিতে যখন এই গুণত্রয়ের সংক্ষেভ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আর যখন উক্ত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হয়, তখন সৃষ্টি লোপ হয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয়, এবং প্রকৃতি স্বয়ং পূর্বে লিপ্ত বা মিলিত হইয়া যান । পুরুষ তখন নিগুণ অর্থাৎ যোগনিদ্রাগত হইয়া অনন্ত শব্দায় শয়ান থাকেন । বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় সেই নিদ্রিত আদিপুরুষের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে । প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অনন্ত কোটি জগত সৃষ্টি হইতেছে, এবং সংহতি হইতেছে ।

বাহাইউক, সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতি হইতে, ভূতাদি সৃষ্ট হইবার পূর্বে সর্ব প্রথমে মহতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে । মহতত্ত্ব অর্থে সর্বব্যাপি চৈতন্য বা চৈতন্য সমষ্টি বুঝিতে হইবে । ইংরাজিতে বলিতে হইলে ইহাকে Universal consciousness বলা যায় । এই চৈতন্য সমুদয় বা Universal consciousness

হইতে জীবগণ ব্যক্তিগত, পৃথক পৃথক চৈতন্য অর্থাৎ individual consciousness প্রাপ্ত হইয়াছে । এখনও পর্যন্ত নৈই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কোন ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই । কেবল সর্বব্যাপি চৈতন্য বা একটি মহা চৈতন্যের সৃষ্টি হইয়াছে । এই মহত্ত্বকে কেহ কেহ আদি ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন । বৈষ্ণব দর্শনে First Logos কিম্বা পরম ব্রহ্মের নাম শ্রীকৃষ্ণ বা 'বাসুদেব', প্রকৃতির নাম 'সঙ্কর্ষণ', এবং মহত্ত্বের নাম 'প্রহ্লাদ' । সমষ্টিভূত চৈতন্য হইতে ক্রমে ব্যষ্টিভাবে জীব চৈতন্য বা ব্যক্তিগত চৈতন্য উৎপন্ন হয় । এই ব্যক্তিগত চৈতন্য বা individual consciousnessএর নাম 'অহঙ্কার' । বৈষ্ণব দর্শনে অহঙ্কারের নাম 'অনিকরু' । 'বাসুদেব', 'সঙ্কর্ষণ', 'প্রহ্লাদ', 'অনিকরু' এই চারিটি তত্ত্ব কইয়া বৈষ্ণব দর্শনের চতুর্ভুজ । বলা আবশ্যক, পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার এ সকলই সাংখ্যিকার মহর্ষি কপিলের ব্যবহৃত শব্দ । অবিকাংশ পুরাণে সৃষ্টির ক্রম বর্ণনা কালে সাংখ্যমতই গ্রহণ করা হইয়াছে । এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" বলিয়া সাংখ্যমতেরই প্রশংসা করিয়াছেন । যাহাউক মহত্ত্ব হইতে কিরূপে তন্মাত্রাদির সৃষ্টি হয় দেখা যাউক । পূর্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণেরই ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধিতে হইলে মহত্ত্বও সাত্বিক, রাজস, ও তামস ভেদে ত্রিবিধ । সাত্বিক মহত্ত্ব হইতে দেবতা ও মানবদির সাত্বিক অংশ সৃষ্টি হয় । রাজস মহত্ত্ব হইতে মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জীবের রাজসিক অংশ সৃষ্টি হয় । এবং তামস মহত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, স্থাবর, জঙ্গম, তির্য্যক্ প্রাণিগণ এবং মনুষ্যাদির তামসিক অংশ সৃষ্টি হয় । এক্ষণে প্রাণিগণের সৃষ্টিকার্য্য না চিন্তা করিয়া, কিরূপে পঞ্চতন্মাত্রাদি ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি হয় দেখা যাউক ।

মহত্ত্ব হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইবার সময় সর্বপ্রথম শব্দ উৎপন্ন হয় । এই শব্দই প্রণব বা পরাবাক্ শক্তি । ইহা অব্যক্ত । ব্যক্তাবস্থার প্রণব যথাক্রমে 'পশ্যন্তিবাক্', 'মধ্যমাবাক্' ও 'বৈখরীবাক্' এই তিন নাম দারণ করে । এ তিন প্রকার প্রণবের কার্য্যক্ষেত্র যথাক্রমে 'কারণ জগৎ', 'স্থল জগৎ' ও 'স্থল জগৎ' । কারণজগতাদির তত্ত্ব বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত আছে । শব্দের সাহায্যে কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিক পাঠক অবশ্য জানেন । কারণ, যাহাকে vibration বলে তাহা শব্দেরই নামান্তর ; এবং vibration হইতেই বেগ, তাপ, আলোক, তড়িৎ, প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । শব্দের

শক্তি সম্বন্ধে Theosophistগণের কোন পুস্তকে কি লেখা আছে তাহার কিঞ্চিৎ পাঠ করুন—

Alike in Kosmos and in man there is the power of sound —sound without which form cannot be, sound which is the builder of form, which generates form, every sound having its own form (as proved by western science) and every sound being of this triple character, that it generates form, that it upholds form, that it destroys form. Thus once again the trimurti appears, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর, * * * * The sacred word ॐ expresses the one and latent being, every power of generation, of preservation and of destruction. Preservation I say, since without sound nothing exists ; everything is in constant motion ; one sort of motion creates form, another preserves it, and the third disintegrates it ; and the destruction of one form is only the building of another. That which is destroyed in one shape is created in another. There is no annihilation.

হিন্দুরা কিজন্য প্রণবকে সকল তত্ত্বের মূল বলিয়া স্বীকার করেন এক্ষণে তাহা কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতেছে । ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে প্রণবের যে সমস্ত রূপ আছে তাহা মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্রে এবং তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের নিকট জ্ঞাতব্য । আমরা কেবল কতকগুলি হ্রস্বোদ শব্দের উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের অধিক কিছু বলিবার অধিকার নাই । সংক্ষেপে এই মাত্র উল্লেখ করিতে পারি যে ব্রাহ্মণের উপাস্য বেদমাতা গায়ত্রীর অর্থবোধ করিতে হইলে এই সকল তত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি করা ক্যতীত গতাস্তর নাই ।

বাহ্যহউক, মহত্ত্ব হইতে সর্ব প্রথম শব্দের সৃষ্টি হইল । শব্দ আকাশের গুণ । এই শব্দ হইতেই আকাশ তত্ত্বাত্ত্বের সৃষ্টি হইল । আকাশ হইতে বায়ু তত্ত্বাত্ত্বের সৃষ্টি হইল । বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ । বায়ু হইতে বহি তত্ত্বাত্ত্বের সৃষ্টি হইল । বহির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ । বহি হইতে জল তত্ত্বাত্ত্বের সৃষ্টি হইল । জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস । জল হইতে ক্ষিতি তত্ত্বাত্ত্বের সৃষ্টি হইল । ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । এস্থলে বলা আবশ্যক, মহাভারত এবং মনুসংহিতাদির কোন কোন স্থলে সর্বপ্রথমে জলের সৃষ্টি হইল এইরূপ বর্ণনা আছে । এস্থলে দার্শনিক তত্ত্বের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলেও

একরূপ মীমাংসা করা বাইতে পারে। হরত মহাভারতাদিতে সৃষ্টির ক্রমিক স্তর-গুলি নথানথ ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। না হয়, জনকে সাক্ষেতিক শব্দরূপে ব্যবহার করা হইরাছে। পুরাণাদিতে সাক্ষেতিক শব্দের বথে প্রয়োগ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। Theosophistগণও বলেন ‘fire’ and ‘water’ are sometimes used as symbolic names for ‘spirit’ and ‘matter’ respectively and express the duality of the Second Logos or ব্রহ্ম। বাহাইউক, পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত সম্বন্ধে শেখোক্ত গুণটিকেই প্রধান গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, ইত্যাদি। এইরূপে মহত্ত্ব হইতে একদিকে পঞ্চভূতের সৃষ্টি, অপরদিকে অহঙ্কার বা ব্যক্তিগত চৈতন্ত্যের সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, এবং চরাচরস্থ স্থল স্থল্য তাবৎ প্রাণিপুঞ্জের সৃষ্টি হইল। এখন বুঝা যাইতেছে পঞ্চভূত ও ব্যক্তিগত চৈতন্ত্য অর্থাৎ অহঙ্কারের সংযোগে মনুষ্যাদি জীবগণের সৃষ্টি। দেব-গণের দেহ স্থল ভূতে গঠিত নহে। সূক্ষ্ণভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের সমবায়ে তাঁহাদের অনৌকিক দেহ রচিত হইয়া থাকে। এই জন্ত দেবতাগণ ও সূক্ষ্ম জগত সকল মনুষ্যের স্থলেন্দ্রিয়ের অগোচর। সাধনবলে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইলে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি লাভ করা যায়।

এক্ষণে ‘আগি কে’? এই প্রশ্নের আংশিক মীমাংসা হইয়াছে। আগি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত এক অহঙ্কার বা ব্যক্তিগত চৈতন্ত্যের সমবায়ে উৎপন্ন জীব। তাহা হইলেই আনাতে পঞ্চতন্মাত্র হইতে গণনা করিয়া একাদশটি তত্ত্ব নিহিত আছে দেখিতেছি। কিন্তু অহঙ্কার পর্যন্ত স্থির হইলেই সমস্ত তত্ত্ব নির্ণীত হইল না। যেমন ত্রিবিধ মহত্ত্ব আছে, সেইরূপ ত্রিবিধ অহঙ্কারও আছে। মহত্ত্বকে macrocosm অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, এবং অহঙ্কারকে microcosm অর্থাৎ জীব সম্বন্ধে বুঝিলেই কোন গোল থাকিবে না। বস্তুতঃ macrocosm সম্বন্ধে যাহা সত্য, microcosm সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই জন্তই বলে “যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে”। একটি ব্রহ্মাণ্ড ও একটি পরমাণু একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। বিশেষতঃ জীব দেহ ও ব্রহ্মাণ্ডদেহ এতদূতরে বড়ই সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই গঠন ও কার্যাবলী এক। কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই মাত্র পার্থক্য। ফলকথা, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি চৈতন্ত্যের নাম মহত্ত্ব, এবং জীব দেহস্থ বিচ্ছিন্ন চৈতন্ত্যের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের সার্বিক অংগ হইতে জীবদেহে বুদ্ধি, মন এবং কৰ্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষ্টাত্রী দেবতা সকলের উৎপত্তি হয়। পাঠকগণ

স্মরণ করুন, আমরা এইজন্তই “অতীন্দ্রিয় জগৎ”* নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে জীব দেহস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্যমূলে এক একটি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী । রাজস অহঙ্কার হইতে জীবদেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় । পরিশেষে তামস অহঙ্কার হইতে জীবদেহে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয় । এস্থলে বলা আবশ্যক, হিন্দু দার্শনিকেরা ‘মন’কে ইন্দ্রিয় মধ্যে গণনা করিয়াছেন । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারিটিকে, এক সঙ্গে সংক্ষেপে অস্তংকরণ বলে । ‘চিত্তে’ ও ‘মহত্ত্ব’ ব্যাটি ও সমষ্টির প্রভেদ মাত্র । Individualসম্বন্ধে যাহাকে চিত্ত বলি, Universeসম্বন্ধে তাহাই মহত্ত্ব । বুদ্ধি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের রুদ্র, এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষেত্রজপুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা ।

তবেই দেখা গেল, জীবদেহে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত বা মহত্ত্ব লইয়া সর্বশুদ্ধ ২৪টি তত্ত্ব আছে । ইহারাই সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব । মহত্ত্বের পর কেহ কেহ ‘প্রকৃতি’ ধরিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব গণনা করেন ।

এতক্ষণে আমরা ‘আমি কে ?’ এই প্রশ্নের মীমাংসার উপনীত হইলাম । আমি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সম্বলিত জীব । আমি প্রকৃতির অধীন এবং সর্বদা প্রকৃতির দ্বারা চালিত । প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান আমার যতদিন না হইবে তত দিন আমি জন্মমরণাদি ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে বাধ্য । যে দিন আমি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিব, সে দিন আমি মুক্ত বা শিব । এই প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানই জীবের চরম সাধনা । এই জ্ঞান সাধন করিতে হইলে আত্মাকে সর্বদা দেহ হইতে পৃথক ভাবনা করিতে হয় । দেহের সুখ দুঃখে আত্মাকে বদ্ধ পূর্বক উদাসীন রাখিতে হয় । আত্মা স্বভাবতঃ নির্মল ও নির্লিপ্ত হইলেও দেহের সান্নিধ্যবশতঃ সমল ও অসক্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । জীব বা microcosm পক্ষে দেহ ও আত্মার বে পার্থক্য, ব্রহ্মাও বা macrocosm পক্ষে প্রকৃতি ও পুরুষও সেই পার্থক্য । পুরুষ যেন প্রকৃতিরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া বিরাজমান আছেন ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস ।

প্রভাবতীর ছানাবড়া ।

১

তোমার এ ছানাবড়া নানা সুষমায় গড়া,
চর্কণেতে সর্কছুঃখহরা ;
কিবা সু-তনুর ছাঁদ, যেন সপ্তমীর চাঁদ,
তারি মত পীণু যেতে ভরা ;
মরি, কি সুন্দর বর্ণ, নিন্দ্রিয়া কষিত স্বর্ণ,
(যাহা, হায়, মোর ঘরে নাই,—
কিবা আসে যায় তাতে, যদি প্রতিদিন পাতে
হেন ছুটি ছানাবড়া পাই !)
আহা, কি সুন্দর গন্ধ, জ্বিনিয়াছে মকরন্দ,
জুটিছে অলির অন্ধ ঝাঁক,
আবরণ খোলা দায়, আসিয়া বসিতে চায়,
পাইলেই এতটুকু ফাঁক ।
কেমন নধর কান্তি, হৃদয়ে উপজে ভ্রান্তি,
জিহ্বায় মাখায়ে দেয় লাল্য,
যদবধি না মিলন, কেবলি সে উচাটন,
রাধার বিরহে যথা কাল্য !
সে পূত মিলন হলে, যবে তার তনু গলে,
হৃদয়ের টুটে আবরণ,
কি দেখি ভিতরে তার ? — কোমলতা মধুতার
অনবদ্য সূচক মিলন !—
পেস্তা-আঁটা বাটা ক্ষীর, শুভ্র শোভা নবনীর,
তায় এলাচির দানা রাজে,
বৃন্তে ঘেরা যথা বেলী,—আশা-বাঁধা প্রেম-কলি,
সুরভি বিরহ মাঝে মাঝে !
কেবা আছে বঙ্গবধু, দিতে পারে হেন মধু,
যেমন তোমার ছানাবড়া,
রূপে, গুণে, ঠিক পাকে, সবেত্র দূরে থাকে,—
কেউ থম্বসে, কেউ কড়া ।

২

মহাকবি কানিদাসে, বঙ্কিমের উপন্যাসে,
 হেম-রচা হৈম কবিতায়,
 রবীন্দ্রের কাকলীতে, নবীনের যুদ্ধ-গীতে,—
 কোথাও না দেখিলাম, হায়,
 লয়ে রসনার প্রীতি কেহ রচেছেন গীতি ;
 রসনা কি এতই অসার ?
 চক্ষুঃ, কণ, স্বক, শ্রাণ, কি কারণে সম্মান
 পেতে পদ্যমহলে পসার ?
 বলে কবি,—“শোভাময়ি, গানমাখা-কণ্ঠে, অয়ি,
 অধরের পরশে শিহরি,
 তোমার অলক-গন্ধ, যেন সামবেদ-ছন্দঃ,
 ধমনীতে নাচায় লহরী !”—
 বলে জিহ্বা,—“ওন কবি, মোরা পাঁচ ভাই সব
 এক ঘরে এক অন্নে রয়ে,
 কাটাতেছি জন্মাবধি ; মনে করে দেখ যদি,
 পড়িয়া থাকিলে বোধোদয়ে ।
 তবে কেন মোর প্রতি হেন অবিচার অতি ?
 কাব্যে কেন মোর স্থান নাই ?
 আমার তৃপ্তির কথা, না জাগায় কবি-ব্যথা,
 কেন তাহা গুনিবারে চাই ।
 আমার নির্মল আশা, শৈশবের ভালবাসা,
 জননী-স্তন্য-পূত কথা,—
 তাহে না কবিতা জুটে ? তাহে না উপমা ছুটে ?
 গদ্যময় হেন সরলতা ?”—
 অবজায় বক্র ঠোটে, কবি সেথা হতে ওঠে ;
 রসনা কানদিয়া তবে কয়,—
 “দেখ, দেখ ছু দৈবর,— ব্যক্ত গুপ্ত কবির,
 বিদ্যার সাগর মহাশয় !”

শ্রীবরদাচরণ মিত্র ।

মন্দ ।

(শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় রচিত মন্দ পাঠ্য)

আজ তোর নিস্তরঙ্গ ভাব সিন্দূবকে,
 কার এ উদার মন্দ, হাঁ মা বীণাপাণি !
 কে তোর ও শুষ্ক তন্ত্রী চেতাইয়া স্পন্দে
 গাহে এ তৈরব স্বনে, হে কল্পনা-রাণি !
 ক্ষীণ-প্রেম-গীতি মুগ্ধ শ্রাম কুঞ্জে তোর
 এ উন্মাদ আশা ভেরী বাজিল কাহার ?
 নির্ভয়ে, বিচারি' কেবা নিগড় কঠোর
 ছিঁড়িল, টুটিল গর্বে পীড়িতা ভাষার ?
 কোটি মৌন কণ্ঠ মাঝে স্থির, অচপল
 কার আজি উঠিল এ সতেজ ঝঙ্কার ?
 কে দেখাল, কে বুঝাল, কি দীপ্ত প্রবন,
 তোর বক্ষে মাতৃভাষা ! করিছে সঞ্চার ?
 কোন্ বর পুত্র তোর কমল-আসনা
 করিল এ সম্ভাবনী বিজয়-ঘোষণা ?

শ্রীগিরিজা কুমার বসু ।

জনস্তুভ ।

চুষক শলাকা যেমন মেরুমুখী হয় সেইরূপ আকাংক্ষার দিক হইতে বাম্পাগ্র-
 ভাগ ও উত্তাল তরঙ্গায়িত অধুরাশির দিকে শটনঃ শটনঃ অগ্রার হইতে থাকে ।
 কখনও কখনও অতি অল্প দূর মাত্র অগ্রনর হইয়াই নিঃশেষে ভাবে অবস্থান
 করে । স্তুভ পুচ্ছটি আর অবতরণ করে না । জনস্তুভের লক্ষ্য ভ্রষ্টতাই ইহার
 কারণ, এই বৃত্তি নির্দেশ করা বোধ হয় অসম্ভব নহে । বাম্পস্তুভ অধুরাশির
 নিকট হওয়া মাত্র উহার বক্ষদেশ ক্ষীত হইতে থাকে ।

১৭৫১ সালে জালাবার্ট (M. Jalabert) ছেনেভা হুদে পুর্কোক্ত

দৃশ্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন । উভয় গিরি-শ্রীপরিবেষ্টিত হইয়াও এই ক্ষুদ্র ইনটুকু তাড়িতের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় নাই । জালাবার্ট বলিয়াছেন “মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিরম উল্গ্বন করিয়া ও অমুরাশি উদ্বেলিত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে প্রয়াস পাইতে লাগিল । কিন্তু অনতিদূরে বায়ুগুণ স্থির নিষ্পন্দ ।” (১)

১৭৫২ সালে এই ইন্দু হইতে একটি ভয়ঙ্কর সরল স্তম্ভের শূন্য উঠিবার প্রয়াস জালাবার্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । উর্ধ্ব মেঘের চিহ্ন মাত্রও নাই, তথাপি স্তম্ভটি অদৃশ্য শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শূন্য উঠিতে লাগিল । কিন্তু উর্ধ্ব মেঘ না থাকাতে স্তম্ভটি অনির্ভর অবস্থায় আর অধিক দূর উঠিতে পারিল না । অল্পদূর মাত্র উঠিয়াই ইন্দু-বেলা-ভূমিতে প্রবল বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইল ; আর অমনি তটদেশে জলপ্রাবন উপস্থিত হইল ।

নিউজিল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত শ্বিথবীপের পূর্বোত্তর প্রান্তে প্রিন্সেস্ চার্লট (Princess Charlotte) উপসাগরে কাপ্তান কুক, ১৭৭৩ সালের ১৭ই মে তারিখে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী পণ্ডিতপ্রবর ফরেষ্টারকে সমভিব্যাহারে যে জল নাত্রা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দেখিয়াছেন যে অতি সন্নিকটে সমুদ্র উদ্বেলিত ও কেনিল হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই গুল ফেনরাজি ফুলিতে আরম্ভ করিল, এবং নাবিকগণ সমুদ্র মধ্যে জলের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ উখিত হইতেছে দেখিতে পাইল । এই স্তম্ভটি অগ্রেমে মেঘের সঙ্গে মিলিত হইয়া গেল ; এবং মুহূর্তমধ্যে আরও তিনটি সূর্য্য স্তম্ভ প্রথমটির চারি দিকে উৎপন্ন হইল । তন্মধ্যে প্রাণটি স্রাহজ হইতে অন্ধম, ইল মাত্র অস্তরে অবস্থিত ছিল । ক্ষণকাল মধ্যেই ইহা অতি আশ্চর্যজনক ভৌতিক কার্য্য সংঘটন করিয়া আরবা উপত্যাসের দ্বিতীয় অবতারণা করিয়াছিল । সূর্য্যকিরণসম্পাতে জলস্তম্ভ পীতবর্ণে রঞ্জিত হইল এবং চাক্রমূর্তি ধারণ করিয়া দর্শকবৃন্দের প্রীতি বর্ধন করিতে লাগিল ।

কাপ্তান নেপিরার তৃতীয় জলযানের সন্নিকটে একবার জলস্তম্ভ সন্দর্শন করিয়াছিলেন । তিনি যেমন দেখিলেন অমনি রিভলবার লইয়া স্তম্ভকে গুলি করিলেন, স্তম্ভটি বিচলিত হইল, আবার রিভলভার ছুড়িলেন এইবার গুলি স্তম্ভের ক্ষীণ ভাগে স্পর্শ করিল এবং স্তম্ভটি ছিন্ন করিল । স্তম্ভটি দুই ভাগে বিভক্ত হইল । কিন্তু উহা পুনরায় মিলিত হইবার জন্ত বেন ছিন্ন সর্পের

জল হেলিতে ছলতে লাগিল। হেলির ঢলিয়া পুনরায় উইটী অংশ মিলিয়া গেল। এবার কিন্তু ইচ্ছাজল ভেদ হইল। যে ভয়ঙ্কর নিবিড় মেঘরাশি স্বর্গ দেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল বারিবর্ষণে তাহা অপগত হইল, এবং যেন নিম্মুক্ত প্রভাকর আবার সুনীল গগনে জগৎকে আলোকিত করিল। যেন বৃষ্টি হয় নাই; সকলি যেন অলীক, স্বপ্নের ছায়া মাত্র।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি জনপথে একবার পূজার ছুটিতে বাড়ী যাউতেছি, মহা নদীবক্ষে জলস্তুম্ভ সন্দর্শন করিলাম। শরৎ কাল,— নদী পূর্ণমলিনা, ধলেশ্বরীর জল রাশি তর তর বেগে ছুটিয়াছে—ভাঙ্গপ্রভার বহুধা দীপ্তিময়ী; ধীরে ধীরে আকাশের এক প্রান্তে একখণ্ড নীরদ উদ্ভিত হইল। দেখিতে দেখিতে মেঘখানা আকাশে পরিবাস্ত হইল, প্রভাকরকে ঢাকিল, বিশ্বয়োৎকর্ষ লোচনে দেখিলাম—পশ্চিম গগনে হস্তিশৃঙের মত একখণ্ড মেঘ ছলিতেছে। একটি উইটী করিয়া আরও কয়েকটি মেঘখণ্ড এই প্রকারে আকাশ হইতে খুলিয়া পড়িল, উহার মধ্য হইতে একটা নদীবক্ষ স্পর্শ করাতেই সেখানকার জলরাশি উচ্ছলিত হইল এবং একপ্রকার সোঁ সোঁ শব্দ শ্রুত হইল। আমরা তন্তুযন্ত্রে সন্নিহিত একটি ঝোড়ার মধ্যে আশ্রয় লইয়া এই অপূর্ণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ইতিপূর্বে জলস্তুম্ভের বিষয় পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি নাই। আনন্দ, বিশ্বয় ও ভয় বৃগপৎ আমার হৃদয় পরিপ্লুত করিল। আমি তন্ময় হইয়া উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত উহা স্থায়ী হইল, তাহার পরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একণে গম্ভীর পরিত্যাগ করিয়া আমরা ইহার বৈজ্ঞানিক বৃত্তি নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব।

আবর্তন নিবন্ধন বায়ুস্তম্ভের মধ্যস্থলে কেন্দ্রবিমুখ শক্তির (Centrifugal force) উদয় হয় এবং তদ্ব্যতিক্রম স্তম্ভের মধ্যস্থল একেবারে বায়ুপরিশূন্য হয়; চারিদিকে বায়ুরাশি অবিরত প্রচণ্ড বেগে আবর্তন করিতেছে, সুতরাং কোনও প্রাসাদপৃষ্ঠ দিয়া এই ঘূর্ণমান বায়ুস্তম্ভ প্রবাহিত হইলে প্রাসাদোপরি বায়ুর বাহ্যিক চাপ (external pressure) হঠাৎ হ্রাস হইয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে প্রাসাদমধ্যস্থিত বায়ুরাশি একেবারে বহির্গত হইতে না পারায় দেওয়ালে ও ছাদে প্রাসাদমধ্যস্থিত বায়ুরাশির চাপ অত্যন্ত অধিক হয়। ইতিপূর্বে প্রাসাদের বাহিরের ও মধ্যের বায়ুর চাপ সমান ছিল, কিন্তু এফণে বাহিরে

বায়ুর চাপ কিছুই না থাকতে, আভ্যন্তরিক চাপ অত্যন্ত অধিক হয় । (১)
এই আভ্যন্তরিক চাপনিবন্ধন দেওয়াল ও ছাদ প্রভৃতি দ্বিগ্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ।

এক্ষণে, সমুদ্র বক্ষে এই প্রকার বাতাবর্ত উপস্থিত হইলেই জনস্তম্ভ উদয় হয় । ইহা প্রথমতঃ অতি উর্দ্ধ মেঘমণ্ডলে হস্তিশৃঙের জায় প্রকাশ পায় । পৃথিবীর নিকটবর্তী স্থানে উপরের স্থান অপেক্ষা বায়ুর গতির প্রতিরোধ অনেক বেশী, সুতরাং উর্দ্ধেই বায়ুর আবর্ত প্রথম আরম্ভ হয়, এবং নিম্নস্থ শীতল বায়ুরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে । এই শীতল বায়ুরাশি তূর্ণ মধ্যস্থিত উচ্চ ও অধঃ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলেই বাষ্পরাশি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মেঘরাশি ও হস্তিশৃঙাকারে পরিণত হয় । বায়ুস্তম্ভের আবর্তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পৃষ্ঠের নিকটস্থিত প্রতিরোধ অতিক্রম করিতে থাকে । এং শৃঙের অগ্রভাগ ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড় । এই প্রকারে স্তম্ভের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান সমুদ্রবক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হয় । এই শূন্যস্থান দিয়া জলরাশির উর্দ্ধে উঠিবার ঝোঁক থাকে ; এবং বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধ বক্রগতি কর্তৃক জলরাশি উর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘস্তম্ভের সহিত মিলিত হইলেই জনস্তম্ভ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । (২)
জলরাশি উর্দ্ধে উঠিবার ঝোঁক অন্য কারণেও সংঘটিত হইতে পারে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঘূর্ণমান বায়ুস্তম্ভের মধ্যস্থিত বায়ু একবারে শূন্যতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই বায়ুস্তম্ভ সমুদ্রবক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হইলে সমুদ্রবক্ষকে যে স্থানে বায়ু স্পর্শ করে তাহার মধ্যবর্তী স্থান বায়ুভারশূন্য হয় কিন্তু উহার চতুর্দিকে বায়ু তন্নিম্নস্থ বারিরাশি পূর্ববৎ চাপিতেছে, সুতরাং চারি দিকের বায়ু চাপ কর্তৃক প্রসীড়িত হইয়া চাপহীন স্তম্ভ মধ্যস্থিত জলরাশি ক্ষীত হইয়া উর্দ্ধে উঠে । সুতরাং বায়ুচাপে বেক্রপ ভাবে পীচকিরী ভিতর জল উঠে সেইরূপে বায়ুস্তম্ভের ভিতর জল উঠিয়া জলস্তম্ভের উদয় হয় । এই শেষ যুক্তিটী একেবারে প্রবল না হইলেও অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ।

বর্তমান সময় পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিবুধমণ্ডলী পূর্বোক্তযুক্তিসমূহ দ্বারা জনস্তম্ভের কারণ তত্ত্ব নীমাংসা করিয়াছেন ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় ।

(১) ১২গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ১৫ পাউণ্ড বা ৭২ সের ভারের চাপ বাহা হয় সেই হারে ।

(২) W. Ferrel in Mathametical Monthly.

বলদ পঞ্চানন ।

নারদীয় ধর্ম শাস্ত্রে .

(শ্বেতবরাহকল্পে চাতুর্থ্যপর্বে বোড়শ অধ্যায়)

এই পঞ্চানন স্বয়ং সিন্ধুবিদ্যা মহানহোপাধ্যায়—ইহার নামই পঞ্চানন, বলদ এই শব্দটী উপাধি । ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কখন কখন পদ সংস্থানের পৌর্দ্ধাপূর্ন ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে, সুতরাং “বলদ” পদটি উপাধি । এ উপাধি-টা উপহাসজনক নহে । আভিধানিক অর্থের দ্বার্থ থাকিলেও আমরা বুৎপত্তি লভ্য অর্থ লইব ; অর্থাৎ বল-দান করে নে ; অথবা বলধ্বংস করে নে ।

উপাধিটি কোথা হইতে পাইলেন ? কার্য্য দেখিয়া সমাজ দিলেন, রাজা তাহা অমুমোদন করিলেন । বলদ শব্দে ব্যবসায়ী লোকের ভারবাহী বলীবর্দ নহে, ঠিক জানিবেন । তবে দুক্লির অত্যন্ত স্থূলতা বা স্থূলতার চরম সীমা অতিক্রান্ত হেতু বলীবর্দে লক্ষণা করা যাঠিতে পারে ।

পাঠক এখন জিজ্ঞাসা করিবেন ইনি কোন শাস্ত্রে পণ্ডিত ? আমরা কহিব ইনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ । তাহা না হইলে উপাধি পাঠিলেন কেন ? পাঠক কহিবেন “উপাধি ব্যাবির্বেব স্তাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে ।”

বিদ্যা আছে । “ কাজে কুড়, ভোজনে দেড়ে, বাক্যে মারেন পুড়িয়ে” এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ।

১ । কুড়মীর অধ্যাপনায় ইহার তিনটি ছাত্র ছিল । একটির নাম বাদসাই আলসে, দ্বিতীয়ের নাম গোপ খেজুরে, তৃতীয়ের নাম গুলিখোরের ইয়ার ।

• বাদসাই পরীক্ষার জন্য ঘরে আগুন দিলেন, অনেকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল । আধা আলসে কহিল “কও রবি জলে” । বাদসাই আলসে কহিল “কে বা আঁখি মেলে” । বাদসাই কহিলেন “সাবাস সাবাস সাবাস সাবাস, বলিহারি যার” ।

• গোপ খেজুরে পণে গাছতলার শুইয়া আছে, গোঁকে খেজুর পড়িয়াছে, কে মুখে তুলিয়া দিবে ? একজন পখিক কহিল, “তোমার মুখে খেজুর রহিয়াছে, খাইতেছ না কেন” ? সে উত্তর দিল “তুমি জান আমি নবাবী আলসে, অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণাবাতে আমার মুখে ফেলিয়া দিলে খাইতে পারি । আমার উদ্যোগ শূন্য পুরুষ, আমাকে এখনও আলসেমির আর একটৈপঠা উঠিতে হইবে ।”

তৃতীয় আলসের কথা। গুলিখোরদিগের সঙ্গীর এক জনের মস্তক কাটা যায়। তাহার পুত্রাদিরা মুণ্ড লইয়া রাজ্য দ্বারে অভিযোগ করিল। রাজা সেই মুণ্ড কাহার জানিবার জন্ত গুলিখোরদিগকে সাক্ষিস্থলে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এই মুণ্ডটি তোমাদের সঙ্গী গুলিখোর রামকান্তের কিনা।” তাহার কহিল, “দাম্পত্যের আমরা বহু দিন হইল একত্র উহার সহিত গুলি খাইতাম বটে—কিন্তু কখনও তাহার মুখত দেখি নাই”। রাজা বুঝিলেন যে উহারা এত বড় আলসে যে কেহ কাহারও মুখ দেখিবার অবসরও পায় না।

২। পঞ্চানন ভোজন পটুতা শাস্ত্রাধ্যাপনায় অনেকগুলি ছাত্র পাঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুই জন কৃতকন্ধ্যা ও প্রাপ্তোপাধিক হইয়া তাঁহার কালেজ হইতে বাহির হইলেন। একজনের নাম মহাপেটুক বিদ্যাবাগীশ, আর এক জন তাঁহার দাদা দামোদর। মহাপেটুককে একটা নিমন্ত্রণের ভোজনের পর চারি পাঁচ জনে বসিয়া পংক্তি হইতে হস্ত ধারণ পূর্বক উঠাইয়া দিল। সে কষ্টে স্রষ্টে দুই চারি পাদ গমন করিয়া ক্রমশঃ আস্তে আস্তে শয়ন করিল। লোকে কহিল “তুমি বড় পেটুক”। সে কহিল “দেখ হাম্ কাসা খায়া, খানেওয়ালো দেখ ভি হামারা দাদাকো দেখ, হাম পাওদলমে আতাই। দাদাজীভি এয়ছা ভোজন লিয়া উন্কা উঠনেকা তাগুন হের নেয়। উছিছে উন্কো জর ও লেড়কো খাটিয়া পর উঠাকর লে আতা হৈ।”

পরান্নং পবিত্রং মনো ত্রিভু লোকেষু চর্লভং ।

বাবদেহে স্থিতাঃপ্রাণাস্তাবন্ গৃহস্থি পেটুকাঃ ॥

বলদপঞ্চাননের শেষাবস্থায় চতুস্পাঠার ছাত্রগণ শব্দ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনিও বাচলানীতে লোককে জ্ঞাতন করিতেন।

শেষ বয়সে লোকে প্রায় হরিপরায়ণ পরম ভাগবত হয়। বলদপঞ্চানন এই প্রকার অনুবর্তী না হইবেন কেন? তিনি তিলকসেবা আরম্ভ করিলেন, হরিনাম করিবার নানা বর্ণের বুনী ও ঠকঠকী গ্রহণ করিলেন, মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। অবলাকুলের শেষ বিধান ভোজন হইলেন। ভক্ত বৃন্দ আসিয়া সেবা করিতে লাগিল। একদিন দুই সতীর্থ নিষোর পরস্পর একটা শব্দ লইয়া ঘোর বাগ-বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। একজন “বদরী” ফলকে কচু বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। আর একজন কহিলেন “না তুমি প্রভুর নিকট শিক্ষা কালে মনোযোগ দেও নাই। বদরী কলের অর্থ কাচকলা।”

আবাত ১৩১০]

বলদ পঞ্চানন ।

১৬৫

শিষ্যদ্বয় প্রভু বলদ পঞ্চানন গোস্বামী মহোদয়ের নিকট আসিয়া উভয়ের অর্থ উভয়ে বিজ্ঞাপন করিল । প্রভু হতবুদ্ধি হইলেন বটে, কিন্তু চাতুর্য্য প্রভাবে কহিলেন, “জ্ঞানদাস বাপাজী যে বদরীকে ব্যাখ্যা করিয়াছ কচু, সেটা তোমার পক্ষে অতি উত্তম হইয়াছে । না হইলে কেন ? তুমি ভাগবত চুড়ামণি । তুমি বাগদৌ কুলের প্রহ্লাদ স্বরূপ । তোমার মহড়া নেয় কে । আশীর্বাদ করি, দীর্ঘ-যু হইয়া আমার তিরোভাবের পর তুমি আমার মঠরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ।”

দ্বিতীয় শিষ্যের নাম চৈতন্য দাস । ইহাকে অলিঙ্গন ও অষ্টাঙ্গে চুম্বন করিয়া কহিলেন, “বাপু আমি তোমার ব্যাখ্যা শুনে অবাক্ হইয়াছি । তাই ভাবিতেছি প্রভু কি আবার যুগান্তর না হইতেই ধরণী মণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন ? বদরীকে কাঁচকলা ব্যাখ্যা করিয়াছ । কোন অভিমান কর্তা এতদূর অর্থ দেখিতে না শুনিতে পান নাই । তোমাকে ত আমি কোন আশীর্বাদ করিতে সাহসী হই না । তবে বলি, তুমি আমার সালোক্য সাযুগ্য প্রাপ্ত হও এবং নেড়া নেড়ি আঁটকুড়ীদিগের সমাজে বিরাজমান হও । তাহারা তোমার সেবক হউক ।” চৈতন্য দাস, কহিল “প্রভু কি মৌনংসা করিয়াছেন ! উভয়ের কি মর্যাদা রক্ষা করিলেন ! না হবে কেন, যেমন বংশে জন্ম । গোস্বামীর ঔরসে জাত, নাম বলদপঞ্চানন । সার্থক জন্ম, সার্থক নাম ।” (উভয়ের কোলা কুলি ও দণা প্রাপ্তি, আর হরি বোল শব্দ) ।

আর এক শিষ্য কহিল “গোসাই প্রভু আমার একটা সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতে আস্থা হয় ।” প্রভু কহিলেন, “বৎস প্রশ্ন কর ।”

সে বলিল,

“নমো নলিন নেত্রায় রেণুবাদ্য বিনোদিনে ।

রাধাধর স্মরণান শালিনে বনমালিনে ॥”

কবিতা শুনিয়া পঞ্চাননের চক্ষু হইতে অনবরত নদীর স্রোতের ন্যায় ধারা বহিতে লাগিল । শিষ্যগণ নিস্তব্ধ !—প্রভুর কি হইল ! এতজন কহিল, “দণা উপস্থিত না হয় ।”

প্রভুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপর শিষ্য কহিল “আর ভয় নাই, প্রভুর চৈতন্য হইয়াছে । প্রভুর বদনে সকলে জলোচ্ছ্বাস দিন । জলপান করিতে-দিন ।” তাষূল ও তাম্বকুটাদি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া প্রভু সজীব হইলেন । এখন প্রভু কহিলেন, “গৌর, তুমিই জীবের কল্যাণে রত তোমাকে নমস্কার করি ।

শিষ্য নিত্যানন্দ দাস ! শুন,—“নমো নলিননেত্রায়” এটুকু বোধ হয়, না জানে এমন বৈষ্ণব কেহ নাই । সুতরাং ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন” ভক্তগণ বলিল “আহা” । তৎপরে “বেণু বাদ্য বিনোদিনে” এই অংশটুকু যে বৈষ্ণব না জানে সে পামর কুলপাংশুল, পাষাণ ও নাস্তিক, অধিক আর কি বলিব, যে বলিবে জানি না, তাহার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া ফেলি ।” তাবুক শ্রোতৃগণ বলিল “আহা আহা !” গুরুপরায়ণ ছাত্র অবৈষ্ণব পরিগণিত হইবার ভয়ে আর কোন কথা কহিল না । গুরু আবার বলিতে লাগিলেন, “তবে—‘রাধাধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে’ এটুকুর অর্থ অবশ্য আমি করিব । স্বামী লাগুক না লাগুক তাহাতে আমার কি ?” বলদপঞ্চাননে—“আগে গ্রন্থটা শুন ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার মিলন হইলে, একদিন উভয়ে একত্র উপবেশন করিয়া নানা কোতূকের সহিত আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভক্ত গৌর কার্য্য না করিয়া প্রভুকে সভাস্তিক একটি পান দিল । ঐ পানটা খাইতে শ্রীকৃষ্ণের মনে একটু দ্বৈধভাব হইল । তিনি ভাবিলেন শ্রীরাধা স্ত্রীজাতি কিছু বুঝিতে পারিবেন না ; তাহাকে দেওয়া বাউক । তাই প্রিয়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শ্রীরাধে ! তাম্বুল ধর । শ্রীরাধা তাম্বুলটা হস্তে লইয়া কহিলেন, “সুধাপান” । শ্রীরাধার এই শ্বেষ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মনে ক্রোধ হইল, কহিলেন, “ভূমিত আমার সভাভাষা বা কল্পিণী নহ । ‘শালি নে’—এখানে শালি অর্থে শালিকা । শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রণয় সূচক অশ্লীল ও কঠোর বাক্যে শ্রীরাধা বিরক্ত হইয়া কহিলেন “বনমালি ! নে” । কেমন ব্যাখ্যা ঠিক হইল কিনা ।” সকলেই এক বাক্যে কহিল, “প্রভু বেখানে অতিথির প্রেম সেই খানেই প্রেমের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন ।” আর এক শিষ্য কহিল “এ শ্লোকটা তবে রসোল্লাসের নহে, রসাভাসের ।” বলদপঞ্চানন গোখানী কহিলেন, “তাই বটে ।”

এক শিষ্য কহিল “এ ব্যাখ্যায় স্বামী লাগিবে কি ?” বলদপঞ্চানন কহিলেন, “না লাগিবে কেন ? শ্রীরাধার যে প্রকার রাগ দেখা যাইতেছে, ও ঝটনা কুটিলে ও বড়াই বুড়ী আনা গোনা করিতেছে, শ্রীরাধার রাগটা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাড়িলে, আমার আশ্রয় দাদার প্রতি অনুরাগে পরিণত হইবে । সুতরাং স্বামী আপনি লাগিবে অর্থাৎ স্ত্রীর পতিতে অনুরাগ হইবে ।”

এক শিষ্য কহিল, “প্রভু ! আমি আপনকার কৃত অর্থটা আমরা আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক অদ্ভুত পাষাণ ঘোর শাস্ত আসিয়া দাড়াইল, ‘নমো নলিননেত্রাদির’ ব্যাখ্যা শুনিয়া হাশ্ব করিয়া

কহিল “ওরে ভূত, বোকা অভাগা, শোন তোদের গোস্বামীর কথা আর কি বলিব—নিভান্ত মূৰ্খ ।

যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, যিনি বংশী বাদনদ্বারা সকল জীবকে মোহিত করেন, এবং যিনি রাধার অধরামৃত পানে অত্যানন্ত অর্থাৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাঁহাকেই নমস্কার করি—শ্লোকের অর্থ এই ।”

“প্রভু আর কি বলিব ! নমস্কার কথাটা শুনিয়া আমার গা জলিয়া উঠিল । বেটাকে সকলে মেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম । আম্পর্ক ! অখিলের পতি কৃষ্ণ, তাঁহার সহিত সাম্যভাব, তাই নমস্কার !

বলদ পঞ্চাননের যেমন শব্দ শাস্ত্রে ও ব্যাকরণাদিতে পাণ্ডিত্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রে-ও তদপেক্ষা পাণ্ডিত্যের নূনতা দৃষ্ট হয় না ।

একটা ছাত্র পঞ্চাননের নিকট প্রণ কঁরিল, “গুরু শুনিয়াছি, চন্দ্রের বোটা মাত্র কলা, পোনেরটা আমরা দেখিতে পাই, একটি দেখিতে পাই না । কেন সেটা দেখা যায় না এবং উহা কোথা থাকে, সব লোপ হইলে আবার কোথা হইতে আইসে ?” পঞ্চানন কহিলেন, “গুরুপক্ষের চন্দ্র অর্থাৎ যখন জ্যোৎস্না হয়, তখন ষোল কলা । যখন কৃষ্ণপক্ষ আঁধার—তখন চৌষট্টি কলা । ভারতের উক্তি আছে যথা,—“চন্দ্র সবে ষোল কলায়, কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ।” তখন ছাত্রগণ সমস্তরে বলিল—আহা মরি ! কি ব্যাখ্যা ! পাঠকও বলিলেন—“আহা মরি বলদ পঞ্চাননও পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ।”

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ।

মেঘদূত ।

কোথা কবি ! কবে কোন্ আষাঢ়ের দিনে,
নবনীল মেঘভার হেরিয়ে গগনে,
কল্পনা-কুসুম-বনে করি বিচরণ
করেছিলে কাব্যসৃষ্টি, মুগ্ধ ত্রিভুবন !
সে দিন কি বিরহের দারুণ হতাশে
কঁদেছিল প্রাণ তব ? তাই কি উদাসে

এহেন করুণ-গীতি ? রামগিরি শিরে,
তাই কি বিরহী বক্ষ ভাসে আঁখিনীরে ?
বরষে জলদ-জাল, চমকে বিজুরী,
প্রিয়র বিরহ-শোকে শিহরি শিহরি
কাদে প্রাণ ঘন ঘন, ময়ূরী হরষে
অঙ্গ ভঙ্গ করি নাচে, শ্যামস্বর্ণ দেশে,
হাসে পুষ্প পুঞ্জ পুঞ্জ, আকুলিত হিয়া,
দৌত্য কার্যে মেঘ বার প্রিয়ার লাগিয়া ।

শ্রীবোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

সমালোচনা ।

বেতালে বহুরহস্য । শ্রীচন্দ্রনাথ বাবু এম এ প্রণীত

মূল্য ১০ চারি আনা ।

আমি আমার “প্রবন্ধ লহরী”তে চন্দ্রনাথ বাবুর কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছি । যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কাহারও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্ম সম্বন্ধে, যদি আমার চিন্তার গতি কিরিয়া থাকে তাহা ভূদেব বাবু, বঙ্কিম বাবু, ও চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ; গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহা লইয়াছি, তাহাতে কৃতজ্ঞতা ; যাহা লই নাই, তাহাতে প্রতিবাদ । সেই জন্য যেমন ঐ তিন জনের নিকট কৃতজ্ঞ আছি ; তেমনি তিন জনের লেখার বিরুদ্ধেই সময় সময় প্রতিবাদ করিয়াছি । অদ্য যে পুস্তিকার সমালোচনা করিতেছি, তাহার মূখ্য কথাতে আমাদের প্রতিবাদের কিছুই নাই । কেন না তাহা আমাদেরও মর্ম্ম কথা ।

বৈতাল পত্নী নামক হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাতে নানা মনোহর গল্প আছে । তাহার মধ্যে একটি গল্প এই—

“ধর্ম্মপুরে গোবিন্দনামে ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার দুই পুত্র । তন্মধ্যে একজন ভোজন বিলাসী ; অর্থাৎ অন্ন ও বস্ত্রনে যদি কোনও দোষ থাকিত

তাহা দুজের হটলেও ঐ অনের ও ঐ বাঙ্কনের ভক্ষণে তাহার প্রভৃতি হইত না ; দ্বিতীয় শন্যাবিলাসী ; অর্থাৎ শব্দায় কোন দুর্লক্ষ্য বিষয় ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না । ইহার মধ্যে ভোজনবিলাসী নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি আহাৰ করিতে উপদেশন করিয়া, শাশান সম্বিহিত ক্ষেত্রজাত ধাত্তের অগ্নে—শবগন্ধ পাঠিয়া আহাৰ করিতে পারে নাই । আর একজন শব্দাবিলাসী—দুর্লক্ষ্যনিভ পরম রমণীয় শব্দায় শয়ন করিয়াও ঐ শব্দায় সম্ভ্রম ভলে এক ক্ষুদ্র কেশ ছিল বলিয়া, তাহাতে নিদ্রা নাটতে পারে নাই ।” এই দুইটী গল্পে অভ্যুক্তি থাকিলেও ইহা অবলম্বন করিয়া, পূর্বে ইচ্ছিরের তীক্ষ্ণতা ছিল, এক্ষণে সে তীক্ষ্ণতা নাই, ইচ্ছিরের ও দেহের অননতি হইতেছে, গ্রন্থকার এই গুরুতর তথ্যের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন । আমরা কিন্তু অশুক্রণে, বিলাসানগ্নে পতঙ্গবৎ ছুটিয়া পড়িতেছি, দগ্ধ হইতেছি, ছটফট করিতেছি—তবুও ঐ দীপনিখাতিমুখে না ছুটিয়া থাকিতে পারি না । তাদের ভরা পদ্মার আবর্ত বেমণ নৌকাকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া, তাহাকে অতলজলে ডুবাইয়া দেয়, তেমনি তথাকথিত সভ্যতার বিষময় সৌখীনতার এক ভয়াবহ আবর্ত আমাদের সর্বনাশ গর্ভে নিমগ্ন করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাটতেছে । আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না ।

আমাদের জীবনীশক্তির বিলোপ হইতেছে আমরা নিজেই নিশ্চয় হইয়া পড়িতেছি । আমাদের সেই পূর্বের সাহস, ক্ষুণ্ণ সামাজিকতা প্রভৃতি আর নাই । আমাদের বালকেরা পর্যন্ত যেন বৃদ্ধের স্থায় গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে । আমরা সকলেই ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছি । যে ভীত, নিজেই, বিলম্ববৎ সে আপনাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না । অপরকেও বিশ্বাস করিতে পারে না *মনে বাহ্য করি কাজেত আমরা কিছুই করি না—কাজে আমরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের স্থায় পড়িয়া আছি । আমাদের দেহের পক্ষাঘাতে আমাদের মনও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে ।—(২০-২১পৃ)

• চন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালি জাতির কায়িক ও মানসিক রোগ নিরূপণ করিয়া তাহার নিদানতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন :—

আমরা বাল্যেরিয়া বিবে জঙ্ঘরিত, তুকার আমরা জলপান না করিয়া বিধপান করি ; আমরা বিকৃত অনিশ্চয় জবা ভক্ষণ করি ; দুগ্ধ, যুত, মৎস্য প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরই শোচনীয় অভাব ঘটয়াছে ; আমরা ভাত পর্যন্ত পেট ভরিয়া ধাইতে পারি না । অশচ বিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিবাস্ত ; দুষ্টিয়া দুর্ভাবনার আমরা অভিজ্ঞ ; আমাদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া বাইতেছে । * * * সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি গুরুতর কার্য্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সূনিয়ম ভঙ্গ করিতেছি’ (২৩ পৃঃ) ।

এই সকলই যে কেবল মাত্র কারণ তাহা নহে, এইরূপ নানা কারণ আছে ।

তাহা ধীর ভাবে নিরূপণ করিবার জন্য চক্রনাথ বাবু সকলকেই অনুরোধ করিতেছেন । এই হতভাগ্য জাতি যে জীবন মরণ সমস্যায় আনিয়া পড়িয়াছে অচিরে এই সমস্যার সমাধান না হইলে, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, এই অনপলোপা সত্য, গভীর বিষাদের সহিত, আন্তরিক সরল স্বদেশ প্রেমিকতার সহিত তিনি ঘোষণা করিতেছেন । এই গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া এক্ষণে তুচ্ছ বিষয় হইয়া দেশের ধুরন্ধরগণ সে উন্নত হইয়াছেন তাহাতে তিনি মর্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি কারন্ত হইয়াও বৈদ্যের উপরে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত নহেন । তিনি বস্তু হইয়া আপনাকে অজ্ঞধারী বীর ক্ষত্রিয় সম্মান প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিনী ভাষা নিয়োগ করেন নাই । তিনি অবগত আছেন—যেমন ব্রাহ্মণগণ যদি মোক্ষমূলর-পদছায়ায় বসিয়া, অদ্য গবেষণা বলে নবতর উদ্ভাবন করিয়া, “আমরা ইংরাজ ইংরাজ” বলিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে তাহারা জেতা ইংরাজের অধিকার বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না ; তেমনি কায়স্থগণ যদি “আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা ক্ষত্রিয়” অথবা “আমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ” বলিয়া তারস্বরে বঙ্গদেশ প্রতিধ্বনিত করেন, তাহা হইলে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ করিবার বা আহাৰ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না । কন্মই অবনতির হেতু, কন্মই উন্নতির মূল । যে ব্যক্তির বা যে বর্ণের, বা যে জাতির কন্মের পুণ্ড্রবল আছে, সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও তাহার উন্নতির বাধা দিতে পারে না, তাহার শ্রেষ্ঠতা খর্ব করিতে পারে না । পুণ্যে সমাজের উন্নতি, পাপে অধোগতি । তাই চক্রনাথ বাবু বলিতেছেন যে আমাদের গাণেই আমরা এমন হইরাছি’ (পৃঃ ৪০)

লোভে পাপ । পাপে মৃত্যু । তাই আমরা মৃত্যুমুখে । আমাদেরই এক্ষণে লোভ, বিলাস বৈভবে । টাকা আমাদের উপাস্য দেবতা । মান খোয়াইয়া হউক, তঞ্চকতা করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, টাকা কর, তাই টাকা কর । একবার টাকা করিয়া ফেল, তখন আর তোমার চুরির কথা কেহ বলিবে না । তখন তুমি মান্য, গণ্য, পূজ্য । যে সমাজ ধনের দাস, যে সমাজ পাপে পরিবর্জিত, যে সমাজ ঈশ্বর-পরিবর্জিত, তাহার দুর্দশার অন্ত কোথায় ?—চক্রনাথ বাবু বলিতেছেন,

বোধ হয় যে আমরা বিশ্বনাথকে ভুলিতেছি (৪০ পৃ)

আমরা বলি, “বোধ হয়” কেন—নিশ্চিতই আমরা বিশ্বনাথ, বিশ্বনিরস্তা

আগস্ট, ১৩১০ ।

মাই থাই ।

১৭১

বিশ্বনিয়ম ভুলিতেছি । তাই আমাদের এত দুর্গতি । চন্দ্রনাথ বাবু প্রথমে বর্তমান হিন্দুজাতির রোগ নির্ণয় করিলেন । তাহা কার্মিক ও মানসিক পক্ষাবাত ।

তৎপরে তাহার কারণ নির্ণয় করিলেন । তাহা স্বাস্থ্যজনক পেষ ও খাদ্যের অভাব এবং স্বাস্থ্য জনক প্রকৃতির অভাব । এই উভয় অভাবের মূলে স্বকৃত পাপ গূঢ়াধিষ্টিত ।

রোগের চিকিৎসা—বিশ্বনাথের প্রতি ভক্তি—যে ধর্মভিত্তির উপর হিন্দু সমাজ সংস্থাপিত ছিল, সে দৃঢ় ভিত্তির উপর আবার তাহাকে সংস্থাপিত করিতে হইবে । তাহা না হইলে, বৃথা কংগ্রেস কন্ফারেন্স, বৃথা শিল্পাদির প্রদর্শনী, বৃথা ব্যবস্থাপক সভার সভাগিরি । সুধী চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ বাবু তাহার বেতালে বহরহস্য নামক পুস্তিকাতে জাতীয় জীবন মরণ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন । এক্ষণে আমাদের দেশে অধিকাংশ লেখকই দেশের বর্তমান সমস্যা আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ । এই হৃদ্যে চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের অনেকটা আশা ভরসা । তাহার “বেতালে বহরহস্য” শিক্ষিত বঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ও আলোচ্য । তাহাতে মহার্ঘযুক্ত বাক্য আছে ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রললি রায় ।

মাই থাই ।

(প্রথম প্রস্তাব)

নবপ্রভার পাঠক মহাশয়েরা পৃথিবীর পুরাতন ভূগোল শাস্ত্র পাঠ করিয়া বহুল দেশ ও মহাদেশের নাম, প্রকৃতি এবং ইতিহাস বিষয়ে প্রকৃষ্ট রূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মনোরম “মাই থাই” মূলক পৃথিবীর কোন্ অংশে অবস্থিত তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন ? ইউরোপীয়! প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ প্রণীত ভূগোলাদির নবা পাঠকপুঞ্জের নিকটে, ভারতবর্ষ ও চীন দেশের মন্যস্থিত যে প্রাচীন মূলক “সাম” বা “সাম্মাম” (Siam) নামে

পরিচিত, তাহারই প্রকৃত নাম মাই থাই ।* ‘মাই’ শব্দের অর্থ দেশ, ‘থাই’ শব্দের অর্থ স্বাধীন—অর্থাৎ “স্বাধীন দেশ” (The land of the free) । সামবাসীদিগকে তাহাদের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এখনও মাই থাই বলিয়া পরিচর দেয়, সাম বা সায়াম শব্দ তাহাদের প্রাচীন বা নবীন ইতিহাসে কিম্বা ভূগোলে নাই । তাহাদের জন্মভূমিকে “সামদেশ” বলিয়া আখ্যাত করিলে তাহারা বিবাদ ও বিদ্বেষের সহিত আখ্যাতকারীকে তিরস্কার করে এবং এই অশ্রুতপূর্ব নাম শ্রবণ করিয়া উপেক্ষার সহিত মৃদু মধুর হাস্য করিয়া থাকে । কোতুহলাক্রান্ত পাঠক মহাশয়েরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “তবে সাম বা সায়াম নাম কোথা হইতে বা কেমনে উৎপন্ন হইল ?” ইহার সম্ভবতঃ এই যে, মুসলমানেরা যে সময়ে এ দেশে সর্বপ্রথম বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল এবং বিশেষতঃ যে সময়ে তাহারা এদেশে ইসলামীয় ধর্ম ও অধিকার বিস্তার করিতে প্রয়াস করিয়াছিল, যে সময়ে চীন পিতার ঔরসে এবং সায়ামী মাতার গর্ভে উৎপন্ন যে সকল সঙ্কর বা অস্ত্যজ জাতি মিনামা নদী তটে বাস করিত, তাহারা শান্ বা সাম (shan or sham) নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, এই শান্ শব্দ হইতে মুসলমানী সাম শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে । এই জন্ত এ দেশ এখনও ইউরোপীয় ও ইসলামীয় সমাজে সাম নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । শানদিগের বংশ অদ্যাপি সাম দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ।

আমরা বাম্পীয় অর্ণব পোত হইতে অবতরণ করিয়া সায়ামী তরণী যোগে মিনামা নাম্নী মনোহারিণী তটিনী অতিক্রম পূর্বক সামের রাজধানী বঙ্গকক্ক (Bangkok) নগরে উপনীত হইলাম ।† এই স্রোতস্বতীর উভয় কূলে বিবিধ বিচিত্র দেবালয়সমূহ দর্শন করিলে পথিককে মস্তমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকিতে হয় । নদীর নিম্নল সলিলে যখন এই সকল অসংখ্যসংখ্য অট্টালিকা ও মনোহর দেবমন্দিরের অপক্লপ ছায়া নিপতিত হয় তখন সে সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে মনোমধ্যে এক অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে । মিনামা নদীর

* রোমকেরা ভ্রম ক্রমে মাই থাই (Muang Thai) মুয়ং থাই বলিয়া উচ্চারণ করিত, এজন্ত এখনও ইংরাজেরা সামকে ‘মুয়ং থাই’ कहিয়া থাকে ।

† ইংরাজি ভূগোলের পাঠকেরা সামের রাজধানীকে বাংকক্ক বলিয়া উচ্চারণ করেন, ইহা ভ্রম । এই নগরের প্রকৃত নাম বঙ্গকক্ক ; এ কথা প্রস্তাবান্তরে বিদ্রূপ রূপে বুঝাইব । বৌদ্ধদেশের অনেক শব্দ ইংরাজিতে অতীব বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়—তদাখা, কং চং কু শব্দ ইংরাজিতে Confucius কন্ ফিউশন্ নামে উচ্চারিত হইয়া থাকে ।—লেখক ।

স্থানে স্থানে সামাধিবাসীদিগের বংশনির্মিত কুটীর দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল কুটির এমন সুন্দর ও সুদৃঢ় যে প্রবল বন্যা বা ঝটিকায় তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না অথবা ভাসিয়া যায় না । এখানে এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা বংশপরম্পরায় জলচর জন্তুর স্থায় কেবল জলের উপরেই বাস করে । ঘাটে উপস্থিত হইবা মাত্র নানা প্রকারের বহুলোককে আমরা আহাৰ্য্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দেখিয়াছিলাম । এই সকল ভোজ্য দ্রব্য বিক্রেতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মধ্যে মধ্যে এক একজন লোককে “আইশা—কি” “আইশা—কি” বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে দেখিয়া আমরা বিস্ময় সহকারে একজন ফিরিস্মিকে জিজ্ঞাসা করিলাম “আইশা-কি” শব্দের অর্থ কি ? মৃদু মধুর হাস্য করিয়া সাহেব কহিল “বিক্রেয় পদার্থের নাম Icecream (আইশক্রম্) অর্থাৎ বরফের কুল্পী” !!

নগরে প্রবেশ করিবার পূর্বে সর্বস্থানেই বহুসংখ্যক সারমেয় দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, পৃথিবীর কোনও স্থানে বোধ হয় এত কুকুর একত্রে থাকে না । এই সকল কুকুরের গায়ের রং স্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি । এক একটা কুকুরের গায়ের চর্ম্ম চিতা বাঘের গাত্রের চর্ম্মের স্থায় চিত্রিত । ইহারা এদেশের সর্বত্র বিচরণ করে কিন্তু উপদ্রব করে না । এই সকল কুকুরেরা দেখিতে সুন্দর বটে কিন্তু ইহাদের আচার অত্যন্ত জঘন্য । কুকুরেরা মেধরের কার্য্য করে এবং ইহাদের দেহ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় ; সময়ে সময়ে সেই দুর্গন্ধ অসহনীয় হইয়া উঠে । উগ্র প্রাকৃতিক নয় বলিয়া পখিকেরা প্রায়ই সারমেয় কর্তৃক দংশিত হয় না । নগরে প্রবেশ করিয়া যে সকল স্ত্রীলোক দেখিলাম তাহাদের একটিও অলঙ্কার বর্জিত নহে ; শেষে জানিতে পারিলাম, এখানকার স্ত্রীলোকেরা এক্রূপ অলঙ্কার প্রিয়া যে, খাউতে পাউক আর নাই পাউক, ইহাদের গাত্রে অলঙ্কার থাকা নিতান্তই আবশ্যক । এই জন্ত স্বর্ণ বা রৌপ্যের অভাব হইলে লৌহ, তাম্র, কাষ্ঠ, টীণ প্রভৃতি নির্মিত অলঙ্কারও ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে । কুমারী কিম্বা সখবা অথবা বিধবা সকল স্ত্রীলোকই অলঙ্কারকে স্তম্ভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করে ।

রাজধানী ব্যাংককে আমি অনেক দিন ছিলাম, কিন্তু প্রথম সপ্তাহ কাল অতীত না হইতে হইতে আমি সায়ামী জাতি ও সায়াম দেশ সম্বন্ধে বাহ্যিকিছু জানিতে পারিলাম তাহাতে আমার কোতূহল বৃদ্ধি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল ।

প্রথম কথা এই যে, সায়ামী দেশের লোকের মুখের চেহারায়, শরীরের গঠনে, আহার ও গার্হস্থ্য ক্রিয়ায় এবং বিশেষতঃ তাহাদের মাতৃ ভাষায় এবং কথোপকথন কালে উচ্চারণ পদ্ধতিতে আমি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম । তাহার পরে তাহাদের ভাষার অক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, অনেক অক্ষর আমাদের বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ, ঙ্কার, উকার, রেফ, বিন্দু, চক্ৰবিন্দু, রফলা প্রভৃতি অবিকল বাঙ্গালার নিয়ম প্রণালীমত । গ, ম, ঞ, ষ, ব প্রভৃতি অবিকল বাঙ্গালা । “ চিঃ চিঃ ” “ খাই কি না খাই ” “ পথ চোল্ (চল) ” প্রভৃতি কথা প্রত্যেক অণুতে অণুতে বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে মিলে । এখানকার প্রধান প্রধান প্রখ্যাত প্রবন্ধ পণ্ডিতেরা ব্যাংকককে “ বঙ্গ কঙ্ক নগর ” বলিয়া পরিচয় দেয় । এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া লাভিলাম, বুঝিবা কোনও সময়ে এদেশে বাঙ্গালীর গতি বিধি ছিল । পরিণামে প্রকৃষ্ট অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, সামদেশ এক সময়ে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল ; কেবল হিন্দুরাজ্য নহে, এই সুদূরবর্তী সামদেশ বাঙ্গালী জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালী জাতি কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল । একজন সায়ামী সৈনিকপুরুষের গৃহে আমি তাহার এক কণ্ঠার গলদেশে রৌপ্যানির্মিত একটা মাছলি দেখিয়াছিলাম, ঐ মাছলীর পার্শ্বে একটা সুবর্ণের কবচ ছিল । কবচের আকার চতুষ্কোণ, ইহার উপরে বাহা খোদিত ছিল তাহা একদা সুস্পষ্ট ভাবে পাঠ করা যায় না, কিন্তু যে কয়েকটি অক্ষর এখনও পড়া যায় তাহার অবিকাংশই খুব পুরাতন বাঙ্গালা । চিত্র দ্বারা না দেখাইলে তাহা আমি পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিব না ; যদি সায়ামী ভাষার বর্তমান অক্ষর সমূহ বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত মিলাইয়া চিত্র করিতে পারিতাম তাহা হইলে পাঠক মহাশয় বুঝিতেন, সায়ামের অক্ষরের সহিত বাঙ্গালা ভাষার অক্ষর প্রায় এক । কবচে যে কয়েকটা অক্ষর পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা এই—

“রৌব নাম শ্রীজগদ্রম পতি...ছে” এই সকল মহাপ্রয়োজনীয় কথার আলোচনা, তৃতীয় প্রস্তাবে বিশদরূপে করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে । এতলে ইহা বলিয়া রাখা উচিত, আসিয়ার, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিলে আজিও বাঙ্গালাক্ষরে খোদিত মুদ্রা এবং তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনেক বৎসর পূর্বে উজ্জয়িনী নগরীতে আমি এক খুব প্রাচীন মুদ্রায় বাঙ্গালা অক্ষর দেখিয়াছিলাম । সম্প্রতি মেদিনীপুরের “মেদিনীবাক্তব” নামক সাপ্তাহিক সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, উক্ত জেলাস্থগত গড়বেতা নামক সমৃদ্ধি সম্পন্ন

পুরাতন গ্রামে মাটির নিম্নদেশে হইতে একটা স্তূর্ণ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহার একদিকে স্তূর্ণপৃষ্ঠে বাঙ্গালী অক্ষরে বাহা খোদিত আছে, তাহা এই—

“শ্রীরাধা গোবিন্দচরণ সেবকস্ত” অপরদিকে বাঙ্গালীক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত দেখা গিয়াছে—

“শ্রীগন্তীরসিংহ নৃপবরস্ত চন্দ্রাদ ১০৪৩” এই সকল প্রমাণাদি দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালী নৃপতিদিগের শাসন সময়ে বাঙ্গালী অক্ষরে বাতুমূর্তি খোদিত হইয়া জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত হইত। এই সকল পুরাতন অক্ষরের বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বাঙ্গালী ভাষার ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সমুদ্র সামদেশে একটি সায়ামী লোকেও রজকের (ধোবার) কার্য্য করে না। এখানে বাহারা ধোবার কার্য্য করে তাহারা চীনের লোক, ইহাদের একজনও শ্রামবাসী নহে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানকার স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সোমবারে যে রংএর কাপড় পরিতে দেখিয়াছ, মঙ্গলবারে সে রংএর কাপড় পরিতে দেখিতে পাইবে না। এইরূপে প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন রংএর কাপড় পরিহিত হইয়া থাকে, তদ্যথা—রবিবারে লোহিত, সোমবারে শ্বেত, মঙ্গলবারে বাসন্তী রং, বুধবারে সবুজরং, ইত্যাদি ইত্যাদি। সামান্ত (দরিদ্র) লোকেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় আর কোনও দেশে বস্ত্র সম্বন্ধে এরূপ প্রথা নাই।

- শ্রামদেশে বাঙ্গালীর আগমন, উপনিবেশ স্থাপন, রাজ্যবিস্তার এবং অধঃপতনের বিবরণ দিবার পূর্বে, সায়াম দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা স্বংক্ষেপে অভিযুক্ত করিতে চচ্ছা করি। সায়ামের স্তূর্ণ, টীন, কাঠ, শ্বেত হস্তি, মাংগোস্টীন ফল এবং মৎস্য ব্যবসারে পৃথিবীর বহুজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। লোক সংখ্যা প্রায় ৯৬ লক্ষ; ইহার মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। পুরুষদিগের মধ্যে এক লক্ষের ভিতর একজনেরও দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই দাঁত কৃষ্ণ বর্ণ, ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দাঁতকে কালো করে; আমি কোতুহলাক্রান্ত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় একজন সায়ামী বলিয়াছিল কুকুরের মত শুভ্র দন্ত অথবা মুসলমানের মত দাড়ি রাখা ভদ্রলোকের কৰ্ম্ম বা ধৰ্ম্ম নহে”।
- বাহারা ধনধান তাহারা নথ কাটেনা, এক এক জন ধনীলোক বা উচ্চপদস্থ

কর্মচারীর অঙ্গুলির নখের যদি চিত্র দেখাইতে পারিতাম তাহাইলে পাঠক মহাশয়েরা আমোদ ও আশ্চর্য্য অনুভব করিতেন । কাহারও কাহারও নখের অগ্রভাগ বিগুন্ধ ও মূল্যবান স্তব্ধ দিয়া বাঁধান থাকে । সকলেরই গলায়, হাতে বা কোমরে তাবিজ, মাছলী, পদক বা কবজ ঝোলান আছে ইহা দেখিয়াছি ; পুরোহিতেরা ভূত, প্রেত, দৈত্য ও মাহুকদিগের হস্ত হইতে শিষ্যের পরিব্রাজ্য এই নিরাপদাঙ্গিকা মাছলী পরিতে দেন ; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে পুরোহিত মহাশয়েরা নিজেই এক একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বা প্রেত !! সামদেশ বাসীরা ভাত খায় ; চা, চুরুট ও পানের (তাম্বুলের) প্রচুর ব্যবহার হইরা থাকে কিন্তু সুরার প্রচলন প্রায়ই নাই । গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে, কুঠরীর সংখ্যা বিঘোড় করিতেই হইবে, অর্থাৎ ২ ৪ ৬ ৮ প্রভৃতি সংখ্যার কুঠরী (Rooms) থাকিলে সে গৃহে কখনই মনুষ্য বাস করিবে না ; ১ ৩ ৫ ৭ ৯ প্রভৃতি সংখ্যার গৃহ হওয়া চাই, নতুবা সে গৃহ ভূত ও প্রেতেরই উপবৃদ্ধ, মানবাধি বাসের যোগ্য নয় । গ্রহাচার্য্য, গণক, জ্যোতিষিক প্রভৃতির প্রভুত্ব সর্বত্রই প্রবল । ভূত ভবিষ্যৎ গণনাকারীদিগের কথায় মাই থাই দেশের লোকেরা মরে ও বাঁচে । “রোজা” বা “অদৃষ্ট গণনাকারী”র সহিত পরামর্শ না করিয়া ইহারা কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করেনা ।

সাম দেশে বার বৎসরে এক যুগ হয়, যে বে বৎসরে যে যে জীবের আধাত্ত থাকে তাহা এই—মৃষিক, গাভী, ব্যাঘ্র, শশক, সর্প, কীট, অশ্ব, ছাগ, বানর, মোরগ, কুকুর ও গুগুর । যাহারা বলেন, সায়ামে জাতিভেদ নাই, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত ; এদেশে কথায় কথায় জাতি ভেদ দেখা যায়, এদেশের লোকের হাড়ে হাড়ে জাতি ভেদ প্রথার প্রভাব প্রকৃষ্ট প্রকারে প্রবেশ করিয়াছে । এখানকার নৌকা অতি সুন্দর ; মৎস্য ধরিবার প্রণালীও চমৎকার । নরপতির প্রায় একশত খানি নৌকা আছে, তন্মধ্যে প্রধান নৌকা খানি স্তব্ধ মণ্ডিত । রাজার পরিচ্ছদের বর্ণ পীত, রাণীর পরিচ্ছদের বর্ণ লোহিত, এবং সেনাপতির পরিচ্ছদের বর্ণ সম্পূর্ণ শুভ্র ।

এদেশের আদালত সমূহের বিচার প্রণালী অদ্ভুত ৭ অন্ধ, খজ্জ, বোবা, বধির কুমারী, ভিক্ষুক ও জুয়াড়ী (Gamblers) এই কয়েক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আদালতে কোনও মোকদ্দমায় “সাক্ষী” স্বরূপে আহূত হয় না । পুত্র যদি পিতার পীড়ার সময় বখাসাধ্য সেবা না করে অথবা তাহার মৃত্যুর পরে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি বখারীতি সম্পন্ন না করে তাহা হইলে পৈতৃক ধন ও সম্পত্তি

হইতে সে বঞ্চিত হয় । হত্যাকারীর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহাকে খনের মধ্যে বন্ধ করিয়া প্রকাণ্ড স্থানে লাঠি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলা হয় এবং ভূমিতে তাহার রক্ত পতিত হইবার পূর্বে মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে । নিখা সাক্ষ্য দিয়া যদি কেহ কাহারও প্রাণদণ্ডের কারণ হয় তাহা হইলে নিখা সাক্ষীকে হাতির পায়ে বাঁধিয়া দিয়া নগরে ঘুরাইয়া আনা হয়, তাহাতে তাহার প্রাণত্যাগ না হইলে বড় বড় কুকুরের দ্বারা তাহার মাংস খাওয়াইয়া দেওয়া হয় । ব্যভিচারীগণ প্রকাণ্ডপথে বেত্রদ্বারা আহত হইয়া থাকে ; বলাৎকারীর কপালে বা কপালে অঙ্গারতণ্ড নৌহ-শলাকার দাগ দেওয়া হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুরেরা পশুশালায় জীতদাসরূপে নিযুক্ত হইয়া রাজার হাতির জন্ত ঘাস কাটে । নরপতির বার্ষিক আয় প্রায় দুই কোটি টাকা, এখানে টাকার নাম “টাইকল” । বাজারে শস্যাদির পরিমাণের সময় দোকানদারেরা যে মাপ ব্যবহার করে তাহা অতীব কৌতুকান্বিত ; তাহা এই—

৮৮০ তিস্তিড়িবীজে	...	...	অর্ধনারিকেল ।
২৫ অর্ধনারিকেল	...	...	একটা বাঁশের ঝুড়ি ।
৮০টা বাঁশের ঝুড়ি	...	...	একটা শকটভার ।
১২টা শকটভারে	...	...	অর্ধরাজহ ।
২৪টা রাজহ	...	...	এক সংসার ।
৩ সংসারে	...	...	এক জাহাজ ।
১২ জাহাজে	...	...	এক সমুদ্র ।

ছোট ছোট বালকদিগের পাঠশালায় একদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম ; দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা, রাজা, রাজকর্মচারী ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে কেমনে পত্র লিখিতে হয় তাহাই তখন শিক্ষা করিতেছিল । রাজাকে পত্র লিখিবার প্রথা এই—“মহামহিমাবিত তরু লতা ও জল এবং স্থলের কর্তা, স্বৈত-হস্তির অধিপতি সুর্যের সমুদ্র, সুন্দরী ত্রীলোকদিগের নারক, নৌকার মালিক, বালকদিগের প্রধান, বাণিকদিগের ভাবী পতি শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত স্বর্গ মর্ত পাতালের সর্বসুন্দর রাজা, ত্রীত্রীত্রী—” ইত্যাদি !!! চতুর্থ শ্রেণীর বালকেরা একটা কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, তাহার অবিকল বাঙ্গালানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

সকলেই স্বার্থপর, সকলেই গরজি ।

আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে, কি করবে দর্জি ॥

বাঘ মরে, ছাগ মরে, মরেনাকো মন ।
বিদ্যা যদি নাহি থাকে, কি করিবে ধন ॥
বুদ্ধ বুদ্ধ সদা ভজ, বাড়িবেক বুদ্ধি ।
বুদ্ধিতে শুদ্ধিবাড়ে, শুদ্ধি হোতে সিদ্ধি ॥
ইত্যাদি ।

(ক্রমঃ)

শ্রীধর্যনন্দ মহাভারতী ।

ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র ।

(বারাণসীর আধ্যাত্মরক্ষিণী সভাতে শ্রীমৎ

উত্তমানন্দ স্বামীর বক্তৃতা ।)

সম্পাদক মহাশয়, বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীজীর দুইটা মাত্র বক্তৃতা “নবপ্রভা”তে প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার পরে ঐ বিষয় আর যে দুইটা বক্তৃতা প্রেরণ করিয়াছি তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত না করার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না । আমি শুনিয়াছিলাম যে স্বামীজীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি নবপ্রভার গ্রাহক হইয়াছেন, এবং কোন কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সম্পাদক, শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কে, তাহা জানিতে সমুৎসুক । এবং দেশের কোন অতি উচ্চপদস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বারাণসীতে আগমন করিবেন । তবে আপনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় বক্তৃতা আর ছাপাইতেছেন না কেন ? কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রকাশিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও বঙ্কিমভক্ত পাঠকগণ অতিশয় ব্যথিত বা কুপিত হইয়াছেন, তজ্জন্ত আপনি ক্ষান্ত হইয়াছেন । কিন্তু আমার বিবেচনার ছই দিকে বাহা বক্তব্য আছে তাহা নিরপেক্ষভাবে “নবপ্রভা”তে প্রকাশ করার কোন দোষ হইতে পারে না । বাহা হউক, সম্প্রতি কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম । যদি কোন আপত্তি না থাকে প্রকাশ করিবেন, অথবা আগাকে ফেরত পাঠাইবেন ।—

রাত্রি চটা, সভাগৃহ সভাপূর্ণ । এক্ষণে স্বামীজী আসেন নাই । সকলেই প্রবেশ দ্বারের দিকে ঘন ঘন দৃষ্ট নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন । ঐ স্বামীজী—সেই প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন । তিনি পূর্বের স্থায় গৈরিক-বনন-পরিহিত, তাঁহার মস্তক দীর্ঘকেশ-সম্ভারশোভিত, বদনমণ্ডল গম্ভীর-চিন্তা-ব্যঞ্জক । তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভানীন ব্যক্তিগণ যুগপৎ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । সভাপতি মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইয়া মঞ্চের উপর বক্তার আসনে বসাইলেন এবং নিজেও বসিলেন । সকলেই প্রতীক্ষাময় ।

সভাপতি মহাশয় উত্থান করিয়া বলিলেন—কবি হেমচন্দ্র মর্ত্যালোক পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন । স্বামীজী আমাদিগের অনুরোধে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে স্বীকার করিয়াছেন । তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে ছয়টি বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা আপনারা শুনিয়াছেন । এবং তাঁহার সমালোচনা প্রণালী আপনারা অনেকটা অবগত হইয়াছেন । তাঁহার চিন্তার তেজস্বিনী স্বাধীনতা, তাঁহার স্বাভিমত প্রচারের নির্ভীকতা, তাঁহার বেগময়ী ভাষা, তাঁহার হৃদয়দ্রাবি ভাবুকতা—কতবার আমাদিগকে আনন্দিত ও মোহিত করিয়াছে, আপনারা জানেন । আমি এক্ষণে আর কিছু বলিব না । স্বামীজী দয়া প্রকাশে হেমচন্দ্র বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন ।

স্বামীজী দণ্ডায়মান হইলেন । অমনি চারিদিক হইতে করতালি-ধ্বনি হইল । আবার সভা নিস্তব্ধ । তখন স্বামীজী গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।—

- হে ব্রাহ্মণগণ !—ব্রাহ্মণ কবির তিরোধান হইয়াছে । অদ্য তাঁহার আসন কে লইতে পারে ? ব্রাহ্মণ উপন্যাসিক বঙ্কিম গিয়াছেন ; ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্রও গত হইলেন । এই ব্রাহ্মণ-প্রাণ হিন্দুসমাজকে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন, আর কে বুঝিতে পারে ? ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে তাহার হৃৎথে কাঁদিতে পারে ? ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে তাহার
- বিষাদ-পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গাইতে পারে ? ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে
 - বিপ্রেত কঠোর স্বার্থ-ত্যাগ-স্বরূপ অস্থির বজ্র-শক্তির মহিমাকে অপূর্ব মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারেন ? মনুষ্য হৃদয়ে, অবনীতলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, চিরকালই
 - দেবাসুরের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে । উত্তমে ও অধমে, পাপে ও পুণ্যে, রিপু ও বিবেকে, ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, দেব ও দৈত্যে এই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে ।
 - জীবদিগের মধ্যে এক শ্রেণী ধর্ম্মের ও মহৎ উদ্দেশ্যের সহায়, আর এক শ্রেণী ধর্ম্মের ও মহৎ উদ্দেশ্যের নানা ও শত্রু ।

মহাকবিগণ তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী নাগক-যুগ্মের সংগ্রামে এই দুই শ্রেণীর বিবাদ ও মহৎপক্ষের পরিণাম-জয় প্রদর্শন করেন ।—

তাই মহাকবি হোমর, একিলিস্ এবং হেক্টরে,—কবির ভার্জিল, টর্নস (Turnus) এবং ইনিয়সে (Aeneas)—কবিগুরু বাস্কীকি, রাম ও রাবণে—ব্রহ্মর্ষি ব্যাস, দুর্যোধন ও ভীমে—মহাকবি মিল্টন, ঈশ্বর ও সয়তানে,—শেলী, জুপিটার ও প্রেমিথিয়সে—এবং হেমচন্দ্র, বৃত্র এবং ইন্দ্রে—বিচিত্র বুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ মহাকবির কাব্যে বিশেষত্ব দেখুন, দেব ও দৈত্য সংগ্রামে—দেবতার পরিত্রাতা ব্রাহ্মণ দধীচি । হেমচন্দ্র পণ্ডিত ভারতে, অবসন্ন হিন্দুহৃদয়ে, ব্রাহ্মণ মহিমা কাব্যে প্রচার করিবার জন্ত, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । হেমচন্দ্রের কবিতাতে আমি চারিটা স্তর দেখিতে পাই ।

১ । ব্যক্তিগত । যথা, “হত্যাশের আক্ষেপ” ও “উন্মাদিনী” ।

২ । স্বদেশগত । “ভারত সঙ্গীত” ও “ভারত বিলাপ” ।

৩ । সমগ্র মানব (দেব-দৈত্য) জাতি গত । যথা “বৃত্রসংহার” ।

৪ । অখিলব্রহ্মাণ্ডগত । যথা, “দশমহাবিদ্যা” ।

হেমচন্দ্রের কবিতাতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রতিহত প্রণয় হইতে, বিশাল অপ্রতিহত প্রীতি, অবিরাম আনন্দ প্রবাহ—যাহা চরিত্র নিঃখণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—তাহা ক্রমবিকাশে বিকশিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণকবি ক্ষুদ্র সংসার হইতে সুরাসুরের বুদ্ধ, সুরাসুরের বুদ্ধ হইতে বিপুল বিশ্ব-সৃষ্টি, বিপুল-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি হইতে পরব্রহ্মদিকে পাঠককে আকর্ষণ করিতেছেন । কোনও অব্রাহ্মণ কবির পক্ষে ঈদৃশ রচনা সম্ভব নহে । যে বর্ণ জগৎকে রামায়ণ ও মহাভারত দিয়াছে, সেই বর্ণই জগৎকে বৃত্রসংহার মহাকাব্য দিতে পারে । যে ব্রাহ্মণজাতি, নিজে আপনার জন্ত দারিদ্র্য-দুঃখ-সারু ভিক্ষাবৃত্তি বাবস্থা করিয়া পরহিতব্রতের অমর উদাহরণ জগতের চক্ষে ধরিয়াছিল—কেবল সেই জাতীয় কবি, পরহিতার্থে প্রাণত্যাগী দধীচি মুনির মহিমা প্রচারার্থে, মহাকাব্য লিখিতে সমর্থ । “বৃত্রসংহার” কি ধর্ম্যপুস্তক নহে ? ইহার প্রতি সর্গে, প্রতি শ্লোকে, কি আধ্যাত্ম্য প্রচারিত হয় নাই ? ইহা হিন্দু জাতির মহতী গীতি, পণ্ডিত জাতির উদ্ধারের এবং মানব জাতির মোক্ষ-পন্থার এক মহাশাস্ত্র । হে হিন্দু ! ইহার গূঢ় অর্থ কি তুমি আজিও বুঝিলে না ? অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কি তুমি বৃত্রসংহার পাঠ কর নাই ? হে ব্রাহ্মণগণ ! অন্ত লোকে ইহার অর্থ না বুঝিতে পারে, আপনারা ইহার অর্থ বুঝিবেন । আমি

তো নিশীথে, আমার নির্জন পর্ণকুটীরে নিবাতনিকম্প দীপালোকে, টহা কত-
বার পড়িয়াছি—সন্ন্যাসী হইয়াও কতবার পড়িয়া কাঁদিয়াছি, কতবার অশ্রু-
মোচন করিয়া বাতায়নপথে তারকা-খচিত অনন্ত গন্তীর নীলাকাশ আবেগ
ও আকাজ্জক সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছি । (করতালি) হে ব্রাহ্মণগণ !
এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথার অর্থ বুঝিলেন কি ? (বুঝিলাম, বুঝিলাম) ।

এক্ষণে আমি যে চারিত্র্যের কথা বলিয়াছি তাহা একে একে সমা-
লোচনা করিয়া দেখি ।

প্রথম স্তরে “হতাশের আক্ষেপ ।” ব্যক্তি সম্বন্ধে হতাশের আক্ষেপ বাহা,
হিন্দু জাতি সম্বন্ধে “ভারত বিলাপ” তাহাই । আমার বাহা তাহা আমার
নহে, উভয় কবিতাতে এই কথা ।

“হতাশের আক্ষেপে” প্রণয়ী বলিতেছেন,

“হায় সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,

পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল” ;

“ভারত বিলাপে”ও স্বদেশ প্রেমিক গান করিতেছেন,—

না পারি সতেজে—বলিতে আপন •

যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

“ভারত বিলাপের” মূল কথা, আমার দেশ আমার নহে । হতাশের
আক্ষেপের মূল কথা, আমার প্রণয়িনী আমার নহে । উভয়ই প্রেমের বিচ্ছেদ
কাহিনী । একটাতে প্রণয়ীর প্রেম, অপরটাতে স্বদেশানুরাগীর প্রেম ।
উভয়প্রেম বিকলীকৃত, নৈরাশ্রে মর্মান্বিত, মহীয়ান্ কবিত্বে মুখরিত ।

আবার “হতাশের আক্ষেপে” যেমন পুরুষের নৈরাশ্র বর্ণিত হইয়াছে,
“উন্মাদিনী” কবিতাতে তেমনি নারীর প্রণয়ে নৈরাশ্র চিত্রিত হইয়াছে । তবে
উন্মাদিনী যেন “হতাশের” অপেক্ষাও আর এক গ্রামে উর্দ্ধে উঠিয়াছে । কেহ
• কেহ বলেন, “হতাশের আক্ষেপে” হেমবাবুর পুরুষ রমণীবৎ শোকবিহ্বল, আর
উন্মাদিনী পুরুষের স্ত্রীর তেজস্বিনী অগ্নিস্কুলিঙ্গময়ী । অর্থাৎ হেমবাবুর পুরুষ
রমণীবৎ, তাঁহার রমণী পুরুষবৎ । ইহা ভ্রম মাত্র । পুরুষ সতত বিষয়কার্যে
রত । প্রণয় তাহাকে একবারে গ্রাস করিতে পারে না । কিন্তু প্রণয় রমণীর
জীবন-সর্বস্ব । সুতরাং প্রণয়ের নৈরাশ্রে পুরুষকে একবারে উন্মাদ করিয়া
তুলিতে পারে না । কিন্তু রমণী প্রণয়ে হতাশাস হইলে, বন্ধিমের ভ্রমরের স্ত্রীর
ভয়ঙ্করতা হইয়া দিন দিন শয়ায় বিলীন হইয়া ধরাবাস ত্যাগ করে, অথবা

কুন্দের শ্রায় বিব পান করে, অথবা হেমচন্দ্রের উন্মাদিনীর শ্রায় ভৈরবী সাজিয়া দেশে দেশে আপন মনে গান করিয়া থাকে । ক্ষিপ্ততা বলের চিহ্ন নহে, দুর্বলতার চিহ্ন ।

হেমচন্দ্রের আদর্শ প্রায়ই ইংরাজি কবিতা । কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রশংসা এই যে, তিনি ইংরাজি আদর্শ হইতে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে পরিণত করিয়াছিলেন, দেশ কাল পাত্র ভেদে যাহা অস্বাভাবিক তাহা হেমচন্দ্রের কবিতাতে পাওয়া যায় না ।

হেমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার কবিতা ইংরাজি কবিতার সহিত তুলনা করা আবশ্যিক । শেলির স্কাইলার্ক (Skylark) হৈমহন্তে চাতকপক্ষী হইয়া বঙ্গ নাহিত্যাকাশে উড্ডীন হইল, অনুক্ষণ স্নেহে সুধাস্বর বর্ষণ করিয়া ভূমণ্ডল সুধার, বারায় ভাসাইতে লাগিল । ড্রাইডেনের “আলেক্সান্ডার ফীট”এ হেমচন্দ্রের কল্পনা “অমরপুরীতে ইন্দ্রের সুধাপান” রূপ গ্রহণ করিল । ড্রাইডেনের প্রসিদ্ধ শ্লোক

Happy happy happy pair
None but the brave
None but the brave
None but the brave deserves the fair

হৈম-লেখনীতে প্রবেশ করিয়া দেবকন্ঠার মাধুরী ছাড়াইয়া নিঃসৃত হইল—

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,

কত সুখ তার হয় রে ;

বীর বিনা আহা রমণীরতন
বীর বই আর রমণীরতন,

কারে আর শোভা পায় রে ?

মহাকবি মিল্টন তাঁহার মহাকাব্য “প্যারাডাইজ লষ্টের” প্রথমে লিখিলেন,—

Of Man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing heavenly Muse !

আষাঢ় ১৩১০ ;

ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র ।

১৮৩

হেমচন্দ্র, বৃত্ত সংহারের ২য় খণ্ডের আরম্ভে, লিখিলেন,—

কহ, মাতঃ শ্বেতভূজে, স্বরস্বনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধামে ?
শিবের ক্রোধাঘি-শিখা ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্য মণ্ডল ।

• • • • •

কেমনে দেবেজ্ঞ উদ্ধ, অভীষ্ট সাধিতে
লভিলা দধীচি-অস্তি ? বিশ্বকর্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র—ভীম প্রহরণ ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র, বৃত্ত মহাসুরে ?

“প্যারাডাইজ লষ্টে” One greater Man হইতে স্বর্গের পুনর্জন্মের উল্লেখ হইল । “বৃত্ত সংহারে” One greater Man ব্রাহ্মণ দধীচি হইতে স্বর্গের উদ্ধার হইল ।

আবার “প্যারাডাইজ লষ্টে”এ পরাজিত “এঞ্জেল”গণ যেমন নরকে বাদামুবাদ করিতেছে, তেমনি দানব-পরাজিত দেবগণ পাতালপুরে তর্ক বিতর্ক করিতেছে । একরূপ সাদৃশ্য হেমচন্দ্রের কবিতাতে এবং ইংরাজি কবিতাতে অনেক পাওয়া যায় ।

হেমচন্দ্রের “দশমহাবিদ্যা” ডার্কিনের ক্রম বিকাশের (Evolution) পরমেশমুখী মহীয়সী গীতি ।

বোধ করি আপনারা প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি টেনিসনের “লক্‌নুলি হল” কবিতা পাঠ করিয়াছেন । এই কবিতার সহিত “হতাশের আক্ষেপে”র কি সাদৃশ্য আছে দেখুন । উভয় কবিতাতেই নায়কের বাহার সহিত প্রণয় হইয়াছিল, তাহার সহিত পরিণয় হয় নাই ।

• “হতাশের আক্ষেপে” গগনে সুধাংশু দেখিয়া প্রণয়ীর হৃদয়েচ্ছাস হইল ।

- “লক্‌নুলি হল” কবিতায় নায়িকার অন্তর সহিত বিবাহ হওয়ার নায়ক নৈরাশ্রে সেনা-দল ভুক্ত হইয়াছেন, “লক্‌নুলি হল” ভবনের নিকট দিয়া গমন করিতেছেন । পূর্বে এই স্থানে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ হইত । এই স্থানে প্রাতে ছই জনে বিচরণ করিতেন, ছই জনে সায়াহ্নে সাগরতটে বলিয়া দূরগামী অর্ণবপোত নিরীক্ষণ করিয়াছেন । তাই এই স্মৃতিময় স্থানে আবার উপনীত হওয়ায় নায়কের হৃদয় উবেল হইল । এক্ষণে নায়িকা অন্তর পরিণীতা পত্নী এই চিন্তায় নায়কের চিত্ত অবসন্ন :—

O my cousin, shallow hearted, *O my Amy, mine no more !*

O the dreary, dreary moorland ! O the barren barren shore !

অই শশী অই খানে, এই স্থানে ছই জনে,

কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !

কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি !

পরে সে হইল কার, এখান কি দশা তার

আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি !

উভয় কবিতায় নায়ক নায়িকার মা বাপের উপর আক্রোশ আছে ।

হেম বাবুর কবিতায়—

লোক লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে

আমার হৃদয়-নিধি অগ্নি করে সঁপিল ।

অভাগার যত আশা জন্মশোধ খুচিল ।

টেনিসনের কবিতায়—শাসক পিতার ও ব্যাপিকা মাতার উল্লেখ আছে ।

তবে হিন্দুর কন্যা পিতামাতার অধীন, তাই হেম বাবুর কবিতায় নায়িকার কোন নিন্দা নাই । ইংরাজ কুমারী ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে, তাই নায়ক হতাশ্বাস হইয়া নায়িকার নিন্দা করিতেছেন ।

Falser than all fancy fathoms falser than

all songs have sung

Puppet to a father's threat, and servile

to a shrewish tongue !

উভয় কবিতাতে সামাজিক প্রথার প্রতি ক্রকুটী আছে ।

হেম বাবু বলিতেছেন—

“ওরে ছুটে দেশাচার,—কি করিলি অবলার” ।

টেনিসনের হতাশ প্রাণে বলিতেছেন—

Cursed be the social wants that

Sin against the strength of youth !

Cursed be the social lies that warp

Us from the living truth !

“হতাশের আক্ষেপে”, ও “লব্ধলিহন” কবিতায় প্রণয়নিরোধী বিবাহকে বৈধব্য বলা হইয়াছে ।

আঘাট ১৩১০]

ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র ।

১৮৫

কতক্ষণে অকস্মাৎ,

“বিধবা হয়েছি নাথ”

বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে ।

Then a hand shall pass before thee, pointing to his

• drunken sleep •

To thy widowed marriage-pillows, to the tears that thou
wilt weep.

উভয়ে জাতিগত বৈষম্য আছে—

হিন্দু কবির কবিতাতে নায়ক ও নায়িকার জন্মান্তরের কথা আছে ।

নায়ক বলিতেছেন—

অরে বিধি, তারে কিরে জন্মান্তরে পাব না ?

নায়িকা বলিতেছেন—

“ ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই বেন তোমারে” ।

ইংরাজ “জন্মান্তরে” বিশ্বাস করেন না । সুতরাং তাঁহার কবিতাতে “জন্মান্তরের” কথা থাকিতে পারে না ।

বাঙ্গালী বাহ্যিক ঘটনাতে অভিভূত হয় । ইংরাজ বাহ্যিক ঘটনাতে অভিভূত হইতে চাহে না ; একদিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার দেখিলে, অন্যদিকে আনোকের সন্ধান করে ; উত্তান-ভরঙ্গ-সঙ্কল-নাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেও আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে । বাঙ্গালী হতাশ হইলে ক্রন্দন করে, বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, বা ধরাসনে শূন্যমনে বসিয়া থাকে, অথবা কবিতা লেখে । ইংরাজ, প্রাণে হতাশ হইলে, ছত্তর-নাগর লঙ্ঘন করিয়া, নবজীবনের অন্ধপাত করে, অথবা ভেরীর রণোন্মাদে মত্ত হইয়া, বুদ্ধক্ষেত্র বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, স্বদেশের জন্য শোণিত-প্রাণ পাত করে । তাই টেনিসনের কবিতাতে bugle horn শৃঙ্গধ্বনি শুনিতে পাই ।—

• Hark, my merry comrades call me sounding on the bugle horn

এক্ষণে আমরা ব্যক্তিগত স্তর পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় স্তর নিরীক্ষণ করি । “ ভারতসঙ্গীত ” এই দ্বিতীয় স্তরের কবিতা । হতাশের আক্ষেপে হেমের হৃদয় করুণ রসে স্রবীভূত ; ভারত সঙ্গীতে হেমচন্দ্র বীরভাবে উদ্দীপিত । একটি সাম্রাজ্য সমীরণের বিষাদেচ্ছাস, অপরটি জালামুখীর তরল ধাতুনিঃস্রব ।

হেমচন্দ্র শৃঙ্গনির্নাদে “ ভারতসঙ্গীত ” গাহিলেন । নগরে, কাননে—কুজীয়ে,

রাজপ্রাসাদে,—তুয়ার-ধবল হিমাচলে, গস্তোর-নাদী বিশাল বারিধি-বক্ষে
সেই নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইল । সেই সঙ্গীত স্কুমার বালকের চপল-চিত্ত,
কামিনীর কুসুম-পেলব ছন্দ, যুবার আকাজক-তপ্ত মানস,—বৃকের অব-
সাদ-অসাড় জীবন—এক নবভাবতরঙ্গে কল্লোলিত করিল । বিহঙ্গ মুখ-
রিত, অরুণালোকিত প্রনাতে, ভারতবাসী ভাবিল, “ভারত শুধু যুমাইয়া রয়”।
মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডমণ্ডিত ধরায়, ভারতবাসী ভাবিল—

“সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই যুমাইয়া রয়”।

দিবাবসানে, স্বভবনমুখ ভারতবাসী রাজপথে বাইতে বাইতে ভাবিল—
“ভারত শুধু যুমায়ে রয়” । নিশীথে, শয়ন কক্ষে উপাধানভ্রমন্তক ভারত-
বাসী কি শুনিল ?

ঐ বে দূরে, গগণমণ্ডল বিষণ্ণরবে নিনাদিত হইতেছে—

বাক্সে রে শিক্ষা বাক্সে এই রবে
শুনিয়া ভারত জাগ্রত হবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি যুমায়ে রবে ?

নিদ্রাকর্ষণে, নিমীলিত নেত্রে, স্বপ্নাবেশে, ভারতবাসী কি দেখিল ? দেখিল—

—মুখে শিক্ষা তুলি

শিখরে দাঁড়ারে গায়ে নামাবলী,
নয়ন জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
(রয়েছে দাঁড়ারে) জনেক যুবা ।
আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরব তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ারে গায়ে নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী
বহনে (ভাতিছে) অতুল আভা ।

কে ঐ সন্ন্যাসী ? মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্য স্বদেশের হীনতার
একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরে নগরে এবং
পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্তক গান করি-

তেছেন । হে ব্রাহ্মণগণ ! পুনর্বার দেখ, সন্ন্যাসী কে ? দেখিতে দেখিতে মহা-
রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের স্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ গায়ক হেমচন্দ্রাচার্য্যকে দেখিতে পাই-
তেছি । এ হঠকোটের ব্যবহারজীবী হেমচন্দ্র নহে, ভারতের মুগ্ধপত্র, চন্দন-
চর্চিত-ললাট, নামাবলী-পরিহিত ব্রাহ্মণ-কবি হেমচন্দ্রাচার্য্য । আর স্বপ্ন
দেখিতেছি না । কিন্তু হৃদয় মন্দিরে ঐ প্রতিধ্বনি শুনিতেছি ।

বাক্সে রে শিক্ষা বাক্স এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,

ভারত শুধু কি বুঝায় রবে ?

হেমচন্দ্রের সঙ্গীতে ভারত জাগে নাই । তাই দেখ, হেমচন্দ্র পর্বত শিখর
হইতে অবতরণ পূর্বক দূরে শূঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া রাজধানীতে একা গঙ্গাতটে
দণ্ডায়মান । আবার “বিলাপ”—“ভারত বিলাপ”—ভারতের দুঃখকাহিনী ।
যখন হেমচন্দ্র ভারত-সঙ্গীত এড়েক্ষণে গেজেটে মুদ্রিত করিবার জন্ত
প্রেরণ করেন, তখন মহাত্মা ভূদেব বলিয়াছিলেন, ‘এক্ষণে সঙ্গীতের সময়
নহে ।’ মহাকবি হেম বুঝিলেন “ভারত সঙ্গীতে” ভারত বিলাপ নিহিত
রহিয়াছে । তাই “ভারত বিলাপ” লিখিলেন । বঙ্গদেশের অবস্থা যদি ভিন্নরূপ
হইত, তাহা হইলে সঙ্গীতের পর বিলাপ লিখিবার কারণ হইত না । কেননা
তাহা হইলে এ সঙ্গীতে চতুর্দিকে অগ্নি ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকিত । ভারত সঙ্গীত
প্রকাশ করায় হেমচন্দ্র বিপন্ন হইয়াছিলেন । কিন্তু বুদ্ধিমান গবর্ণমেন্ট বুঝি-
লেন যে বর্তমান অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘকালেও এই কবিতাতে কোন
বিশ্রব হইবার সম্ভাবনা নাই । উদার বাঙ্গালিবন্ধু স্মার এশলি ইডেন
“জাতীয় সঙ্গীত” রচয়িতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার আবশ্যক নাই বুঝিয়া-
ছিলেন, এবং দয়ালু গবর্ণমেন্ট হেমচন্দ্রকে কোনরূপে লাক্ষিত করেন নাই ।
ইহা ইংরাজের গৌরব ।

দুইটা মাত্র কবিতার সমালোচনে অনেক সময় অতিবাহিত হইল । হে
ব্রাহ্মণগণ ! আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্তরে উপনীত
হইলাম । “বৃত্ত সংহার” হেমচন্দ্রের অদ্ভুত সৃষ্টি । এই কবিতাতে ব্রাহ্মণের অনন্ত
মহিমা, পরহিতব্রতের অমর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে । স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইলে
জীবের দুঃখ ।—তাই, “হতাশের আক্ষেপ”, তাই “ভারত বিলাপ” “ভারতসঙ্গীত”

স্বরলোক হইতে বিভাঙিত অমরবৃন্দ স্বাধিকারচ্যুত । তাই তাহাদিগের ক্ষোভ । কি “হতাশের আক্ষেপ” ও “উন্মাদিনী”, কি “ভারত বিলাপ” ও “ভারত সঙ্গীত”, কি “বৃত্তসংহার”—এই তিন স্তরের মূলে একই কথা—জীব স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইলে দুঃখ পায় । স্বাধিকার লাভ করিলে জীব সুখী হয় । আবার, আত্মাতে যে আমাদের প্রকৃত অধিকার আছে তাহা লাভ করিলে চরম সুখ, অবিরাম আনন্দ, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয় । ইংরাজগণ অধুনা বাহাকে self-realization বলেন, তাহার গন্তব্য স্থান আধ্যাত্মিক স্বাধিকার ; স্বকীয় আত্মাকে লাভ করাই self realization ।—নিজের আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, অত্মের আত্মার সহিত, অত্মের সুখ দুঃখের সহিত মিশিতে হইবে, নিকামচিন্তে পরহিতব্রত অবলম্বন করিতে হইবে । যিনি পরহিতব্রতধারী তাঁহার গুণে ও পুণ্যে, স্বর্গচ্যুত অমরবৃন্দ আবার স্বরলোকে প্রবেশ করেন, এবং তিনি নিজে ব্রহ্মলোক লাভ করেন । বৃত্তসংহারে দেখিতেছেন, পরহিত ব্রত এমনি মহৎ, এমনি শক্তিশালী, ব্রাহ্মণের নিকাম যোগ এমনি মহীয়ান্ যে দেবতার স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পরহিতব্রত ব্রাহ্মণের কৃপায়, ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগে, তাহা লাভ করিতে পারেন । তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—“উৎপত্তি রেব বিপ্রস্ত মূর্ত্তি ধর্ম্মস্ত শাস্বতী”, ব্রাহ্মণের দেহ, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি ।

ব্রাহ্মণ পরহিতে নিজপ্রাণ দিতে কাতর নহেন । তাই মুনীন্দ্র দ্বীচি বলিতেছেন,—

এভব যঙলে—

পরহিতে প্রাণদিতে পায় কতজন !
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হার রে অবোধপ্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিরোজ্জিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?

• • • • •

হে শিষ্যমণ্ডলী—

জগতকল্যাণ হেতু নরের স্বজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ, এ জগতীতলে ।

হে ব্রাহ্মণমণ্ডলী—ঐ দেখুন দধীচির প্রাণ বিসর্জনের অপূর্ব দৃশ্য—
দেখুন, ঐ—

বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র দুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ফণে শূন্য উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে । বাজিল গগন্তীর
পাকুজনা—হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ বুড়
পুষ্পাধার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে ।

হে বিপ্রগণ ! ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র আপনাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন ?
যেদিন ভারতে ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পরহিতব্রত তনুত্যাগ করিবেন, সেই দিন
দেবতারা স্বরলোকে প্রবেশ করিবেন ।

কবি একদিকে যেমন ধর্ম্মের ও পুরুষকারের জয় প্রচার করিয়াছেন,
তেমনি অত্রদিকে অদৃষ্ট বা ভাগ্য বা নিয়তির প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন । এই
নিয়তির ভিতরে কর্ম্মফল নিহিত আছে । তাই কবি বলিতেছেন,—

“আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি
কে রক্ষিতে পারে তারে ।”

“ছুষ্ট ব্রহ্মাসুরজায়া দানবী দাশুিকা,”—ক্রোধ-মদ-মাৎস্য-পাপরূপিণী
ঐন্দ্রিলা, দৈত্য মহিষী ; অসুররাজ রূপজ মোহে মুগ্ধ । তাই শচীপীড়ন ।
তাই বোমমার্গে মহেশের ক্রোধাগ্নি দেখিয়া ছুষ্টদানব ভীত হইয়া বলিল বটে—
“শচীরে ছাড়িব আমি তু্যবতে মহেশ” । কিন্তু কুটিল মহিষীর মায়াবাহকে
পড়িয়া মতিচ্ছন্ন হইয়া আবার—মহিষীকে

কহে দৈত্যপাত “তোমায় সুন্দরি—
দিল্যাম মঁপিয়া ইন্দ্র সহচরী ;
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি,—
পুরাও মহিষি ; ফণা চূর্ণকরি—
আনো ফণিনী ।”

তাই ঐন্দ্রিলা সর্ব্বনাশিনী—“ভীমা তুলিলা চরণ শচী বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ”
হায় ! ইন্দ্রাণীর বক্ষে দানবীর পদাঘাত ! হা বিধাতঃ ! এত অত্যাচার
বরদাতা মহেশও সহ্য করিতে পারেন না । তাই, আবার শিবের ক্রোধাগ্নি ।
কবি বলিতেছেন সকলেরই সীমা আছে অত্যাচারেরও সীমা আছে । বখন

বিজয়ী বিজিত জাতিকে কেবল স্বাধিকার ভাঙে করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তাহাদের পুরাঙ্গনাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করেন, তখন অত্যাচারের শেষ সীমাও উপস্থিত হয় ; তখন মহাদেব তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিকেও দণ্ডিত করেন, তখন মহাদেবের ক্রোধে, অগ্নিরিমের দৈত্য-শক্তি অজ্ঞের ত্রিশূল সবই বিফল হয় । তখন “অদৃশ্য হস্তের শূল মহাশূন্যকোলে” । পুরাকালে এক দিন বিজেতা স্বাধীন আৰ্য্যঋষি বৃত্তসংহার আখ্যান লিখিয়াছিলেন । অদ্য বিজিত অধীন আৰ্য্য কবি তাহা মহাকাব্য রূপে গান করিলেন । সেই দিন—আর এই দিন ; হেমচন্দ্রের সমুদয় বৃত্তসংহার মহাকাব্য “সেই দিন আর এই দিনের” বিষাদময় ভারতম্যের করাল ছায়ায় আচ্ছন্ন । পতিত আৰ্য্যের ধমনিতে প্রাচীন ঋষিশোণিত আজও প্রবহমান, তাহা বৃত্তসংহার কাব্য প্রমাণ করিতেছে ।

এক্ষণে আমরা হেমচন্দ্রের কবিতার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিলাম । ব্রাহ্মণ যখন নিকাম কৰ্ম্মযোগে, বা পরহিতব্রতে, মোক্ষ লাভ করেন, তখন তিনি সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, দিব্যচক্ষু লাভ করেন, তখন নারদের রূপ গ্রহণ করিয়া গান করেন

জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভূনাম,
গাওরে প্রেমভরে মনোহর বাদনে ?
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন জীবনে ?

তখন মহাদেবের কৃপায়

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে
অনিমেঘ লোচনে, নিরখিছে অবশে ॥
চক্রেখাতে ঘুরি সারি সারি সাক্ষিয়া ।
দশদিকে শোভিতে দশ ছবি হাসিয়া ॥
পরতেক মণ্ডলে মহারূপ ধারিণী ।
লীলানিরত সতী স্মরহর ভামিনী ॥

দেখিতে দেখিতে

মিলাইল দশরূপ, উমারূপ ধরিল
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল ।

দশমহাবিদায় কবি একটী তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন । নারদ প্রকৃতি দেবীর লীলাতে জীবনের দুঃখ দেখিয়া দয়াজিচিত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

আষাঢ় ১৩১০ ।

ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র ।

১৯১

সতীর লীলার মধ্যে জীবের উৎকট দুঃখ দেখি কেন ? সতী কি অশিন, অমঙ্গল
অশুভ ?

“জীব দুঃখ তবে কিগো অনাদ্য রচনা ?

অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর বাতনা ?”

মহাদেব তাহার উত্তর দিলেন

“দুঃখের কারণ নহে জীব লীলা”

এই জগতে ক্রমবিকাশে পূর্ণমুখ লাভ হইবে; জীব ক্রমে পূর্ণ কাম হইবে,
শোক দুঃখ তাপ সকলই দমন হইবে, তোমাকে যে দশ জগৎ দেখাইলাম
তাহার অর্থ এই যে এই দশ জগতে জীব ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে ।

“পর পর পর এ দশ জগতে

জীবের উন্নতি কেবলি”

টেনিসনের কবিতাতেও এ কথা

Yet I doubt not thro' the ages one

increasing purpose runs

And the thoughts of men are widen'd

with the process of the suns.

আর বৃত্তসংহারেও ঐ কথা — অশুভ চিরস্থায়ী নহে—বদি স্বর্গচ্যুত
হইয়া থাকে, মহেশ্বরের আরাধনা কর ও অব্যবসায়ের সহিত কাল প্রতীক্ষা কর,
সংগ্রাম কর, চেষ্টা কর,—ত্রিদেশালয় লাভ করিবে । সিদ্ধি লাভ করিতে
হইলে, কিরূপে সাধনা করিতে হয়, বৃত্তসংহার কাব্য তাহারই বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ।
ক্রমে ক্রমে জীব উন্নতি লাভ করিতেছে, সিদ্ধি ও গন্তব্য স্থানের দিকে
যাইতেছে । দশমহাবিদ্যাতে কবি দুঃখকাতরজীবের নিকট এই আনন্দবাণী
প্রচার করিতেছেন ।

- আমি যে স্বাধিকার উদ্ধার (বা রক্ষার) কথা বলিয়াছি, তাহা রামায়ণে,
মহাভারতে, তাহা ইলিয়দে, তাহা দান্তের ডিভাইন কমেডিতে, তাহা শেলির
(Prometheus unbound) “প্রোমিথিয়স্ অন্বাউণ্ড”এ লক্ষিত হয় ।—
রামায়ণে ও ইলিয়দে বনিতার উদ্ধার, মহাভারতে ও বৃত্তসংহারে অপহৃত
রাজ্যের উদ্ধার, প্রোমিথিয়স্ অন্বাউণ্ডে, কুসংস্কার বন্দীকৃত মানবজাতির
উদ্ধার —এই সকল গুলিতেই স্বাধিকার উদ্ধারের জন্য একটা মহতী চেষ্টা,
একটা বিপুল সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় । তবে বৃত্তসংহারের বিশেষত্ব

এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধিকার, অর্থাৎ আত্মার মুক্তি লাভ—দীপ্তিময় অনলাফরে দীর্ঘাচী মূনির তনুভ্যাগে বর্ণিত হইয়াছে । নিকাম ধর্ম, আত্মার মুক্তি । মহাভারতে মহাপ্রস্থানেও দেখা যায় ধর্মবলে ধর্মরাজ্য সুধিষ্টির স্বর্গে গমন করিলেন । যতগুলি মহাকাব্য আছে তাহাতে মূলে একই কথা—মনুষ্য হৃদয়ে রিপু ও বিবেক স্বরূপ যে দেবাসুর আছে, অনবরত হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার যুদ্ধ চলিতেছে । বিবেকের জয় লাভই স্বর্গলাভ, স্বাধিকার লাভ ।—ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যাহা সত্য, মনুষ্য জাতি সম্বন্ধেও তাহা সত্য । বিবেকের দয়ার ও প্রীতির যতই বিকাশ হইবে, ততই নরলোক সুরলোকে পরিণত হইবে । যখন জ্ঞান ও প্রীতি পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখনই “পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে”—তখন জীব হুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শিবশাস্তি সচ্চিদানন্দ হইবে । এবম্বিধ শিক্ষাপ্রদ হেমচন্দ্রের বৃত্তসংহার ও দশমহাবিদ্যা ভারতের বর্তমানযুগের ধর্মসংহিতা । হে ব্রাহ্মণগণ ! শুনিয়াছেন, পুরাকালে এথেন্স মহানগরীতে একটা নিয়ম ছিল যে প্রতিবৎসরে নির্দিষ্ট দিবসে সমুদয় ইলিয়দ মহাকাব্য আবৃত্তি করিতে হইবে । হে বিপ্রগণ ! যদি আপনারা হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরে একটা নির্দিষ্ট দিনে হেমচন্দ্রের স্বদেশ-হিতৈষণা ও ধর্মভাবপূর্ণ কবিতা গুলি সমুদয় বঙ্গদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আবৃত্তি করিবেন, এবং তাহার প্রচারিত স্বার্থত্যাগে আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিবেন । আর, বসিতে বুক কাটিয়া যায়, হেমচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষভাগে, অর্থাভাব নিবন্ধন কষ্টে দিনপাত করিয়াছিলেন । ইহা বঙ্গবাসীর কলঙ্কের কথা । এক্ষণ হেমচন্দ্রের বিধবা শোকাঁকুলা, অনাধিনী, দারিদ্র্যপীড়িতা । স্মরণ্য যিনি হেমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে চাহেন, অগ্রে তাঁহার বিধবা পত্নীর সাহায্যার্থে অর্থ প্রেরণ করুন । হেমচন্দ্র আমাদেরকে যে একটা বিপুল সাম্রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন তাহার বিনিময়ে, অথবা কৃতজ্ঞতা স্বীকাররূপে, তাঁহার বিয়োগবিধুরা পত্নীকে সাংসারিক কষ্ট হইতে আপনারা মুক্ত করুন ।

গভীর বিষাদপূর্ণস্বরে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন । এবং তিনি আসন পুনর্গ্রহণ করিলে করতালি ধ্বনির পরিবর্তে শ্রোতাদিগের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস সন্মিলিত হইয়া উত্থিত হইয়াছিল ।

জটনক কাশীবাসী ।

নবপ্রভা ।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩১০ সাল ।

[৬ষ্ঠ সংখ্যা]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।

ষষ্ঠ প্রপাঠক ।

(উদ্দালক ও ষেতকেতুর প্রসঙ্গ)

উদ্দালক বললেন বৎস ষেতকেতো ! এষ্ট বে শ্রুতঃ অগ্ন্যশ্বতল
তোমার নয়ন গোচর হইতেছে, বাহার স্বপ্ন অবস্থা ও বাসস্থানিচয় চিন্তা
করিলেও মানবের মানস-সরোবরে এক অদ্ভুত বিশ্বয়রসের তরঙ্গ-মালা খেলা
করিতে থাকে, বাহার কার্য-কারণপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে বাসিলে
অতি প্রাক্ত বাক্তিও হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন, এবং বাহার আদ ও অস্ত তত্ত্ব
প্রাক্ত বুদ্ধির অগম্য বলিলেও অতুক্তি হয় না । তুমি নিশ্চয় জানিও, ঐদৃশ
শিশাল জগতের মধ্যেও একটা সুনিয়মিত কার্যকারণভাব সুস্বক্ক রহিয়াছে ;
বাহার বলে এই প্রকাণ্ড জগচ্চক্র অনন্তকাল এক অবাভিচারী নিয়মে চলি-
তেছে ও চলিবে । মানব বুদ্ধি যতকাল সেই কার্যকারণ-ভাবের গূঢ় রহস্য
বুঝিতে সমর্থ না হয়, অস্তত বুদ্ধিবীর জন্ত অগ্রসরও না হয়, ততকাল ঐহিক
এ পারলৌকিক মঙ্গলময় কোন শুভকনের আশা করিতে পারে না ।

ইদানীন্তন বিজ্ঞান বিদ্যাবিগারদ যুরোপীয় পণ্ডিতগণ এষ্ট অব্যভিচারী
কার্য-কারণ ভাবের গূঢ় গবেষণার ফলেই বিশ্ববাবহ বিবিধ কার্য সম্পন্ন
করিয়া আমাদের সেই পুরাতন, “অঘটন ঘটন-পটীয়াসী মহামায়ার” আসন
অধিকার করিতেছেন । এই কার্যকারণ-ভাবের অভিজ্ঞতা-বলে আমাদের

পূর্বতন ঋষিগণ কতশত লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি সম্পাদন করিয়া জগৎ-জ্ঞানের বিশ্বয়-বিস্ফারিত মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই চিরন্তন কার্য্যকারণ-ভাব ভুলিয়া যাওয়ার এত আশ্রয় আমাদের হৃদয় উপস্থিত হইয়াছে। আজ দূরদর্শী মহামুনি উদ্দালক তত্ত্ব-ভিজ্ঞান প্রিয় পুত্রকে সেই কার্য্যকারণ-ভাবের গূঢ় রহস্য উপদেশ দিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, বৈষয়িক সমুন্নতি বা প্রতিপত্তি লাভ এই উপদেশের উদ্দেশ্য নহে, এই উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম-তত্ত্বোপলব্ধি।

উদ্দালক বলিলেন, বৎস শ্বেতকেতো! তোমাকে নিত্য নিরাময় যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি, সেই ব্রহ্ম প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক দেহে, প্রত্যেক ভূতে, অধিক কি জগতের প্রতি অণুতে অণুতে বিরাজমান রহিয়াছেন। যদি সূত্র-নির্মিত বস্ত্র হইতে এক একটি করিয়া সমস্ত সূত্র, কিম্বা স্বর্ণ-নির্মিত বলয় হইতে সমস্ত স্বর্ণাংশ পৃথক করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে যেমন সেই বস্ত্রের “বস্ত্রত্ব” ও বলয়ের “বলয়ত্ব” উড়িয়া যায়, কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত জগৎগুলি হইতে ব্রহ্ম সত্তাকে বাহির বা পৃথক করা যায়, তাহা হইলে কল্পনানীত এই বিশাল জগতেরও অস্তিত্ব থাকে না বা থাকিতে পারে না। কোন উচ্চ বস্তু দেখিলে বেরূপ তাগাতে তাপ-সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ “সৎ” বা “সত্য” রূপে প্রতিভাসমান এই জগতের অভাস্তরেও সেই ব্রহ্ম-সত্তার অনুমান করিতে হয়।

জীবও অস্বর্ধ্যায়িকরূপে সর্বত্র বিরাজমান সেই ব্রহ্ম নাম (রাম, শ্রাম ইত্যাদি) ও রূপ (আকার-বরহিত, নিত্য, নির্বিকার পরম সূক্ষ্ম ও সর্ব-কারণ। তাদৃশ সূক্ষ্ম-কারণ হইতে তুচ্ছ ভূগাণ্ডি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত নাম-রূপা-ক্ক এই বিশ্ব প্রপঞ্চ প্রাচুর্ভূত হইয়া জীবের বিবিধ ভোগ সম্পাদন করিতেছে।

পিতার উল্লিখিত উপদেশ পরম্পরা-শ্রবণে মন-মাকতানোলিত লতার স্তায় শ্বেতকেতুর প্রশান্ত হৃদয় সংশয়ে কিঞ্চিৎ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি পিতার প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও তাঁহার মন যেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেছে না,—সে প্রতিনিয়ত সংশয় উত্থাপন করিয়া উদ্দালকের উপদেশের গূঢ় রহস্য নিকাসিত না করিয়া নিরস্ত হইতেছে না। তাই শাস্ত্রমূল শ্বেতকেতু বিনয়-পূর্বক পিতার চরণ-প্রান্তে পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন যে, শুরো! আপনার উপদেশ হইতে বুঝিলাম যে, বিশাল আকাশ যেরূপ জগতের ভিতরে ও বাহিরে

বিদ্যমান আছে, এবং সূক্ষ্ম সূত্র যেকোন বস্তুর মনো-ওত-প্রোতভাবে বর্তমান থাকে সেইরূপ নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মও এই জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তরে সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছেন । আর, কোন উষ্ণ বস্তু দেখিলে যেকোন তদ্রূপ তত্ত্বের সূক্ষ্ম সত্তা অনুমান করা যায়, তদ্রূপ মিশ্রা জগতে সত্তা বাহ্যে দেখিয়া উহার মনোও ব্রহ্মসত্তার অনুমান করিতে পারা যায় । এ সমস্ত কথা বুঝা যায় নটে, কিন্তু নামরূপ-নিবন্ধিত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ব্রহ্ম হইতে নাম-রূপাত্মক এই স্থূলতর জগৎ যে কিরূপে প্রোচ্ছূত হইতে পারে, তাহা ত আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না । পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, যেকোন উপাদান হইতে যে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য ঠিক সেই উপাদানেরই অমুরূপ হইয়া থাকে । সাদা সূতার দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করিলে, সেই কাপড় কখনই সাদা ভিন্ন বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয় না । কিংবা সুবর্ণ-নিষ্পিত অলঙ্কার সুবর্ণময় না হইয়া কখনও মৃণ্ময় হয় না । সেই প্রকার বাহার নাম নাই, রূপ নাই, নাই বলিতে কোন গুণই নাই, তাদৃশ ব্রহ্ম হইতে এই নামরূপময় জগৎ-সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

মহর্ষি উদ্দালক পুত্রের ঈদৃশ সংশয় দন্দর্শনে চমৎকৃত বা অসম্বৃত না হইয়া পুনর্বার প্রশ্নগন্তীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস! যেতকেতো! সূক্ষ্ম হইতে স্থূল সৃষ্টি হওয়াই জগতের রীতি, দেখ, দুইটা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল একটি দ্বাণুক উৎপন্ন হয় এবং তিনটা দ্বাণুকে একটি স্থূল “ত্রস-রেণু” প্রোচ্ছূত হইয়া থাকে । বৎস! ইহা যদি তোমার প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ কর ।

এই যে, সমুখে বহু-শাখা-সমাকর্ষণ বিস্তীর্ণ ভূভাগ-ব্যাপী একটি বিশাল বট বৃক্ষ দেখিতেছ, বাহার এক একটি শাখা এক একটি বৃক্ষের সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়, বৃক্ষটি শাখা-বাহুগুলি প্রসারিত করিয়া সৌরকর-ক্লিষ্ট জগৎ-জীবকে আশ্রয় দিতেছে এবং সেই দুঃখ দয় পৃথিবীর কথা সূর্য্যদেবকে বলিতার নিমিত্তই যেন আকাশের গায়ে হেলিয়া শির সমুন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । বৎস! এই বট বৃক্ষ হইতে একটি ফল আনিয়ন কর, তৎ-জিজ্ঞাসু যেত-কেতু পিতার কথায় আর দ্বিক্রান্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি বটফল লইয়া আসিলেন । এবং “ইদং ভগব উপাঙ্কতং”, ভগবন্ এই আনিয়াছি, বলিয়া পিতার সমীপে অর্পণ করিলেন । পিতা বলিলেন, “ভিক্ষি” ভিক্ষ । যেতকেতু ফলটি ভাঙ্গিয়া বলিলেন, “ভিক্ষং ভগবঃ” । পিতা বলিলেন,

ইহার ভিত্তি কি দেখিতেছি ? খেতকেতু বলিলেন, স্মৃতি পরমাণুর জ্ঞান কতকগুলি বীজ দেখিতেছি । পুনশ্চ উদ্ভালক বলিলেন, ইহার একটি বীজ আবার ভাঙ্গ ? এবং তাহার মধ্যে কি দেখিতে পাও, তাহা আমাকে বল । তখন খেতকেতু সেই স্মৃতি বীজটী চূর্ণ করিয়া বলিলেন,—“কিঞ্চন ন ভগবঃ”, ভগবান্ কিছুই দেখিতেছি না । পুত্রের এই কথা শেষ হইবামাত্র মহর্ষি উদ্ভালক বলিতে লাগিলেন, নঃস ! যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই আছে, আর যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই নাই, এইরূপ প্রান্ত সিদ্ধান্ত কখনও মনে স্থান দিও না । কারণ, এরূপ বহুতর পদার্থ আছে, যাহা তুমি আমি না দেখিলেও যুক্তি-যোগে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় । দেখ, এই যে, বটদীর্ঘ ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরে আর কিছু দেখিতে পাইলে না, এবং “কিছু নাই” বলিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিলে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, যে কারণ না থাকিলে কখনও কাঁচা হইতে পারে না । অতএব, তুমি যাহা দেখিতে পাও নাই, উৎপত্তির পূর্বে এই বিশাল বটবৃক্ষও সেই স্মৃতি বীজ-গুণে অবস্থিত ছিল এবং তাহা হইতেই নিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখা-পরিণোভিতরূপে প্রাচলিত বা অতিবাক্ত হইয়া লোকের লোচন রঞ্জন করিতেছে । এই প্রকার স্মৃতি দুর্লভা সেই ব্রহ্ম হইতেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রাচলিত বা অতিবাক্ত হইয়াছে । আমার এই কথার অশ্রদ্ধা করিবার কোন কারণ নাই, বাক্যে অশ্রদ্ধা বা দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে দুর্লভগম্য তত্ত্ব কখনও হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে না । সেই ক্ষণ প্রণামে, গুরু না আচার্য্য-পদাভিষিক্ত ব্যক্তির কথাগুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, পরে সেই বাক্যে কোনরূপ সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যুক্তিধারা সেই সংশয়ের কারণ গুলি ক্রমে বিদূরিত করিতে হয় । ইহাই লৌকিক বা অলৌকিক মর্লবিধ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের সমীচীন উপায় ।

স্মৃতিঃ স্মৃতিম্ সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাচলিত এই জগৎ তাহা হইতে পৃথক নহে, তিনিই পরম সত্যরূপী সাক্ষা, “তৎস্বমি” অর্থাৎ তুমিও তাহা হইতে অভিন্ন,—সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ।

খেতকেতু পিতার নিকট এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব উপদেশ যতই শ্রবণ করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই যেন তাঁহার হৃদয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কোতূহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । পুনর্বার তিনি সংশয় অপনোদনার্থ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—তাত ! সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম যদি জলে, স্থলে, অস্তরে, বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান, তবে তাঁহাকে দেখা যায় না কেন ? যাহা নয়নগোচর

হয় না, তাহার অস্তিত্ব মানিবার কারণ কি ? অতএব, অমুকম্পা-পুরঃসর পুনর্বার এ বিষয় আমাকে বুঝাইয়া দিন :

শ্রদ্ধাবান্ পুত্রের মনোরথ পরিপূরণান্তিলাষে স্বপ্নদর্শী মহর্ষি উদ্ধালক আরও একটি উত্তম দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন । যাহা শ্রবণ-মাত্রে সংশয় সমাকুল চিত্তও বিশ্বাস দারি-বিদ্রোহ হইয়া তিরস্তাব প্রাপ্ত হয় ।

মহাপ্রজ্ঞ উদ্ধালক একখণ্ড সৈন্ধবলবণ খেতকেতুকে দেখাইয়া বলিলেন, বৎস খেতকেতো ! এষ্ট যে সৈন্ধবলবণ দেপিতেছ, আজ রাত্রিতে ইহা একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া দাও, কল্য প্রাতঃকালে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও ? ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া খেতকেতু চলিয়া গেলেন এবং পিতার আদেশে পরদিন প্রাতে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । উদ্ধালক পুত্রের তাদৃশ নিরতিশয় নিরীক সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া ধীরপ্রশান্তভাবে বলিলেন, খেতকেতো ! গত রাত্রিতে যে সৈন্ধবলবণ জলে রাখিয়াছিলে অদ্য তাহা আমার নিকট আনয়ন কর । এষ্ট আদেশমাত্র খেতকেতু সেই জল মধ্যে সৈন্ধবলবণের অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে যখন বহু অমুসন্ধানেও জলমধ্যে সৈন্ধবলবণ পাইলেন না, তখন পুনরায় পিতার নিকট প্রত্যাগত হইয়া বিবলহৃদয়ে বলিলেন, পিতঃ ! সে সৈন্ধবলবণ নাই—জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; উদ্ধালক বলিলেন, বিলীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তা’বলে ঐ জলেও নাই, একরূপ সিদ্ধান্ত করিও না ; কারণ, উহাতেই সেই সৈন্ধব লুক্কায়িত আছে । ইহা যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে উত্তার উপর, নীচ ও মধ্যভাগ হইতে কিছু কিছু জল পান কর, তাহাতেই সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিবে । এষ্ট কথাবান্ধারে খেতকেতু সেই জল আশ্বাদন করিলে পর উদ্ধালক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! ক’রস আশ্বাদন করিলে ? পুত্র বলিল, লবণ,—এ জলের সর্বত্রই কেবল লবণরস বিদ্যমান রহিয়াছে । তখন, উদ্ধালক অবসর বুঝিয়া বলিলেন, দেখ বৎস ! এ জগতে যে সমস্ত বস্তু বর্তমান আছে, তৎসমস্ত যে কেবল একমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, এমত নহে । একান্ত পরমকারুণিক পরমেশ্বর প্রাণিবিগকে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুই শক্তি বা ক্ষমতা বেরূপ পরিচ্ছিন্ন বা সোমাবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতাও সেইরূপ পরিমিত করিয়া দিয়াছেন । সেই কারণেই চক্ষু থাকিতেও বদীর ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে না এবং কণ

খাকিতেও অল্প ব্যক্তি কোনরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারে না । বিশেষতঃ বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অনেক কারণ প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে । যেমন, অতি দূরত্বনিবন্ধন প্রকাণ্ডকায় ইন্দিপ্রভৃতি, আর অতি সান্নিধ্যাবশতঃ নিজ নয়নাস্ত্রন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না । ইন্দিয়ের বিনাশ ও বিকলতা, মানসিক চঞ্চলতা, দৃশ্যবস্তুর সূক্ষ্মতা প্রভৃতি অনেক কারণ আছে, বাহ্যিক প্রভাবে জীবগণ বিদ্যমান বস্তুও প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । অতএব হে শ্বেতকেতো ! তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার বা আমার চক্ষুর দৃষ্ট হয় না বলিয়াই কোন বস্তুর অভাব হইতে পারে না । যুক্তি ও প্রমাণাস্তর দ্বারা বাহ্যিক অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা “ঋণ সত্য” বলিয়া মানিতে হইবে । যেমন অগণন পরমাণু নিচয় নিয়ত নয়ন পথে থাকিয়াও দৃষ্ট হইতেছে না, বলিয়া ঈগতে পরমাণু নাট একরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । অতএব, জানিও, পরমকারুণিক পরমেশ্বর এ ঈগতের অন্তর্বহিঃ সর্বত্র আকাশের স্থায় বর্তমান আছেন । রূপ না থাকায় আমাদের কণ্ঠের তাঁহাকে শুনিতে পারি না, রস নাট বলিয়া আমাদের রসনা তাঁহার আশ্বাদন গ্রহণ করিতে পারে না । বৎস শ্বেতকেতো ! রসনার রসাদানে যে রূপ জলাভাস্তর-বিলীন লবণের সত্তা উপলব্ধি করিয়াছি, সেইরূপ এই ঈগতগুলোর অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মকে জানিতে হইলেও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনের প্রয়োগ করিতে হয়, এবং দিগ্ভ্রাস্ত বৈদেশিক পুরুষ কোনও অপরিচিত দেশে উপস্থিত হইয়া বেকরূপ বিশ্বস্ত সাধু-পুরুষের উপদেশে আপন আপন গন্তব্যদেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অদৃষ্ট ও অক্ষতপূর্ব্ব সেই ব্রহ্মকে জানিতে বা হৃদয়গ্রম করিতে চাইলেও উপযুক্ত আচার্য্যের শরণাগত হইতে হয় ; নচেৎ কিছুতেই তাহা হৃদয়স্থ হইবার নহে । অতএব, হে শ্বেতকেতো ! “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” । অর্থাৎ যিনি উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্মত্ব বুঝিতে পারেন । একথা তুমি সন্মদা শ্রবণ রাখিবে ।

শ্রীভগবদ্গীতাচরণ শম্মা ।

মাই থাই ।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব ।]

সায়াম দেশে রমণী সমাজ মদ্যে শিক্ষার প্রথা প্রচলন নাহি : জ্ঞানমাত্রে শিক্ষার প্রথা প্রচলিত হয় নাহি বটে, কিন্তু শতকরা প্রায় ৯০ জন জ্ঞানলোক চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞা !! এই ৯০ জনের মদ্যে প্রায় ৮৮ জন “হাতুড়ে” !! কেবল শুনিয়া শুনিয়া এবং দেখিয়া দেখিয়া অথবা কেবল কল্পনা দ্বারা ইহারা চিকিৎসা করে । এই সকল চিকিৎসা-ব্যবসায়িনী সায়ামী জ্ঞানলোকের মতে মানবদেহ ৩২ অংশে বিভক্ত, এই “৩২ অংশ বিভক্ত মানবদেহ” খানি ২৬টি রোগের আশ্রম অর্থাৎ প্রত্যেক অংশ তিন তিনটি রোগের আগার বা উৎপাদক । সায়াম দেশে রোগের সাধারণ নাম “বায়ু ।” পীড়িত ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসিকাগণ মে সকল ব্যবস্থা (Prescriptions) দেখ তাহা অত্যন্ত কোতূকাবহ । আমি একটা জ্বরগ্রস্ত ও উদরাময় রোগীর ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, নিম্নে তাহার সমুদয় অবিকল বাজালাব্বাদ দিলাম—

“শ্রীশ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ।

নদীর জল	...	...	...	...	এক সের
হৃদের জল	...	...	...	...	এক সের
ঘরের বাগী জলকে উষ্ণ করিয়া লওয়া তাহার	...	...	...	...	এক সের
যুবতী জ্ঞানলোকের শুদ্ধ হৃৎ	...	...	...	...	এক তোলা
পুরাতন (বৌদ্ধ) দেবালয়ের পুরাতন দেওয়ালের	...	...	...	...	...
মাটি	...	...	...	...	অর্দ্ধতোলা
• মুষ্ণু মৌর্গাশা (নিম্ব) পত্রের রস	...	...	...	...	২ তোলা
• লবণ	...	...	...	...	১ তোলা
• কপূর	...	...	...	...	”
গোমূত্র	...	...	...	...	১ তোলা
ঘোল	...	...	...	...	অর্দ্ধ পোয়া
• শর্করা	...	...	...	...	একতোলা
হিরণ্য (নামক তিক্ত লতার) রস	...	...	...	...	একতোলা
ফাণা (নামক মৎস্তের) উদরস্থ পিণ্ড	...	...	...	...	১ তোলা

এই সকল জ্বা একত্র কারয়া মিলাইয়া, পুরোহিত (বাহার নাম আত্মগিরি কান্দীর) মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তে কিছুক্ষণ রাখিয়া এবং তাহাকে অর্ধরোপা-দক্ষিণা দিয়া, তিন বার প্রণাম পুরঃসর, ৫৬ বার বুদ্ধ বুদ্ধ নামোচ্চারণপূর্বক পূর্বমুখে ঔষধ গলাদঃকরণ করিলে, তিন দিনে, না হয় ৫ দিনে, না হয় ৭ দিনে, অথবা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়—৯ দিনে রোগী আরোগ্য হইবেই হইবে । ইতি”

স্বাগত—

চিকিৎসক ।

আর একটা কোতুকান্ন ব্যবস্থাপত্র অবিকল এইরূপ—

“শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ।

অহং সম্যম্ শরণং গচ্ছামি ।

শ্রীশ্রীআনন্দং শরণং গচ্ছামি ।

“রোগী কাহিল তাহার মাথার ব্যথা আছে, কোমরে বেদনা আছে, প্রস্রাব পাব্ধার হয় না, মল কঠিন, উদরে অজীর্ণ, বুক বেদনা, মনে অশান্তি এবং রাত্ৰিতে ভুতের ভয় । তন্নিম্ন অর্ধরাত্রে কুশল দেখে, বোধ হয় যেন কোনও দৈত্য তাহাকে কামড়াইতে আসিলে । এতদ্ব্যতীত পা ফুগে, হাত কুলে, চক্ষু জলে, পূর্বে ব্যথা ও গায়ে জ্বর আছে । আরও দেখা গেল, প্রেত ও রাক্ষসদিগের প্রভাববশতঃ মনো মনো প্রবল তিক্ত হয় । পাতালের প্রোতিনি-গণের অশুভ আগ-নে কাণের উৎপত্তি হইয়াছে, মুখ হঠতে অন্ন অন্ন রক্ত উঠে । বাহা হউক চিন্তা বা ভয় নাহি ।

“গণনা দ্বারা জানা গেল, রোগীর জন্ম-লক্ষণ শুভপ্রদ । বর্তমান বর্ষে তাহার গ্রহ অশুভ দায়ক নহে । বুদ্ধমন্দিরে একটা বিরাট ব্রতের আয়োজন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তন্নিম্ন ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতির শাস্তি জন্ত মহাব্রতের আয়োজন করিতেই হইবে ।

“ঔষধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, তিল ভিজাইয়া সেই জলে মর্কৎপুষ্পের রস এক চটাক মিলাইয়া ৫৬ বার বুদ্ধ নাম স্মরণ পূর্বক তাহা পান করিবে ।

“পখা।—পশু, পক্ষী, মৎস্য এবং ভেক মাংসের মধ্যে বাহা সুলভে পাওয়া যায় তাহাই প্রধান খাদ্য । ভাত দিবসে তিনবার, রাত্রে একবার ।

শ্রাবণ, ১৩১০ ।]

মাই থাই ।

২০৩

মান বন্ধ । ফল ২২টার অধিক খাটতে পাইবে না । নিজ' সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম নাট । পুরোহিতকে প্রতিদিন প্রণাম করিতে হইবে ।" ইত্যাদি

স্বাক্ষর—

চিকিৎসক ।

একদিন একটা রোগী একটা চিকিৎসিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি সকল ব্যবস্থাপত্রেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবার কথা লিখিয়া থাকেন, কিন্তু যদি আমি এই রোগ হইতে আরোগ্যলাভ না করি তাহা হইলে কি হইবে ?" চিকিৎসিকা উত্তর দিল "তাহা হইলে তোমার ভাগ্যকে মন্দ ভাবিয়া সম্বন্ধ থাকিও ।" সূচতুর রোগী কহিল "যদি সম্বোধ না অন্যে তাহাহইলে কি করিব ?" চিকিৎসিকা বলিল "তাহাহইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে জানিও ।" রোগী কহিল "যদি মৃত্যুই হয় তাহা হইলে কি করিব ?" চিকিৎসক মহাশয় রোগীর মাথায় হাত দিয়া কহিলেন "আমার হাতে মৃত্যু হইলে বুকের শরণাগত হইবে ইহা নিশ্চয়, অথবা চিন্তা বা ভয় নাই । সাধুরা তোমার সহায় আছেন, আমরাও সহায় হইলাম ।" এই কথা কহিয়া মৃদু মধুরহাস্য সহ চিকিৎসিকা সূদূরে পলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল । ভ্রমণ-কারী ঠায়ং সাহেব(Kingdom of Siam, Page 122) একখানা অদ্ভুত পুস্কপুশ্ণ (ব্যবস্থাপত্র) দেখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে এই দেবদূর্ভাব ব্যবস্থাপত্র খানির অবিকল অনুবাদ দিয়াছেন । পাঠকদিগের আমোদের জন্য আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে ইহা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

পুস্কপুশ্ণের অনুবাদ ।

(ভয়াবহ বিপদজনক জ্বরের ব্যবস্থাপত্র)

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ।

গণ্ডারের শৃঙ্গ চূর্ণ	...	...	১ তোলা
হাতির দাঁত চূর্ণ	...	...	ঐ
বাঘের দাঁত ঐ	...	...	ঐ
কুণ্ডীরের দাঁত ঐ	...	...	ঐ
ভল্লকের ঐ	...	...	ঐ
শকুনির অস্থি চূর্ণ	...	...	২ তোলা
হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ...	...	...	ঐ

চন্দন চূর্ণ	...	...	ঐ
টিকটিকীর লেজ চূর্ণ	...	...	ঐ
কপূর	...	...	২ তোলা
মহিষের গায়ের দাম	..	...	১ তোলা
কালো বিড়ালের চক্ষু	...	...	একটা
পুণাতন লৌহ চূর্ণ...	...	...	৩ তোলা
ছাগ শিশুর বৃকের হাড় চূর্ণ	...	...	একছটাক

“এই সকল দ্রব্য, পচা দধির সহিত মিশাইয়া, পাথরের উপরে উষ্ণ জল সহ একপে পেষণ করিবে যে, পেষণ করিতে করিতে ঔষধগুলি মাখমের দ্বারা কোমল ও তরল হইয়া যায় । দেখিও যেন একটু ও শক্ত না থাকে ; অর্ধ ঘণ্টা অন্তর, শ্বেতবর্ণের ছাগলের দুগ্ধ সহ, যে কয়েক দিন ইচ্ছা হয়, খাইও । ইহাতে নিশ্চয়ই জ্বর-দস্তু উদ্ধ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া যাইবে । অত্র বিষয়ে সন্দেহো নাহি ।”

স্বাক্ষর —

ত্ৰীচিকিৎসক ।

বলা বাহুল্য, ঐ রোগী একজন ধনবান লোক ছিল, সুতরাং চিকিৎসকের পুরস্কারটা বখোচিত হইয়াছিল বলিয়াই সকলের বিশ্বাস আছে । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঔষধ আদৌ মিলে নাই ; যদিও পাওয়া যাইত তাহা হইলে ঔষধ পেষণ করিতে করিতে বোধ হয় দশজন লোকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল ! ! সায়াম দেশের চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থাপত্রের শতকরা প্রায় ৯০ টা প্ৰসূকপ্ৰসূনের ঔষধগুলি স্বৰ্গ মর্ত্য পাতাল প্রদেশে পাওয়া যায় না ! !

সায়ামের রাজধানী ব্যাংকক্ নগর মিনামা নদীর তটে অবস্থিত । খ্রীষ্টীয় ১৭৬৭ অব্দ হইতে ডই নগর সামের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছে । রাজধানীতে প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ সহস্র লোকের বসতি । এখানে দেখিবার অনেক আশ্চর্য্য ও মনোহর পদার্থ আছে ; বাহুল্য ভয়ে তাহার বিবরণ দিলাম না । কোরাট, পচাবুরী, সিংগরা, চিংমল, চংতাবুম, অউথিয়া প্রভৃতি নগর দেখিবার যোগ্য । রেশমের দোকান, হাতির দাঁতের কারখানা, ভোজ্য দ্রব্য সমূহের পাকশালা, রাজ্যের বাটী, নৌকা নির্মাণের কার্যালয় প্রভৃতি দর্শন করিলে পথিকেরা আশ্চর্য্য হইতে পারেন ।

একদিন আমি একজন মায়ামৌ গ্রহাচার্যের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম । এই ব্যক্তি মানুষের অদৃষ্টে গণনা করিয়া জীবিকা নির্ভর করে । আচার্য্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “আপনার কি প্রয়োজন ?” আমি বলিলাম “আপনার দ্বারা আমার অদৃষ্টটা একবার গণনা করাইয়া দেখিতে চাই” । আচার্য্য আমাকে একটা ঘরে বসিতে বলিল, সেট ঘরের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে বাহা গোদা ছিল তাহা এই—

“ভাল কিছা মন্দ ; মন্দ কিছা ভালো ।

বদি না হয় নাদা, তাহ'লে হবে কালো ॥

সকলট মতা, সকলট মিথ্যা ;

সকলেই বাঁচলো, সকলেই মোলো ।

বদি না হয় অক্ষকার, তাহ'লে হবে আলো ॥”

গ্রহাচার্য্য মহাশয় তাহার বিপুল বপু খানিকে লোহিত চন্দনে চর্চিত করিয়া আমার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন । আমাকে আমার এবং আমার পিতার, পিতামহের, প্রপিতামহের, বৃদ্ধ পিতামহের, মাতার, মাতামহীর, প্রমাতামহীর প্রভৃতির নাম জিজ্ঞাসা করায়, আমি বলিলাম “আমি এখানে তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করিতে আসি নাই, কেবল অদৃষ্ট গণনা করাইতে আসিয়াছি ।” গ্রহাচার্য্য কহিল “তবে একটা গরুর নাম বলুন” । আমি বলিলাম “মানুষের মত গরুর নাম থাকে নাকি ?” গরুর নাম থাকে না শুনিয়া জ্যোতিষী মহাবিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইল, ধীরে ধীরে বলিল “আমাদের দেশের প্রত্যেক গরুর নাম আছে । বাহা হউক, একটা মানুষের নাম বলুন” । আমি বলিলাম “মহামহোপাধ্যায় অমরেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বেদান্তচক্ৰ” ; লোকটা বিরক্ত হইয়া বলিল “এত বড় কর্কশ নামে কাজ চলে না, একটা সরল নাম বলুন” । আমি বলিলাম “ফটিকচাঁদ” । গ্রহাচার্য্য কহিল “তবে অঙ্ক পাতিয়া হিসাব করি ।” তিনঘণ্টা অঙ্ক পাতিয়া হিসাব হইল কিন্তু হিসাবের শেষ ন! হওয়ার আচার্য্য কহিলেন “অদ্যকার নক্ষত্র ভাল নয়, সময়ও খারাপ, আপনি আর এক সময়ে আসিবেন ; বাহাই হউক, আপনার দেহে শুভচিহ্ন দেখা বাইতেছে, অতি অল্পকাল মধ্যেই আপনার শুভগ্রহ উদয় হইবে বলিয়া বোধ হয় । আমাকে কিছু টাকা দিয়া যাউন” । আমি কিছুই না দেওয়ায়, সক্রোধে জ্যোতিষিক কহিয়া উঠিল” আচ্ছা তবে যাও কিছু টাকা না দিলে অশুভগ্রহ

তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে । অশুভ গ্রহগণ আমাদের অনুগত ।” আমি বলিলাম “তোমরাই এক এক জন অশুভগ্রহের সাক্ষাৎ মূর্তি !” এই কথা কহিয়া আমি তাহার গৃহ তটতে চলিয়া আসিলাম ; লোকটা তাহার স্বাক্ষর কহিল “এমন লক্ষ্যচাড়া গোঁকর আগমন হইলেই আমাদের ব্যবসার সর্বনাশ দেখিতেছি ! !” আমি একবার সাতজন গ্রহচার্য্যকে আমার একজন বন্ধুর এখানে জন্মপত্র (কোষ্ঠি) প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম । ইহাদের কেহই পদম্পর্শকে চিনিত না এবং কেহই জানিত না যে অপর কাহাকেও কোষ্ঠি প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছে । কোষ্ঠি প্রস্তুত হইলে দেখিলাম, সাতখানি কোষ্ঠি ভিন্ন ভিন্ন ; কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই ! ! কিন্তু কয়েকটা কথা সকল কোষ্ঠিতেই ছিল, তাহা এই——“দীর্ঘজীবন, ধনলাভ, উত্তম বন্ধু প্রাপ্তি, দার্শনিক স্বভাব এবং সুস্থশরীর ” পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল, সাত জনেই প্রবঞ্চক এবং সাতখানা কোষ্ঠিই জাল ! !

সামনেশে চা বিক্রেতাদিগের বড় বড় দোকানে বড় বড় অক্ষরে বাহা লেখা থাকে তাহার একটা বাস্তবতা অনুবাদ দিলাম । এখানে প্রতিদিন অনেক টাকার চা বিক্রয় হয় । চা দোকানের সম্মুখস্থ কাষ্ঠি খণ্ডে লেখা থাকে——

“চুমুপ দিয়ে চা খাও চোঁচা পাখির মত ।

গরম্ গরম্ চা পেল আয়ু বাড়ে শত ॥”

সামনেশে ইংরাজ-প্রভুত্ব ছিল না, সম্প্রতি ব্রীটিশ বিক্রম ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইবার উপায় হইয়াছে । কেনা, পাটানি, কেলোন্টম, তিরিগানু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ সাম রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের অবিবাসীরা সাম্রাজ্য নরপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় ব্রীটিশ-সিংহ আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং সেইজন্য এই সকল দেশে ব্রীটিশ রেসিডেন্ট, ব্রীটিশ সেনা এবং ব্রীটিশ বণিক থাকিবার সুবিধা হইয়াছে । কিছুদিন পরে ইংরাজ প্রভু প্রদেশগুলিকে ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে আমরা আশ্চর্য্য হইব না ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধরানন্দ মহাভারতী ।

শ্রাদ্ধ সাহিত্য ।

শ্রাদ্ধ (প্রীতি, মায়া, ভক্তি)

“পিতামহঃ পিতা বর্গঃ পিতাহি পরমতপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্রে প্রীতস্তে সর্বদেবতাঃ ।
যেনাত্ত পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ ।
তেন মায়াং সত্যং মার্গং তেনগচ্ছন্নরিষাতে ।”

মহু ।

“শ্রদ্ধা দীপতে বহুচ্ছাদ্ধং” ।

এই বাক্যের বাচ্যার্থ ধরিলে শ্রদ্ধাপূন্যক যাগকে বাহ্য দেয় তাহাই তাহার শ্রাদ্ধদ্রব্য বলিতে হয় । বস্তুতঃ শ্রাদ্ধ শব্দে গেরূপ অভিধেয়ার্থ নাই । শ্রাদ্ধ বলিলেই ক্রটি অর্গস্থার মৃতব্যক্তির স্বর্গ কামনায় তদ্বন্দেবে তর্পণাদি সহিত পিণ্ডদান, তিলকাঞ্চন দান, ভূমাদি ষোড়শ দান, বৃষোৎসর্গ, ত্রাশ্বণাদির ভোজন ক্রিয়া এবং প্রকৃত নিরন্নব্যক্তিবর্গের ভূবি ভোজন সম্পাদন করাই আর্ঘ্য-চাতির শ্রাদ্ধ শব্দের প্রকৃত অর্থ হয় ।

এ ন দেখা যাউক কেবল ভারতীয় জাতি চতুষ্টয়ই কি মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, কি অন্য জাতি মধ্যেও শ্রাদ্ধ অথবা তাদৃশ কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রথা প্রচলিত আছে কি না ?

জ্ঞানিগণ মধ্যে সকল জাতিরই পিতৃ পিতামহাদির মৃত্যুতে একটা বিশেষ কষ্ট হয় । সেইরূপ কষ্ট হয় কেন ? জনক অপত্য স্নেহের অর্গাৎ মায়ার বশীভূত হইয়া, সন্তানকে সমুদয় বিঘ্নের হাত হইতে যথাসাধ্য উদ্ধার করিয়া, মনুষ্য ভাবে পরিণত করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন । প্রতিপালন সম্বন্ধে মাতৃদেবীর কথা উল্লেখ করা পিষ্ট পেষণ মাত্র, কারণ কে না জানেন যে মাতৃদেবী সন্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহেন । সুতরাং সর্বদেশীয় লোকেরই যে পিতৃলোকের প্রতি একটা বিশেষ ভক্তি আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । ঐ ভক্তির নামান্তর শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধা জ্বলিত কার্যের নাম শ্রাদ্ধ ।

প্রথমত দেখা যাইতেছে আর্ঘ্যগণ সকল লোকের আদি ও আদর্শ । তাহারাই বাহ্য করেন তাহারই অনুকরণ করা সকল জাতির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ; তবে আর্ঘ্যজাতির অনুষ্ঠিত গতি অনুসারে কার্য্য করিলে পাছে

জাতীয় উৎকর্ষ এবং নবীনতার গন্ধ প্রকাশ না পায় এই হেতুবশতঃ তাঁহারা সংক্রিয়া রূপ মহামারীর হৃৎপদাদি ছেদনপূর্ব্বক অঙ্গ বিকৃতি করিয়া একটা সংসাজান । সংসাজাইলেও তাহার মধ্যে একটা প্রগাঢ় ভাব নিহিত থাকে । আমরা সেই ভাবটিকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা শব্দে অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে পারি ।

মুসলমানেরা মৃতের উদ্দেশে প্রত্যেক দশা হাফে চতুর্থ দশাপর্ষ্যন্ত অর্গাৎ ৪০ চাম্পে বলিয়া একটা প্রেতকৃত্য করিয়া থাকেন । ঐ প্রেতকৃত্যে সম্ভবমত দান ও মৃতের উদ্দেশে দান ও মজ্জ পাঠ ইত্যাদি থাকে । মজ্জ পাঠকালে রোদনের বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায় । অনেকেরই মনঃকাজে প্রমাণ দেখিয়াছেন ; মৃত হাসেন হোসেনের জন্ত অনবরতঃ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করা হয় । এই কার্য্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করাও সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় । বুক চাপড়ান শোকপ্রকাশ ও ক্রন্দনকার্য্যে লোক ভাড়া করা হয় । নিরঙ্কর ও ভক্তিহীন আমীর ওমরাগণ এই পথের পথিক । প্রকৃত ধার্মিকগণ ক্রিয়ার অনুর্ত্তানে ভক্তিভাবে ক্রন্দন ও ক্লদয়ে করাঘাত করেন । মুসলমানগণ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণাদি ভেদে চান্দ্র মাস গণনায় যে অনেক কার্য্য করেন তাহার অধিকাংশ মৃতের উদ্দেশে সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

পৌষসংক্রান্তিতে অথবা অম্বুবাচির সময় পশুপক্ষীর হনন, পিষ্টক ও জলোৎসর্গ প্রায় সমুদায় মুসলমান মধ্যেই দেখা যায় । তবে যাহারা হেদা যৎ অর্গাৎ একেশ্বরবাদী তাঁহারা কোন কার্য্যই করেন না । কেবল লোকহিতার্থ কতকগুলি কার্য্য করা তাঁহাদিগের যেন মূল উদ্দেশ্য । তাহা সাধন করিতে বতটুকু জাতীয় গৌরব ও মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখান আবশ্যক তাহারই চেষ্টা করেন মাত্র ।

ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানগণও মুসা ও যিশুখৃষ্টের মৃত দিনকে পবিত্র জ্ঞানে সংক্রিয়ার অনুর্ত্তানি করিয়া থাকেন, সুতরাং ঐ দিবসীয় সংকার্য্যগুলিকে শ্রদ্ধার অনুকরণ কহিতে পারা যায় । খ্রীষ্টিয়ান ও ইহুদীজাতির মাতা পিতার স্বর্গোদ্দেশে দানাদি করিয়া থাকেন । এবং মলিন বেশে অনেকদিন সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাচ করেন । সুতরাং তাঁহাদিগের ঐ সময়টাকে অশোচ কাল বলিতে পারা যায় । অপিতৃ পিতাদির স্মরণার্থ দানাদি বাপারটিকে শ্রদ্ধা শব্দেই নির্দেশ করা যাউতে পারে ।

সভ্যজগতের কথা বলা গেল। এখন অসভ্য বর্ষরেরা কি করে দেখা যাউক। তাহারাও মৃতব্যক্তিকে সহসা পরিত্যাগ করে না। রাখিবার চেষ্টা করে। যতদিন শবটি পচিয়া না যায় তাবৎকাল উহা বৃক্ষাদিতে সংস্থাপন করিয়া ফলপুষ্পাদি দ্বারা পরিমোচিত করিয়া প্রত্যাহ দেখিতে থাকে। পচিয়া গেলে পক্ষাদিকে ভক্ষণ করায়, অথবা জলে ফেলিয়া দেয়, কিঞ্চিৎ বোধবিশিষ্ট অসভ্য লোকে মৃতব্যক্তির সমাধি দেয় কুকৌর। মৃতব্যক্তিকে ভক্ষণ করে। তাহার উদ্দেশ্য কি বলা যায় না। সে যাহা হউক অধিকাংশ জাতির উদ্দেশ্য ভক্তিপ্রদর্শন। সেই ভক্তিকে আমরা শ্রাদ্ধ বলিয়া আসিতেছি।

আমরা আর অন্তের কথায় কালক্ষেপ করিব না। আমরা কেন শ্রাদ্ধ করি তাহাষ্ট বলা কর্তব্য। তদনুসারে আমরা বেদ স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদি ধর্মশাস্ত্রের মতানুযায়ী শ্রাদ্ধের অঙ্গ এবং শ্রাদ্ধ কার্যের ঐতিকর্তব্যতার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বলিব।

যে ব্যক্তির যতদিন যেখানে বাস বা পরিচয় সেইস্থান এবং পরিচিতের সাহিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। মৃতরাং অনেক দিনের মায়ী হেতু তাক্ত বস্তুতেও একটা মজামায়ার স্মৃতি হয়। সেই স্মরণ নিবন্ধন মৃতব্যক্তি স্থল শরীর পরিত্যাগ করিয়াও স্থল শরীরে অবস্থান পূর্বক পরিচিতস্থান ও চিরপরিচিত সম্বন্ধ ভুলিতে পারেন না। পূর্বপরিচিতের নিকট হইতে নিজের স্বচ্ছন্দতা ও পরলোকে সুখের কামনা করেন। ঠাইলোকে অবস্থান সময়ে নিজের সুকৃতি ও দুকৃতি নিবন্ধন সুখ দুখের সীমা অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার ইহসংসারে জন্মের যত্ননা ও পরকালে যমদ্বারে পুরাম নরকে না যাউতে হয় বলিয়া পুত্র কামনা করেন। পুত্র শব্দে, পুত্র পৌত্রাদি সন্তান বর্গকে লক্ষণা করিতে হইবে।

- (১) পুত্রই পুরাম নরক নিস্তারে পিতার একমাত্র সহায়। পুত্রই পিতার অংশ অর্থাৎ তাহার আত্মা হইতে জাত। এইজন্য পুত্র শব্দের প্রকৃত নাম আত্মজ। পুত্র দ্বাদশ প্রকার। অন্য একাদশ বিধ, আত্মজের প্রতিনিধি মাত্র। সেই একাদশ পুত্রপ্রতিনিধি মধ্যে দত্তক পুত্রই শ্রেষ্ঠ। দত্তক পুত্র ঔরস পুত্রের ত্রায় বংশরক্ষক এবং পিতাদি উচ্ছতনপুরুষের পিতা দাতা।

শ্রাদ্ধ না করিলে পুত্রাদির প্রতাবায় ও অধর্ম্ম জন্মে। অধর্ম্ম হেতু

নরক গমন করিতে হয় । নরক আছে কি না সে সন্দেহ বাহার। করেন তাঁহার। নাস্তিক । আমরা নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত নহি । আস্তিক ব্যক্তি শাস্ত্র মানেন তাঁহাদিগের জন্তই এ প্রস্তাব ।

শুনিতে পাঠ এখন অনেক নাস্তিকও, বিলাতি প্রেতহস্তের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের, দ্বারকা নাথ ঠাকুর ও রণজিত সিংহাদির ছায়া দেখেন, ও কথাবার্তা শুনিতে পান, ও তদনুসারে নিজের অভীষ্ট ব্যক্তির সহিত হস্তলিপিতে কথা কহিতে চাহেন ! তাঁহাদিগের সঙ্গে বিলাতী বিদ্যাতের অংগুর অংশ প্রবেশ করে ; এবং অভীষ্ট ও প্রিয় ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে পান । ইহারা শ্রদ্ধা বাদী ।

স্বর্গকামনায় কাহাকে কিছু দিতে হইলে পরিশুদ্ধ হৃদয়ে ও পবিত্র শরীরে দিতে হয় । কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা না জন্মিলে দত্ত বস্তু স্বর্গে পৌঁছে না । সুতরাং দাতাকে সর্বতোভাবে অগ্রে পবিত্র হইতে হয় ।

মানুষ মরিলেই আত্মার ও ব্যক্তির শোক ও পরিতাপ ভয়ে । যাবৎ শোক থাকে তাবৎ কাল সে ব্যক্তি অশুচি এই হেতু বশতঃ ঋষিবর্গ শোকের একটি সীমা নির্দেশ করিয়াছেন । যে যেমন জানৌ বা অজ্ঞান তাহার তদনুসারে শোক তাপ নিবৃত্তি হইবার কথা, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জ্ঞানিব্যক্তির অশুচি কাল অর্থাৎ অশৌচের অপেক্ষাকৃত অল্পতা দেখা যায় । এবং আকস্মিক বিপদ অর্থাৎ হঠাৎ হৃদৈব নিবন্ধন অপমৃত্যু স্থলে, অদিককাল ওরূপ বিষয়ে শোক করায়, অন্তবিধ অপকার্যের প্রবেশ হইবার সম্ভাব বলিয়া, তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি বিধানের ব্যবস্থা দেখা যায় । অপমৃত্যুস্থলে ত্রিরাত্রাশৌচ তাহার প্রমাণ ।

প্রেত শ্রাদ্ধে কি কি কার্য্য হয় । তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এক্ষণে ইহা বলা কর্তব্য যে শ্রাদ্ধ না করিলে মৃতব্যক্তির প্রেতস্থ পরিহার হয় না । প্রেতের সুখের জন্ত সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ অথবা অশৌচান্ত দিনের সন্ধ্যাকালে নীর ক্ষীর দেওয়া হয় । ইহা দ্বারা শ্মশানানল দন্ধের ক্লেশ এবং বন্ধুজন কর্তৃক পরিত্যাগ জন্ত দুঃখ দূর হইয়া থাকে । প্রেত ভাব দূর হইলে তিনি স্বর্গে পিতৃলোকের সহিত বাস করিতে অধিকারী হইবেন । এই কার্য্যটি সপিণ্ডীকরণ কার্য্য দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে । সপিণ্ডীকরণে তিনি পিতাদি উর্দ্ধতন তিন পুরুষের সহিত একত্র অধিষ্ঠানপূর্বক পুত্রাদি অধস্তন ত্রিপুরুষ প্রদত্ত পিণ্ড ভোগ করেন । এইরূপে তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন হইলে তিনিও অক্ষয় স্বর্গভোগে অধিকারী হইবেন ।

পাতপুত্রবিহীনা নারীর সপিণ্ডন নাহি । তাহার কারণ জ্বীলোকের সপিণ্ডতা, অর্থাৎ পরলোকে পতির সালোকা ও সাযুজ্যাণি প্রাপ্তি, সেই নারীর স্বশ্রু আদি উর্দ্ধতন স্বশ্রুতের সহিত অর্থাৎ শাণ্ডী বড়শেষ ও তাহার শাণ্ডীর সহিত । পতিপুত্র না থাকায় এতসকল জীজ্ঞাতির সালোকা, সামীপ্য ও সাযুজ্যা প্রাপ্তির উপায় নাহি ! মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ, পুত্রাদি তিন পুরুষের অধিকার । পুত্রহীনা অথচ পতিবস্ত্রী নারীর সপিণ্ডতা স্বামীদ্বারা সাধিত হয় । কারণ স্বামী জ্বী অর্দ্ধাঙ্গ ও অর্দ্ধাঙ্গী, পতি পুত্র বিহীনা জ্বীর সে পথ নাহি ।

এক্ষণে কেহ কেহ কহিতে পারেন যে অপুত্রক অথবা সপিণ্ড্য রহিত ব্যক্তির পিণ্ডদান কার্য্য হয় কিনা এবং তাহাদিগের রোরবাদি নরক নিস্তারের পথ আছে কি না ? পাঠক তুমি নিশ্চয় জানিবে যে আর্য্যোরা যে প্রকার ভক্তিমান, ব্রহ্মবান, প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে যতটুকু অপুত্রক অপহৃত ও দুর্গত লোকের প্রতি সমধিক দয়া ও তাহাদিগের ইহলোক ও পরলোকের তৃপ্তি ও সুখের জন্য প্রতি গৃহস্থের প্রতি আতিথ্য ও ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন । পরলোকেগত ব্যক্তিবর্গের অপুত্রক ও বন্ধুহীনাতির অগ্রে পিণ্ডদান ব্যতিরেকে অভৌষ্ট ব্যক্তির পিণ্ডদান সিদ্ধ হয় না ; তর্পণাদিতেও আত্মীয় অনাত্মীয় শত্রু মিত্র স্বজাতি বিজাতি ইহজন্মে ও পূর্বজন্মের পরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবার কথা নয় ; অগ্রেই নির্বিকার চিন্তে এবং ভক্তিভাবে অপহৃতাদিগকে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা প্রীত করা আর্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ আছে । যিনি এই পথ পরিত্যাগ করিবেন তাহার পিতৃদিগের পিণ্ডদান কার্য্য অসিদ্ধ হইবে । আর্য্যদিগের মনের উদ্যম্য কত দেখ । গয়াশ্রাদ্ধে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বুঝ নাহি । স্বরণপথে যত মৃত ব্যক্তির নাম উপস্থিত হয় তৎসমস্তেরই শ্রাদ্ধ তর্পণ ও তদ্বন্দ্বেনে দান করিতে হয় । গয়াশ্রাদ্ধে যে কোনরূপ অগতিক ব্যক্তির সঙ্গতি করিতে হয় ; অপিণ্ডক জন গয়াশ্রাদ্ধ প্রভাবে অক্ষয় সঙ্গতি প্রাপ্ত হয় । সুতরাং এই কার্য্যটি সাধারণের প্রধান কার্য্য । পিণ্ডদাতাকে স্বার্থপর বলা যায়না । শ্রাদ্ধে আরও একটি কৃষ্ণজ্ঞতার কার্য্য দেখা যায় । প্রথমে দেখা যায়, যে ঈশ্বর হইতে স্বাবর জন্ম অভিন্ন, ও বাহার দ্বারা ও বাহার অনুগ্রহে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে, জীবিত আছে ও অবশেষে যাহাতে লীন হইবে, তাহার স্মরণার্থ মন্ত্রের অগ্রে ও পশ্চাৎ প্রণব উচ্চারণ করা যাবে ।

দ্বিতীয়ে, সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চনা, ইহাধারা নিজের দেবসাক্ষ্য প্রাপ্তি । তদ্বারা ঋষি পিতৃ ও দেবাদির অর্চনার অধিকার জন্মে । নতুবা ক্রিয়ার অনধিকার জন্মে একরূপ শ্রুতি আছে । তৃতীয়ে, বাস্তব পুরুষের আরাধনা । এই কার্য্যধারা অধিষ্ঠান ভূতা পৃথীর অধিদেবতার ভূপ্তিসাধন হয় । ইহাতে নিজের অধিবাসের নিব্বিঘ্নতা সম্পাদন হয় । চতুর্থে, ভূস্বামীর পূজা : এই পূজাধারা রাজার সহিত প্রজার পিতা পুত্রস্ব স্বক্বের স্পষ্ট প্রীতির নির্দেশ অনায়াসে অমুভূত হয় । পঞ্চমে, সর্বভূতের প্রীতি সাধন । তৎপরে অগ্নি-দগ্ধাদি অসদগতিক ব্যক্তির পিণ্ডদান । এই কার্য্য হইলে অভাষ্ট ব্যক্তির পরগোন্ধে পিণ্ডদান কার্য্যে অধিকার জন্মে ।

অভীষ্টের পিণ্ডদান সময়ে ঐতিহাস কীর্ত্তন করিতে হয় । কেন করা যায় ? ভোজনকালে মনোহর গল্প শুনিলে বাস্তুশ্য শানন্দ হয় তেমন আর কোন সময়ে হয় না । গল্প শুনিলে বিশেষ তৃপ্তি জন্মে । সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধকালে ঐতিবৃত্তমূলক দুই একটি বৈদিক বা পৌরাণিক গাথা শুনাইয়া আসিতেছি । পূর্বকালে সাম গান হইত, এক্ষণে সচরাচর বিরাটপদ ও গীতা পাঠ হইয়া থাকে ।

পিণ্ডদানের পর ভাবনা অর্থাৎ যদ্বক্ষেপে পিণ্ডদান হইতেছে তিনি স্মৃশ শরীরী হইলেও, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্তী হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যরূপে পিণ্ডদাতার হস্তচ্যুত অন্ন প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পিণ্ডদাতাকে আশীর্বাদ করিতেছেন । এইরূপ চিন্তা কি নিতান্ত ভক্তি প্রীতি ও বিশ্বাসের কার্য্য নহে ? বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিলেই, পরলোকস্থিত ব্যক্তিবর্গ ঠহলোকে স্মৃশদেহে আগমন পূর্ব্বক, ভক্তিভাবে প্রদত্ত পিণ্ডাদির সারভূত সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন । কেহ কেহ কহিবেন, যেমন পিণ্ড তেমনই থাকে, মৃতব্যক্তির ভোজন দ্বারা পিণ্ডাদি উৎসৃষ্ট বস্তুর ক্ষয় হইতে দেখা যায় না । তদ্বস্তরে বলিব, সূক্ষ্মাংশ বহির্গত হইলে সূক্ষ্মাংশের পরিমাণের তারতম্য করা কখনই বাঁঠিতে পারে না । তাই আমরা উৎসৃষ্ট বস্তুকে যথাবস্থায় দেখিতে পাঠি ।

পিণ্ডদানের পর আশীর্বাদ প্রার্থনা আছে । তাহাতে পিণ্ডদাতার সর্বাঙ্গীন শুভকামনা, এবং সন্তানবর্গের নিরন্তর অনাময় ও মঙ্গল প্রার্থনা, এবং অতিথিবর্গের অপ্রতিহত ভাবে অন্নপ্রাপ্তির হেতুভূত স্বকীয় সন্ততির অন্ন-ব্যক্তির বর বাঞ্ছা (পশ্বাদির জায় আশ্বোদুর পরিপূরণে) কাহারও নিকট না করিতে হয়, ইত্যাদি স্বাবলম্বন প্রকৃতি চিন্তাধারা নিজের দৈন্যাবস্থা

দুরীকরণের অভিলাষ নীচমনার কার্য। প্রত্যাশী হওয়া কর্তব্য নহে তাহার প্রার্থনা ।

পিণ্ডদাতার অবস্থানুসারে শ্রাদ্ধের আড়ম্বর পারিপাট্য ও হীনতা হইয়া থাকে । উচ্চ অবস্থায় বিস্তৃষ্টা করিলে পিণ্ডদান কার্য পণ্ড হয় : প্রকৃত অসংস্থান সময়ে বখাশক্তি দানেই কার্যসিদ্ধি হয় । এই নিয়মানুসারে বনবাসী রামচন্দ্র বখার্ণ ভক্তিভাবে বালির পিণ্ড দিয়াও রোদন করিয়া পরি-
ত্ৰাণ পাঠিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তদীয় পিতা রাজা দশরথের প্রোতস্ব পরিহার হয় :

এখন দেখ প্রীতি, মায়া ও ভক্তিই সকলের মূল । অমরা, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার প্রণোদিত শ্রাদ্ধ কোন কার্যকর নহে । সুতরাং মহারাজাকেও কহিতে হইবে যে আমি অন্নহীন, সৎক্রিয়াগীন, বিধিহীন, ভক্তিহীন পামর সদৃশ ব্যক্তি, অতএব আমার প্রদত্ত পিণ্ড আপনারা স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে গ্রহণ করিয়া আমাকে অশ্লীল করুন । আপনাদিগের দর্শনে ইহা সুখাময় হউক ।

যুক্তিযুক্তিতে একোদ্বিষ্টে শ্রাদ্ধ বর্ষান্তে একবার করিলেই হয় । কিন্তু পার্শ্বগাদি শ্রাদ্ধ, বাহাতে ত্রৈপুরুষিক ক্রমে পিতৃাদিত্রয় ও মাতামহাদিত্রয় এবং বসুমত্যাতির পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে, উহা নিত্য অর্থাৎ প্রতি অমা-
বস্তায়, গ্রহণে, তীর্থে এবং দশবিধ সংকারে আত্মাদয়িক কার্য্যে অবশ্য করণীয় ।

আর্য্যগণ বখন যে কার্য্য আরম্ভ করিবেন তখন ষট্পুরুষের এবং দৈব পৈতৃাদির শ্রাদ্ধ না করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না । বর্ষমধ্যে প্রথমে নুতন অন্ন গ্রহণ করিতে হয় । অমনি নবান্ন শ্রাদ্ধ নির্দিষ্ট হইল । অপূপ গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইল, তখন অপূপাষ্টকা না করিয়া অপূপ আহার করার বিধি নাই । মাংস ভোজনের ইচ্ছা হইলে শাস্ত্রবিহিত মাংসদ্বারা মাংসাষ্ট-
কার শ্রাদ্ধ অবশ্য করিতে হইবে ।

উদরপূরণের ইচ্ছায় পশুহিংসা অবৈধ । বৈবহিংসা করিতে হইলে যজ্ঞ করিতে হইবে । যজ্ঞের প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মণ ভোজন । সুতরাং ব্রাহ্মাভোজ্য পশুবধ পাপজনক নহে । তদ্রূপ পশুহিংসা বৈধ ।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে যিনি সংস্তাসাদি যুক্তিমার্গের দ্বারা অথবা কালীপ্রাপ্তি দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের সদগতি অন্ত

পুত্রাদি সন্ততিবর্গের পিণ্ডদান কার্যের আবশ্যকতা নাই ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা পিণ্ডের প্রত্যাশা না করিলেও পুত্রাদির পিতৃদির প্রতি ভক্ত্যভি-
শয়তা দেখান নিতান্ত কর্তব্য । তদ্বারা পুত্রাদির শুভফল বাতীত অন্তত-
সম্ভাবনা নাই । বরং ঐ কার্যদ্বারা চিন্তের ক্ষোভ ও শোক তাপাদি অনার্য্যাসে
নিবৃত্তি হয় ।

আদ্যাশ্রাঙ্গে, ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠ্যাসে ও সংবৎসর মধ্যে ব্রহ্মোৎসর্গ বিধানের
প্রমাণ—যথা

একাদশাহে প্রেতস্ত যন্তচোৎসৃজ্যতেবৃষঃ ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং সগচ্ছতি ॥
আদ্যাশ্রাঙ্গে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠ্যাসিচ বৎসরে !
ব্রহ্মোৎসর্গস্ত কর্তব্যো যাবন্নর্যাং সপিণ্ডতা ॥

অগ্নিপুরাণ ।

সুলক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মোৎসর্গ করা আবশ্যক । কারণ ঐ ব্রহ্মদ্বারা প্রেতের
স্বর্গসাধন এবং আনুষঙ্গিক ইহলোকের গোজাতির গর্ভাধান সুন্দররূপে হইয়া
থাকে । যথা

তাব্যজ্ঞে! জীববৎসারাঃ পরম্বিষ্ঠাঃ সূতোবলী ।
একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যো, ত্রি, কাদষ্টকাসুতঃ ॥

কাত্যায়নসংহিতা ।

ব্রহ্মোৎসর্গ ও গর্য্যাক্ষের তুল্যতার প্রমাণ যথা—

ত্রষ্টব্য্য বহবঃপুত্রা যদ্যপেকোহপি গর্য্যাহব্রজেৎ ।
গৌরীষ্যপুত্রহেৎ ভার্য্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥

ব্রহ্মপুরাণ ।

গর্য্যাক্ষের ফলশ্রুতি । যথা—

গর্য্যাক্ষং পিণ্ডদানেন যৎকলং লভতে নরঃ ।
নতচ্ছকামর্য্যাবক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি ॥ ৪।২

বায়ুপুরাণোক্ত শ্বেতবরাহকল্পে গর্য্যামাহাশ্র্য্যং ।

কাক্ষস্তিপিভরঃ পুত্রান্নরকাস্তরভীরবঃ ।

গর্য্যং যান্ততি যঃ পুত্রঃ সনজাতা ভবিষ্যতি ॥ ১১।১।ঐ

মহাকল্পকৃতং পাপং গর্য্যং প্রাপ্য বিনশ্যতি ।

পিণ্ডং দদ্যাক্ষ পিতৃদেবর্য্যান্ননোহপি তিলৈবিনা ॥ ১৪।১ ঐ

যদ্বারা প্রমাণ হইল যে, নিজের পিণ্ডও নিজে গয়ায় দেওয়া যাউতে পারে ।
লোক উচ্চা করিয়া গার্হস্থ্যশ্রম পরিত্যাগ সময়ে নিজে দিয়া থাকেন ।

গয়ামাহাত্ম্য-পিণ্ডদান মন্ত্রে দেখা যায়, অসদগতিকের পিণ্ড যে কেহ
দিলেই তাহার সন্দতি হয় যথা—

রৌরবে অন্ধতামিশ্রে কালমৃত্রেচ যে গতাঃ ।

তেষামুদ্ধরণার্থায় তমংপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩৬৬

যে ইবাক্কা বাক্কাযমে বেহস্তজন্মানি বাক্কাবাঃ ।

তেষাং পিণ্ডোমরাদত্তো হৃক্ষযামুপার্জিততাং ॥ ৪৪ ৬ ঐ

গয়াস্বরের মন্তকে যে কোন ব্যক্তির নামে পিণ্ড দিলেই সে ব্যক্তি নরক
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।

গয়া শিরসি যঃ পিণ্ডান্ যেষাং নাম্না তুর্নিবপেৎ ।

নরকাৎ স্বর্গ লোকান্তে স্বর্গস্থা মোক্ষ মাগ্ন্যুযুঃ ॥ ৭৪।৭ ঐ

প্রেত শ্রাদ্ধে ষোড়শদানে কি কি দ্রব্য আবশ্যক তাহার নির্ণয় যথা ;—

ভূম্যাসনং জলংবস্ত্রং প্রদীপোহ্নয়ঃ ততপরং ।

তাশূলং চতুর্গন্ধাশ্চ মালাং ফলমতঃপরং ॥

শয্যা পাছুকাপাবঃ কাকনং রক্ততং তথা ॥

দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেত মুক্তিদায়কং ॥

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব ধৃত মন্ত্র পুরাণ ।

শ্রাদ্ধে ভূস্বামীর পূজা অত্যাবশ্যক, সুতরাং অন্য যজ্ঞেও ভূস্বামীর
নিমন্ত্রণ স্বতঃসিদ্ধ । যথা—

“যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরং ধ্যয়েৎ শ্রাদ্ধে বিষ্ণুং বিশেষতঃ ।

পুরুষং বাস্তু সংকল্প ভূস্বামীন মৃষীসুখা ॥

ইতি আচার মাধবীয়ে শ্রাদ্ধকর্মে ।

মৃতব্যক্তির প্রেতত্বে, বর্ষ মধ্যে পরিহার হয় না বলিয়া স্ত্রী পুত্রের
শোক তাপ অন্য লোক অপেক্ষা অধিক হয় । এবং কাল প্রেতত্ব
থাকে তাবৎকাল স্ত্রী ও পুত্রের দেহাশোচ থাকে । তৎকালে নৈমিত্তিক
দেব কার্য্যে এবং পিতৃ মাতৃ কার্য্য ব্যতীত অন্য পৈত্র কার্য্যেও
অধিকার হয় না । তবে পুত্রাদির অন্তপ্রাণন উপনয়ন ও কস্তার বিবাহ
উপলক্ষে ব্রহ্মি শ্রাদ্ধে নিমিত্তক অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই
প্রেতত্ব ও দেহাশোচ দূরীকৃত হইয়া থাকে । যথা—

প্রমৃতৌ পিতরৌষস্ত দেহন্তস্যাশুচি ভবেৎ ।

নাপি দৈবং নবাটৈপত্রং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ ।

অক্ষাক্ সৎসং সবাৎ বৃদ্ধৌ পূর্ণে সংবৎসরে হপিণী

শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেক ।

ভর্তৃ সমক্ষে মৃত পতি পুত্রবতী নারীর শ্রাদ্ধে চন্দনধেনু হয়, বৃষোৎ, সর্গ হয় না : প্রমাণ যথা—

তাতে জীবতি সো মাতৃবৃষোৎসর্গং সমাচরেৎ ।

বৃষয়ন্তেন ভবতি পিতৃহাচোপ জায়তে ॥

পতি পুত্রবতী নারী ম্রিতে ভর্তৃ, রক্ততঃ ।

চন্দনেনাকৃত্যং ধেনুং তন্তু স্বর্গীয় কর্ততে ॥

মদন পারিজাত মৃত আপস্তম্ব বচন ।

পতিপুত্র হীনা স্ত্রী জাতির সপিণ্ডিকরণ হয় না । যথা—

“পতিপুত্র বিহীনাধাঃ স্ত্রীয়া নাস্তি সপিণ্ডনং ।” শ্রাদ্ধ তত্ ।

পিত্রাদির উদ্দেশে অন্নদান সময়ে নিজের দৈন্ত্র জানাইতে হয় । যথা—

অন্নগীনং ক্রিয়া হীনং বিধিহীনং মদর্চিতং ।

ভক্তি হীনং কৃতং শ্রাদ্ধ মচ্ছিত্রং স্বং প্রসদাতঃ ॥

মদন পারিজাতায় আপস্তম্ব বচনঃ

অন্নদানাদির পরে বৈদিক ক্রতি পাঠ করিতে হয় যথা—

মধুবাভা ঋতায়তে মধুক্ষরাস্ত সিদ্ধবঃ ।

ইত্যাদি মন্ত্র, সকলেই জানেন বলিয়া লেখা গেল না ।

অন্নুরাদি হইতে হব্য কবোর রক্ষা কবা এবং অব্যাস্ত্র হরির স্মরণ আবশ্যক যথা—ক্রতি

ও বক্তব্যরো হব্য সমস্ত কব্য ভোক্তা অব্যাস্ত্র হরির ঈশ্বরেত্যাদি মন্ত্র সকলেই জানেন ।

শ্রাদ্ধের পিণ্ডদান সময়ে ধর্মশাস্ত্রকার ঋষিবর্গকে স্মরণ করিতে হয় । যথা—

‘মহত্ৰিবিম্বুহারীতযাক্ষবকোশনেত্যাদি’ মন্ত্র ।

ইহার পরেই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠ করা রীতি । তদনুসারে মহাভারতীয় কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয় । যথা—দুর্যোধনো মহ্যাময়ো মহাক্রমঃ স্বক্ক-
কর্ণঃ শকুনীত্যাди । যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাক্রমেত্যাদি মন্ত্র সকলেই জানেন ।

শ্রাবণ, ১৩১০ ।]

শ্রাদ্ধ-মাহাত্ম্য ।

২১৭

স্বর্গীয় পিতৃলোকদের উদ্দেশে হীনজাতিও, ভক্তি নিবন্ধন পিতৃলোকের অভক্ষ্য বস্তুর পিণ্ডদানের ফলে, জন্মের ক্রমোন্নতিতে ত্রিসোনি উত্তীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । ইহা কি সামান্ত কামনার কথা ।
যথা—

সপ্তন্যাসা দশার্ণেবু-মৃগঃ কালাঞ্জরে গিরৌ ।
চক্রবাকাঃ সরসীপে হংসাঃসরসি মানসে ॥
তেভিজাতা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুগং তেভো। হবসৌদতঃ ॥

অপুত্রক ও অপঘাতাদি মৃত্যুহেতু অসঙ্গতিকের পিণ্ডদান অগ্রে কর্তব্য । সে মন্ত্ৰটি সকলের জানা থাকিলেও আৰ্য্যজাতির মনের ঔদার্য্য প্রদর্শন জন্য লিখিত হইল ।

অগ্নিদক্ষাশ্চ যে জীবা যে পাদশ্চ কুলে মম ।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্ত্যশাস্তি পরাং গতিং ॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু নৈবান্নসিদ্ধির্নতথা
নমস্তি তৎতৃপ্তয়ে হ্নঃ ভবিদন্তমেতৎ প্রয়াস্ত
লোকায সুখায় তদ্বৎ ॥ শ্রাদ্ধপদ্ধতি ।

স্বকীয়পিণ্ডাদির তর্পণেও এইরূপ দেখা যায়

যথা—দেবায়ক্ষাস্থথানাগেত্যাদি,

ভীষ্মশাস্তনবো বীরেত্যাদি, যে হবাকবা বাক্ববাবেত্যাদি আত্মক ভবনেত্যাদি ।
আত্মক স্তম্ভ পর্ষাশ্বেত্যাদি' যে চান্সকং কুলেত্যাদি মন্দহারা অগতিকের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করা হয় ।

পিণ্ডদানান্তে দক্ষিণা বাক্যের পরই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এই মন্ত্ৰটিও অনেকেরই জানা আছে তথাপি আশুকা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির স্মরণার্থ লিখিত হইল । যথা—

যাক্রা ও আশিষো মোদীষতাং ।
প্রভাস্তরং ও আশিষঃ প্রতি গৃহ্ততাং ।

ও দাতারোনো বিবর্জিতাং বেদা সন্ততি রেবচ । শ্রদ্ধাচ নোমা ব্যাগমং
বহুদেয়ঞ্চ নোহ স্থিতি ।

অন্নঞ্চ নো বহুভাব দত্তিথিঞ্চ লভে মতি ।
যাচি তারশ্চ নঃ সন্ত মাচ যাচিষ্য কঞ্চন ॥

অন্নং প্রবর্জতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু ।

যস্যৈ সঙ্কল্পিতো বিহঙ্কৃতাক্ষয়া তৃপ্তরসঃ ।

এতাঃ সতাঃ আশিষঃ সন্ত পিতৃবর প্রসাদোইহম্ ॥

শ্রাদ্ধ সময়ে পূর্বকালে শ্রাদ্ধের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পূজার ও পিণ্ডদান জন্য ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইত । এক্ষণে সদ্ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না তন্নিবন্ধন মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিও কুণময় ব্রাহ্মণের কল্পনা স্থাপন করা হয় ।

আশীর্বাদ গ্রহণের পর দেব, ঋষি, ও পিতৃাদি গুরুজনের প্রতি সভক্তিক প্রণাম ।

শাস্তি যন্ত্র মধ্যে উদার চরিত্রের শব্দে জগতের মঙ্গল কামনা যে স্বতঃ সিদ্ধ তাহারই প্রমাণ দেখান বাটতেছে । যথা —

ওঁদৌ শাস্তিঃ পৃথিবী শাস্তিঃ ওষধিঃ শাস্তিঃ বনস্পত্যঃ শাস্তিঃ শাস্তিরেব শাস্তিঃ । ইত্যাদি ।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ।

একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে পত্র ।

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর ।)

৩য় পত্র ।

পত্নীর পত্র পাঠে, পত্নীর প্রতি সুরেজ্জনাথের উত্তর ।

স্নেহের স্বর্ণ,

তোমার পত্র পাঠলাম । শ্রীমতী অল্পপমার কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহা পড়িলাম,—পড়িয়া আর কি করিব. অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরনে কাঁদিলাম । আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজে, কি ধর্ম্ম আর কি অধর্ম্ম—দীর্ঘকালেও তাহা বুঝিতে পারিলাম না, জীবনে কখন বুঝিতে পারিব কিনা—জানি না । যাহা হউক, তুমি আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছ, যাহাতে তাহার সুমীমাংসা হয় প্রাণপণে তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । তবে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ ও ব্যবহার

শ্রাবণ, ১৩১০ ।] একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে পত্র । ২১৯

দেখিয়া তাঁহাদের উপর আমার কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস নাই । সুতরাং চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া, তোমার প্রশ্নের মীমাংসার ভার কোন বামুন পণ্ডিতের উপর না দিয়া, আমার জনৈক শৈশব স্মৃতির উপর দিয়া, অদ্যই তাঁহাকে পত্র লিপিলাম । তাঁহার পত্র পাঠিলে পর, যাহা করিতে হয় করিব এবং পুনরায় তোমাকে লিখিব । অদ্য এই পর্য্যন্ত—আমি ভাল আছি । উতি তোমায় হতভাগা—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

৪র্থ পত্র ।

স্বরেন্দ্রনাথের পত্র—(আমার প্রতি ।)

দিনাজপুর, কালিতলা ।

৩০শে বৈশাখ, ১৩১০ ।

প্রিয়তমেষু !

ক'দিন তোমার পত্র পাই নাই । এবার তোমার উপর একটা গুরুতর কার্যের ভার দিতেছি । তুমি সাধারণের চক্ষে পণ্ডিত না হইলেও, আমার নিকট তুমি সুশিক্ষিত এবং চরিত্রবান্ ; সুতরাং আধুনিক কৃষ্টিশাশনৌ উপাধিধারী পণ্ডিতদের উপর এ কার্যের ভার না দিয়া, তোমার উপরই দিলাম । আমার পূর্ব পত্রে তুমি শুনিয়াছ যে, আমাদের চিরদিনকার সুখের সংসার, এক্ষণে শ্মশান হইয়াছে—শ্রীমতী অনুপমার বৈধব্য দশা ভাবিয়া, এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া আছি । তারপর, গত কলা আমার পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভার একখানি পত্র পাইয়াছি । স্বর্ণ লিখিয়াছে যে, শ্রীমতী অনুপমা একাদশীতে নিরসু উপবাস করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত । তাহাই এখন আমাদের শাস্ত্র ও সমাজ মানিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য—আমার মত চাতিয়াছেন । দেশের আধুনিক পণ্ডিতের উপরই আমার বড় একটা প্রত্যাশা নাই । কেন যে প্রত্যাশা নাই, তাহাও কি আবার তোমাকে লিখিতে হইবে ? যদি, চারিদিক না জান, তাহাই আমার পত্নীর পত্রখানি তোমার পাঠের জন্য এই সঙ্গে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলাম । আমাদের গ্রামের বড় পণ্ডিত—বড় উচ্চদরের (?) স্মার্ত্ত কৃষ্ণকমল বিদ্যাভূষণ ও তাহার পুত্র নীলাধর বিদ্যালঙ্কার—উভয়ে বড় পণ্ডিত হইলেও কুৎসিত চরিত্রের লোক হুঃ সমাজে সতত ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রত্নয় দিয়া আসিতেছেন এবং নিজেরাও সতত কুকার্য্যে লিপ্ত । ইহাদের এবং আর আর সকলের এইরূপ স্থগিত ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে

আশঙ্কা হয় বুঝি বা আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই এইরূপ নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক ।

এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—আমার পত্নীর পত্রানুসারে এদেশের বিধবারা একাদশীতে যদি নিরন্তর উপবাস করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত হয় ; তবে দেশ কাল পাত্রভেদে ফলমূল গ্রহণ করিয়া একাদশীর উপবাস ব্রত পালন করা যায় কিনা, এবং পালন করিলে তাহাতে কোন পাপ আছে কিনা, এবিষয়ে তোমার মতামত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তোমাকেই লিখিলাম আর শুধু যে আজ আমার প্রাণাধিকা অনুপমাই বিধবা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে এত তর্ক উঠিয়াছে, তাহা নহে । আমাদের দেশে ও সমাজে বর্তমান-কালে আমার জ্ঞায় এমন অনেক হতভাগা আছে, যাহাদের গৃহে বিধবা ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ, বিধবা পুত্রবধূ বা কন্যা, বিধবা মা মাসী পিসী,—অর্থাৎ ; কিন্তু, কৈ স্বার্থাক্ত পুরুষ আমরা—আমরা একবারতো সেদিকে,—এই চিরহতভাগিনী বিধবাদের মলিন মুখের পানে, একবারের জন্যও তো দৃষ্টিপাত করিনা । মনে হয়, আজি যদি আমার বড় স্নেহের অনুপমার এদশা না ঘটিত, তবে নিতান্ত স্বার্থদাস আমি,—আমিও এবিষয়ে আলোচনা করিতে কখনই অগ্রসর হইতামনা । যাহাউক, এখন যাহা করিলে আমার পক্ষে ভাল হয়—আমাদের সমাজে এই হতভাগিনী বিধবাদের কষ্টের কতকটা লাঘব হয়, তুমি তাহাই করিয়া আমার হৃদয় বেদনা দূর করিতে বদ্ধ করিও । কিন্তু, ভাই মনে রাখিও, শুধু আমার মনস্তষ্টির আশায় যাহা তাহা না বলিয়া, আমার পক্ষে যাহা প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত হয়, তাহাপ্রদেয় দানে আমাকে সুখী করিও । আর একটাকথা, তুমি নিজে যথাসাধ্য সাহিত্যানুশীলনে রত, তুমি বাজে উপ-ভাস ও গল্প লেখা চাড়িয়া দিয়া এইবিষয়ের একটা উৎকৃষ্ট আলোচনা করিতে পার না কি ? করিলে, দেশের চিরহতভাগিনী বিধবাদের বড় একটা মহৎ উপকার হয় এবং নিজেও চিরস্মরণীয় হইতে পার,—কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিও । যাহা ভাল বুঝ—করিও, এবং যত সম্ভব পার আমার পত্রের উত্তরদানে সুখী করিও । ইতি

তোমারই চিরহতভাগ্য—

(স্বাক্ষর) শ্রীমুরেরুনাথ শর্মা ।

৫ম পত্র ।

সুরেন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে মংকর্তৃক লিখিত :—

বেল ঘরিয়া (চক পাড়া) পাটুল P. O.

নাটোর (রাজসাহী ।)

২৪ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ ।

ভাই সুরেন ! তোমার পত্র পাঠিয়াছি । তুমি আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছ, অনেক দিন হইতেই আমি এবিষয়ে শাস্ত্রানুযোদিত তথা দেশ কালোচিত একটা বিস্তৃত আলোচনা করিব মনে করিতেছিলাম; কিন্তু নিজের মানসিক হোর অশাস্তি ও কঠোর অর্থচিন্তা এই সবে এবং এই হতভাগ্য দেশের বর্তমান অবস্থা ও লোকচরিত্র দর্শন করিয়া, এ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই । তবে আশা আছে যে, তোমাদের মত দুই দশ জন অকৃত্রিম সূহৃদের উৎসাহ পাইলে, হয়ত দুদিন অগ্র পশ্চাৎ এবিষয়ে সম্যক আলোচনা করিতে সমর্থ হইব । আমাদের দেশের লোক প্রকৃত পক্ষেই যে ঘোর স্বার্থক তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আমরা শুধু নিজ নিজ সুখ ও বিলাস বাসনা লইয়াই ব্যস্ত—পরের ভাবনা ভাবিতে কেহই প্রস্তুত নহি । এ সংসারে এমন গৃহ নাই, যে গৃহে দুই একটা হতভাগিনী বিধবা রমণী না আছেন ? হয়তঃ কাহারো বৃদ্ধা মা, খুড়ি মা, কাহারো গৃহে বাগিকা কল্যা ও পুত্রবধূ ; অন্তের গৃহে যুবতী ভগিনী বা ভ্রাতৃবধূ আছেন এবং সতত অসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ; কিন্তু কৈ সে দিকেতো একবারও আমরা দৃক-পাত করি না ; করা আবশ্যক জ্ঞান করি না ; কেবল আপন আপন জীপুত্রের সুখাবেশে সতত ব্যস্ত এবং কি করিলে তাহাদের বিলাস বাসনা যোল কল্য পরিপূর্ণ হয়, তাহারই গভীর চিন্তায় সতত মগ্ন । তারপর, আর একটা মতঃ দোষ দিন দিন খুব প্রবল বেগে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে—

নাতিচারিতা । তোমার কথাই ঠিক, এখন আমাদের সমাজে যাহারা ধনবান তাহারা অর্থের অপার মহিমা বলে সকল প্রকার কুক্রিয়া দিবা রাত্রি করিয়া ও সমাজের স্থান অধিকার করিয়া আছেন, আর যাহারা আমাদেরই মত দরিদ্র তাহারা যদি কোন বিশেষ কারণবশতঃ অখাদ্য (নিষিক্ত মাংসাদি) ভোজন করিতে বাধা হন, তবে সমাজে তাহাদের ছরবস্তার শেষ নাই ।

এখন আমাদের সমাজের এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, অর্থ থাকিলে সকল পাণ্ডাই পূণ্য হইয়া দাঁড়ায় ; আর অর্থ না থাকিলে পুণ্যবান্ বাক্তিকে পদে পদে লাঞ্চিত ও অপমানিত হইতে হয় । শৈশব হইতে যাহাদিগকে দেশের ভবিষ্যৎ আশাশ্বল মনে করিয়া আশিসিতছিলাম, এ অধঃপতিত দেশের একমাত্র আশাশ্বল সেই সব যুবকেরাই এখন শিক্ষিত হইয়া আমাদের অদৃষ্ট দোষে দিন দিন আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনের বশবর্তী হইয়া এতেন নিরীকৃত ও কলুষিত সমাজ শাসন স্রোতে আপন আপন গা ঢালিয়া দিয়াছেন ।

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত যে, আমাদের এই ধর্মশাস্ত্র পরিবর্তনশীল কিনা ? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-ব্যবস্থা ছিল, কি সকল যুগেই এক নিয়ম প্রবর্তিত ছিল,—যদি তাহা নাহয়, অর্থাৎ সত্যযুগের যে শাস্ত্রব্যবস্থা ত্রেতায় যদি তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপালিত না হইয়া থাকে অথবা ত্রেতার যে শাস্ত্র তাহাও যদি দ্বাপরে সম্যক্ প্রতিপালিত না হইয়া কতকটা পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তবে কলিযুগে সে নিয়ম না থাকিবে কেন ? কিন্তু, বেশ স্থির ও সংযতভবে শাস্ত্রালোচনা করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইযুগত্রেয়ে কেহ কখন একই শাস্ত্রের অধীন ছিলনা,—অসম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক বে অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । আর আমাদের সেই সব প্রাচীন ঋষিরা এমন কোন কথা কোথায় বলিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়না যে, চিরদিন একই শাস্ত্রের অধীন হইয়া আমাদের দিগকে চলিতে হইবে ? আমাদের দেশের অবস্থা, লোকের শারীরিক ও মানসিক শক্তি দেখিয়া প্রাচীন ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে যে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে,—কলিযুগে, যখন নানা কারণে বিশেষতঃ জল বায়ু প্রভৃতির সম্যক পরিবর্তনে দিন দিন লোকে স্বাস্থ্যহীন এবং দুর্বলপ্রকৃতি হইতেছে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহা অবশ্যস্তাবিক, তখন এখনকার এই দুর্বল প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া পূর্ববর্তী যুগত্রয়ের অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারে,—স্থিরচিত্তে একবার ভাগ করিয়া বুঝিয়া দেখিলেই চলিতে পারে । তার পর আর একটা কথা— শাস্ত্রটা কি ? বর্তমানকালে যে ভাবে আমরা Law এই শব্দের অর্থ বুঝি শাস্ত্রও সেই সামাজিক Law ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ইহা

স্থির নিশ্চয় । সমাজে সুশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যক । এবং আগাও বতদূর বিশ্বাস, প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিগণও সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন মানসেই আৰ্য্য ধর্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । যখন তাঁহারা আপন আপন শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সমকালীন দেশের অবস্থা, জল বায়ু, লোকের শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহারা একাৰ্য্য করিয়াছিলেন । সুতরাং সেকালের অবস্থানুযায়ী বিলি ব্যবস্থা সকলটাই যে একালে চালাইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই । সত্যযুগের শাস্ত্রমতে বাহ্য সে করণীয় কার্য্য, ত্রেতাযুগ তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে । আবার ত্রেতাযুগ বাহ্য করণীয় কার্য্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল দ্বাপরে তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে,—ইহা স্থির নিশ্চয় এবং আৰ্য্যধর্ম শাস্ত্রালোচনা করিলেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় । তখন পূর্ব পূর্ব যুগত্রয়ের বিলি ব্যবস্থা কেন না বর্তমান অবস্থানুসারে কতকটা পরিবর্তনযোগ্য ? প্রত্যেক পরবর্ত্তি যুগেই যদি পূর্ববর্ত্তি যুগের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহার বধেই প্রমাণ আছে ; তখন এ যুগে কেন যে তাহা না হইবে, আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে সম্পূর্ণ অশক্ত । আমাদের শাস্ত্রই যখন পরিবর্তনশীল দেখা বাইতেছে, তখন বর্তমান কালে হিন্দু বিধবার একাদশীর উপবাসের কতকটা পরিবর্তন করিলে কোনই পাপ নাই—ইহাই আমার মত ।

প্রাচীন আৰ্য্যঋষিগণ যখন একাদশীতে নিরঙ্ক উপবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সমকালীন দেশের জল বায়ু প্রভৃতি এবং মানুষের শক্তির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়াই একাৰ্য্য করিয়াছিলেন । কিন্তু, এখন সেদিন আর নাই, দিন দিন প্রাকৃতিক পরিবর্তন জন্ত দেশের জল বায়ু যতই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে, লোকের মানসিক ও শারীরিক শক্তিও দিন দিন তেমনই কমিতেছে ; সুতরাং আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের যে কতকটা সংস্কার করা কর্তব্য, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন । আর আমাদের এই দেশে বর্তমান কালে কোন কার্য্যইবা শাস্ত্রানুযায়িত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে যে, হিন্দুবিধবার একাদশীর উপবাসের কতকটা সংস্কার করিলেই ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করা হইবে ? আমাদের সমাজে বর্তমানকালে দিন দিন অহরহঃ যে প্রবল পাপ স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত

হইতেছে, তাহাতে শুধু হিন্দু বিধবারা যদি একাদশীতে নিয়মত উপবাস না করেন তবে তাহাতেই বা দোষ কি ? ভূমি যে কাতায়নৌ অথবা বিদ্যালঙ্কারের কথা বলিয়াছ—এমন কাতায়নৌ বা এমন বিদ্যালঙ্কারের অভাব আমাদের দেশে নাই, বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত আছে । আমি সময়ে সময়ে ভাবি যে আমাদের এ অধঃপতন কেন, আবার পরস্পরেই মনে হয় যে, আমরা ভারতের ব্রাহ্মণেরাই আমাদের অধঃপতনের একমাত্র মূলকারণ । চারিবৎসর পূর্বে কলিকাতা বাসের সময় কলিকাতাবাসী জনৈক প্রকৃত ধর্ম্মশীল কায়স্থ স্মৃতির সহিত আমার তর্ক হয়, “হিন্দুর অধঃপতন সম্বন্ধে” । তখন, আমি আমার নিজের জিন্দু বজায় রাখিবার জন্য সেই কায়স্থ স্মৃতির সহিত অনেক বাক্ যুক্ত করিয়া ছিলাম ; কিন্তু জয়লাভ পারিয়াছিলাম না । তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে,—“হিন্দুর অধঃ পতনের একমাত্র মূল কারণ ব্রাহ্মণ । ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণেরা যেদিন স্বেচ্ছায় আপনাদের জগৎ পূজ্য পবিত্র দেবচরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়াছিলেন, সেইদিন সেই অতীব অভ্যুত্থান হইতেই ব্রাহ্মণের এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর অধঃ পতন ঘটিয়াছে । সমাজে এখন বহুপ্রকার পাপ ও দুর্কার্য চলিতেছে ও ভবিষ্যতে চলিবে একমাত্র নির্দোষ ব্রাহ্মণেরাই সেই সমুদয় দুর্কার্য ও পাপ সমূহের প্রথম ও প্রধান পথ প্রদর্শক । অগ্রে ব্রাহ্মণেরাই এইসব দুর্কার্য সাধন করিয়াছেন, তারপর ব্রাহ্মণের দেখাদেখি আমরা ভারতের আর আর জাতিরাও এইপথে পদার্পণ করিয়াছি ।” আমার সেই পরম শ্রদ্ধাঙ্গদ স্মৃতির বাক্য যে খাঁটি সত্য একথা তখন বুঝিতে না পারিলেও এখন এই কয়েক বৎসরে ভাবিবার ও চিন্তিবার পর তাঙ্গা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে হিন্দুর অধঃপতনের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণের অধঃপতন আর এষ্ট অধঃ পতন প্রকৃতই নির্দোষ ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাকৃত যখন সকল রকম পাপেই আমরা রত হইয়াছি, যখন, এখন আমরা পাপকে পাপ বণিয়া মনে করি না, তখন হিন্দু বিধবার বেলায় এ কঠোর বিধি কেন চালাইতে যাই বুঝিতে পারি না । একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে আমি বেশ জানি যে, শাস্ত্রে হিন্দু নাত্রকেই এষ্ট উপবাস করিতে হইবে,—কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বিধবা কি সখবা, সকলকেই এই উপবাস করিতে হইবে এবং না করিলে বহুশেষ পাপ আছে কিন্তু কৈ, আমাদের দেশে আজকাল কয়জন ব্রাহ্মণে এষ্ট উপবাস করিয়া থাকেন ? শাস্ত্রে একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও

বিধবার একই প্রকার বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু আমরা স্বার্থপর কুটিল ব্রাহ্মণ আমরা সে শাস্ত্র বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া একাদশীর দিন মনের সুখে ঘোড়শোপচারে আহার করিয়া থাকি ; হার আমাদেব্রট পরম স্নেহের ও পরম প্রীতির পাত্রী সংসারে বাহাদিগকে একমাত্র আপনার বলিয়া মনে করি, সেট মন চির হতভাগিনী বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূ, বিধবা ভগিনী ভ্রাতৃবধূ—তাহাদের একাদশীতে এষ্ট কঠোর উপবাস প্রচণ্ড নৈদাঘকালিন একাদশীতে ত্বকায় এক বিন্দু জলের জন্ত যন্ত্রণায় ছট ফট্ করিতে দেখিলেও, বনুপশু আমরা, আমাদের সেদিকে দৃকপাত নাষ্ট, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ? সংসারে গাজকাণ সকলের গৃহেই বাসিকা বিধবার অভাব নাষ্ট, অপচ সেদিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাষ্ট । যদি বা কোন ক্ষদ্রবান্ ব্যক্তি অভাগিনীদের দুর্দশা ও মন্বাস্তিক যন্ত্রণা দেখিয়া কোন সংস্কার করিতে অগ্রসর হন, অমনি পিশাচ আমরা—আমরা তাহার বধেষ্টে বিক্কাচরণ করিয়া থাকি । বাহা হউক আক্ষেপ করিয়া কি করিব ? যতদিন বাচিয়া থাকিতে হইবে, ততদিন এ অসহ্য নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, চিরহতভাগিনী বিধবাদের এ কাতর আর্তনাদ শুনিতেই হইবে । সংসারের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধঃপতন—তাহারা সতত কুক্রিয়াগত ; সুতরাং সমাজ সংস্কার করিতে হইলে এখন আমাদেরই অগ্রসর হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য কিন্তু আমরা শুধু নিজে নিজে জ্ঞানী পুত্রের সুখাবেশে সতত ব্যস্ত, অনাপিনী বিধবাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিবার সময় ও ইচ্ছা আদৌ আমাদের নাষ্ট ।

বাহা হউক, এখন বাজে কথা রাগিয়া কংজের কথা বলি । তোমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর মতন বাভিচারিণী হইয়া একাদশীর উপবাস করা অপেক্ষা, আপনার সতীত্ব ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি একাদশীর উপবাস না করিয়া জীবন কাটান যায়, আমার মতে তাহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই, বরং অনন্ত পুণ্য আছে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্ম উপবাসের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে, ধর্ম আপনার মনে । যদি মন শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিয়া উজ্জ্বল সংযম করিতে পারি, তিৎসঃ ঘেষ কাম ক্রোধ প্রভৃতির উচ্ছেদ করিয়া হৃদয়ে পূণ্যের পবিত্রচ্ছটা বিকাশিত করিতে পারি, তাহা হইলে, একাদশী বা অন্য যে কোন কিছুতে উপবাস না করিলেই যে আমাকে নিঃশয়গামী হইতে হইবে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস কার না । আসল কথা, আপনার চরিত্র

ও মন, ত্র যদি বিস্তৃত হয় তবে জীবন ধন্য ও পবিত্র হইবে যেদিন হইতে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ এই মহৎ শিক্ষা চিরদিনের তরে কৰ্মনাশার অতল জলে বিসর্জন দিয়া রাখিয়া অধম্মানুষ্ঠানে রত হইয়াছে, সেদিন হইতেই আমাদের—এই হিন্দুদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে ইহা স্থির নিশ্চয়। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ অতঃপর এইমাত্র বলিলেই হইবে যে, এখন আমাদের সমাজে বর্তমানকালে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া কোন বন্ধনই নাই, তখন হতভাগিনী বিধবাদের বেলায় এই কঠোর উপবাস শৃঙ্খল একটু শ্লথ করিলে যে কি ক্ষতি হয় বুঝিতে পারি না। তোমার গুণবতী-জ্ঞী যাহা য'হা লিখিয়াছেন, সবই সত্য এবং মনে হয় আমাদের এই দুঃখ দারিদ্র্য জরা মৃত্যু পরিপূর্ণ সংসারে সকল জ্ঞী পুরুষই যদি তোমার পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণের জায় সহদয়া হইতেন, তাহা হইলে আমাদের অধঃপতিত এই সমাজে এত অশান্তি এত অমঙ্গলের ঝঞ্ঝা বহিত না। আমার আত্মীয় স্বজন মধোও বিধবা আছেন, তাহারা শত কষ্ট ও শত অসহ্য যাতনা ভোগ করিলেও, আপন আপন অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া একাদশাতে কঠোর নিরম্ম উপবাস করিয়া আসিতেছেন। মুখে শতবার শতছলে বলেন “আর উপবাস করিতে পারি না”, অথচ পারি না বলিলেও, নিরম্ম উপবাসে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপবাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ কোন ফল হইয়া থাকে, আমি এমন বিশ্বাস করি না। কেননা ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় পালন না করিয়া কেবল দায়ে পড়িয়া উপবাস করিতেছি মনে করিয়া বে উপবাস করা হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতে অতি অল্পই ফল লাভ হইয়া থাকে। আমি আমাদের আত্মীয় স্বজনস্থিত। বিধবাদের মধো, একাদশী তিথি আসিবার তিন চারিদিন পূর্ব হইতেই, আবার উপবাস যজ্ঞণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া, গভীর আক্ষেপ করিয়া আসিতে শুনিয়াছি। কি অন্ধ বিশ্বাস? পাছে দেশে ও সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইতে হয় এই মনে করিয়াই তাহারা সতত অস্ব-মান, এবং লোকের সেই নিন্দা ও ঘৃণার ভয়েই প্রাণপণ করিয়া এই কঠোর উপবাস করিয়া আসিতেছেন। আমি আমার আত্মীয় স্বজনস্থ বিধবার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, প্রায় পনের আনা। বিধবার সম্বন্ধেই যে আমার এই ব্যক্তব্য খাটে সে বিষয়ে আবার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আর এইমত বিধবাদের মর্ম্মকাতরা দেখিয়া মনে হয়, যে, সমাজের

শ্রাবণ, ১৩১০ । । একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে পত্র ।

২২৭

সকলেই যদি একজোট হইয়া এত নিয়মের কতকটা ব্যতিক্রম করেন, তাহাহটলে তাঁহারাও যে ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া একাদশীর এত কঠোর উপবাসের দায় হইতে অনেকট রক্ষা পান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু, আমাদের সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? বীহারী আমাদের দেশের ও সমাজের নেতা, সেই সব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী আপন আপন জেদ্ বজায় রাখিতে সন্তত ব্যস্ত এবং নিজে হস্তঃশ্রমাদ্বারা উপস্থিত হইয়া বিপজ্জীক হইলে পুনরায় সংসার জ্ঞানশূন্য বালিকার সর্বনাশসাধনমানসে বৃদ্ধবয়সে দ্বারপরিগ্রহ করিতে বাস্তব, অথচ এত কুলাস্বারদের বালিকা বিধবা পুত্রবধূ বা কন্যা, ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ নিদাঘকালীন কঠোর একাদশীতে তুচ্ছ এক বিন্দু জলেরক্ষণ হট্‌ফট্‌ করিলেও, এবং যথ পিণ্ডাচদের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে যেরূপ একটুমাাত্র মিথহিন্নোল প্রবাহিত হয় না,—ইহবার কিছুমাত্র আশা নাই । সমাজের এই দুর্দশা ও অভাগিনী বিধবাদের প্রতি এত অমানুষিক নির্ষাভন দেখিয়া আমি পূর্বাঙ্কেই আমার পক্ষী শ্রীমতী নিভাননৌ দেবীকে বলিয়া রাখিয়াছি যে, যদি তাহার মৃত্যুর পূর্বে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তিনি যেন বৃথা কুহকে মুগ্ধ হইয়া এই কঠোর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন ; বরং আমার অভাবে বাহাতে আপনার চরিত্র পবিত্র রাখিয়া আমার ও তাহার—উভয়ের চৈতন্য পবিত্র করিয়া যাইতে পারেন, সেই দিকে যেন স্মৃতীকৃত দৃষ্টি রাখেন,—তাহাতে একাদশীতে বা অন্তকোন পালপালক্ষেপে নিরম্ম উপবাস করুন বা না করুন,—ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই ; বরং আমি পসন্নচিত্তে তাহাকে অনুমতি দিয়াছি যে, তিনি যেন আমারই জায় একাদশীতে ফলমূল গ্রহণ করিয়া একাদশীর ত্রুতরক্ষা করেন, তাহাতে কোন পাপ বা নরকের ভয় নাই ।

আমার এ কথা, হস্তঃ দেশের অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলী আপন আপন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন যে, বিধবা উপবাসাদিতে অশক্ত হইয়া গরিলেই বা কি ক্ষতি আছে ? এ কথার উত্তরে আমার এতমাত্র বক্তব্য যে, হিন্দু বিধবার পক্ষে, বিধবার ক্লেশকর জীবনের কোন মূল্য না থাকিলেও, আমাদের পক্ষে, হিন্দু সমাজের পক্ষে বিধবার জীবনের মূল্য খুবই যে বেশি—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । আর বিধবার পক্ষে বিধবার জীবন যদি বৃথা হয়—ইহাই মনে করি, তবে সর্বদেশের সর্বকালের যোগী ঋষিদের জীবনও যে বৃথা,—ইহাই

বলিতে হয় । আমাদের এই অধঃপতিত দেশে, আজিও যে ঘরে ঘরে স্বার্থত্যাগের অমন উজ্জল ও পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাঠি ; আজিও যে আমাদের গৃহে গৃহে কতকটা ধর্ম আছে, কতকটা নীতিও চরিত্রের আদর্শ আছে, আজিও যে আমরা সাধারণের নিকট হিন্দু বলিয়া গর্ব করিয়া থাকি, তাহার প্রধানতম কারণ আমাদের এই হিন্দু বিধবারা । আমাদের সমাজ দিন দিন স্বার্থপরতা, কুটিলতা, হিংসা, ঘেঁষ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আজিও যে আছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ হিন্দু বিধবা ; আজিও যে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে ধর্মচর্চা, রোগচর্চা প্রভৃতি হইতেছে, দীনদরিদ্র প্রভৃতি মুষ্টিমেয় অন্ন বা ভিক্ষা পাঠিতেছে, তাহারও একমাত্র কারণ আমাদের এই হিন্দু বিধবা । সুতরাং বিধবার নিকট বিধবার কষ্টকর জীবনের কোন মূল্য না থাকিলেও, আমাদের সমাজের পক্ষে বিধবার জীবন তুচ্ছ নহে, বরং প্রভূত মঙ্গলের কারণ হইয়াছে । সুতরাং, এ হেন সাফাৎ মূর্তিমতী সরলতা ও পবিত্রতার আধার এই চির হতভাগিনী বিধবাদিগকে হেয় জ্ঞান না করিয়া, অবিকতর ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখাষ্ট আমাদের কর্তব্য ।

পত্র ক্রমেই বড় হইতেছে । বাহা হউক, এখন সংক্ষেপে দুইটা কথা বলিয়া পত্র শেষ করিব । প্রথম কথা, একাদশীতে নিরম্ব উপবাসের পরিবর্তে ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া ব্রত পালন করিতে কোনই পাপ নাই,—ঠহাই আমার মত । যখন নিরম্ব উপবাসের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, তখন সমাজের বা দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই ; দিন দিনই দেশের লোক নানা কারণে দুর্বল ও শক্তিহীন হইতেছে, সুতরাং প্রাচীন কালের নিয়ম প্রতিপালন করা কঠিন, একজন্ত পূর্ব ব্যবস্থার সংস্কার করায় কোনই পাপ নাই । তাহার পর, দেশে এমন অনেক গুরুতর বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক সমাজের অবস্থা দেখিলেই প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায় । হিন্দু বিধবার দ্বারা ব্রাহ্মণেরাও শাস্ত্রমতে একাদশীর উপবাস করিতে বাধ্য হইলেও, আত্মসেচ্ছাচারিতায় তাহা করেন না, বরং উপবাসের পরিবর্তে ঘোড়শোপচারে আপন আপন উদর পূরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে যদি এ দেশের ব্রাহ্মণদের কোন পাপ না হয়, তবে হতভাগিনী হিন্দু বিধবারা নিরম্ব উপবাসে অশক্ত হইয়া একাদশীর দিন ফলমূল গ্রহণ করিলে কেন যে ঠাহারা প্রত্যয়ভাগী অথবা সমাজে বৃণিত ও নিন্দিত হইবেন,—ঠহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না । দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে যে ভাবে একাদশীর উপবাস

চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে উপবাসে যে কোন পূণ্য লাভ বা ফল পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস আমার নাট কেননা, মহাদি ধর্মশাস্ত্র প্রণেতারা বলিয়াছেন যে,—“একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবে না, কেননা, ঐ তিথিতে ব্রহ্মহত্যা কতিপয় গুরুতর পাপ অল্পকে আশ্রয় করিয়া থাকে, একান্ত একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিলে ব্রহ্মহত্যা গুরুতর মহাপাপ অন্নগ্রহীতাকে আগিয়া বর্তে ।” সুতরাং মহাদি ধর্মশাস্ত্র মানিতে হইলে, যে সময়টা প্রকৃত একাদশী, সেই সময়টার মধ্যেই অন্নাদি আহার নিষিদ্ধ । কিন্তু আমাদের দেশে, মহাদির মস্তকে আমরা পদাঘাত করিয়া স্মার্ত রঘুনন্দনের পদানত হইয়া, অনেক সময়ে পূর্ণ একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিয়া, দ্বাদশীতে অনর্থক উপবাস করিয়া থাকি—ইহাতে একাদশীর উপবাস যে কিসে সিদ্ধ হয়, ঈশ্বর জানেন । কলিকাতা থাকা সময়ে, আমার মনে হয়, একদিন হিতবাদী কার্যালয়ে, এই একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুত সখারাম গণেশদেউস্কর মহাশয়ের সহিত এবিষয়ে আমার কথোপকথন হয় । তাহাতে দে-উস্কর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, “আজিও তাঁহাদের দেশে মহাদি ঋষি প্রণীত শাস্ত্রানুসারে একাদশীর ব্রত পালন হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ যতক্ষণ একাদশীতিথি ততক্ষণই মহারাষ্ট্রবাসীরা অন্নগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া অন্নগ্রহণ করেন না,—একাদশী ছাড়িয়া গেলে অন্নাহার করিতে কোনই আপত্তি নাই । তারপর, সেদেশে একাদশীর দিন অল্পের পরিবর্তে অনেক বিধবারাই ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন পাপ হয় বলিয়া মনে করেন না । সুতরাং আমাদের দেশে স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থাপিত এই একাদশীর দিনে ফলমূল গ্রহণ করিয়া একাদশীর ব্রত পালনে যে কি দোষ হয়, সম্বন্ধের পাঠক ! তাহার বিচার করিবেন । অনেকে হয়ত, বলিবেন. বহুদিন হইতে এদেশের রঘুনন্দনের মতানুসারে আমরা চলিয়া আসিতেছি ; তুচ্ছ বিধবার আশ্বস্তকল্প সে উপদেশ প্রতিপালন করিতে বিরত হইবে কেন, —উত্তম কথা । কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, বর্তমানকালে আমরা কি রঘুনন্দনের সকল উপদেশানুসারে চলিয়া থাকি ; যদি না থাকি, তবে এই চিরহৃতভাগিনী বিধবাদের বেলায় • কেন এ শৃঙ্খল গাথক করিয়া রাখিব, ইহাই আমাদের মনুষ্যত্ব, না বিবেকানুমোদিত উপযুক্ত কার্য ? যে, আমাদের দেশের স্বার্থকে পণ্ডিতেরা আপন আপন জেদ বজায় রাখিবার জন্য এ

শৃঙ্খল একটু অল্প পরিমাণে শ্লথ না করিলেন, গাইস আমরাই কেন শৃঙ্খল কতকটা শ্লথ করিয়া দিইনা ? যখন দেখিতেছি যে, দিবারাত্রি আমরা যেসব গুরুতর পাপচার্য্য করিতেছি, তাহার তুলনায় একাধিক করলে বিশেষ কোন ধর্ম্মহানি নাই, অথচ চিরহতভাগিনী বন্ধের বিধবাদের জীবনের কষ্ট কতকাংশে লাঘব হয় ; তখন তাহা না করিয়া, কেন হতভাগিনীদিগকে এই অসহ্য যাতনা ভোগ করাই ? নৈদাঘকালীন একাদশীর উপবাস করা যে কি কঠোর একমাত্র ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্ত্রে কি বুঝিবে ? যদি বুঝিত, তবে এপাপ প্রথা অনেক দিনই এদেশ হইতে উঠিয়া যাউত । এখন, গাইস আমরা আমাদের চিরহতভাগিনী বিধবাকন্যা ও পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনী, বিধবা বৃদ্ধা মা ও খুঁড়মা প্রভৃতির একাদশীতে নিরসু উপবাসজনিত বিষাদ-মলিনমুখ মনে করিয়া, এই সংস্কার সাধন করি, ইহাতে আমার মতে কোন পাপ নাই, বরং অক্ষয় অনন্তপুণ্য আছে,—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস । ইতি

দীনশীন

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়—

মায়া ।

নায়েব ও কুমুদিনী উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া এই গান শুনিল । শুনিতে শুনিতে সেই গীতি নৈশ বায়ুতে বিলীন হইয়া নিস্কল হইল । গানের শেষ চরণে “দেখ দেখ গুরুজন করিতে তোমা শাসন” ইত্যাদি কথায় নায়েব প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই তাহার পাশবরুত্তি আবার উদ্দীপ্ত হইল, ভয় থাকিল না । তখন নায়েব কুমুদিনীকে বলিল—“ঐ শুনিলে, গান ? ককরাধার প্রেম—আমি কুমু তুমি রাধা, তুমি আমাকে নির্ভয়ে ভজনা কর । প্রাণেশ্বরী—জীবনসার্থক কর” এই বলিয়া কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিতে গেল । কুমুদিনী, এইবার নটবরের হাত ছাড়াইয়া খাটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, নটবরের স্থল উদরে সজোরে পদাঘাত করিল ! নটবর পদাহত হইয়া, কৃষকবধূর পদশক্তি অনুভব করিল, “উঃ উঃ” করিয়া উঠিল । কিন্তু এবার সে পালঙ্কের উপর লাফাইয়া উঠিয়া কুমুদিনীর চুলের মুঠি ধরিয়া বিষম জোরে টানিয়া কুমুদিনীকে খাটের উপর

ফেলিল । কুমুদিনী মর্শ্বেভেদীস্বরে কঁাদিতে কঁাদিতে বলিল—“হে ধর্ম্ম, তুমি কি আছ ?”—দূর হইতে কে বলিল “হাঁ ধর্ম্ম আছে” কুমুদিনী পুনরপি—বলিল—“মা দুর্গা, মা কালী, তুমি কোথায় ? সতীর সতীত্ব রক্ষা কর” । নিকটে কে বলিল “ভয় নাই” “ভয় নাই” “মা কালী তোমাকে রক্ষা করিবেন” । কুমুদিনী দেখিল, চারিজন গৈরিকবসনধারী পুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল । দুইজন অতি স্বরায় নায়েবকে খট্টাঙ্গে বন্ধন করিল । তাহার পর একজন বৃদ্ধগম্যাসী “মা, ভয় নাই” বলিয়া কুমুদিনীকে তুলিয়া সেট গৃহ হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইল । অপর তিন জন সন্ন্যাসী তাহারা সঙ্গে সঙ্গে চলিল ।

এদিকে কাচারীবাটি পোড়াইয়া নিজেহা কৃষকগণ “মার মার” শব্দে নায়েবের প্রেমকুঞ্জে আসিয়া পড়িল । তাহারা ঘরের ভিতর গাঙ্গিয়া দেখিল নায়েব পালকপাদে দৃঢ়বন্ধ, কিন্তু বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য ঝাঝঝাঝি করিতেছে কোন মতে বন্ধন খুলিতেছে না । সেখানে মোকারিম, যহ, ষড়ানন ও কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইল । কেহ বলিতেছে “মার মার”, কেহ বলিতেছে “বান্ধন খোল”, কেহ বলিতেছে “ইহার মাথা ভাঙ্গ” । কেহ বলিতেছে মহেশের “পরিবার কোথায়” ? কেহ বলিতেছে “চারিদিক খোজ” । কেহ ঘরে ঘরে খুজিতে লাগিল, কেহ প্রাঙ্গন, কেহ আঙ্গকানন খুজিতে লাগিল । এদিকে ভীম বাগদৌ “নায়েব মহাশয়, তোর সেলামী নে”, বলিয়া শুড়ম শুড়ম করিয়া নটবরের গরিষ্ঠ পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল । কালীকৃষ্ণ বলিল “বাঁচিয়া থাক, বাবা ভীম” । ইতিমধ্যে একজন কৃষক লাফাইতে লাফাইতে ঘরে আসিয়া “বেটা পাপে কত সুখ এখন দেখু”, এই বলিয়া নটবরকে লাঠি মারিতে লাগিল । নায়েব চীৎকার করিল “মলাম” আর একজন বলিল “মরিয়া যাঁইবে, মরিয়া যাঁইবে” । কৃষক বলিল “খুন করিব, খুন করিব—দিন পেয়েছি খুন করিব”—ইহার বিধবা ভগ্নীকে নায়েব হরণ করিয়াছিল । সে নটবরের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য ষষ্টি উত্তোলিত করিল । মোকারিম লাঠি ধরিল । কিন্তু ঘরে, বাহিরে চতুর্দিকে কেবল “মার মার” শব্দ কৃষকগণ মারিবার জন্য খুঁকিয়া পড়িতেছে । মোকারিম যহ, ষড়ানন ও ভীম তাহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে । নটবর বলিতেছে, “দোহাই তোমাদের, আমাকে খুন করিও না, ও মোকারিম ভাই, ও যহ, তোমাদের পায় পড়ি, আমাকে রক্ষা কর, তোমরা বা বলিবে আমি তাই করবো—বাবা মোকারিম, বাবা যহ, আমার ন্যাপ—তোমরা আমাকে বাঁচাও,

চিরকাল তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব” । মোকারিম বলিল “মহেশের জেনানা লোক কোথায়” ?

নটবর—“সন্ন্যাসী লঠিয়া গিয়াছে । মোকারিম “কোথায় ?”

নটবর “জানি না” ।

মোকারিম বলিল—“বাধন খোল” তখন একজন কৃষক বাধন খুলিল । ভীম নটবরের হস্ত রজ্জুতে বাধিয়া বাহিরে লঠিয়া আসিল । সঙ্গে সমুদয় কৃষক বাহিরে আসিল ।

সব বলিল চল হারাধনের সংকার করিতে হইবে ! তখন সেই কৃষকগণ নায়েবকে বাধিয়া লঠিয়া সারি সারি শ্মশানাভিমুখে চলিল ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

শ্মশানে ।

শ্মশানে ইহার পূর্বেই হারাধনের জ্ঞাতিগণ তাহার মৃতদেহ স্বক্কে করিয়া লঠিয়া আসিয়াছিল । এবং হারাধনকে চিতারোহণ করাইয়াছিল । চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল । তাহার শিখার রক্তিম আভাষ নিকটে নদীবক্ষ, দূরে অপর পারের আকাশ কেমন গাঙ্গীর্যাময় শোকময় হইল । কৃষকগণের মধ্যে অনেকে সেই চিতার চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল । কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে কেহ বলিতেছিল, “হারাধন তুমি সাধু, তুমি কোথায় চলিয়া গেলে” । কেহ হুঃখ করিতেছিল—“হায়, মহেশ তুমি এখন কোথায় ? অন্য তুমি বাঁচিয়া থাকিতে হারাধনের মুখায়ি কে করিল” ? যখন ধু ধু করিয়া চিতা জ্বলিতেছে, ও হারাধনের আত্মারগণ বিলাপ করিতেছে, তখন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা শ্মশানের ঘাটের দিকে সন্ সন্ করিয়া আসিয়া পড়িল । তাহাতে একটি বালিকা পূর্ণ করিয়াছিল । নৌকা শ্মশানের ঘাটের নিকটে আসিলে বালিকা নৌকার উপর উঠিয়া বসিল । একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকাইয়া থাকিল । এমন সময় একজন কৃষক বলিল “হা ! হারাধন তোমার মেয়েকে, তোমার বেটার বোকে কার কাছে রেখে চলে গেলে” ? বালিকা তাহা শুনিয়া—দাঁড়াইল—উচ্চৈঃস্বরে বলিল “বৌ, বৌ, নায়েব বাবাকে বুঝি মারিয়া ফেলেছে—বৌ, বৌ, ঐ বুঝি বাবাকে পোড়াচ্ছে—হা, ঠিক—ঠিক, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে—বৌ—বাবার কাছে যাই—বাবার পাশে শুয়ে আমিও বাবার সঙ্গে

পুড়িয়া মরিব, এই কথা বলিয়া বালিকা সেই পদ্মাবক্ষে কাঁপ দিয়া পড়িল ।
পদ্মার অগাধ জলে ডুলাইয়া গেল । বলিতে হইবে না, এই বালিকা হারাধনের
কন্যা, আমাদের সেই মায়া :

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

Sir Walter Vivian all a summer's day
Gave his broad lawns until the set of sun
Up to the people : thither flocked at noon
His tenants, wife and child, and thither half
The neighbouring borough with their Institute
Of which he was the patron.

The Princess by Tennyson.

পাঠক, চলুন এখন আমরা প্রবোধ বাবুর মহৎহাটা পরগণার কাছারিতে
যাই, সেখানকার পবিত্র বিত্ত বায়ু সেবন করি ।

অপরূহ হইয়াছে : কাচারীবটির প্রাঙ্গন বিস্তীর্ণ । তাহার একপাশে
দেবালয়, আর একপাশে বড় বড় গোলা । একজন ভৃত্য একটা গোলাতে
আরোহণী লাগাইয়া দান্ন বাহির করিবার জন্ত উঠিতেছে । কতকগুলি
কৃষক তাহার নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতেছে । তাহার অনতিদূরে দুইজন
কৃষক বসিয়া আছে । তাহাও মধ্যে একজন বক্কা, একজন শ্রোতা । শ্রোতা
গুণিতেছে আর তামাক খাটিতেছে । বক্কা বলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়
ও হাত নাড়িতেছে । বক্কা নরেশ বাবুর জমিদারির বিজোহী প্রজা । নায়েব
নটবর মহেশের বাপ হারাধনকে খুন করিয়াছে, মহেশের জ্বীকে বেইজ্ঞত করি-
য়াছে, বিজোহী প্রজার কাচারী বাগী লুটিয়াছে, ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, নটবর
ঘোষ নায়েব মহাশয়কে বীধিয়া বেধড়ক মারিতেছে, এবং তাহার গলায় দড়ি
বীধিয়া রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছে—মহেশের বুন মায়া জলে
ডুবিয়া মরিয়াছে, বিজোহী প্রজার অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী লুঠ করি-
য়াছে, কলিকাতা হইতে পল্টন আসিয়াছে, শীঘ্র তাহাদিগরের সহিত বিজোহী
প্রজাদিগের তারি একটা লড়াই হইবে—ইত্যাদি নানা কথা বক্কা বেশ একটু
রংচড়াইয়া বর্ণনা করিতেছে । বক্কার নাম মতিলাল । শ্রোতার নাম পীতাম্বর ।
পীতাম্বর বলিল—মুঠ আগে বপেনাম—‘মহেশভায়া ? লেখাপড়া শিখেছিস

বটে, কিন্তু তোর ডবগা বয়স । মোদের চুল পেকেছে । মোরা অনেক দেখেছি । প্রজা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ কোরে কেবল জেরবার হয়, খানে ধারাপ হয় । চল প্রবোধ বাবুর জমিদারিতে মোরা পাগাই—তবে যান মান সন্তুষ্ট সব থাকবে—ছোড়া কোনমতেই আমাদের কথা শুনিল না । এক্ষণ নিজে কয়েদ, বাপ খুন, বোন খুন, হাঙ্গামে বৈজ্ঞানিক ।

মতিলাল । তার পরিবার নাকি এখানে পেলিয়ে এসেছে । এখানকার নায়েব মহাশয়ের পরিবারের কাছে আছে ।

পীতাম্বর । এখানে কবে এলো ?—কার সঙ্গে ? আমি শুনেলাম যে নায়েবমশায় তাকে নেইজ্ঞত করারপরে সে অপসৃত হয়েছিল ।

মতি । আরে, না । সন্নাসীঠাকুররা তার দশা রক্ষা করেছে আর তাকে সাথে নিয়ে এখানে রেখেছে । এই নায়েব মশায়ের বাসায় নাকি রেখে গিয়েছে !

পীতাম্বর । আহা ! বোটা কত দুখো পেলো । এখানে যদি সত্যিই এসে থাকে তবে আর কোন ভয় নাই । এ নায়েবমশায় যেমন ভাল, তার পরিবারও তেমনি । কলিকালে এমন লোক আর হয়না ।

মতি । ভাল শুনেইত তার হিলে লিয়েছে । এখন কপাল । পেলিয়ে আসবার সময় গুরু লাঞ্ছিত কিছুই আনতে পারিনি, দাদা । কোন প্রকারে হিমসিম করে কটাজান লিয়ে এসেছে ।

পীতাম্বর । গোলমাল হবার আগে মুঠ উঠে এসেছি, গুরু খেদিয়ে এনেছি । তোকেও আসবার জন্য ত তখন কত বল্লম তুই কিছুতেই বুঝিলি নে ।

মতি । আরে “দাদা মুঠকি তখন বুঝতে পেরেলাম যে গোল হাজাম দিন দিনই এমনি বাড়বে । মোর চৌদ্দ পুরুষ যে ভিটেতে কাটিয়ে গিয়েছে, চট করে করে কি তা ছাড়া যায় আর এত কারকিতের জমি, নিজের জমি, বাপ পিতামহের জমি, তাহা ছাড়তে কি কষ্টটা হল,—কি আর বলব, পেতোম-দাদা মুঠ এখন পথের কাঁড়াল ! মোর না আছে এখন গুরু, না আছে লাঞ্ছল, না আছে টাকা । শুধুটিচিৎ এক কুটুমবাড়ী । এখন উপায় কি ?

পীতাম্বর । কোন ভাবনা নাই । আমাদের নায়েব মশায় খুব ভাল লোক । তাঁর কাছে সব উপায় হবে । জমি পাবি, বীজ পাবি, গুরু লাঞ্ছল পাবি, টাকা ধার পাবি ।

মতি । সত্যি ?

পীতাম্বর । সত্যি নয় কি মিথ্যা ?

মতি ।—এখন অনেক প্রজা পেলিয়ে আসূতে লেগেছে । আমার ভয় হচ্ছে, নায়েব মশায় বাগে পেয়ে পাছে একদম পাছনার নিরিখ বাড়িয়ে ফেলে ।

পীতাম্বর । তেমনি নায়েব নয় রে, তেমনি নায়েব নয় । চল, নায়েব মশায়ের কাছে চল ।

মতি । নায়েব মশায়ের কাছে এবে যাই কেমন করে । টাকা মুছলম্ নেই । নজর দেব কি ? যখন নায়েব বলবে ‘আমার সঙ্গে দেখা করিতে এসেছিস, বেটা, নজরের টাকা কই’ ? মুই তখন বলব কি ?

পীতাম্বর । আরে বলছি কি ? এ তেমনি নায়েব নয় । ‘নজর’ লাগবে না ।

মতি । পেতম দাদা, বলিস কি ? নজর লাগবে না ?

পীতাম্বর । আরে, হাবা, না, না । মতি । জমী লেব তার সেলামী ত দিতে হবে ?

পীতাম্বর । সেলামী কিস্তিবন্দী করে নেবে ।

শ্রীমতি । ভাল । কিন্তু “আমলা খরচ”ত লাগবে ? তা না দিলে ত পাট্টা কবুলতি হবে না । আমলা খরচ ত আর কিস্তিবন্দী হবে না । আমলা মহাশয়রা আগে ভাগেই হাত পাতে ।

পীতাম্বর । আরে এ জমিদারীতে “আমলা খরচ” দিতে হয় না । নায়েব মশায় বন্দবস্তের সময় নিজেও “উপরি” কিছু লন না । অন্তরেও নেবার ছকুম নাই ।

• মতি । পেতম দাদা বলিস্ কি ? তুই কি মোর কটির সময় ফটী নষ্ট কর্ছিস্ ?

• পীতাম্বর । ফটী নষ্ট নয়রে, সত্যি । মতি । উঁহু । মোর প্রতায় হল না ।

• পীতাম্বর । আরে মতে, পেতায় না হয়, তুই কাছারী এসেছিস । আমার সঙ্গে নায়েব মশায়ের কাছে আয় । আমি যা বলছি সত্য, কি মিথ্যা, এখনি দেখবি ।

• মতি । আচ্ছা, চল, দাদা । তোর কথাই যেন সত্য হয় ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

প্রবোধ বাবুর নায়েব বদমায়েস নহে, সাধু ।

“ There exists in him a heart-aborrence of whatever is incoherent, pusillanimous, unveracious,—that is to say chaotic, ungoverned ; of the Devil not of God. A man of this kind can not help governing ! ” * * * It is clear Abbot Samson had a talent ; he had learned to judge better than Lawyers, to manage better than bred Bailiffs—a talent shining out indisputable, on whatever side you took him. * * * That he was a just clear-hearted man, this, as the basis of all true talent, is presupposed. How can a man, without clear vision in his heart first of all, have any clear vision in the head ? ’ It is impossible !

Carlyle's Past and Present.

মহৎ হাট। পরগণার নায়েবের নাম শ্রীশিবনাথ লাহিড়ী । তাঁহার বাটি নবদ্বীপে । তিনি প্রকৃতই একজন ধার্মিক পুরুষ, প্রজাদের পুত্র নির্বিশেষ পালন করেন ; পীড়ন করা দূরে থাকুক, প্রজাদিগের রোগে, শোকে, বিপদে, শিবনাথ স্বয়ং তাহাদিগের কুটীরে বাইয়া, ঔষধ পথা দিতেন, ও নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন । জমিদার প্রবোধ বাবু যেমন সাধু, তাঁহার নায়েবও তেমনি সাধু ।

নায়েব শিবনাথ কেবল সাধু নহে । তিনি অতি দক্ষ বৈষয়িক লোক । তিনি কাহাকেও ঠকাইতেন না । কিন্তু অতি চতুর লোকেও তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না । তিনি পরগণার সমুদয় সংবাদ রাখিতেন । অধিকাংশ প্রজা দিগকে তিনি চিনিতেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইতেন । পরগণার কোন্ জমাতে কি ও কত ফসল হয় তৎপ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন । তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, কৃষকদিগের সহিত মিশিয়া, কি করিলে প্রজার ও জমির উন্নতি হইতে পারে, তৎবিষয় তথ্য নিরূপণ পূর্বক কৃষক দিগকে শিক্ষা দিতেন । কর সংগ্রহার্থে কখন কোন প্রজা পীড়ন করিতেন না । তথাচ তাঁহার তহশীলদ্বীনে কোন প্রজার খাজনা প্রায়ই বাকী পড়িত না । তাঁহার আয়লে কোনও প্রজার নামে বাকী পাওয়ার নালিশ হয় নাষ্ট । আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য প্রবোধ বাবুর জমিদারী প্রণালী ।

আশ্চর্য্য। শিবনাথ নায়েব মহাশয়ের কার্য্যকুশলতা। নায়েব একশত টাকা বেতন পাঠিতেন। সপরিবারে বাসের জন্য জমিদারের একটি বাড়ি পাঠিয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর আদেশ মত, নায়েব অগ্রসর দ্বারা সে সকল লোক সচ্ছিন্ন বলিয়া জানিতেন, তাহাদিগকে গোমস্তা নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার অধীন আমলাগণকেও নিজের কনিষ্ঠ সহোদরের জায় ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, টাকা কড়ির ব্যাপারে তত্ত্বাবধান না থাকিলে, কোন কোন সংলোকেও ক্রমে ক্রমে প্রলোভনে পড়িয়া অসং হইয়া যায়, প্রভুর টাকা পরে দিব ভাবিয়া ব্যয় করে, এবং শেষে দিতে পারে না। তিনি আরও জানিতেন, অধিকাংশ আমলা প্রথমে পরিশ্রমী থাকিলেও, উপরিতন কর্ম্মচারী তাহাদিগের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহারা ক্রমে কেহ নিরুৎসাহ, কেহ অলস হইয়া পড়ে। তজ্জন্ত তিনি নিয়ন্ত্রণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতেন। তিনি অন্য জমিদারের জমি কখন অন্যায় করিয়া প্রভুর জমিদারির অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু যদি অন্য কোন জমিদার বা তাহার লোক তাঁহার প্রভুর জমি বেদখল করিবার চেষ্টা করিত, তখন তাঁহার ভীষণক্তি ও জেয় কৌশল অশনিপাতের জায় শত্রু মস্তকে আসিয়া নিপতিত হইত।

শিবনাথ কাছারিতে গদির উপর বসিয়া আছেন। পীতাম্বর ও মতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিল।

নায়েব বলিলেন, কি চাও ?

পীতাম্বর । এক্ষে মোরা জমি চাই—নায়েব । ভূমিত জমি পেয়েছি ।

পীতাম্বর । এক্ষে, মুই চাহি না । মতি চায়, ও নরেশ বাবুর জমিদারী থেকে পেলিয়ে এসেছে ।

• নায়েব । কত বিঘা চাও ।—মতি । ৪০/ চল্লিশবিঘা ।—নায়েব । অত হবে না । ২০/ হবে ।

• মতি । দয়াকরে মোকে যা দেন ।

নায়েব । খাজনা কি নিরিখে দিবে ?

মতি । হজুর যা হুকুম করবেন মুই তাই দিব ।

নায়েব । তবু, কত ?

• মতি । (হুস্ হুস্ করিয়া) পেতমদাদা কত বল্‌বো ?

পীতাম্বর । তুই যা পারিস তাই বল ।

মতি । নায়েব মশায়, মোরা প্রবোধ বাবুর জমিদারিতে বিঘাপ্রতি ৪০ টাকা দেতাম।—নায়েব । জানি ?

মতি । এখন ছজুরের দয়া । ৩০ করিয়া দিন ।

নায়েব । তোমরা কজন লোক ?—মতি । ৬ জন ।

নায়েব । হিসাব করে দেখ—গড়পড়তা যে ধান হবে, তা হতে গরুর খোরাক, লাঙ্গলের খরচা, তোমাদের খোরাক, তোমাদের কাপড় প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়া, কত টাকা থাকে দেখ । তা হইতে সিকি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে । তৎপরে বাহা থাকে তাহাষ্ট খাজনা বলিয়া দিতে পারিবে ।

• মতি । মোরা কি অতশত হিসাব কর্তে পারি ?

শিবনাথ । যে খাজনা স্থির হইবে, বৎসর বৎসর তাহা দিবে । এ জমিদারিতে বাকিখাজনার জন্ত নালিশ নাই, পেরাদার "রোজ" নাই । পার্কণি নাই, কর্তন নাই, হিসাবানা নাই । সকলেই নিজের নিজের খাজনা আপনি আসিয়া কাছারিতে দিয়া যায় ।

মতি । মোকে কোন্ জমি দেবেন, তা দেখে মোরা যেমন পারি তেমনি হিসাব করে বলব ।

নায়েব । হালসানা ! এষ্ট প্রজাকে জমি দেখাইয়া দিবে । গিরিধর প্রামাণিকের জমির উত্তর হরিনাথ কয়ালের জমির দক্ষিণ যে ২০/ বিঘা জমি আছে তাহা ।

হালসানা । যে আজ্ঞা ।

নায়েব । তোমার গরু ও লাঙ্গল আছে ?

মতি । না । মোর কিছুই নাই । পেলিয়ে আসবার সময় কিছুই লিয়ে আসতে পারিনি ।

নায়েব । গরু লাঙ্গল ও ঘরবাধার টাকা চাই ? কত টাকা হলে হবে ?

মতি । মুঠ কি বলব ? মশাই দেখুন ।

নায়েব । ৪০ টাকা কর্ত্ত দেব । তোমার জামিন থাকবে কে ?

মতি । মুঠ কি টাকা লিয়ে পালাব ?

নায়েব । জামিন দেওয়ার আপত্তি কি ?

মতি । মুঠ নূতন লোক, মোর এগ্রামে কে আছে ? মোর কে জামিন হবে ?

পীতাম্বর । মুই মতির জামিন হব । নায়েবমশায় ! তুমি টাকা দেও ।
আপনার তোমার টাকার ভাবনা নাই ।

মতি । মোশার । সুদটার কথা— ?

নায়েব । সুদ লাগবেনা । চারি কিস্তিতে চারি সনে টাকা দিতে হবে ।

মতি । (আশ্চর্য্য হইয়া) নায়েব মশায় সত্যি বলছ ? (শিবনাথ একটু হাসিলেন) ।

পীতাম্বর । আরে মতে, চুপমাব, চুপমার নায়েবমশায় তোর সঙ্গে
কি ঠাট্টা করছে ?

নায়েব । কিস্তিখেলাপ করলে সুদ লাগবে । মাসে শতকরা আটআনা
কিস্তিখেলাপি সুদ লাগবে ।

পীতাম্বর ও মতি কাচারিতে খানিতে থাকিতে সন্ধ্যা হইল । কাচারি-
বাটীর সমুদয় কক্ষ দীপে আলোকিত হইল । গোলাবাড়ীতেও প্রদীপ
প্রজ্জ্বলিত হইল । ক্রমে ক্রমে অনেক প্রজা আসিল । কেহ ধাত্র চাহে, কেহ
ঔষধ চাহে, কেহ পথ্য চাহে, কেহ পরামর্শ চাহে, কেহ খাজনা দিতে
চাহে, কেহ টাকা কর্ক লইতে চাহে । এদিকে কাচারিবাটীর সংলগ্ন
দেবালয় দীপমালায় সুশোভিত হইল । এবং মন্দিরে 'হরগৌরীর আরাতি
আরম্ভ হইল । ঝু ঝু করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হঠতে লাগিল । শঙ্খের গম্ভীর
কলনাদ শ্রুত হইল । ঢং ঢং করিয়া কীশর বাজিতে লাগিল । পুরোহিত
ভক্তিভরে নক্ষত্রপ্রদীপ দেবদেবীমূর্তি সম্মুখে মণ্ডলাকারে সঞ্চালন করিতে
লাগিলেন । কৃষ্ণকবুজ দেবালয়প্রাঙ্গণে আসিয়া লম্বীকৃতবাস হইয়া দেব
দবীকে প্রণাম করিতে লাগিল । শিবনাথ ভক্ত হিন্দু, কপট হিন্দু নহে । তিনিও
দেবালয়ে আসিয়া উপবেশন করিলেন, এবং হরগৌরীর আরাধনা করিতে
লাগিলেন । পূজা সমাপ্ত হইল । শিবনাথ কাচারিঘরে আবার বসিলেন ।
তখন চারিদিকে আবার কার্য্যস্রোত বহিতে লাগিল । খাজাঞ্চী টাকা
গুণিয়া লইতেছে, মুহুরি হিসাব লিখিতেছে, মুন্সি পাট্টা কবুলতি লিখিতেছে,
নকল নবিশ পত্রের নকল করিতেছে, জামিন জরিপী চিঠা লিখিতেছে । যখন
বাহার আবশ্যক হইতেছে নায়েবমশায়ের উপদেশ লইতেছে । গোলমাল
গালিগালাজ নাই, কোন প্রজাকে জরিমানা করার কথা নাই । প্রজাগণ
প্রফুল্ল । আমলাগণ কার্য্যোৎসাহী—নায়েব প্রজাবৎসল ।

পীতাম্বর ও মতি এই রমণীয় দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছে ।

মতি বলিল—“পেভম দাদা ! এ কি জমিদারের কাছারি না স্বগ্গ ? না বৈকুণ্ঠপুরী ? নায়েব মশায়কে দেখলেই তাঁর পার ধুলা নিতে টেচ্ছা যায় ।

পীতাম্বর । মতে, চূপ মার

এমন সময় হরিদাস নামক একজন কৃষক সেই খানে আসিল । সে রাগে কুলিতেছে । সে বলিল যে গোপাল ঘোষ আমার জমি বেদখল করিয়াছে । এমন সময় গোপালও আসিল । সে বলিল, “নায়েব মহাশয় দেখুন, হরে আমাকে মেরেছে, হরের জন্তে আমি আর এ গাঁয়ে টিকিতে পারি না ।” নায়েব মহাশয় বলিলেন “পেক্কার বাবু, কলা পঞ্চায়তের বৈঠক হইবে । এষ্ট মকদ্দমা পঞ্চায়তের দ্বারা বিচার হইবে” । পেক্কার খাতাতে ফরিয়াদি ও আসামীর ও সাক্ষীর নাম লিখিয়া রাখিলেন ।

মতি জিজ্ঞাসা করিল, বিচারে অপরাধীর কি দণ্ড হয়—?

পীতাম্বর । প্রায়ই জরিমানা হয় ।

মতি । জরিমানার টাকা নায়েব মশায় লন ত ?

পীতাম্বর । না ।—মতি । পঞ্চায়ত লয় ?—পীতাম্বর । না ।

মতি । তবে টাকা লয় কে ?

পীতাম্বর । এখানে একটা ধর্মশালা আছে । বত গরিব দুঃখী লাচার লোক তাতে খেতে পায়, কাপড় পায়, সেখানে থাকতে পায় । জরিমানার টাকা সেষ্ট ধর্মশালার খরচের জন্য দেওয়া হয় ।

মতি । জরিমানার টাকাতই কি ধর্মশালার খরচ চলে ?

পীতাম্বর । তা কি চলতে পারে ? জমীদার বাবু তাঁর খরচ দেন । তাঁর উপর জরিমানার টাকা বা হয় লাচারদের জন্য খরচ হয় :

মতি । ধর্মশালার খরচ পত্রের হিসাব লয় কে ?

পীতাম্বর । নায়েব মশায় আর পঞ্চায়তরা ।

মতি । পঞ্চায়ত বহাল করে কে ?

পীতাম্বর । একজন পঞ্চায়ত নায়েব মহাশয় নিযুক্ত করেন । গ্রামের ভদ্রলোকেরা একজন বহাল করেন, কৃষাণরা একজন ; কামার ছুতার, কুমোর, মিস্ত্রি ও দোকানীরা একজন পঞ্চায়ত পাঠায় । আর এই চারিজন পঞ্চায়ত এক জন পঞ্চায়ত বাছিয়া লয় । মতে, আজগে একজন যাই । কাল আবার আসুব । তোকে নিয়ে আসুব ।

মতি । আচ্ছা ।

পীতাম্বর ও গতি নায়েব মহাশয়ের নিকট আবার অগ্রসর হইল । পীতাম্বর বলিল—নায়েব মহাশয়, আজগে মোরা বিদায় হই । মোরা কাল আসুবো । এই বলিয়া স্রণাম করিয়া চলিয়া গেল । এমন সময় নায়েব মহাশয়কে তাহার খানসামা বলিল—“কি বলিতেছে, আপনি একবার বাটার ভিতর যান ।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

নায়েবের অস্ত্রপুরে একটি সুন্দরী যুবতী আর একটি প্রৌঢ়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন । প্রৌঢ়া নায়েব মহাশয়ের স্ত্রী, নাম দীন তারিণী না তারিণী । যুবতী মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী ।

দীনতারিণী । বাচ্চা তুমি এত ব্যস্ত হইও না ।

কুমুদিনী । মা, আমার এক্ষণ যে কেউ নাই । চারিদিক যে আমি আঁধার দেখিতেছি । কি জানি “তার” কি হোল । লোকে বলছে, হাকিমের নাকি কি হুকুম দিচ্ছে, আমি “তাকে” নাকি আর এজীবনে দেখতে পাব না । নাকি দ্রৌপাস্তর হবে — ও মা কি হবে— ।

দীনতারিণী । না না, ও সব কথা তুমি শুনো না । তিনি বলেছেন, কোন ভয় নেই, মহেশ পালাস হবে ।

কুমুদিনী । এমন দিন কি পাব ? ঠাকুরদের যে আমি কত মান্ছি ! তাঁরা কি দয়া করবেন না ?— যেমন “তার” জন্তে হচ্ছে, তেমনি আবার আমার জন্তে আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে । কোথায় গেলে সেই মেহের পুতুল আবার পাব ? আমি কেন ডুবে মরলাম না ? কাঁপ দিতে ত গিছিলাম । আমাকে সকলে ধরলো কেন ? আহা বখন মায়া বলিল “কে ঐ বাবাকে পোড়াচ্ছে আমি তার পাশে পুড়ে মরিগে” তখন তাঁর চাঁদপানা মুখে শ্রাণনের চিত্র আঁলো পড়েছিল, সেই মুখখানি আমি এখনও যেন দেখছি—মুখখানি কেমন লাল দেখান, মেহ মাথা সেই বড় বড় দুইটা চোখ কেমন আভাতে চিকচিক করিলি—মায়া আকাশ পানে একবার চক্ষু তুলে হাত ঘোড় করে—“মা দুর্গা, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাও” এই বলে সেই শিশু পদ্মার গর্ভে ঝাঁপ দিল । মায়া মানুষ নয়, দেবী ঠাকুরণ, মায়ায় জন্ত আমার বুক কেটে যাচ্ছে । আজগে কোথায় সেই ননীর পুতুল—কোথায় সেই বাছুরিণি ! কোথায় সেই আমাদের প্রাণের দন ! কোথায় সেই

স্বর্গের হাসিময় মুখ—মায়া, তোদের অভাগিনী বোকে তুইও ছেড়ে গেলি !
এত ভালবাসা সবই ভুলে গেলি হায় ! খুঁটাই কোথায় গেলেন ! পাষাণের
তাকে খুন করে ফেলে ? এমন ভাল লোক—তাকে খুন করে ফেলে ! আর
মায়া তুই ইচ্ছা করিয়া তোর এত ভালবাসার বোকে ফাকি দিয়া চলিয়া
গেলি—ছি ! ছি ! তুই এত নিষ্ঠুর ! তোর দাদাকে না দেখতে পেয়ে, তোকে
নিষে যে ত্রি পোড়াবুক একটু শীতল কর্তাম । মায়া ! তুই কোথায় ?
একবার আয়, তোকে বুক নিষে প্রাণ শীতল করি—বুক যে পুড়ে গেল—

দীনতারিণী অভাগিনী কুমদিনীর বিলাপ শুনিতে শুনিতে, অশ্রু বিসর্জন
করিতেছিলেন । তিনি বলিলেন “বাচ্চা ! ‘উনি’ মায়ার খোজ করিবার
জন্ত চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন তা তুমি জান ।

কুমদিনী । সে কি আর বেঁচে আছে ?

দীনতারিণী । আজকে একজন ভিখারিণী এসেছিল । সে বলিল যে
রাধাপুর গ্রামের হাটে একটা মেয়ে দেখেছিল । সে ঠিক মায়ার বয়সি । মায়ার
চেহারা তুমি যে রূপ বলিয়াছ তাহার চেহারাও সেইরূপ, সেই মেয়েটিও
ডুবে গিয়াছিল । “বৌ, দাদা, বাবা” বলে বলে কাঁদে । নিশ্চিতই সে
তোমাদের মায়া, কোন ভয় নাই, সে বেঁচে আছে ।

কুমদিনী । সে আমাদেরই মায়া । আমাদেরই মায়া ! ঠিক ! ঠিক !
রাধাপুর গাঁ এখান থেকে কতদূর ?

দীনতারিণী । কেন ?

কুমদিনী । আমি সেখানে গিয়ে মায়াকে খুঁজে বের করবো ।

দীনতারিণী । তোমার যে বয়স ঘরের বাহিরে গেলেই তোমার পদে পদে
বিপদ, তোমায় যাওয়া হবে না !

কুমদিনী । দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বিপদে পড়ে ছিলাম, মনে
করিলে একগুণও বুক কাঁপে । আপনাদের আশ্রয়ে কোন বিপদ নাই । তবে মা,
মায়ার ভ্রাস কিরূপে হবে ? মায়া একলা না জানি কত কাঁদছে—সে কার
কাছে রয়েছে ? সে যে কেঁদে কেঁদে মারা যাবে ।

দীনতারিণী । যখন মায়া জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তখনই একজন সন্ন্যাসী
তাকে তুলিবার জন্ত তোমাদের নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ছিলেন ।
কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, তাই তিনি মায়াকে দেখিতে পান নাই । তা তুমি
জানত ।

নবপ্রভা ।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩১০ সাল ।

[৭ম সংখ্যা ।

মায়া ।

কুমুদিনী । তাত জানি ।

দীনতারিণী । সেই সন্ন্যাসী মহাশয় তোমাকে এখানে রেখে নদীর পারে গ্রামে গ্রামে মাঝাকে খুঁজিবেন বলিয়া গিয়াছেন ।

কুমুদিনী । আজিও যে তিনি ফিরে এলেন না ।

দীনতারিণী । কদিনই বা হয়েছে ? আর এখানকার নায়েব মহাশয়ও চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন ।

কুমুদিনী । হ্যাঁগা, নায়েব মহাশয় কি আজ রাত্রেই রাধাপুর গ্রামে মাঝার তল্লাসে লোক পাঠাইতে পারেন না ? দেরি হলে, কে কোথায় আবার তাকে নিয়ে যাবে, তা হলে আর খোঁজ পাওয়া যাবে না । মা, তোমার পায় পড়ি, তুমি নায়েব মহাশয়কে বল, তিনি আজ রাত্রেই লোক পাঠান ।

দীনতারিণী । তোমার বলবার আগেই আমি তাঁকে খবর দিয়েছি । আসছেন ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

যে ঘরে কুমুদিনী ও দীনতারিণী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, শিবনাথ সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন । দীনতারিণী বলিলেন, “কুমুদিনী মাঝার জন্ত বড় কাদিতেছে, আজ রাত্রেই রাধাপুরে কি লোক পাঠান যায় না ?”

শিবনাথ । কেন ? মাঝার কোন খবর পাওয়া গিয়াছে ?

দীনতারিণী । একজন ভিখারিণী বলছিল যে সে সেখানে একটা মেয়ে মায়ার মত দেখেছে ।

শিবনাথ । আমিও সেখানেও লোক আগেই পাঠিয়েছি । সে এক্ষণে ফিরে নাই ।

দীনতারিণী । কুমুদ বলে, আজগে রাত্রিই সেখানে লোক পাঠালে মায়াকে সেখানে পাওয়া যেতে পারে । আর একজন লোক আজ রাত্রিতে পাঠালে ভাল হয় না ? বোটি বড়ই কাতর হয়েছে । ননদের প্রতি এত ভালবাসা কখন দেখি নাই ।

শিবনাথ । আমি রাত্রিতেই রামকৃষ্ণ পাইককে পাঠাইতেছি ।

কুমুদিনী । মা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, মায়ার দাদার আর কোন শ্রবণ পেয়েছেন কি ?

শিবনাথ এই কথা শুনিয়া বলিলেন “মা, কোন ভয় নাই । আমাদের জমীদার বাবুর পত্র অদ্য পাইলাম । তুমি আসুবামাত্র তাকে সব সংবাদ লিখেছিলাম । তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন—মহেশের মোকদ্দমার খরচ তুমি সমুদয় দিবে । মোকদ্দমার ভাল করিয়া তত্ত্ব করাইবে, মহেশ নির্দোষী, সে বাহাতে খালাস হয় তাহাই করিতে হইবে । আমি আজ মোক্তারের কাছে পাঁচ শত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি এবং জেলার প্রধান উকীল জামাপদ বাবুকে নিযুক্ত করিবার জন্ত লিখিয়া দিয়াছি, এবং যাহা যাহা উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক, তাহাও আমি দিয়াছি । মা কোন ভাবনা নাই ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক । আমরা মহেশকে খালাস করিয়া দেব ।”

কুমুদিনী অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—“ওগদান আপনাকে আর প্রবোধ বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন । আমি বড়ই দুঃখিনী, বড়ই নিকপায়, আপনারাষ্ট আমার ভরসা ।

হেমচন্দ্র ।

১

কবিতা কাননে কোকিল কুজন
কেনরে সহসা নীরব আজ ?
সুনীল গগনে নিবিড় নীরদ
আধারে আবরে তপন রাজ ?

২

বীশরী জিনিয়া সুধার লহরী
ঢালিত বিহগ ললিত তান,
নবনো ছানিয়া অমিয় মাখিয়া
সে অমৃতধারা জুড়াত প্রাণ ।

৩

কোথা আজ সেই কলকণ্ঠ পিক
বন্ধারে বাহার মাতিত প্রাণ ?
মধ্যাহ্ন ভাঙ্গর প্রতিভা বাহার
জাতীয় জীবন করেছে দান ?

৪

সাহিত্য গগনে সুকণ্ঠ গায়ক
পঞ্চমে তুলিয়া গাহিত গান,
কেনরে নীরব সে গায়ক আজ
মধ্যমে পুরিয়া তুলেনা তান ?

৫

পাবনা যে আর শুনিতে সে গান
যে গান শুনিতে উছলিত প্রাণ,
সিদ্ধ গোদাবরী নন্দা কাবেরী
যমুনা জাহ্নবী বহিত উজান ।

৬

প্রশান্ত মুরতি উদার প্রকৃতি
বিজলীর ছটা নয়ন ভাতি,
শিশুর সমান সরল পরাণ
কোথা গেলে আজ ছাড়িয়ে সাথী ?

৭

করে রে নির্দয় কেড়ে নিলি হায়
দরিদ্র বাগালী মুকুটমণি ?
ভারতী ভাঙারে অমূল্য রতন
কে হরিলি বল্ স্মৃধার খনি ?

৮

কোথা হেমচন্দ্র ভারত গৌরব
জনমে যাহার পবিত্র ধরা ?
কোথা হেমচন্দ্র জাতীয় সৌরভ
বিহনে যাহার সংসার কারা ?

৯

কাঁদ মা ভারতি সন্তান তোমার
পরায়ে তোমারে বিবিধ সাজ,
চুনি পান্না মতি প্রবাল হীরক
গিয়াছে চলিয়া কোথায় আজ ।

১০

বল মা ভারতি যেজন তোমারে
আজন্ম সেবিল ভক্তের মত,
কোথা আজি তারে কি দোষের তরে
দিলে মা বিদায় জন্মের মত ?

১১

কেন মা ভারতি এ অখ্যাতি তোর
চিরদিন মাগো জগতে রবে,
যে জন সেবিবে ওপদ কমল
দারিদ্র্য অনলে দহিতে হবে ?

১২

ওহে কবির হয়েছ অমর
নিজ কৌশলে এতব ধামে,
নশের মুকুট মাথায় পরিয়ে
ষাও দেব ষাও অমর ধামে ।

১৩

সংসারের পাপ সংসারের তাপ,
সংসারের জ্বালা নাহিক সেথা,
পারিজাত হার নন্দন কানন
মনাকিনী বারি হরয়ে বাধা ।

১৪

ঐ শুন গায় তব মশোগান
দেববালা যত মোহিনী ছবি,
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে দাঁড়িয়ে ছুয়ারে
পূজিতে তোমারে বজের কবি ।

১৫

দেখিতে দেখিতে খুলিল ছয়ার
দেব বালা যত দাঁড়া'ল ঘিরে,
আদরে ধরিয়ে বাণীপুত্র কর
যতনে বসা'ল বেদীর' পরে ।

১৬

সংসারে আসিয়া ভারতী সেবিয়া
পেয়েছ হে দেব কতই জ্বালা,
ত্রিদিবের সুখা দেবের বাঞ্ছিত
পিয় প্রাণ ভ'রে যুড়াবে জ্বালা ।

১৭

কল্পনা কাননে ফুটন্ত গ্রন্থন
তুলিয়া যতনে গাঁথেন মালা,
যে মালা পরিয়ে গোড়বাসী জন
ভাবেতে বিভোর পাশেরে জ্বালা ।

১৮

কল্পনার হার যে “ব্রতসংহার”
বঙ্গ মাতা গলে দিয়াছ তুমি,
লহরে লহরে মুকুতা বলকে
প্রভায় যাহার উজল ভূমি ।

১৯

“ভারত সঙ্গীত” কীৰ্ত্তিস্তম্ভ তব
বিজয় নিশান ভারত গান,
“দশ মহাবিদ্যা” অমৃতের ধারা
“বাজ্রমাতে” তব মাতার প্রাণ ।

২০

কত আর কব অতুল বৈভব
ভারতী ভাণ্ডারে রেখেছ যাহা,
যত দিন ভবে বঙ্গভাষা রবে
তোমার প্রতিভা ঘোষিবে তাহা ।

২১

ওহে কবিবর কেঁদেছ বিস্তর
ভারত ললনা বিধবা তরে,
অট দেখ আজ ভারত রমণী
তিতে আঁখিনীরে তোমার তরে ।

২২

ভাষার সরসে প্রফুল্ল কমল
তোমার রচিত কবিতা চয়,
গোড় বাগী জন ভ্রমর নিকর
পান করে সুধা মাধুরী ময় ।

২৩

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আঁখি হারা হয়ে
পর-ভিক্ষা-ছাঁচী বন্ধের কবি,
গেলে পুণ্য ধামে শাস্তি নিকেতনে
লভ শাস্তিসুখ অমর কবি ।

২৪

গেলে চলে দেব সংসার তাজিয়ে
 ঋণ পাশে বাধা দরিদ্র মোরা ।
 কি দিয়ে তোমার হৃদে ঋণাধার
 শোধিব এ ঋণ ভাবিয়ে সারা

২৫

প্রীতির প্রসূন মেহ বিবদল
 সমতা তুলনী মারা দুর্লাদল,
 প্রকার চন্দন ভক্তি গঙ্গাজল
 পর উপহার ভিখারী সম্বল ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু ।

মোহ ।

(মৃতের কঙ্কাল দর্শনে)

১

ছিলে একদিন তুমি আমাদেরি মত,
 ছিল রক্ত মাংসময়, ওই দেহ তব,
 প্রাণের মাঝারে ছিল কথা শত শত,
 আনন্দ পাঠিতে যাহে নিত্য নব নব ।

২

ছিল তব প্রণয়ের কাহিনী সুন্দর,
 বাহার কুহকে ভূলে মাতিয়া রহিতে,
 ছিল আশা সরসীতে, আঁকা মনোহর,
 মনোরম শিশু ছবি, আঁখি ছুড়াইতে ।

৩

ধনী হও দীন হও, ছিল তব তরে,
 আরামের গৃহ মাঝে, নিশীথ বিশ্রাম ;

পরিশ্রমে শ্রাস্ত দেহে, শাস্তি পাইবারে,
প্রেমসীর যত্নে হ'ত কতট আরাম ।

৪

এই অস্থিসার দেহ আছে যে পড়িয়া,
জাহ্নবীর কূলে আছি বালুকার মাঝে,
হবে মম এত দশা জানিয়া গুনিয়া
তবু মোহে বদ্ধ রত হৃদয় না বুঝে ।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী ।

“জগদগুরু” লিও ।

কাস্টাল বন্ধু, সম্রাসী সত্ৰাট, পোপ ত্রয়োদশলিও ।

তিরা নব্বই বৎসর বয়সে, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের প্রধান আচার্য্য ও নেতা, সত্যপরায়ণ, সৰ্বজন পূজ্য, সৰ্বলোক প্রিয়, রোমের পোপ সঙ্কদয় ত্রয়োদশ লিও গত ৪ঠা জানু—ইং : ০ ৭ে জুলাই, ১৯০৩ সাল—সোমবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে এ নব্বই জীবনের সমস্ত ভার, সৰ্বকার্য্য, সমস্ত সুখ দুঃখ, মোহ মায়া পরিত্যাগ পূর্বক অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন । লিওর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎ শোকাকুল, কোনও সত্ৰাটের দেহত্যাগে লোকের হৃদয় এত চঞ্চল, এত আকুল হয় নাট । “অবিনশ্বর—রোম” এবং পোপদিগের দীর্ঘ রাজত্বের তুলনায়, সত্ৰাট ও সাম্রাজ্য সমূহ স্বপ্ন সদৃশ মনে হয় । এক সময়ে পোপের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ছিল । অধুনা তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে সত্য, তথাপি তাহাদিগের বর্তমান বিভব ও গৌরব দেখিয়া, প্রাচীন রোমের বিপুল শক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্তকীর্ত্তির কথা স্মরণ হয় । নূতন নূতন রাজ্যের উত্থান ও পতন, নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি ও নাশ সম্ভবপর সত্য, কিন্তু রোম অবিনশ্বর বলিয়া চির প্রসিদ্ধ । রোমীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায়, যে রোমান ক্যাথলিকদিগের জগদগুরু বা প্রধান ধর্ম্মাধাক্ষের পদ, রাজবংশের পরিবর্তনের বিষময় কালে, ইতালী ও যুরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের রাজনৈতিক ঝগড়াতে, জ্ঞান ও চিন্তার সংঘর্ষে, প্রকম্পিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আপনার উন্নত শির কখন অবনত করে নাট । অনেকে মৃত পোপ

ভাঙ্গ, ১৩১০।]

“জগদগুরু” লিও।

২৫১

ত্রয়োদশ লিওর রাজত্ব আশান্তি ও অসুখকর হইবে এতরূপ বিবেচনা করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁহার সুশাসন শুনে তাহা শান্তি ও সুখময় হইয়া-
ছিল। পঁচিশ বৎসর কাল রোমীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় জটিলক সুশাসক আচার্য্য ও
বিচারক কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই যত্ন ও অধ্যবসায়ে, রোমীয়
প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদের গৌরব বতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, রোমীয়দিগের
পতনের পর হইতে মৃত পোপের পূর্বনর্তী কোনও ধর্ম্মাধ্যক্ষের রাজত্ব সময়ে
তাদৃশ গৌরবান্বিত হয় নাই।

মহাত্মা লিও ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ তারিখে অর্থাৎ ১২১৬
বঙ্গাব্দের সুখময় বসন্তে, অনিচ্ছা ধর্ম্মাধিকরণের অন্তর্গত কার্পিনেটো
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাউন্ট লিউডোভিকো পেট্‌চি
(Count Ludovico Pecci) সাইনাক্ষ বংশসম্মত এবং নেপোলিয়নের
এক জন রণসঙ্গী ছিলেন। শৈশবে ভিনসেন্ট জোয়াকিম রাকেল লুইস
পেট্‌চি (Vincent Joachim Raphal Lewis Pecci) মহাত্মা লিওর এত-
রূপ নামকরণ করা হয়। অষ্টম বর্ষ বয়সে তাঁহার ছোট ভ্রাতার
সহিত ভাইটার্বো নগরে জেসুইট কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রয়োদশ লিও
ছয় বৎসর কাল বিদ্যানুশীলন করেন। চতুর্দশ বৎসরে তাঁহার মাতৃ-
বিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি রোম নগরে তাঁহার জটিলক আত্মীয়ের
আশ্রয়ে থাকিয়া কালেজিও রোমানিও (Collegio Romano) নামক
বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন এবং অঙ্ক শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এক
বিংশে দর্শন শাস্ত্রে সম্মান স্বরূপ মালোপহার প্রাপ্ত হন এবং দ্বাবিংশে
ধর্ম্মশাস্ত্রে ‘ডাক্তার’ উপাধি লাভ করেন। পরে, রোমীয় খৃষ্টান সম্প্র-
দায়ের দৌত্যকার্য্য শিক্ষার্থ, সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত পাদরীগণের নিমিত্ত প্রতি-
ষ্ঠিত আকাডেমিয়া নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অধ্যবসায়
ও যত্ন, তাঁর আয়ত্তমোদিত আচরণ এবং তাঁহার সর্ব আমোদ প্রমোদ
বিরাগ প্রভৃতি তাঁহার বাল্যজীবনে—শিক্ষাবস্থায়—পরিলক্ষিত হইত।

ইহার পরই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ—তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের আরম্ভ।

১৮৩৭ খৃঃ ষোড়শ গ্রেগরী তাঁহাকে আপন পরিবারের ধর্ম্মাচার্য্য এবং রেফা-
রেন্ডারী অব দি স্টিগনাটিউরা (Referendary of the Signatura) র পদে
নিযুক্ত করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে বিশপের পদ
প্রদান করা হয়। ইহার কিছু দিন পরে, বেনেভেণ্টো প্রদেশে শঠ বণিক ও

দক্ষ্যদিগকে দমন করিবার জন্ত, তাঁহাকে তথাকার শাসন কর্তা নিযুক্ত করা হয়। এই কার্য্য তিনি অতি সূচাঙ্গরূপে, সূকোশলে সম্পন্ন করেন, এবং তাহারই পুরস্কার স্বরূপ ১৮৪১ খৃঃ তিনি পেরুগিয়া প্রদেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত হন, তিনি সেই স্থানের বহুল সামাজিক ও নগর সম্বন্ধীয় উন্নতি করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহাকে বিশপের পদে উন্নীত করা হয়, এবং পোপের দূত স্বরূপ বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেল নগরে প্রেরণ করা হয়। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি পেরুগিয়ায় বিশপ হইয়া পুনর্বার তথায় গমন করেন। ১৮৫৩ খৃঃ পোপ নবম পাইয়স তাঁহাকে ‘কার্ডিনাল’ পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে কার্ডিনাল পেট্‌চি নূতন উপাসনা-মন্দির গঠন, পুরাতনের সংস্কার, সমাজের ও শিক্ষার উন্নতি, আপনার অধীনস্থ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মানসিক ও পারমার্গিক উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্ত সতত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১৮৭৭ খৃঃ কার্ডিনাল আন্টেনেলির মৃত্যু হওয়ার পোপের গৃহাধাক্ষের পদ শূন্য হয়। কার্ডিনাল পেট্‌চি এই পদে নিযুক্ত হন। অল্প দিন পরে—নবম পাইয়সের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে—Lenten Pastoral নামক একটি প্রবন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত আধুনিক সভ্যতার কিরূপ সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করেন। বহু বৎসর পরে শ্রমজীবীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যে আদেশ পত্র প্রচার করেন তাহা ইহার প্রতিলিপি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৭৮ খৃঃ পোপ নবম পাইয়স পরলোক গমন করেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে পোপদিগকে চিরদিন অবিবাহিত থাকিতে হয়, তজ্জন্ত তাঁহাদিগের পুত্র-সন্তানাদি না থাকায় কার্ডিনালদিগের মধ্য হইতে পোপ নির্বাচিত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী—নবম পাইয়সের মৃত্যুর একাদশ দিবস পরে—৬২ জন কার্ডিনাল, পোপ নির্বাচনের জন্ত সিষ্টাইন ধর্ম্মমন্দিরে, আপনাদিগকে আবদ্ধ করেন। পরদিন কার্ডিনাল পেট্‌চি পোপ নিযুক্ত হইয়াছেন এইরূপে তাঁহারা প্রকাশ করেন। কার্ডিনাল পেট্‌চি সেন্টেলিওর স্মারকদিবসে পোপ নির্বাচিত হন এবং দ্বাদশ লিওকে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিতেন এই দুই কারণে তিনি আপনাকে লিও নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ লিও পোপীয় সিংহাসনে অরোহণ করিয়া কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সর্ব্বপ্রথমে আপনার সাংসারিক আব্রব্য এবং অন্তান্ত বিষয় সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন। তিনি

স্বীয় যত্নে শিক্ষিত পেরুগিয়া প্রদেশের স্বকীয় পাদরীগণের মধ্য হইতে কন্সচারীবন্দের অধিকাংশ নির্বাচিত করেন। সমস্ত রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায় বাহাতে বিখ্যাত বিদ্যালয়সংস্কারক টমাস একুইনসের মতামতাবলী ধর্মবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্ত লিও বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন ; এবং এই কারণে ঐ মহাত্মার নামানুসারে রোমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাহার পুস্তক সকল প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তিনি খৃষ্টধর্মস্বকীয় ইতিহাস অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যাহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংকলনে সমর্থ একরূপ ব্যক্তিগণকে আপনার পুস্তকাগারে দপ্তরখানায় অসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। মহাত্মা লিও নিজে শিক্ষিত ও বিদ্বান, প্রাচীন সাহিত্যে পণ্ডিত, লাতিন কবি, এবং সুবক্তা সিসিরোর অনুকরণে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। এজন্ত তিনি ধর্মপ্রচারকগণ বাহাতে ধর্মশিক্ষার সহিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং সাধারণ লোকে বাহাতে ধর্মশিক্ষালাভ করে, সে কারণে বিশেষ উৎসুক উদ্যোগী ছিলেন। তাহার এই সঙ্কল্প বাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্ত একটি শিক্ষাসভা বা স্কুলবোর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সভাতে সর্বশ্রেণীর লোক—পাদরী এবং সাধারণ এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ—সভা নির্বাচিত হইতেন। লিওর প্রতিষ্ঠিত এই সকল বিদ্যালয় একরূপ সুফল প্রদান করিয়াছিল যে ইতালীয় গভর্ণমেন্টে তাহাদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আপনার শাসন সময়ে ত্রয়োদশ লিও খৃষ্টানদিগের বিবাহ, সামাজিক-মৃত্ত্রে বন্ধ গুপ্ত সম্প্রদায়দিগের বিধি ব্যবস্থা, কুলিমজুর প্রভৃতির অবস্থা এবং অন্যান্য কয়েকটি অবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় নূতন আদেশ ও বিধি প্রচারিত করেন। কুলিমজুর প্রভৃতির অবস্থাসম্বন্ধে যে নূতন আদেশপত্র বাহির হয় তাহাতে অতি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গতশতাব্দীর শিল্প ও সমাজ ব্যাপারে খৃষ্টীয়সমাজের প্রধান নেতা ও গুরু পোপ ত্রয়োদশ লিওকেও লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। স্বার্থের সাধারণত্বই সামাজিকবন্ধন এইমতের সহিত লিওর শেষোক্ত আদেশপত্রে প্রকাশিত বিধির এত অধিক ঐক্য ছিল যে তিনি “working-man's Pope” বা “শ্রমজীবির ধর্ম্যাচার্য্য” এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্মবিশ্বাস ও তাহার অনুসরণ, এবং ইংলণ্ডে প্রচলিত প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম-

সম্বন্ধে মহাত্মা লিও যে সকল মত ও আদেশ প্রকাশ করেন, তাহা আন্দোলনে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন । ১৮৯৪ খৃঃ তাঁহার খৃষ্টীয়সমাজের পুনর্মিলন (Reunion of Christendom) যে আদেশপত্র প্রকাশিত হয় তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে বেশ একটুকু আন্দোলন হইয়াছিল । ইংলণ্ডে, ঠিক এই সময়ে, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এই উভয়ে ধর্মের ক্রিপে সাম্য ও মিল হইতে পারে তাহার আলোচনা হইতেছিল, এবং কতিপয় আপত্তিকর বিধি-ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলে উভয় ধর্মের মিল হইতে পারে, এইরূপ স্থির করিয়া লর্ড হালিফক্স প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা ইংরাজ তাহা প্রস্তাব করিবার জন্য মহাত্মা লিওর নিকট প্রেরিত হন, কিন্তু, তাঁহা-দিগের বিশ্বাস যুক্তিকর নহে বলিয়া পোপের অনুমোদিত না হওয়ায়, তাঁহা-দিগকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় ।

ত্রয়োদশ লিওর শাসন সময়ে, এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই বাহার নিমিত্ত লিওকে অপরাধী বিবেচনা করা যাইতে পারে । তাঁহার রাজত্ব যেন রামরাজ্য—নিকলঙ্ক, নিখুঁত । তাঁহার পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী শাসন সুধময় ও শান্তিপূর্ণ এবং মৈত্র্যভাবাপন্ন ছিল ; তাঁহার রাজত্ব জ্ঞান ও প্রীতির ভাণ্ডার । তাঁহার সুন্দর সন্ধিকোশল রোমকে বহু বিপদ ও বিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছে । মহাত্মা লিওর চরিত্র নানা সঙ্গুণে ভূষিত । তাঁহার আদর্শচরিত্র প্রভাবে আজ তিনি সর্ব খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । তিনি শান্তিপ্ৰিয় ;—এজন্য তিনি শাস্তিকর উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতে ভাল বাসিতেন । পূর্ব-বর্ষে ধর্ম্যাচার্যদিগের জ্ঞায় “sword in one hand and Bible in the other” তাঁহার ধর্ম প্রচার বা ধর্ম সংরক্ষণের মন্ত্র ছিল না ;—এরূপ উপায় বা কোশল অতিশয় কদর্যা ও দৃঢ় বলিয়া বিবেচনা করিতেন ; অসং-কার্যের জন্য তিরস্কার, সন্ধিস্বরে প্ররোচন, বিরুদ্ধবাদীদিগকে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা স্বমতে আনয়ন, তাঁহার সুনিপুণ ধর্মনীতি এবং শান্তি সংরক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা তিনি শত্রুমিত্রের নিকট সুখ্যাতি ও সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । তিনি বোগী, অধ্যয়নশীল এবং শাস্ত্রবিদ । তাঁহার হৃদয় পরহঃখে কাতর হইত, পরের মঙ্গল কামনা করিত ; নিজে পরহিত-ব্রতধারী এবং দীনবন্ধু ছিলেন । শ্রমজীবীদিগের কার্যাদি (Labor) সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সকল রোমীয় ইতিহাসে নীর্যস্থান লাভ করিবে ।

যখন বিশপ হইয়াছিলেন তখন হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহার প্রাণ দীন দরিদ্র অনাথ আতুরের অদস্তার উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টিত ছিল । তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য এবং সূচিন্দ্রা, তাহার পরমেশ্বরের বিশ্বাস ও শ্রীতি, তাহার শক্তি ও পারমার্থিক সামর্থ্য, তাহার দয়া দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা তাহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরসন্মানিত করিয়া রাখিবে ।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায় ।

সাহিত্য দরবার ।

প্রবাসী । আষাঢ় ।

“অজবিলাপ”—কবিতাটি মন্দ নহে । কিন্তু উপযুক্ত ছন্দের অভাবে একটু মলিন হইয়াছে ।

“কবি হেমচন্দ্র”—প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে । দারিদ্র্য-পীড়িত অন্ধ হেমচন্দ্রকে জায়া সন্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে ।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবি বঙ্গের কবিতার গীতি-প্রবাহ কিরায়িয়া দিয়াছেন । করুণ-রসের এক তন্ত্রীটা ছুড়িয়া কেলিয়া ইহার গভীর তানপুরার সঙ্গে তাহাদের গুপ্তস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাজালীকে এক নুতন সঙ্গীত-রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছেন ।

দীনেশ বাবুর এই বর্ণনা মানাজ্ঞ । মেঘনাদবধ ও বৃত্তসংহার এই দুই কাব্য । একটা শৈলনিঃসৃত মূক্তশ্রোতা ওরফিণী, অপরটা ঘনীভূত ভূবার খণ্ড ; একটীর উদ্দাম ও খর প্রবাহ আমাদিগকে আবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়, অপরটীর বাকা বিরলতা ও নীরব বিশালত্ব আমাদিগের বিশ্বয় উৎপাদন করে । ... বৃত্তসংহার কাব্যে ভাষার আশ্চর্য সংযম আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—গূঢ় নাটকীয় কোণে কবি আমাদিগের নিকট দুই একটা ইঙ্গিতে নৌদর্ঘ্যের অবতারণা করেন । এই ভাষার সংযম ও উচ্ছ্বাস সম্বরণ শক্তির রক্ত কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করিয়াছে ।

এই সংঘমের মূলে ইতিহাস ও কবিত্ব জড়িত । বৃত্তসংহার কাব্যখানি আমাদিগের নিকট কঠোর নহে । তবে যে পরিমাণে উদ্বোধক সে পরিমাণে প্রকাশক নহে । “বৃত্তসংহার” বিস্তৃত “ভারত সঙ্গীত” ! বৃত্তসংহারে যে সকল গভীর বেদনার কথা আছে, যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা “মেঘনাদবধে” নাট ।

আধুনিক কালে জাতীয় জীবনে যে অতিনব স্ফূর্তি ও একতার লক্ষণ চতুর্দিক হইতে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার প্রাগ্ধ্বনি হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত হইতে প্রাপ্ত। বঙ্কিম বাবুর “বন্দে মাতরং” ও রবীন্দ্র বাবুর “অরি ভুবনমোহিনী” সেই ধ্বনির মনোভূত সূক্ষ্মর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিতেছে ”

হেমচন্দ্র বঙ্গীয় কাব্যে পুরুষভাব সঞ্চার করিয়াছেন। এ গৌরব হেমবাবুর নিজস্ব। বাঙ্গালার ভবিষ্যতাকাশে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অক্ষয় ও অমর।

“প্রেমের কবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবিষয়ে বঙ্গীয় কবিগণের অপেক্ষিত পটুতা ও সিদ্ধি সর্বজনসম্মত। হেমচন্দ্রের নিরাণ প্রেমের কবিতাগুলি বঙ্গীয় বালক ও বধূগণ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; চন্দ্রোদয় দেখিলেই “আবার পগণে কেন হৃদাংগে উদয় রে” অনেকে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

দীনেশবাবু কবি হেমচন্দ্রের ফটোগ্রাফ আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছেন, দীনেশবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে :

কংগ্রেস ও ক্রীড়া প্রদর্শনী—ভাবিবার বিষয় বটে।

অধুন। ভারতবর্ষে তিনটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্বীপ্ত হইয়াছে। ঐ আকাঙ্ক্ষাত্রয় তিনটি প্রবল সামাজিক শক্তি। প্রথমতঃ ঘোর দরিদ্রতায় প্রলীড়িত ভারতবাসীগণ স্ববৃত্তির নোহতাগ করিয়া শিল্প বাণিজ্যের দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ইহার প্রসঙ্গ ক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষ। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক অধিকার-লালসা ভারতবাসী জনগণকে পিপাসিত করিয়া তুলিতেছে এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দ্বিতীয় স্থানীয়, কিন্তু প্রমার সংকীর্ণ, যেহেতু প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়েই ইহা নিবদ্ধ। তৃতীয়তঃ আত্মকল সর্বত্রই শারীরিক উন্নতির প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। ইহা অতি বিস্তৃত; যেহেতু শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই নিজ শরীরের মঙ্গল কামনা করে। ... এই দ্বিতীয় শক্তি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের উদ্ভব। ... বর্তমান অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষ একত্রিত না হইলে যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ হইবে না, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই।”

তাই কংগ্রেসের নেতাগণ শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়া ভারতের রাজকুল হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়কে স্বদলে অনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এখন চারিদিকে পরিলক্ষ্যমান শারীরিক উন্নতি প্রয়াসরূপ তৃতীয় সামাজিক শক্তি আত্মসহায় করিয়া লইলেই কংগ্রেস আশাস্বরূপ বললাভ করিতে পারিবে।”

কংগ্রেসের সম্বন্ধে নবপ্রভায় বিস্তৃতভাবে একাধিকবার আলোচনা করা হইয়াছে।

অধ্যাপক বস্তুর আবিষ্কার—আণুবিক বিচলন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

ভাদ্র, ১৩১০ ।]

সাহিত্য দরবার ।

২৫৭

জর্মান দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ — গ্লেবর, ব্যালাব, কৌলহর্ন, ব্রাউ, এগালস, জেকোবি এই ছয়জন পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

বিদ্যার্থী— গল্পের উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য্য আমরা অনুধাবন করিতে পারি-
লাম না ।

আদিকাব্য—বিজয় বাবুর মতে রামায়ণ মহাভারতের পর রচিত হইয়াছে ।

কোহিনুরের কথা—কোহিনুরের ইতিহাস । এ পুরাতন কাহিনী আর
কেন ?

বঙ্গদর্শন । আষাঢ় ।

গ্রাম—কবিতা সুন্দর ।

ভরত—দীনেশ বাবুর উপযুক্ত হইয়াছে ।

“রামায়ণ কাব্যের একমাত্র আদর্শ চরিত্র ভারতের ভাগ্য যে কি বিড়ম্বনা ঘটয়াছিল,
তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই” ।

পিতা দশরথ তাঁহাকে ভাগ করিলেন । পাছে ভারতের মন বিচলিত
হয় এই ভয়ে ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই রামচন্দ্রের অভিষেক
ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । রাম ও ভারতের প্রতি দুই
একটি সন্ধেহের বাণ মধ্যো মধ্যো নিক্ষেপ করিতে চাড়েন নাই । দশরথের মৃত্যুর
পর কৌশল্যার কটুক্ৰিতে ভরতকে ক্ষুণ্ণরিত হইতে হইয়াছিল । বসন্ত ও বারং-
বার “ভরতশ্রবণে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব” বলিয়া আশ্ফালন করিয়াছিলেন ।

“দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুলা চরিত্র বিশ্বের সকলের সন্ধেহের ভাজন হইয়া লাহিত
হইয়াছিলেন ।”

প্রকৃতি পুঞ্জের ভারতের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই বিদ্যমান
ছিল । মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সূত্র
চালনা করিয়া কৈকেয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি ?

• বিশ্বময় যে ভারতকে সন্ধেহ করিয়াছিল— তাহার মূল কৈকেয়ী ।

“সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে মগ্ন পতিপাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক ব্যাপারের
আনন্দের চিত্র মনে মনে করিয়া স্থগী হইতেছিলেন । ভারতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত
হইলেন । শেষে ভারতের উন্নতি ও রাজত্বকামনায় কৈকেয়ী যেসকল কাণ্ড করিয়াছেন,
তাহা বলিয়া পুত্রের প্রতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন । ভারত
তাঁহার মাতাকে যে ভৎসনা করিলেন তাহা তাঁহার মহা দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণ-
রূপে সম্যোগযোগী মনে করি । তুমি ধার্মিক বর অশ্রুতির কস্তা নহ, তাঁহার বংশে রাজসী ।

তুমি আমার ধর্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর ।

একথা শুনি ভারতের উপযুক্তই হইয়াছে । নটনাবলী যতই জটিল ভাব ধারণ করুক না কেন, একটু প্রবেশ করিয়া দেখিলে সকলেই তাহাকে বেকসুর খালাস দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না ।

“রামায়ণে” যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে তাহা একমাত্র ভারতের চরিত্র । সীতা লক্ষ্মণকে যে কটুক্তি করিয়াছিলেন, তাহা কন্দিহ নহে । রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কাব্যই সমর্থন করা যায় না । লক্ষ্মণের অনেক কথা; অনেক সময় অতিরিক্ত ও দুর্ভাবনীয় হইয়াছে । কৌশলা দশরথকে বলিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষুদ্র বৈরাগ্য স্বীয় সম্মানকে ভক্ষণ করে তুমিও সেইরূপ করিয়াছ । কিন্তু ভারতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই, পাছকার উপর হেমছত্রধর জটা বকলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অমিত্যয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে ।

দীনেশ বাবু ভাল উকীল হইতে পারিতেন, ভাল বিচারক হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ । ভারতকে অনেকে সিংহাসন চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল । কিন্তু তিনি চোর নহেন । ভারতের চরিত্রে অভাবাত্মক গুণ দেখা যায়, ভাবাত্মক গুণ অধিক দেখা যায় না । যন্ত্রণার অগ্নি পরীক্ষায় তাহার চরিত্র কখন দোষিত হয় না । চরিত্র গৌরব দোষের ন্যূনতায় নহে, গুণের আধিক্যে । পিতা পর্যন্ত যখন ভারতের চরিত্রে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই তখন বুঝিতে হইবে, ভারতের অসাধারণ চরিত্র মহিমা ছিল না । রামের বা সীতার বা লক্ষ্মণের চরিত্রে যে তাগ স্বীকার আছে, ভারত চরিত্রে তাহা নাই । বাল্মীকি ঠিক পূর্বক ভারতের চরিত্র আদর্শস্থানীয় করেন নাই । দীনেশ বাবু তাহাকে ঠিক আদর্শ বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন ।

মুচ্ছ কটিক—কাহারও মতে কানীদাসের সময়ের বহু পূর্বে রচিত, আবার কেহ কেহ বলেন শকুন্তলার বহু পরবর্তী সময়ে রচিত । বিজয় বাবুর মতে মুচ্ছকটিক ৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ ।

নৌকাডুবি—উপন্যাস । এখনও চলিতেছে । মন্দ নহে ।

স্বপ্নতত্ত্ব—প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী ।

মেঘোদয়—কবিতা মন্দ নহে ।

বুদ্ধের স্বপ্নদর্শন—কবিতাটি Holmes ‘The oldman’s Dream’ এর অনুকরণে লিখিত ।

সার সত্যের আলোচনা—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ইহার সমালোচনা করা অনাবশ্যক ; লেখকের নামই যথেষ্ট ।

নব্যভারত । ভৈষ্ঠ, ৩ আষাঢ় ।

“কাপুরুষতা” কথা সত্য ।

“মহামতি গ্লাডষ্টোন ভারত বাসীর জন্য কিছুই করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, ভারত-বাসী কাপুরুষ ; যে কাপুরুষ, সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না । সুতরাং তাহার জন্য চেষ্টা করা পণ্ডিত্য মাত্র” । পুলিশ যখন আসিয়া বলিবে, “তোমার জল নিম্ন পুত্রকে তুমি খুন করিয়াছ, অতএব তোমার চালান দিব” তখন তুমি যে তাহাকে ৫০০ টাকা ঘুষ দেও, ইহা কি তোমার কাপুরুষতা নহে ? দেশে আইন আছে, বিচারক আছে, বিলাতে পার্লামেন্ট আছে, লাটের কাউন্সিল আছে, একবার বীরের জায় দাঁড়াও দেখি ; বল, “দেও তুমি চালান আমি ঘুষ দিব না” । তখনই দেখিবে পুলিশ বাবাজীর মুখ চুণ হইয়া যাইবে ।

একজন গোরা মদ খাটয়া গোলযোগের মধ্যে গুলি ছাড়িয়া দিল, নগরের ভূতনাথ নামক এক জনের দেহ পকভূতে মিলাইল । পুলিশ আসিল, তোমরাও সকলে পলাইলে । ২।১ চাবাকে পুলিশ ধরিয়া সাক্ষী দিল, বহু সাহেবের মধ্যে কেহ সনাক্ত করিতে পারিল না, তাই ইউরোপীয় জুরীর বিচারে সে বেকসুর খালাস হইল । যদি তোমরা দশজন বাইরা তাহাকে ধরিয়া দেখিতে পারিতে, এবং পুলিশকে ধরাইয়া দিতে পারিতে, তবে কি ইহার প্রতিবিধান হইত না ?

কথাটা শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল, কিন্তু কার্যে পরিণত করাই কঠিন ।
আশা করি লেখক নিজের উপদেশ গুলি নিজে কার্যে পরিণত করেন ।
Example is better than precept.

উত্তরাখণ্ড—উত্তরাখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

আসিব—কবিতা । গোবিন্দ চন্দ্র দাসের লেখনী ক্রমে ভেঁতা হইয়া যাউতেছে । এই বেলা সাবধান হউন ।

উপনিষদের উপদেশ—নিতা নিরবয় ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এই অনিতা সাবয়ব জগৎ প্রসূত হইল পিতা অরুণি শ্বেতকেতুকে বুঝাইয়া দিতেছেন । এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু নমুনাটি ভাল ।

কয়লার খনি—যাহাদিগের কয়লার খনি আছে তাহারা ইহা হইতে অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—একটিও ভাল লাগিল না ।

“ইংরাজ রাজত্বে শিক্ষা”—এখনও চলিতেছে ।

বিশ্বামিত্র—কবিতা মন্দ নহে !

নহি উপযুক্ত আমি, দেব দয়াময়,

লভিবারে ব্রাহ্মণ্য ; আমার হৃদয়

স্নেহ প্রেম বিজড়িত । কহিলেন ষবি ।
কহিলেন ব্রহ্মা তারে, সাগরে আঁখাসি,
স্নেহহীন নির্মমতা ব্রাহ্মণত্ব নহে ।
জানি, যে সন্তাপে সদা তব চিত্ত দহে ।
সে সন্তাপ নাহি যার সে নহে ব্রাহ্মণ ।
স্নেহময় লোক হিতে হও নিঃগন ।

ইহাতে অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিতে পারেন । কিন্তু আমরা আপত্তি করি না ।

শ্রীমদত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর—তীবনী ।

“শ্রীকৃষ্ণাবতার ব্রহ্মত্বমে এই যে দ্বাদশ গোপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন. তন্মধ্যে স্ববাহু যে ব্রহ্ম গোপা দত্ত উদ্ধারণথাক “অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দাবতার তিনিই উদ্ধারণ দত্ত নামে বিখ্যাত ।

১৪০৩ শকে ত্রিবেণী তীরবর্তী সপ্ত গ্রামে শ্রীকর দত্তের ঔরসে ভদ্রাবতীর গর্ভে ইহার জন্ম হয় । পুত্রের নাম শ্রীনিবাস, উপাধি দত্ত, ও শাওলা গোত্র । তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসারশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গিত নীলাচলে গমন করেন । ৬৮ বৎসর নীলাচলে, এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে অর্থাৎ ১৪৫৩ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী দিবসে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন । শ্রীবৃন্দাবনের বংশী ভট্টের নিকট এখনও তাহার সমাধি বর্তমান আছে । শ্রীউদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের যে স্থানে বাস ছিল, সেই স্থানে একটি বহু কালের মাধবী লতা আছে । প্রবাদ আছে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে অন্ন ভোজন করিয়া “ভাতের কাঠি” এখানে প্রোপিত করিয়াছিলেন, তাহাই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে । এইস্থান বৈষ্ণব-দিগের দ্বাদশ পীঠের মধ্যে একটি পীঠ । হুগলী বালীগ্রাম স্বর্গীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে পূর্বকালের ভাস্কর নির্মিত দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের দাক্ষ্যময় স্বরূপ প্রতিমূর্তি এ পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছেন, প্রতিদিন তাহার পূজা হয় ।

আর্য্য বংশের উৎপত্তি—চন্দ্র ঙ্গুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক প্রভৃতি রাজাগণ যে বংশে সমন্বিত হইয়াছিলেন, তাহার নার নাম মোর্য্যবংশ । লোকের মতে মোর্য্যগণ প্রাচীন আর্য্যজাতির একটি শেষ শাখা । “আকগানিষ্টানের উত্তর • পশ্চিম প্রান্ত হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতে প্রবেশ করেন ।

পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ—পঞ্জাবীর পাঠান প্রদেশের বিবরণ । বর্ম্মা-নন্দ মহাভারতী মহাশয়ের লেখনী সকলেরই সুপরিচিত ।

হেমচন্দ্র—প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে ।

কবির তিনটি জিনিস আবশ্যক.—পবিত্রতা সাধন ও স্বকণ্ঠ । আমাদের আদর্শমত কবি মাইকেল হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্র নাথ কেহই নহেন । প্রকৃত কবি এখনও বঙ্গের জন্মগ্রহণ করেন নাই ।

হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথ অস্বাভাবিক অনেক কবি অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রে তুলনা হয় না । উভয়ে ভিন্ন জাতীয় । হাতী ঘোড়ার কি তুলনা হয় ?

রবীন্দ্রের বিশেষত্ব স্বকণ্ঠে, এমন মধুর পদাবলী আর শুনি নাই । ইংরাজের টেনিসন বাঙ্গালার রবীন্দ্র, “স্বকণ্ঠে রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গালার ভাষার অধিতায় কবি ।

হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষত্ব এই তেজ এই উদ্দীপনা । তিনি বেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, নিদ্রিতকে জাগরিত, অলসকে শ্রম-পরায়ণ, রোগীকে সুস্থ, বৃদ্ধকে যুবা, এমন আর কেহ পারেন নাই । অস্বাভাবিক ভাবে কেহ তাঁহার সমকক্ষ, কেহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ আছেন, কিন্তু উদ্দীপনায় তাঁহার তুল্য কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই । তাঁহার আহ্বানে কত যুবা একদিন প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, অচল দৃঢ় ইংরাজ পৰ্ব্বমেন্টকে কতবার বিচলিত হইতে হইয়াছিল । স্বদেশ প্রেম হেমচন্দ্রকে উন্নত করিয়াছিল ।”

এরূপ কবিও “প্রকৃত কবি” নহেন কি ?

ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড ।

প্রণেতা শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মূল্য ১৥০ টাকা ।

এই গ্রন্থ খানি নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ । স্বামী মহাভারতী মহাশয়ের সুন্দর পাণ্ডিত্যের প্রবন্ধ কিছুকাল হইতে প্রায় সমুদয় বাঙ্গালী মাসিক পত্রকে অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল করিতেছে । তাঁহার যেমন লিখিবার ক্ষমতা আছে, তেমনি পাণ্ডিত্য । তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থপাঠ করিয়া অনেকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিবেন এবং গ্রন্থকারের এতদ্যার বিবিধত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন ।

হিন্দুত্ব এবং ত্রয়োদশ লিও ।

ত্রয়োদশ লিও ধর্ম্ম-সংস্কার-সম্পাদন-প্রয়াসী ছিলেন । ইদানীং ইউরোপে খৃষ্টের অস্বস্তিকার ধ্বনি উথিত হইয়াছিল । খৃষ্টান ধর্ম্ম যেন একবাক্যে বলিল “Back to Jesus”—“খৃষ্টে প্রত্যাবর্তন কর” । ভারতেও অধুনা Back to Krishna “পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর” এই বাক্য শ্রুত

হইল । ইউরোপে—কাজে কিক্রপ খৃষ্টভক্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, “ইম্পিরিয়ালিজম” এ, চীন সমরে, ট্রান্সভাল যুদ্ধে, এবং হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিত Re-barbarisation নামক প্রবন্ধে, তাহার দিব্য পরিচয় পাওয়া যায় । বঙ্গ — শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার বর্তমান কালে কিক্রপ জাতীয় উন্নতি হইতেছে, বাঙ্গালীর স্বাৰ্গপর, অর্গলুক, ভেয় জীবনে, দিন দিন পরিবর্তমান কাপুরুষতার পরিণতি হইতেছে । ইউরোপে এবং বঙ্গ, যুগপৎ ধর্মের নামে অধর্মের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাইতেছে । তাহাতে বোধ হয়, বাহিরে যাহাটী হউক না কেন, অন্তরে ক্রমেই ধর্মবিশ্বাস নষ্ট হইতেছে ।

যুরোপে, বিজ্ঞান, আত্মসোমা অতিক্রম করিয়া, (ধর্ম) বিশ্বাসকে অযথা আক্রমণে দুর্বল করিয়াছে : বঙ্গ, ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী, শাসনকর্তাদিগের বিলাসী বণিজ্যিক জীবনের ধনোপার্জন-লালসার দৃষ্টান্ত, হিন্দুকে ধর্মচ্যুত করিয়াছে । তাই, যুরোপে বাইবেলের ভূরি সংস্করণ হইয়াও, বাইবেল কেবল রসনায় নৃত্য কবে, হৃদয়ে স্থান পায় না । তাই, গীতার বিবিধ ব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়াতেও গীতা এক কর্ণে প্রবেশ করিয়া অল্প কর্ণ দিয়া বহির্গত হয়, অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না, জীবন স্পর্শ করে না । তাই, যুরোপে জন্মান সম্রাট হইতে মূর্খ সৈনিক পুরুষ পর্য্যন্ত, নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, গোমহর্ষণ পীড়ন-পূর্বক নারাহত্যা প্রভৃতি বিবিধ পাপদিশ সংগ্রামে, খৃষ্টের এবং বাইবেলের উদ্বোধন করিতেছেন । তাই, বঙ্গও, যিনি সজ্জতিশালী হইয়াও দারিদ্র দরিদ্র আতুরকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে কাতর, যিনি অর্গ উপার্জন কালে কোনই তরুণতা বা পাপে পারাশ্রয় নহেন, যিনি ভরপুর বিশ্বাস রসে মগ্ন—তাহারাও গীতা গীতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমে, অশ্রুতপূর্ব ভাবে, বিহ্বল হইয়া, নিজে মজিতেছেন দেশকে মজাইতেছেন । ইউরোপে এবং ভারতে বাহিরে সংস্কারের চেষ্টা দেখিতে পাই । কিন্তু অভ্যন্তরে অবনতি স্রোতস্বতী প্রধরা—ক্রমশঃ অধিকতর বেগবতী হইতেছে । কেন ? দার্শনিক ইহার উত্তর দেন ।

ইউরোপে, খৃষ্টের ধর্ম প্রচারিত সামা, তাঁহার অনাপ সেবা, এক্ষণে শ্রমোদিগের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে, এবং দীনহুঁখী শ্রমোদিগের নেতা—রস্কিন টনষ্টার প্রভৃতি, জীবন ও গ্রন্থ দ্বারা, তাহা প্রচার করিতেছেন । . ত্রয়োদশ লিও ভীক্ষুদর্শী, হৃদয়বান্ ; তিনি বুঝিয়াছিলেন দরিদ্র সাধারণ লোকের উন্নতি ধর্মের একটি প্রধান উদ্দেশ্য । ধর্মনীতির উপর ধননীতিকে স্থাপিত করা উচিত । তাই, তিনি শ্রমজীবীগণ সম্বন্ধে একটি বোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন ।

ইউরোপে এক্ষণে একটা আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবের অনুর্ত্তান হইতেছে । পরহিত-এতধারী, উদারচেতা দীনবন্ধু, বীর পণ্ডিতগণের নেতৃত্বে ও শিক্ষায়, শ্রমীগণ দলবদ্ধ হইতে শিখিতেছে । এই বীর, নেতাগণ প্রায়ই ধনীর সন্তান ; কিন্তু দরিদ্রদিগের হুঃখ এই স্বাধিকার মহাস্বাগণের হৃদয়ে অসহ্য । তজ্জন্ত তাহারা কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া দেশে বিদেশে চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন । কার্য্যতঃ তাহারা খৃষ্টের শিষ্য—এই নবযুগে নব পিটার ও পল । লিয়ো ও খৃষ্টের এই নবযুগের শিষ্য-শ্রেণীর মধ্যে স্থান লইয়াছিলেন । তাই শ্রমীদিগের সম্বন্ধে ঘোষণাদি প্রচার করিয়াছিলেন । —হতভাগ্য নীচস্বার্থাকুল বঙ্গে, ধনীদিগের মধ্যে, জমিদারদিগের মধ্যে, শ্রমীগণের বন্ধু, শ্রমীগণের নেতা ও শিক্ষক, কবে আবির্ভূত হইবেন ? বর্ত্তমান গীতাপাঠক ও শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যে কেহ কি লিওর জায় দরিদ্রের জন্ত কোন ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করিতেছেন ? জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কি কৃষকদিগের হুঃখ মোচনের জন্ত নূতন জমীদারি কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করিবার জন্ত চিন্তা করিতেছেন ? কে ?—এখানে যে কৃষকদিগের হুঃখ কেহ বলে না ! উদার সংবাদপত্র ও জমীদারের একটুকু অসুবিধা হইলেই, চাঁৎকারে কণ বধির করিবেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজা, দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীর, অশেষ কষ্ট দেখিলেও নির্দ্বাক নির্বিকার । এখানে ধর্ম্ম প্রচারক দীন হীন কাজালের কুটীরে পদার্পণ করিতে তত অগ্রসর নহে, যত রাজপ্রাসাদ বা পৌর বাক্‌মন্দিরে আপনাকে শক্তি করিবার জন্ত ব্যাকুল । ক্যাথলিক সম্প্রদায়, পোপ যাহার চুড়ামণি, তাহা আজিও জীবিত আছে কেন ? খৃষ্টান ধর্ম্মের অভাৱে যুরোপে দেব দেবীর উপাসনা যেমন তিরোহিত হইল, তেমনি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টিয় অভ্যাসে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোপ হইল না কেন ? তাহার কারণ, “বিফরমেশনর” আরম্ভের সময় হইতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র অর্থাৎ সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থ মহতা চেষ্টা, বিপুলত্যাগ স্বীকার—মহৎ জীবন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ।

- হিন্দু ধর্ম্ম যদি বাচিয়া থাকিতে চাহে, তাহা হইলে সাধারণ লোকের যাহাতে মঙ্গল হয়, দরিদ্রের যাহাতে হুঃখ মোচন হয়, শ্রমী যাহাতে তাহার ধর্ম্মত প্রাপ্য পারিশ্রমিক লাভ করে, তৎপক্ষে হিন্দুগণের কার্য্যমনো-বাক্যে চেষ্টা করা আবশ্যক ।
- ব্রাহ্মণ, হিন্দু ধর্ম্মের আত্মা তাহা স্বীকার করিলেও, সসজ্জাবে ব্রাহ্মকে দেখিতে শিখিয়া শূদ্র ও দরিদ্রকে ব্রাহ্মণ আপনার ভ্রাতার জায় স্নেহ করিবেন ।

এয়োদশ লিও এমন বিজ্ঞতা, উদারতা ও বিশাল-হৃদয়তার সহিত সমাজের সমুদয় বিষয়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, বিরুদ্ধ প্রটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বী ইংরাজ-রাজ এডওয়ার্ড তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন । ক্যাথলিক ধর্ম সম্বন্ধে অনেকের যে কুসংস্কার ছিল তাহা অনেকটা অপনোত হইয়াছে, এবং পোপের পদ এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও পূর্বাশ্রিত ভক্তি ভাঙন হইয়াছে । আধ্যাত্মিক জগতে যেমন পোপ পৃথিবীর তাবৎ ক্যাথলিকের সম্রাট, এক্ষণে পার্শ্বিক জগতে ওরূপ একজন সম্রাট দেখা যায় না । রাষ্ট্রীয় জগতে প্রাচীন রোমক সম্রাট ওরূপ ছিলেন । হিন্দু ধর্মে বা অন্য কোন ধর্মে ওরূপ একছত্র সম্রাট দেখা যায় না । পার্শ্বিক ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য যদি একজনে সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে কি একটি মহীয়ান বাপারের সংঘটন হয় । ত্রায়তঃ পোপ পার্শ্বিক রাজত্বের অধিকারী লিও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন । খ্রিষ্ট ও রাজ্য যদি এক ব্যক্তিতে সম্মিলিত হয়, সেই রাজ্যই দ্বারা জগতের মঙ্গলেরই সম্ভাবনা । এবিষয় পাঠক জোনার “রোম” নামক উপন্যাস পাঠ করিবেন । ভারতবর্ষে যদি হিন্দু ধর্ম এখন প্রচার হইয়া, প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি করিয়া প্রাদেশিক ধর্মমণ্ডল স্থাপিত হয়, এবং এই প্রাদেশিক ধর্মমণ্ডলীর সভাপতিসমূহ দ্বারা, সমুদয় ভারতবর্ষের একটি বিরাট ধর্মমণ্ডলীর সভাপতি নিৰ্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে হিন্দুধর্মে পোপের মত একটি পদ কালে সৃষ্ট হইতে পারে । আপাততঃ যেমন রাজনৈতিক কংগ্রেস, সামাজিক কংগ্রেস বা কনফারেন্স, শিক্ষা কংগ্রেস হইতেছে, তেমনি যদি কিছুকাল পরে, হিন্দুধর্ম কংগ্রেস স্থাপিত হয়, তাহার নিৰ্ব্বাচিত সভাপতি, হিন্দু ধর্মে পোপস্থানীয় হইতে পারেন । কোনও ভাবী হিন্দুধর্ম-কংগ্রেস কি ভারতের গৌরব-কিরীটী মস্তকে ধারণ করিবে ? কে বলিতে পারে ?

আমরা এয়োদশ লিওর জীবন আলোচনা করিয়া কিছু শিখিতে পারি ।—
 (১) সাধারণের লোকের ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হইলে ব্যক্তি বিশেষ প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না । (২) প্রাচীন যদি বাচিয়া থাকিতে চাভে, তাহাকে নবোনের সারভাগ গ্রহণ করিতে হইবে । (৩) প্রকৃত ধর্ম সাধারণ অর্থাৎ দরিদ্র ও মূর্খ লোকের উদ্ধারের জন্ত প্রয়াসী । (৪) বৈচিত্র্যের ভিতরও ঐক্য থাকিতে পারে । হিন্দুধর্মের নানা শাখা প্রশাখা একজন সর্বোচ্চ ধর্মোপদেষ্টা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইতে পারে ।

শ্রীমতীর নিবেদন ।

—০—

I am my beloved's and my
beloved is mine—Solomon.

প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ তুমি সে আমার—
আদরে হৃদয়ে ধর, অথবা বিরহে
দগধ করহে প্রাণ, অথবা চরণে
দলিত কবহ মোরে, কিম্বা ব্রজকুঞ্জে
বাজাও মোহন বাঁশী, ব্রজের জীবন !
রহ যথা তথা, যে ভাবে রহহে তুমি,
রাধার হৃদয়-মণি তুমি, শ্রামধন ;
রাধার সর্বস্ব তুমি, সন্তপ্রাণময়,
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার চরণে,
বিলাস, বিহার, স্বপ্ন তুমি রাধিকার—
তাঁই, প্রাণনাথ ! বলি' সর্বোধিহু তোমা,
যদিও রয়েছ ছাড়ি চির-অধিনীরে ;
প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ বলি শতবার !
বরষি' উপল, তর্জ্জন-গর্জ্জন করি
ত্রাশে জলধর ক্ষুদ্র-চাতকিনী-প্রাণ—
চাতকিনী কিন্তু সদা মেঘবিলাসিনী ।

প্রাণনাথ ! সত্য কি হে ভুলেছ আমারে !
সত্য কি ভুলেছ, শ্রাম, বৃন্দাবন-লীলা—
ময়ুর বন-বিহার, মধু-রাসোৎসব,
যমুনা-বেতস-বন, সে নীপ স্নন্দর,
মধুর মধুর সব, মধুরতাময়—
সত্য কি ভুলেছ, শ্রাম, ব্রজগোপিনীরে !

(ক্রমশঃ)

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

অষাঢ়, ১৩১০ ।

১লা আষাঢ়, ১৩ই জুন। কারাগিরার নিষিদ্ধ সার্ভিসার সিংহাসন আরোহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।...হাজারিরা প্রদেশের পালিরা'মেণ্টের প্রধান সচিব হার জেলি (Herr Szelli) পদ ত্যাগ করেন। "অট্টো-হাজারী সাম্রাজ্যে হার্জিগোভিনা নগরে ১১৫ ডিগ্রী উত্তাপ পড়ে। ঐ স্থানে প্রায় ৮০০ শত মৈত্র কুচ কাওয়ার। করিতেছিল; তাহাদিগের অর্ধেক অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—আবার ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলির মৃত্যু হয়।"—

২রা আষাঢ়, ১৭ই জুন। সিনিয়র জেনারেলজেলি ইতালীর নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

৩রা আষাঢ় ১৮ই জুন। উল উইচ অস্ত্রাগার হইতে লিডাইট গোলা কাটিয়া বাওয়াতে অনেক গুলি লোক হত ও আহত হয়, আটটি বাড়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং নগর কাপিয়া উঠে।

৫ই আষাঢ় ২০শে জুন। ওয়েষ্ট মিনিষ্ট্রের রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ কার্ডিনাল ভোগমের মৃত্যু হয়।

৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন। ব্রিটিশ, ফ্রান্স আমেরিকান, ডচ এবং তুরস্কীয় দূত সকল বেলগ্রেড পরিত্যাগ করে।

১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন। খিদিভ লওনে পহুছেন।

১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন। সম্রাটের জন্মোৎসব অদ্য সম্পন্ন হয়। পূর্বের জায় কতক গুলি উপাধি বর্ষণ হয় কিন্তু ভারত-বর্ষীয় একজন ব্যতীত সকল গুলি বিদেশীয় লাভ হইয়াছে।

১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন। কাউন্ট বুয়েন হেজবতরি হাজারী নূতন মন্ত্রী সভা গঠন করেন।

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন। স্পেনে নাজেরিলা নদীগর্ভে একখানি টেন নির্ম্মিত হয়। ইহাতে বহুলোক হত ও আহত হয়।

১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন। সংবাদ আসে যে গত ১লা মে তারিখে জেডস্থানে আনিসিনীয়ানগণ মোল্লার সৈন্যকে পরাজিত করে।

১২শে আষাঢ়, ৩ঠা জুলাই। খেদিভ লওন হইতে ইউরোপে প্রস্থান করেন।

২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই। রোমের পোপের শারীরিক অসুস্থতা ফুসফুসে বিকার হইয়াছে সংবাদ আসে। পীড়া অতি কঠিন ও সাংঘাতিক।

২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই। ক্রাসী মন্ত্রী সভার সভাপতি প্রেসিডেন্ট লুবে লওনে পৌছান এবং ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই। গ্রীসে ভয়ানক অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছে। গ্রীক মন্ত্রীসভার সভাপতি থিয়টাকিস পদত্যাগ করিয়াছেন।

২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই। বুলগেরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে নীষই বিবাদ বাধিবে এইরূপ জানা যায়।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই। ডব্লিউ, ই, হেনলি কবি ও সমালোচকের, এবং অট্টো হাজারীরা রাজ্যের ভূতপূর্বক আর ব্যার সচিব বেঞ্জামিন কালের মৃত্যু সংবাদ আসে।...বাজুরার নিবটবর্তী দুইটি অরণ্য দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে শুনা যায়।

৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই। বেলুচী সীমান্ত প্রদেশস্থ মাজারি জাতির সর্দার নবাব সার ইলাম বকস ব: কে, সি, আই, ই, র মৃত্যু হয়।...পোপের অন্তিম অবস্থা জানিতে পারা যায়।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রিট ভারতমিহির বস্ত্রে, সান্তাল এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত ও তবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রিট হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, ভাদ্র ৭ আশ্বিন ১৩১০ সাল [৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

রাজা বল্লালসেন।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

পূর্ববর্তী প্রস্তাবভুক্ত প্রমাণপুঞ্জ দ্বারা রাজা বল্লালসেনকে অক্ষত্রিয় এবং অ-বৈদ্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, বর্তমান প্রস্তাবে তাহার কায়স্থজাতিত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি। রাজা বল্লালসেন যে কায়স্থবর্ণভুক্ত ছিলেন, নিম্নলিখিত প্রমাণ সমূহে তাহা জানা যায়।

১ম প্রমাণ।—বঙ্গের কায়স্থেরা সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐতিহাসিক কাগজ পত্র এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা জানিতে পারি, বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির অনেক রাজা ও শাসনকর্তা ছিলেন। পাল উপাধিধারী ৩ জন, শূর উপাধিধারী ৫ জন, রায় উপাধিধারী ১১ জন, সিংহ উপাধিধারী ৩ জন, নন্দী উপাধিক ৭ জন, দত্ত উপাধিক ৪ জন, দাস উপাধিক ছয় জন, ভৌমিক উপাধিধারী ৬ জন, কায়স্থ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মন্ত্রি-কার্যে অধিকাংশ কায়স্থই নিযুক্ত হইতেন, বৈদ্যের নাম গন্ধ ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বল্লাল সেনকে কায়স্থ রাজা বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব বা অসম্ভব হইবে কেন? ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, রাজার জাতির লোক রাজত্ব করিয়াছিল, ইহাই সম্ভব ও সম্ভব।

২য় প্রমাণ।—শূর ও সেন এতদ্ভিত্তিক কায়স্থের উপাধি; শূর বৈদ্যর উপাধি নহে। ত্রিপুরা, মণিপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের শূরোপাধিক কায়স্থদিগের পূর্বপুরুষগণ বহুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে,

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও এই প্রাচীন ও প্রখ্যাত প্রবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন । সুতরাং সেন বংশ বা শূর বংশকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হয় না । পূর্ববঙ্গে এখনও অনেকে “মিত্র মজুমদার” এই উভয় উপাধি একত্রে ব্যবহার করেন ; শূর-সেন অথবা সেন-শূর এই উপাধিদ্বয় এখনও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত ।

৩য় প্রমাণ । কায়স্থ জাতির প্রাধান্য স্থাপন, কায়স্থ জাতিকে মস্ত্রি এবং সর্বোচ্চ পদ প্রদান, কায়স্থকে ব্রাহ্মণের ত্যায় কোলীতে ও মৌলিকো বিভাগ করণ, ইত্যাদি কার্যে বল্লালসেনকে কায়স্থ স্থির করা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয় ।

৪র্থ প্রমাণ ।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক (পঞ্চবটী) নগরের কয়েককোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ লুণামঠ (Loona Cave) অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-শ্রম । এইস্থানে যে সকল প্রস্তর কলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার এক-টিতে সেনবংশের কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ আছে । লিখিত আছে—“বঙ্গাধীশ্বর বল্লাল করণঃ” ইত্যাদি । করণ, কায়স্থের নামান্তর মাত্র । আর একটিতে লিখিত আছে “ব্রাত্য ক্ষত্রিয়কুলেশ্বর বল্লাল নাম বঙ্গেশ্বর” ইত্যাদি । শ্রীমৎ গোপতিভট্ট তাঁহার বল্লালচরিত গ্রন্থে কায়স্থ দিগকে পুনঃ পুনঃ ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

৫ম প্রমাণ ।—বল্লালসেনের চারিটি সহধর্মিণী ছিল, ইহাদের দুইটি কায়স্থা, ইহারা ই বল্লালের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বিবাহিতা পত্নী । চতুর্গা স্ত্রী অতি নীচজাতীয়া ছিল, তাহার বিবরণ পরে লিখিব, এটি রাজার উপপত্নী । তৃতীয়া স্ত্রীও উপ-পত্নী, এই রমণী বাঙ্গালিনী ছিল না, এ দক্ষিণাবর্ত (সম্ভবতঃ দ্রাবিড়) হইতে রাজার পরিতুষ্টির জন্য আনীত হইরাছিল । পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন “Vallal family also came from the Deccan” এইস্থানে family শব্দে শাস্ত্রী মহাশয় যদি “বংশ” বা “সহধর্ম্মিণী” অর্থ করেন তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইরাছেন । দ্রাবিড় দেশ হইতে রাজবংশ আসিয়া বাঙ্গালার এতটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের বিরোধী, শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় ভ্রম বশতঃ উপপত্নীকে family (স্ত্রী) বলিয়া এরূপ লিখিয়াছেন । শূর বা সেন বংশ বঙ্গদেশীয়, ইহারা বিদেশীয় নহেন । কায়স্থ জাতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় বল্লালকে কায়স্থ বলা অন্যায় হইবে কেন ?

৬ষ্ঠ, প্রমাণ ।—বঙ্গের ইতিহাসে আমরা বুদ্ধিমত্তা, কালীদাস নন্দী, কচু

রায়, প্রতাপাদিত্য, দলপতি রায়, ঘনশ্যাম পাল, প্রেমানন্দ, চণ্ডীপাদিপতি, ভবানন্দ, রামচন্দ্র, বসন্তরায়, সৌভাগ্য, পাতালভেদী, শিবচন্দ্র বিশ্বাস, বন সিংহ ভৃগু নন্দী, নারায়ণ দত্ত, কর্কট নাগ, মুকুট মণি প্রভৃতি অনেক কার্য্য জাতীর রাজার নাম পাইয়াছি : অনেক কার্য্য রাজবংশের পরিচয় পরিস্ফুট রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ভৌমিক উপাধি ধারী পূর্ব বঙ্গীয় ছয় জন কার্য্য রাজা ছিলেন । আদিশূরের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা অধিক পূর্বে এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে বা অধিক পরে সমুদয় রাজবংশ কার্য্য, সুতরাং বল্লালকে কার্য্য বলা ন্যায় সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি । বল্লালসেন বৈদ্য হইলে তাহার ন্যায় দান্তিক নরপতি নিজবংশকে অকুলীন করিতেন না ।

৭ম প্রমাণ ।—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শূর বংশ খুব প্রাচীন রাজবংশ, এই বংশের স্থানীয় ভাব (indigenous) দেখিয়া ইহাদিগকে বিদেশীয় বলা যায় না । এই শূর জাতীয় লোকেরা খুব সম্মানিত কার্য্য জাতি । এখানে বৈদ্য জাতির লোকেরা কার্য্যপেক্ষা সহস্র গুণে নিকৃষ্ট ।

আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না ; অন্যান্য আরও অনেক কথা লিখিতে বাকী আছে । এখানে দুইটি আপত্তি খণ্ডন করা আবশ্যক । পাঠকেরা বলিতে পারেন —

(১) আদিশূরই বঙ্গে কার্য্য জাতির সৃষ্ট করেন, তিনি নিজে কেমনে কার্য্য বংশনস্তৃত হইলেন ?

(২) বল্লাল যদি কার্য্য হইতেন তাহা হইলে “সেন” উপাধিধারী কার্য্যেরা কুলীন হইল না কেন ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাজা আদিশূর বঙ্গে সর্বপ্রথম কার্য্য আনয়ন করেন নাই । তাহার পূর্বেও কার্য্য জাতির অস্তিত্ব ছিল । যজুর্বেদ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মৃচ্ছকটিক নাটক প্রভৃতি বহুল প্রাচীন পুরাণ ও কাব্যে কার্য্যের নাম আছে ; মনুসংহিতার করণ ও কার্য্য একই । ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বঙ্গের কার্য্য আদিশূরের বহুশতাব্দ পূর্ববর্তী । কাণ্ডকুজ হইতে পঞ্চত্রাঙ্গণ সহিত যে পাঁচজন সহচর আসিয়া ছিলেন তাহারাও কার্য্য ছিলেন, আদিশূর তাহাদিগকে এ দেশীয় কার্য্য সমাজে প্রবিষ্ট ও সংমিশ্রিত করিয়া কার্য্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন । দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যায় যে, কার্য্য জাতির কোলিষ্ঠ ও মোলিক্য প্রথার দিকে প্রথমে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক ; নিম্নে তালিকা দিলাম ।

কুলীন ।—ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ।

শ্রেষ্ঠ মৌলিক—সেন, সিংহ, দাস, দে, দত্ত, কর, পালিত ।

সাধারণ মৌলিক—৭২ ঘর ।

বল্লালের সময়ে বৈদ্যেরা অতীব হীনাবস্থায় পতিত ছিল, ইহারা অতি জঘন্য বৃত্তি দ্বারা পূর্ব বঙ্গে দিনপাত করিত । রাজাদিগের উপদেশের বিরুদ্ধে সেনো-
পাতিক কার্যস্থেরা বৈদ্যের সহিত সংশ্রব রাখায়, বল্লাল সেন “সেন” কার্যস্থ
দিগেকে কুলীনের মধ্যে গণ্য না করিয়া “তাজা মৌলিক” মধ্যে গণ্য করিয়া
দিয়াছেন, ইহাতে সেনদিগের সামাজিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বল্লাল-
মস্ত্রিগণ নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা এবং ধর্ম পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন ।
বল্লালের এই খানে একটু প্রশংসা করিতে আমি বাধ্য, কারণ এই অভিমতে ও
সিদ্ধান্তে বল্লাল সেন প্রতিবাদ করেন নাই । আদিশূর ত্রিপুরা ও মণিপুরের
মধ্যবর্তী কোনও স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন । সুবর্ণ গ্রামে বল্লাল সেনের
জন্ম হইয়াছিল ।

অতঃপর, আমরা রাজা বল্লালের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে
আকাঙ্ক্ষা করি । বলা বাহুল্য, রাজা বল্লাল ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং ব্যতিচারী
ছিলেন । তিনি অনেক সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করেন ; হিন্দু কুলে তিনি
সেরাজুদ্দৌলা রূপে পরিগণিত হইতে পারেন ।

একটা অতি নীচ ডোমজাতীয়া কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়া রাজা বল্লাল সেন
তাহাকে পরিণামে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ডোমনী উপপত্নী রূপেই
রক্ষিতা ছিল । দামোদর শর্ম্মা নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত “বল্লাল
বিকারোদয়” নামে এক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ; শ্রীনারায়ণ নামে
এক পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার উহার সংক্ষিপ্ত সার (syllabus) প্রণয়ন করেন ।

• “দামোদর বানাউলা গোটা বল্লাল বিকার ।

শ্রীনারায়ণ কৈলা ইপ্পো কুঞ্চমেতে সার ॥

অর্থাৎ, দামোদর শর্ম্মা বল্লাল বিকারোদয় নামে যে বিস্তৃত পুস্তক রচনা
করিয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন । দামোদর শর্ম্মার
পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীনারায়ণের পুস্তক বর্তমান আছে, ইহা সার্ক
• তিনশত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে বিরচিত । এষ্ট পুস্তকে বাঙ্গালা, উড়িয়া,
হিন্দি, সংস্কৃত, এবং তেলুগু শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়, কিন্তু পারস্য শব্দ একটি
ও দেখিতে পাঠি না । গ্রন্থকার শ্রীনারায়ণ তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তৈলঙ্গ

দেশ হইতে উড়িয়ায় এবং উড়িয়া হইতে বাঙ্গালায় বসতি করেন । নানা ভাষায় তাঁহার বৃত্তপতি ছিল । বাঙ্গালা সাহিত্যে তেলুগু ব্রাহ্মণ লেখকের এই প্রথম ও শেষ আবির্ভাব । বল্লাল সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ তাঁহার গ্রন্থে লিখিতেছেন

তঁহ রাজা কৈলা বিয়া

ডোম কণে খুই হিয়া

পকাইলা সবম গাডিপো

ভান্সি খীলা ধরম গাডিপো ইত্যাদি ।

সার্কিছুইশত বৎসর পূর্বেকার লিখিত বহুদলনের মূল ঠাকুর গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

কুক্রিয়া করিতে রাজার নাহি ধর্ম ভয় ।

বে কেহ নিন্দয়ে তারে দূর করি দেয় ॥

মৃগয়া বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে ।

শরীরী ঘাপন কৈলা ডোমনোকালয়ে ॥

ডোমের ঘরেতে খুই তীর ধমু অসি ।

মিলিলেক ডোমকন্ঠা প্রাতঃকালে আসি ॥

বিনাহ করিব বলি লইয়া আইলা ঘরে ।

বেলা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে ॥

যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী ।

সর্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ায় তখনি ॥

বাবু মহিমাচন্দ্র মজুমদারের “গৌড় ব্রাহ্মণ” পুস্তকের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—“রাজার বাবহারে লক্ষণসেন এবং ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ।

বল্লালসেন এক অজ্ঞাতকুলগীলা কন্ঠাকে রাজধানীতে আনয়ন করেন ।”

ভাদ্র সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় লিখিয়াছেন “এই অজ্ঞ

বল্লালের বাটীতে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা জলপান করিতে অস্বীকার করেন, রাজা

তাঁহার কায়স্থ মন্ত্রীর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন, কারণ সংকুলসম্মত কায়স্থ মন্ত্রী

রাজার এই চক্ষুর্দোষ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ।” বৈদ্যকুলজী গ্রন্থে লিখিত

আছে—

শুন মনে অতঃপর বল্লাল কাহিনী ।

সে রূপেতে বল্লালেরে অদাম্বিক গণি ॥

অতীত অধম জাতি ডোমের ছহিতা ।

তাহারে বাটতে রাখে লক্ষণ মার পিতা ॥

ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি সবে চাড়ি গেলা ।

বল্লালের কুকরমে বংশ ধ্বংস হৈলা ॥ ইত্যাদি ।

মাননীয় H. H. Risley সাহেব মহাশয়ও তাঁহার প্রসিদ্ধ Bengal Castes and Tribes পুস্তক মধ্যেও এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন । বল্লাল চরিতের পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত কথা গুলি পাঠ করা যায়—

“নিশ্চিতং জারজঃ সোপি হৃদ্যম্মা মন্দবীশ্চৈব ।

চণ্ডাল ডমকন্তাদৌ রতোহসৌ সাধুপীড়কঃ ।

পরশ্মী কাতরো দ্রোহী পররাজ্য ধনেষু চ ॥”

অর্থাৎ “তিনি (বল্লালসেন) নিশ্চয়ই জারজ, হৃদ্যম্মিত এবং মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন । তিনি ডম প্রভৃতি (অস্ত্রাজ জাতীয়া) কন্তাতে আসক্ত ; সাধুব্যক্তি-দিগের তিনি পীড়াদায়ক, পরশ্মী কাতর এবং পররাজ্য ও পরধন অপহারক ছিলেন ।” অন্তত আছে—

প্রভুশ্চ যৌবনহোপি তস্মিন্নাসী বিবেকতা ।

না হারি ব্রাহ্মণীকন্তা চম্মারকোরি তনয়া ॥

কামাচারোপি দৃশ্তোপি স প্রিয়ঙ্কর কিঙ্করঃ ।

কদাচিত্ত পরশ্মীণাং জারজং না করোম্মূপঃ ॥

অসেবি চাণ্ডাল কন্যা রাজ্ঞা দ্বাদশবার্ষিকী ।

নটী কন্তা চ সিদ্ধার্থং পাষণ্ডমতবর্তিনা ॥

যাবন্নাসীদ্ ভট্টপাদৈ রূপদিষ্টো মহীপতিঃ ।

তাবৎ স কৃতবান্ কৰ্ম্ম তত্তৎ সজ্জনগর্হিতং ॥

অর্থাৎ “তিনি (বল্লালসেন) যৌবনকালে প্রভুত্ববশতঃ বিবেকশূন্য ছিলেন, এবং যদিও তিনি ব্রাহ্মণী হরণ করেন নাই, তথাপি চামার, কোরি প্রভৃতি অস্ত্রাজ কন্তার উপগত হইতেন । তিনি যথেষ্টাচারী ও গর্বিতস্বভাব ছিলেন, দ্বাদশ বার্ষিকী চাণ্ডালিনী নটী প্রভৃতি কন্তার রত থাকিতেন ।”

আমি আর অধিক প্রমাণ দিতে ইচ্ছা করিনা, আর অধিক লিখিবারও ইচ্ছা নাই । রাজা বল্লাল, স্তবর্ণবণিক জাতি এবং স্তবর্ণবণিকবাজী বৈদিক ব্রাহ্মণ বর্গের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন ; তিনি কৈবর্তজাতি এবং কৈবর্ত বাজী পরাশর সম্প্রদায় ভূত ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন । পরাশরী ব্রাহ্মণেরা বানোক্ত ব্রাহ্মণ এবং মধ্যস্থ ব্রাহ্মণ

নামেও প্রখ্যাত । আমরা এ সকল কথার উত্থাপন করিয়া প্রবকের আয়তন বৃদ্ধি করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না । প্রকৃত কথায় বলিতে হইলে, রাজা বল্লালসেন, রাজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ ছিলেন, তিনি উচ্চকে নীচ, নীচকে উচ্চ, সম্মানিত বংশকে অমান্য এবং মানহীন বংশকে অকারণে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন ।

“বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয় ।

উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায় ॥

যাহার বিশংখিলোকে বল্লাল মর্যাদা ।

নম্রশ চৌরানব্বইশকে না ছিল একদা ॥

অর্থাৎ ৯৯৪ শকে যে বিংশতি গৃহস্থ অতীব অধম অবস্থায় পতিত ছিল, বল্লাল তাহাদিগকে মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দিলেন । কায়স্থদিগের “দত্ত” উপাধিধারীদিগকে তিনি প্রথমে কুলীনমধ্যে গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডোমকুল্লার সংসর্গের বিরুদ্ধে দত্তেরা ঘোরতর আন্দোলন করায়, বল্লালসেন ইহাদের কোলীন্ড রহিত করিয়া ইহাদিগকে মৌলিক মধ্যে গণ্য করিলেন । প্রবাদ আছে যে—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী ।

অভিमानে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি ॥”

শ্রীনারায়ণ তাঁহার সংক্ষিপ্তসার বল্লাল বিকার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বারেন্দ্র ভূমেতে যত কায়স্থ নিবাসী ।

রাজ-অন্ন খাইল না, রহি উপবাসী ॥

বৈদ্য সহ মিলি গেলা বৈদিক ব্রাহ্মণ ।

বল্লালের মর্যাদায় বঞ্চিত উভজন ॥

সুবর্ণবণিক আর কৈবর্তকুলপতি ।

রাজার অধর্ম্যে সব রহিলেক মাতি ॥

সমাজের অধিপতি গদাধর দত্ত ।

বল্লালের অপमानে ছাড়িগেলো সত্ত্ব ॥

এইরূপে দেখান যাইতে পারে, বল্লালসেন নিতান্তই অবিবেকী পুরুষ ছিলেন । তিনি নানা প্রকারে আমাদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার অন্যাচারে বহুল ধার্মিক ও শিক্ষিত হিন্দুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, অনেকের তিনি অকারণে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন । বল্লালের পিতার নিকরুদ্ভিতায় আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছি, বল্লালের দুষ্টচরিত্রতায় আমাদের

নাহা নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য স্বাধীনতা-রক্ত হইতে কম নহে । পিতা ও পুত্র উভয়েই আমাদের অহিতকারী । রাজা বল্লালসেন স্বধর্ম ও স্বজাতির কিছু মাত্র কল্যাণ করিতে সমর্থ হইলেন নাই । আদিপুর সেন বংশের সর্বপ্রধান পুরুষ, বল্লাল এই বংশের শেষ রাজা । যে দোষে সেন বংশধ্বংস হইয়াছে—যে দোষে সেনবংশের চিহ্ন পর্যাস্ত নাই—ঠিক সেই দোষে ভারতে মোগল রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । মোগলকুল শিরোমণি আকবর এবং ধর্মগোড়া আওরঙ্গ জেব্-উদদৌলা ধর্ম ও জাতিকে এক করিয়া সমস্ত দেশের উন্নতি সাধনে মনোবোগী হইলেন নাই, আদিপুর ও বল্লাল, জাতি ও ধর্মকে শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, উভয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে স্থাপন করিয়া হীনবল করিয়া গিয়াছেন । স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে রাজা বল্লালসেন বাঙ্গালার ইতিহাসে এক ছরপনের কলঙ্ককালিমার জীবন্তমূর্ত্তি ।

শ্রীধরানন্দ মহাভারতী ।

খুকুর মৃত্যুতে ।

(কোন ব্যক্তির ছুই পত্নী ছিলেন ; কনিষ্ঠা, প্রিয়তরা পত্নীর তিনটি পুত্র ছিল ; উহাদের মধ্যে একটি এক বৎসর কাল ব্যাধি ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । উহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে জ্যেষ্ঠা পত্নীর একটি কন্যা জন্মিয়া ছিল, এই কন্যাই আমার কাব্যের 'খুকু' । খুকু বৎসর কাল জীবন ধারণ করিয়া সামান্য রোগে অনন্ত ধামে চলিয়া যায় । অত্যাগিনীর খুকুই একমাত্র সন্তান ছিল ।)

(১)

অস্তিমানে চলে গেলে, খুকু,
ভালই করেছ, মাগো, যেয়ে
আমাকেই ছুপ দিবে গেলে,
দিলে, দিলে, রহিব সহিয়ে ।

(২)

ভাল করে না দেখিতে, খুকু,
চলে গেলে তুষা না মিটিতে—
বুকের বুকেতে তুলে নিয়ে
প্রাণ ভরা ভাল না বাসিতে ।

(৩)

প্রাণ ভরা ভালবাসা, খুকু ?—
মুখের (ও) আদর করি নাই,
কত হেলা করেছি, বাছনি,
মা হয়ে, মা, তোমাকে সদাই ।

(৪)

যে দিনে আসিলে হেথা, খুকু,
পুত্র ধন অস্তিম শয়ান,
বিষাদ সাগরে ডুবেছি—
কে তোমার পানে কিরে চায় ?

(৫)

সে গেল—সে চলে গেল, খুকু,
আমা দৌড়ে অপরাধী করে ;
তুমি দোষী জনমিতা বাছা,
আনি—তোমা' পরিত্যাগ করে ।

(৬)

মেয়ে হয়ে খেদাঠিলে, খুকু,
সপত্নীর সোনার কুমার ;
'ওমা, ওমা, কি রাক্ষসী মেয়ে ?'
সবাই বলেছে অনিবার ।

(৭)

যে তোমা' পাঠিয়েছিল, খুকু,
সেই তো, মা, নিয়ে গেছে তার,
তোমাকে হুঁসেছি স্কারপে—
আমা, যা (ও) যা বিধির ইচ্ছায় ।

(৮)

দুখে ও তা' বুঝিনাই, থুকু,
দিবা নিশি করেছি, গল্পনা,
তাড়াতাড়ি পানাইলে তাই
সহিতে না পারিয়া যাতনা ।

(৯)

লুকায়ে রেখেছি সদা, থুকু,
তোমাকে, মা, চোরের মতন ;
কেহ বা 'রাক্ষসী মেয়ে' বলে
শাপে দহে কোমল জীবন ।

(১০)

আমি তো দেখিনি কভু, থুকু,
তোমাতে, মা, রাক্ষসী লক্ষণ,
একমাত্র তারা সম নভে
উজলিয়া ছিলে গৃহ কোণ ।

(১১)

এমন মধুর মুখ, থুকু,
আঁখি দুটি এমন (ই) তোমার—
মাগো মা, এ বিশাল ধরায়
এমন হেরিব কোথা আর ?

(১২)

কত হাসি হাসিতে যে, থুকু,
খেলিতে, মা, আপনার মনে,
সে হাসি, সে খেলা নিরখিয়া
ভুলিয়াছি সংসার বাতনে ।

(১৩)

গভীর নিশীথে জেগে, থুকু,
জাগরিত করেছি তোমায়,
হৃৎকনেতে বিরলে বসিয়া
খেলাধুলা করিব আশায় ।

(১৪)

দিবসে সাহস করে থুক,
করিনাই আদর, বতন ;
নিশাকালে বুয়েল সকলে
কোলে নিয়ে বসেছি তখন ।

(১৫)

মধুর পরশে তব, থুক,
সে মধুর চাহনি হেরিয়া,
থল থল হাসিরব শুনে
স্বর্গস্থে থেকেছি ডুবিয়া ।

(১৬)

সে সুখ স্বপন এবে, থুক,
শূন্য কোলে কাঁদি, মা, এখন,
শূন্য কোল, শূন্য বুক মম,
শূন্য গৃহ, শূন্য ত্রিভুবন ।

(১৭)

একদা ছুখের দিনে, থুক,
স্বামী যবে রোগেতে বিকল
“কেন গো, মা”—পুছে ছিন্ন তোমা,
“তুমি এসে এত অনঙ্গল ?”

(১৮)

“রোগ শোক ছাড়েনা, মা খুক,
লোকে কেন দোষে, মা, তোমায় ?”
কেন্দে ছিলে সে কথা শুনিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদায়ে ছিলে মায় ।

(১৯)

সেইদিন অভিমানে, খুক,
শুইলে যে রোগের শযায়,
আর না উঠিলে তাহা ছাড়ি,
বুকে না আসিলে পুনরায় ?

(২০)

হাঁর বকে গিয়েছে, মা খুকু,
 সুখে থাক তাঁহার (ই) আদরে ;
 পায়ে ধরি কহিও তাঁহার
 আমাকেও ডাকেন সত্বরে ।

মানব জীবনে দর্শনের উপযোগিতা ।

[“নবপ্রভার” পাঠক মহাশয়গণের সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই । আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে বিষয়ের “গুরুত্ব ও সাধারণ পাঠকের মানসিক আবেগের খরস্রোতের বিরুদ্ধে আমার দুর্বল লেখনী যে অনেকদূর বাহিয়া ষাটতে পারিবে সে আশা ছরাশা মাত্র” । সেইজন্য ও অন্যান্য নানাকারণে আমার মুক লেখনী একবার মুখরারিত হইয়াই মস্তমুগ্ধবৎ নিঃশব্দ হইয়াছিল । এত দীর্ঘকাল বিলম্বের পর এরূপ নীরস বিষয়ের রসাস্বাদন করা অনেকেরই কষ্টকর হইবে । তবে পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ ইতিপূর্বে যদি কাহারও ভাল লাগিয়া থাকে তবে তাঁহার বিজ্ঞাপনার্থ লিখিতেছি যে “নবপ্রভার” প্রথম বর্ষের পঞ্চম ও দ্বাদশ সংখ্যায় “মানবজীবনে দর্শনের উপযোগিতা” নামে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই উপসংহার] ।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা ও বস্তুর মূলতত্ত্ব ও কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিজ্ঞান উপাদান কারণে সীমাবদ্ধ হইলেন । দর্শন বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া কি প্রণালীতে (Method) নিমিত্ত কারণের দিকে ধাবমান হইলেন এক্ষণে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে । উপাদান (Materials) ছয়েরই এক—উভয়েই নানাজাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাপন্ন ঘটনা পরম্পরা বাহা আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে তাহারই কারণ অনুসন্ধানের রত । কিন্তু অনুসন্ধান প্রণালী একের অপরের হইতে স্বতন্ত্র । বিজ্ঞান, ঘটনা সমূহ সেক্ষণ ভাবে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহাই যথাগণ স্বীকার

ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১০ । মানবজীবনে দর্শনের উপযোগিতা । ২৭৯

করিয়া লইয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সমন্বয়বাদি (coexistence) সম্বন্ধ আছে তাহার নিরাকরণে ব্যাপ্ত থাকে । দর্শন কিন্তু এইখানেই নিশ্চিন্ত নয় । দর্শন প্রত্যেক ঘটনা ও বস্তুকে তন্ন তন্ন ভাবে পর্যালোচনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব উপনীত হইবার জন্য ব্যস্ত এবং প্রতি ঘটনাকে উল্লিখিত মূলতত্ত্বের সহিত সুসম্বন্ধ করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ধারাবাহিক করিবার জন্য সতত উদ্যত । তজ্জন্তই দর্শন ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সাস্তুত্ব স্বতন্ত্রত্ব ও অনিশ্চয়ত্ব পরিবর্তন পূর্বক তদন্তর্নিহিত অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপি সং পদার্থের সত্তা উপলব্ধি করে । বস্তুতঃ দর্শন নিখিল ইঞ্জিয়গ্রাহ্য সাস্তু পদার্থ সমূহকে অন্তর্নিহিত অমূল্য হীরকময় মালা দ্বারা প্রথিত করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য সুশৃঙ্খল সুসম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করে । এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন “ যজ্ঞজ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োত্তম জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ”—যে অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের জ্ঞানলাভ করিলে ইহ জগতে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না ।—ময়ি “ সর্ব মিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাঈব ” ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে দর্শন বিজ্ঞানের গ্রাম “ বাবচ্ছেদন ” ও “ একীকরণ ” মূলে সমগ্র বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞানলাভ করে । এবং ইহাও বলিয়াছি যে বিষয়ের বিশেষত্বে দার্শনিক প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অপেক্ষা “ একীকরণ ” ক্রিয়ার সমধিক প্রাধান্য দেখা যায় । এক্ষণে উক্ত প্রাধান্যের কারণ নির্দেশ ও দার্শনিক প্রণালীর বিশেষত্ব প্রতিপাদন করা প্রয়োজন হইতেছে । ইতিপূর্বে দর্শনের বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের অনুসন্ধান ও উক্ত মূলসূত্র কিরূপে যাবতীয় ঘটনা পরস্পরার সহিত নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে সুসম্বন্ধ তাহা প্রদর্শন করাই দর্শনের কার্য্য হইতেছে । তাহা হইলে “ একীকরণ ” প্রণালীর সমধিক প্রাধান্য দর্শনে পরিদৃষ্ট হওয়াই উচিত । তজ্জন্তই ভগবান্ বলিয়াছেন, “ অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ” এবং উপনিষৎ বলেন “ একং সং বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি ” । বস্তুতঃ জ্ঞানের মূলসূত্রই “ একীকরণ ” “ বাবচ্ছেদন ” উক্ত “ একীকরণ ” ক্রিয়ার সাধন মাত্র । তবে “ একীকরণ ” করিতে গিয়া বস্তুগত পার্থক্যকে একবারে নিরসন করিলে চলিতে পারে না ; যে দর্শন তাহা করে তাহা একদেশদর্শী—অতএব অসম্পূর্ণ । দর্শনকে ইহাও দেখাষ্টতে হইবে যে ঐ অন্তর্নিহিত মূলসূত্র কিরূপে স্বীয় অনাদিঅনন্তত্ব ও স্বসংপেক্ষত্ব পরিভাগ করিয়া আদাস্তবস্ত্ত অপরাপেক্ষী বিশেষ ২ পদার্থের

সৃষ্টির নিমিত্তকারণ হইলেন—অর্থাৎ দেখাইতে হইবে যে অনন্তের অনন্তত্বে এমন একটি অবশ্যম্ভাবী গুণ আছে যে তাহা হইতে সাস্তু পদার্থ সৃষ্ট না হইয়াই পারে না । যে “একীকরণ” বস্তুগত পার্থক্যকে নির্দিষ্ট স্থান না দেয় ও তাহার অস্তিত্বের কারণ নির্দেশ না করে, পক্ষান্তরে তাহাকে ধ্বংস করিয়া সর্বভূক্ত অনন্তের প্রাধান্য মাত্র প্রদর্শন করে, সে একীকরণ প্রকৃত একীকরণ হইতে পারে না । দার্শনিক প্রণালীর বিশেষত্বের বিষয় পূর্বেই অবাস্তর ভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে । অতএব এস্থলে সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলেই যথেষ্ট হইবে । বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের ব্যবচ্ছেদন ও একীকরণ দ্বারা বস্তুগত গুণের বিশ্লেষণমূলে জ্ঞাতিগত গুণের জ্ঞান, অধস্তন জ্ঞাতিগত গুণ জ্ঞান হইতে উপরিতন জ্ঞাতিগত গুণজ্ঞান, সেইরূপে ক্রমশঃ উপর্যুপরি তন জ্ঞাতিগত গুণজ্ঞানে উপনীত হয় (Scientific induction)—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরম্পরার যথার্থ্য আনুল স্বীকার করিয়া যায় । উক্ত বিষয় সমূহের বাস্তব সত্তা আছে কি না ? থাকিলে তাহা কি ? কোথা হইতে কি প্রকারে উদ্ভূত হইল ? এ সমস্ত প্রশ্নের আদৌ অবতারণা করে না । দর্শন কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যাপ্ত—বিষয় পরম্পরার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করাই দর্শনের কার্য । তৎকার্য সাধনার্থ প্রতিপদে দর্শনকে “ব্যবচ্ছেদন” ও “একীকরণ” নামক মানসিক ক্রিয়া দ্বয়ের সাহায্য লইতে হয় বটে, কিন্তু দর্শন ঐ দুই ক্রিয়া দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী (আত্মা) এই উভয় পদার্থের বাস্তব সত্তা ও সাধারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার প্রয়াস পায়—। দার্শনিক কবি বখন “কস্মদ্বা কুত আয়াতঃ” গাহিলেন, তখনই প্রায় সমস্ত দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা করিলেন । জ্ঞানী পাশ্চাত্য মুনি ইমারসন বখন বলিলেন “আমরা জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এইটা সূর্য, এইটা চন্দ্র, এইটা ~~জল~~ এইটা বৃক্ষ বলিয়া দেখি ; কিন্তু এ সমস্তই যে সমগ্র পদার্থের অভিব্যক্ত অংশ মাত্র সেই আত্মা” “এ জগতে কোথাও আবরণ, প্রাচীর বা বাবধান নাই । কিন্তু একই রক্ত অবিরত ধারে সমগ্র মানব জাতির ধমনীতে ও শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, ঠিক যেমন একই সমুদ্র পৃথিবীর নানাস্থানের জলরূপে পরিদৃশ্যমান্ এবং বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে ঐ একই স্রোতঃ সর্বত্র প্রবহমান্” (১) তখনই দর্শনের মূলতত্ত্বের উপদেশ করিলেন ।

“We see the world peice by peice, as the Sun, the moon, the animal the tree ; but the whole of which they are the shining parts is the Soul.”

ভাদ্র ৩ আশ্বিন ১৩১০] মানবজীবনে দর্শনের উপযোগিতা। ২৮১

এজগতে মানব প্রকৃতি অতি অদ্ভুত পদার্থ—চিৎ ও জড়ের অপূর্ণ সংমিশ্রণ উৎপন্ন পরমেশ্বরের এক অনির্বচনীয় সৃষ্টি। ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য সৃষ্টি সর্বশক্তিমান ভগবানের থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা ইতস্ততঃ যে কোনও সৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই তন্মধ্যে মানব প্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। জড় প্রকৃতির বিচিত্র কাককার্য্য নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে মন বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হয়। দেখ ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ নিরন্তর আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিতেছে—উহার পক্ষের উপর নানাবর্ণরাগে রঞ্জিত যে চিত্রকার্য্য রহিয়াছে তাহা, তুমি বিদ্যা বুদ্ধির অভিমানী গর্জিত মানব, তোমার সকল বিদ্যা সকল বুদ্ধিকে পরাজিত করিয়া, নিজের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইংরাজিতে একটা চলিত কথা আছে যে সর্বদা দেখিতে দেখিতে দ্রব্যের উপর ঘৃণা জন্মে। আমরা এখন পরিণত বয়সে অশ্ব, যান, জনস্রোতের কোলাহলের মধ্যে অগণিত ইষ্টক প্রস্তুতময় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার অলিন্দে পাদচারণ করিতে করিতে ঐ ক্ষুদ্র পতঙ্গের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অক্ষম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে আসিয়া যখন আমাদের দর্শন শক্তির প্রথম উদ্ভাসন হয় তখন নিশ্চয়ই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, ঐ পতঙ্গের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ছিলাম। যেদিন বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত দূরস্থিত বস্তু সমূহ দর্শন করিতে শিখিলাম, সেই সময় এক দিন মাতৃদেবীর সুখময় ক্রোড়ে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমার দৃষ্টি সহসা ঐ অগণিত গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূর্ণ অনাদি অনন্ত নীলাকাশের উপর পতিত হইল, তখন না জানি কত আনন্দই উপভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজি আকাশ সেই আকাশই রহিয়াছে, চন্দের কিরণ তেমনই স্নিগ্ধ অবিরল সুখা ক্ষরণ করিতেছে, আমি কিন্তু আর সে আমি নাই। আমি এখন কঠিন জীবনসংগ্রামে নিম্পেষিত বিধ্ব্নিত হইয়া আত্মহারা হইয়া অগ্নিসমাকুল গৃহমধ্যস্থিত সুশোণিত জীবের ন্যায়, এদিক্কে যাইতেছি ওদিকে যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের সম্যক পুর্যালোচনা করিলে অনেক বিস্ময় ও আনন্দের পবিত্র উৎস হৃদয় মধ্যে উচ্ছাসিত হয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকও এই চক্ষেই জগৎকে

“Not a valve, not a wall, not an intersect on is there anywhere in nature, but one blood rolls uninterruptedly an endless circulation through all men, as the water of the globe is all one sea, and, truly seen, its tide is one”—Emerson’s, “Over soul”.

দেখিয়া থাকেন । ইংলণ্ডের বিজ্ঞানজগতের উজ্জ্বল রত্ন মহামতি ফারাডে বলি-
য়াছেন “আমরা ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় শিক্ষালাভ ও জীবন যাত্রা
নির্বাহ করি, কিন্তু সেই জগতের সমস্ত ঘটনা কিরূপে ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে
আমাদিগের বিশ্বয় এক মুহূর্তের জন্তও জাগরিত হয় না । আমাদিগের বিশ্বয়
এত অল্প যে আমরা এ জীবনে কখনও আশ্চর্যাভিভূত হই না”* কিন্তু সাধারণ
বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির এই ভাব একবারে ভুলিয়া যান—জগতে অগ্নিজ্ঞান উদজ্ঞান
প্রভৃতি কয়েকটা বাষ্প, ও তাম্র লৌহাদি কয়েকটা ধাতু দ্রব্য, এবং তাহার। সে
কয়েকটা অল্প নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তত্ত্বের আর কিছুই দেখিতে পান
না—বিজ্ঞানালোচনা করিতে করিতে মানব আপনাকে ঐ অনাদি অনন্ত বিষয়
পরম্পরার অন্তর্ভূত একটি ক্ষুদ্র জীব বলিয়া বিবেচনা করে—জড় পদার্থ সমূহ
যেমন অল্প নিয়মের অধীন হইয়া পরিচালিত হইতেছে নিজেকেও তেমনি
সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ক্রীড়াপুতলি বিবেচনা করে । বাস্তবিক জড়ের হিসাবে
দেখিতে গেলে আমি কত ক্ষুদ্র কত অকিঞ্চিংকর । প্রকৃতি তাহার অনন্ত বক্ষে
অযুত অযুত সৌরজগত স্থান দিয়াছেন, তাহার মধ্যে জানি না কতটুকু একটি
সৌর জগতের মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য পদার্থ মাত্র । তজ্জন্যই
মানব প্রকৃতির বিশেষ আলোচনা স্বসত্তাববোধের জন্য মানবের প্রয়োজন ।
মানব প্রকৃতি অতি অল্প পদার্থ । মানব তাহার স্থূল দেহ নিবন্ধন ইষ্টক প্রস্তর-
দির ন্যায় জড় প্রকৃতির অন্তর্ভূত, যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রাকৃতিক
বাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট, মানব দেহও সেই সমস্ত উপাদানে গঠিত । অতএব ঐ সমস্ত
উপাদানের সংমিশ্রণ বিমিশ্রণ জড় প্রকৃতিতে যে সমস্ত নিয়মে সংঘটিত
হইতেছে, মানব দেহ হইতেও ঐ নিয়ম সমূহের জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি ।
এতদ্বারা চেতন পদার্থ মাত্রের যে সমস্ত সাধারণ ধর্ম আছে মানব প্রকৃতিতে তৎ
সমস্তই বর্তমান আছে—এ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান লাভ অতি সহজসাধ্য ।
অধিকন্তু চিৎ (consciousness) শক্তির সুপরিষ্কৃত কার্য সমূহ একমাত্র মানব
প্রকৃতিতেই দেখা যায়, অতএব মানব প্রকৃতির এইটী একটি বিশেষত্ব । অপ-
রাপর জন্ত সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি (Intelligence) আছে কি না তাহা নিশ্চয়
করিয়া বলা সুকঠিন, তবে বাবতীয় মানসিক ক্রিয়ার জ্ঞান পরিণামে স্বমানসিক

* Here it is that we are born, bred, and live, and yet we view these things with an almost entire absence of wonder to ourselves respecting the way in which all this happens. So small, indeed, is our wonder that we are never taken by surprise.—Faraday's “Forces of matter” p. 2.

ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১০] মানবজীবনে দর্শনের উপযোগিতা । ২৮৩

ক্রিয়ার জ্ঞান সাপেক্ষ (১) বলিয়া প্রত্যেক মানবেরই স্ব স্ব মানসিক ক্রিয়া কলাপের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন । এবং ইহাও প্রায় স্থির সিদ্ধান্ত যে মনুষ্যের জন্তুবর্গের পক্ষে অন্য দাবতীয় মানসিক ক্রিয়া সম্ভবপর হইলেও অহং মমতাকার আত্মার বাষ্টি সমষ্টি জ্ঞান (Self-consciousness) থাকা সম্ভব নয় । অপরন্তু মানব আত্মার অত্যাশ্চর্য্য অনির্দ্বন্দ্বীয় অনন্তসাধারণ যে একটি গুণ আছে তাহাতেই আত্মার গৌরব, তাহাতেই আত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় । আত্মার সেই গুণ স্বল্পভাবে জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যেও পরি-লক্ষিত, তবে মনুষ্যের নৈতিক জীবনেই সে গুণের বিকাশ দেখা যায় । মনুষ্যের যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি আছে তাহার উপর তাহার সমগ্র মহত্ত্ব সংস্থাপিত । এই গুণ আছে বলিয়াই মনুষ্য স্বীয় কার্যের ফলাফলের জন্ত দায়ী, এবং ইহার ফলেই সে ইলিয় ও বিষয়ের তাড়নাকে তুচ্ছ করিয়া নিজ শক্তি ও মহত্ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক এ অশান্তির সংসারে দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক । এই জন্তই মহামতি কান্ট বলিয়াছেন । :-

“মস্তকোপরি ঐ যে তারকা পরিপূর্ণ আকাশ রহিয়াছে এবং আমার হৃদ-যান্ত্রস্তরে যে নৈতিক নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে এট দুই বিষয় আমরা যতবার এবং যতকাল ধরিয়াই চিন্তা করি, প্রতি মুহূর্ত্তই নূতন ও নিরন্তর বর্ত্তমান আনন্দ ও ভক্তিতে আমাদের হৃদয় আপ্নত হইতে থাকে” । * এরদ্বিধ নানাজাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাপন্ন উপাদানের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে উৎপন্ন যে মানব, বাহ্যকে পুরাতন গ্রীকেরা এইজন্তই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড (Microcosm) নামধেয় করিয়া-ছিলেন, তাহাকে জানিবার জন্ত অন্ততঃ চেষ্টা করাও কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

আরিস্টটল বলিয়াছেন “বিশ্বই দর্শনের প্রধান সাধন” † আমি জিজ্ঞাসা করি যে পূর্ব্বোল্লিখিত যে একটি অপূর্ব্ব পদার্থ তৎ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যায় কি প্রতিপদে জাগরিত হওয়া উচিত নয় ? কার্লাইল একস্থানে বলিয়াছেন “যদিও আমরা যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই সমস্তই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি

(১) All knowledge of mental laws depends ultimately on introspection.

* Two things there are, which, the oftener and the more steadfastly we consider them, fill the mind with an ever new, and ever rising admiration and reverence :—The starry heaven above the moral law within”

Kant's Kritik of Poetical Reason.

† “Wonder is the first cause of Philosophy”—Metaphysics. 1,2,9,

মাত্র, মানব তাহাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি", (১) হিন্দুদর্শনও বলিয়া থাকেন "সোহহং" । পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি স্বরূপ, এই মানব প্রকৃতি যে সকলেরই প্রকৃষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাতে আর কি কোনও সন্দেহ হইতে পারে । বিশেষ মানব বন্ধন পরমেশ্বরের কৃপায় জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়াছে তখন কি সে একবার নিজসত্তাবধারণ করিবার জন্য চেষ্টা ও করিবে না । ইংলণ্ডের কবি পোপ বলিয়াছেন "মানব জাতির উপযুক্ত জ্ঞান চর্চার বিষয় হইতেছে মানব" । (২) অতএব সমগ্র জগতের মূলতত্ত্বানুসন্ধান, বিশেষতঃ মানব প্রকৃতির পর্যালোচনা যদি দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, এবং মানুষের যদি নিজসত্তাববোধের জন্য একটা অনন্তসাধারণ শক্তি থাকা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মানব জীবনে দর্শন শাস্ত্রানুলোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না । বস্তুতঃ মানব বুদ্ধি যদি নানাকারণে স্বীয় অধিকার বিচ্যুত না হইত তাহা হইলে এসম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ লেখাই নিম্প্রয়োজন হইত ।

শ্রীবারাণসীবাসী মুখোপাধ্যায় ।

দ্বিজেন বাবুর

হাসির গান ও তাহার স্বরলিপি ।

(১)

গান ।

পারত, জন্মোনা কেউ বিষ্মাৎ বারের বারবেলা,

জন্মাও ত সাম্নাতে পারবেনাক তার ঠেলা ।

দেখ, বিষ্মাৎ বারের বার বেলায় আমার জন্ম হইল,

তাঁই, দিল মোরে, কালো করে', রোনে ধরে' মাথিয়ে, নাথিয়ে তৈল ।

(১) If all things whatsoever we look upon are emblems to us of the Highest God, I add that more so than any of them is man such an emblem."

(২) "The proper study of mankind is man."—Pope's Essay on Man.

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিল নাক মাসের ছদ,
কোরে দিল, শরীর সুরু, বুদ্ধি গুরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের ছদ ;
পরে, মিলে আমার আটটা মামার, বাবার সেই আট শালায়,
হোতে না হোতে বড়, দিবে চড় পাঠিরে দিল পাঠশালায় ।
দেখ মোর গুরু মশায় (যেন কথা শু) বিদ্যায় খাটো শর্ম্মারে ।
কোরে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটেপে পিটেপে লম্বা রে ।
বাবা, আমি উচু দিকেই বাড়ছি দেখে. উস্কল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোর, চাকরি কোরে, তারাও মোরে

ছদিন পরে তাড়িয়ে দিল ।

দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুন্ন, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, কণের দরও চড়ে গেল ।
হায় ! গো বিধি চুষ্ট সবায় তুষ্ট, কুষ্ট কেবল আমার বেলা,—
সে কেবল কেলনাম বোলে, ভয়ে ভুলে

বিষ্মাৎ বারের বারবেলা ।

[অনেকেই “দ্বিজেন বাবুর” হাসির গান পড়িতে ব্যাকুল । আবার অনেকে
এই গান গুলি সুরের সহিত শিখিয়া গাহিতে বা হারমোনীয়ম বাজাইতে লালসিত ।
এক্ষণ হইতে দ্বিজেন বাবুর হাসির গান ও তাঁহার স্বরলিপি নবপ্রভাতে
প্রকাশিত হইবে । তাহাতে অনেক পাঠকই উক্ত গান শিখিয়া রসসম্পূর্ণ সঙ্গীত
দ্বারা নিজের এবং বন্ধুবর্গের আনন্দ বর্ধন করিতে পারিবেন ।]

(২)

স্বরলিপি ।

উদারা—স র গ ম প ধ ন

মুদারা—সা রা গা মা পা ধা না

ভারা—সো য়ো গো মো পো ধো নো ।

বিষ্মাৎবারের বার বেলা—

রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা ;
জ — ক্ষ না . কেউ — বি — ষ্মাৎ বা রের —

ধ সা সা সা সা সা : — — সা গা গা গা ।
 বা র বে লা — — পা র ত —
 রা রা রা রা রা রা , সা সা সা সা সা সা ;
 জ — স্ব না কেউ — বি — যুৎ বা রের —
 ধ সা সা সা সা সা ; — — সা সা সা সা ।
 বা র বে লা — — জ স্বাও ত —
 মা মা মা মা মা মা , মা মা মা মা গা গা ।
 সা — ম লা তে — পা র্ বে না ক —
 রা গা গা গা গা গা ; গা গা গা গা গা গা ।
 তা র ঠে লা — — — — — —
 রা রা রা রা রা রা , সা সা সা সা সা সা ;
 জ — স্ব না কেউ — বি — যুৎ বা রের —
 ধ সা সা সা সা সা ; — — সা গা গা গা ।
 বা র বে লা — — পা র ত —
 রা রা রা রা রা রা , সা সা সা সা সা সা ;
 জ — স্ব না কেউ — বি যুৎ বা রে র —
 ধ সা সা সা সা সা : — — — — পা পা ।
 বা র বে লা — — শো ন
 'সো সো সো সো সো সো , সো সো সো সো সো সো ;
 বি — যুৎ বা রে র্ বা র্ বে লা তে —
 রো রো রো সো সো সো : ধা সো সো সো সো সো ।
 আ মা র জ — স্ব হৈ — ল — — —
 সো সো সো সো সো সো , সো সো সো সো সো সো ;
 বি — যুৎ বা রে র বা র বে লা তে —
 রো রো রো সো সো হো ; ধা সো সো মা মা মা ।
 আ মা র জ — স্ব হৈ — ল তাই দি ল
 পা পা পা পা পা পা , ধা ধা ধা পা পা পা ;
 কা লো — ক রে' — রো দে — ধ রে —
 মা মা মা গা গা গা : রা গা গা গা গা গা ।
 মা খি য়ে মা খি য়ে তৈ — ল — — —

রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
 জ — স্ব না কেউ — বি — ষুং বা রের —
 ধা সা সা সা সা সা : — — সা গা গা গা ।
 বা র বে লা — — পা র ত —
 রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
 জ — স্ব না কেউ — বি — ষুং বা রের —
 ধ সা সা সা সা সা : — — সা সা সা সা ।
 বা র বে লা — — ব নে' মা —
 মা মা মা মা মা মা, পা পা পা মা মা মা
 কা লো — ছে লে — দি লে — তে লে —
 মা মা মা মা মা মা : রা গা গা গা গা গা ।
 — — দি লে না ক মা যের ছধ — করে দিলে
 মা মা মা মা মা মা, গা গা গা গা গা গা ;
 শ রী র স রু — বু — ছি গ রু —
 রা রা রা রা রা রা : সা সা সা পা পা ।
 খা ই যে খা ই যে গাই যের ছধ প রে
 সো সো সো সো সো সো, সো সো সো সো সো সো ;
 মি লে — আ মা য আ ট টা মা মা য
 সো সো রো রো সো সো : ধা সো সো সো মা মা ।
 — — বা বার সেই — আ ট শা লায় হোতে না
 পা পা পা পা পা পা, ধা ধা ধা পা . পা পা ;
 হ তে — ব ড় — দি য়ে — চ ড় —
 মা মা মা মা গা গা : বা গা গা গা গা গা ।
 পা ঠি য়ে দি লে — পা ঠ শা লা য —
 রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
 জ — স্ব না কেউ — বি — ষুং বা রের —
 ধ সা . সা সা সা সা : — — সা গা গা গা । ;
 বা র বে . লা — — পা র ত —

বাকি চরণগুলি [.] স্বরলিপি অনুসারে বোঝ ।

মায়া ।

একোনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

কানন ভবনে ।

চন্দ্রালোকে ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রবোধ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী লীলা তাঁহাদিগের পত্নী-
গ্রামের উদ্যানভবনে বসিয়া আছেন । সম্মুখে সরোবর, মৃদু মন্দ সমীরণ
চুম্বিত হইয়া, ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গে যেন হাসিতেছে । সরোবরতটে উচ্চ ঝাউ
বৃক্ষশ্রেণী পবনহিলোলে ঢলিয়া সোঁ। সোঁ। করিতেছে । গৃহের নিকটে একটা
ঝাউগাছের উপর মধুমালতী লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে । অশোক বৃক্ষের
বন পল্লবরাজি চন্দ্রমার রজতকিরণে উজ্জল হইয়াছে ।

লীলা তাঁহার স্বামীর দিকে স্নেহভরে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কি আজি
বাহিরে যাইবে ?

প্রবোধ বাবু উত্তর দিলেন—তুমি বাহা বলিবে তাহাই করিব ।

লীলা । আমি বলি, আজগে আর বাহিরে যাইও না ।

প্রবোধ । কেন ?

লীলা । এখানে এসেছ বিশ্রাম করিতে । এখানেও যদি দিন রাত্রি
খাটিবে, তা হলে দেহটা রবে কি রকমে । জানত স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন
শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং ।

প্রবোধ । কিন্তু তাই বলিয়া উমা তপস্যা করিতে ছাড়েন নাই ।

লীলা । উমাত তপস্যা করিয়াছিলেন কিছু কাল । তোমার তপস্যার
ষে অন্ত নাই ।

প্রবোধ । জীবনটাই ত তপস্যা ও আরাধনা । কেহ বা ঈশ্বরের আরাধ-
না করিতেছে, কেহ বা যশের আরাধনা করিতেছে, কেহ বা ধনের আরাধনা
করিতেছে, কেহ বা প্রেমসীর কৃপা আরাধনা করিতেছে । আরাধনা চতুর্দিকে
—তবে কোনটা উত্তম, কোনটা অধম ।

লীলা । আমি তোমাকে যে আরাধনা করি সেটা উত্তম না অধম ?

প্রবোধ । তুমি আমাকে আরাধনা কর, না আমি তোমাকে আরাধনা
করি ?

লীলা । বটেইত । যখন তুমি পুস্তক রাশিতে ডুবিয়া বাহুজ্ঞানশূন্য হও, পূর্বদিকের নক্ষত্র পশ্চিমে অস্ত বাউলেও তোমার তাহা থবরে আসে না, তখন তুমি আমার আরাধনা কর বটে । যখন জমিদারির রাশীকৃত কাগজ পড়িয়া তাহার উপর কত কি লিখিতে থাক তখন তুমি আমারই আরাধনা করই বটে । যখন তুমি পুস্তকাগারে বসিয়া পুস্তক লিখিতে থাক তখন তুমি আমারই আরাধনা কর, না ? যখন তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সঙ্গে বসিয়া নির্জনে গোপনে কত কি মন্ত্রণা কর, তখন তুমি তোমার প্রবর্তীর আরাধনা করই বটে । যখন তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রজাবিদ্রোহের কথা বলিতে যাও তখন তুমি তোমার পত্নীর আরাধনা কর । যখন তুমি নরেশ বাবুর সঙ্গে বসিয়া গল্প কর, আর যে ব্যক্তি তোমার পরামর্শ শুনিবে না তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য বাস্তব হও, তখন তুমি আমারই আরাধনা কর বটে ।

প্রবোধ বাবু । (হাসিয়া) বাগ্মীবরা স্ত্রী, চুপ কর । আমাকে একটু কথা বলিতে দেও ।

লীলা । বলনা, বলনা । তোমার কথা শুনিবার জন্যই ত কথা বলি । স্ত্রী তৃষিত চাতক, স্বামী নবীন নীরদ । স্বামীর কথা তুমি জ্ঞান । তৃষিত চাতক নবীন নীল নীরদের দিকে চাহিয়া থাকে না কি ?—বারিবিদুর জ্ঞান ?

প্রবোধ । বারিবিদু কেন ? শ্রাবণের ধারার গায় অদ্য আমি তোমার উপর আমার বাক্যপরম্পরা বর্ষণ করিতে প্রস্তুত আছি ।

লীলা । না । আজগে আমার সাধ, তোমার গান শুনিব । এই বিজ্ঞান উদ্যান ভবনে, এই মৃদুমন্দসমীরণচূষিত জ্যোৎস্না রাত্রিতে—তোমার সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিব । আমি হার্মোনিয়ম বাজাই—তুমি গান কর । আমি গান করিতে বলিলে, অনেক সময় তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দাও ; কখন বল সময় নাই, কখন বল “তুমি পড় আমি শুনি” ।

প্রবোধ । তোমার পাঠই আমার নিকট গান । তুমি যখন আমার প্রিয় পুস্তকগুলি পড়, তখন তোমার মধুর স্বর, বিস্তৃত উচ্চারণ, আমার হৃদয়ে বেন সঙ্গীতের ঢেউ তুলিয়া দেয় ।

লীলা । (একটু লজ্জিত হইয়া) তুমি আমাকে অত প্রশংসা করিও না, আমার অহঙ্কার হইতে পারে । তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, তাই একটু শিখেছি ।—বল, তুমি কি গান করিবে না ?

প্রবোধ । (হাসিয়া) গান করিব না কেন ? তুমি হার্মোনিয়ম বাজাও কোন গানটা করিব ?

লীলা । “তোমারে লইয়া, সর্বস্ব ছাড়িয়া, পর্ণকুটীরে ভাল” এই কথা বলিয়া সুন্দরী তাঁহার সুন্দর হামোনিয়মটির নিকট বসিলেন—বাজাইতে আরম্ভ করিলেন । সেই বাদ্যের তালে তালে প্রবোধবাবুর মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল ।

প্রবোধ বাবু গান করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই কলকণ্ঠের সুস্বর উচ্চ হইতেও উচ্চে উঠিতে লাগিল—সেই মূর্ছনাপ্রকম্পিত স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ হইল, কানন পূর্ণ হইল, ক্রমে তাহা যেন তারকাখচিত নীলাশ্বরে উঠিয়া সুধাধারা বর্ষণ করিয়া জগৎকে সুধাপ্লাবিত করিল । রমণীর দুই হস্তের কনক চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলি হামোনিয়মের পরদার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল । হামোনিয়মের সুর কণ্ঠধ্বনির সহিত মিশিয়া কখন বা তীক্ষ্ণ গধুর ভাবে হৃদয়কে আকুল করিতে লাগিল, কখনবা মৃদুগন্তীর জলদনির্ঘোষের স্থায় এক অনির্দিষ্ট সুখ তরঙ্গের সঞ্চার করিতে লাগিল । প্রবোধ বাবু প্রথমে পত্নীর দিকে প্রীতিভরে চাহিয়া গান করিতেছিলেন । ক্রমে তিনি বিভূপ্রেমে বিভোর হইলেন । চক্ষু মুদ্রিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চঃস্বরে বিভূ গুণ গান করিতে লাগিলেন । তাঁহার দেহ অঙ্গ ছলিতে লাগিল । তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল । লীলার দেহ ভক্তিপুলকে শিহরিয়া উঠিল । লীলার হস্ত যেন অবসন্ন হইল, বাজনা থামিল, কেবল দুইটা পদ্ম টিপিয়া থাকিলেন । তাহাতে কেবল সুর দেওয়া যাইতে লাগিল । লীলাও নিম্নলিত-নেত্রা দরবিগলিত অশ্রু । দুই জনেই পরমেশপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন, গান শেষ হইল । দুই জনে চক্ষু খুলিলেন ।

লীলা । আমরা স্বর্গে গিয়াছিলাম, স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিলাম । যেন দেবকন্যাগণ দলে দলে আসিয়া অন্তরীক্ষে থাকিয়া তোমার গান শুনিতেছিলেন । তুমি যখন গান কর, আমি চোখ বুজিলে, দেবকন্যাগণ দেখিতে পাই । এটা কি কল্পনা ?

প্রবোধ । কল্পনা না হইলেও হইতে পারে । খ্রিস্টসফিষ্টরা বলেন, পবিত্র চিন্তা করিলে, ঐ ভক্তিভরে ভজন গান গাহিলে দেবতারা আকৃষ্ট হন, এবং অলক্ষ্যে আমাদের পার্শ্বে বিচরণ করেন । বড় গরম ।

লীলা । ঐ নীচে বেহারাকে ছোরে পাখা টানিতে বল । (ঐ নীচে গেল) ।

প্রবোধ । চল, ছাদের উপর বাই ।

ছাদের উপর দুই খানা আরাম চৌকী ছিল । তাহাতে দুইজনে বসিলেন ।

দুই জনে নীরব । হৃদয় ভানে পূর্ণ । আকাশে মনোহর শশধর হাসিতেছে । সব নিস্তব্ধ । কেবল মাত্র সরোবর তটে ঝাউ গাছের শ্রেণী তুলিয়া ছলিয়া সোঁ সোঁ করিতেছে । আর কেবল মাত্র দূরে, আকাশ প্রান্তে, চন্দ্রিকার আনন্দোৎসবে মাতিয়া পাপিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে ।

দুই জনেই নীরব । দুই জনেরই চক্ষু নির্মেষ অনন্ত নীল আকাশের দিকে । দুইজনেই যেন অনন্ত ব্রহ্মের চিন্তার মগ্ন । কতক্ষণ পবে লীলা বলিলেন, “এত সুখের মধ্যে আবার দুঃখ কেন ? মঙ্গলময় বিবাতা ইচ্ছা করিলেও সবই সুখময় করিতে পারিতেন । তবে তিনি সংসারে এত দুঃখ দিলেন কেন ? তুমি আমি এত সুখে । আমাদের সহরে একটা বাড়ী, গ্রামে একটা বাড়ী । জমিদারীতে বেখানে কাছারী আছে সেখানেই আমাদের একটা একটা বাড়ী আছে । আর কত জনের একটাও বাড়ী নাই । তাহারা ভাল পাতা দিয়া দোচালা ছাইয়া কোন প্রকারে বাস করে । বর্ষায় তাহার মধ্যে জলে ভেজ, শীতকালে শীতে কাঁপে । তোমার আমার খাওয়ার অভাব নাই । ননী, ক্ষীর, মাখন, ছানা, মাছ, মাংস, সন্দেশ বা ইচ্ছা, বে পরিমাণে ইচ্ছা, তাহাই খাইতে পাই । পাতে কত নষ্ট হয় । আর কত লোক এক মুঠা মোটা ভাতও ছবেলা পায় না । তোমার আমার বেশ প্রস্থ কাপড় আছে, আর কত হুঁতাপ্য ব্যক্তির একখানি ছেঁড়া কাপড়ও শীতের সময় জুটে না । আর বৈশাখের রোদ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া, গরান কুয়াণেরা সমুদায় শত্রু উৎপাদন করে, অথচ তাহারা ছবেলা সবাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না । আর তোমরা জমিদার তাদের কত সম্বরই কত লাঞ্ছনাই কর ।

প্রবোধ । হাঁ, লীলা, আমরা অতি অপদার্থ, অতি স্বার্থপর । তা না হইলেকি প্রজারা এত কষ্ট পাইত ?

লীলা । জমিদাররা সকলে যদি তোমার মত হইত, তাহা হইলে প্রজাদের আর কষ্ট থাকিত না । অন্ত জমিদারদের কথা বলিতেছি ।

প্রবোধ । না, লীলা । আমি যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে দেশের লোকের যখন এত কষ্ট, তখন কি আমি এত সুখে থাকিতে পারিতাম ? আমি যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুক্ত হইতাম । যে সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই, তাহা আমি ভাগ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া আমরা দুইজনে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইতাম । কিন্তু ভিক্ষা

করিয়া খাইতাম না । উভয়ে নিজে পরিশ্রম করিয়া যেমন গরীব লোকেরা খাটিয়া খায়, তেমনি খাটিয়া খাইতাম ।

লীলা । পিতৃধনে তোমার অধিকার নাই, তাহার অর্থ কি ?

প্রবোধ । লীলা, তোমাকে কত বার বলিয়াছি, এ সংসারে যে যাহা শ্রম দ্বারা স্বেচ্ছায় অর্জন করে তাহাতেই তাহার অধিকার আছে ।

লীলা । সে যা হোক, প্রাণেশ তুমি সন্ন্যাসী হইবার কথা বলিলে, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠে । বুঝি তুমি আমাকেও ছাড়িয়া যাইবে ।

প্রবোধ । জীবন থাকিতে তোমাকে ছাড়িব ? এ আশঙ্কা করিও না । যে পথেই যাই, তুমি আমার সঙ্গিনী, সহায়, প্রীতিদায়িনী । সন্ন্যাসী হইব না, ভয় নাই । তুমি আর আমি গৃহে থাকিয়াই সমাজের সেবা করিব, আমাদের নায়েব লাহিড়ী মহাশয় পত্র লিখিয়াছেন যে মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী তাহার বাসাতে আশ্রয় লইয়াছে, মহেশের ভগিনী মায়ী পিতৃশোকে জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা নিরুদ্দেশ হইয়াছে ।

লীলা । মায়ার বয়স ?

প্রবোধ । আট বৎসরের কম নহে দশের অধিক নহে ।

লীলা । পিতৃশোকে জলে ঝাঁপ দিয়েছে ?

প্রবোধ । হাঁ । লোকে বলে সে মানুষ নয়, বুঝি বা দে দেবতা ।

লীলা । কৃষকের ঘরে দেবীর আবির্ভাব ?

প্রবোধ । হবে না কেন ? ধনী যখন মৃত ও পাষাণ হয়, তখন মহামায়ী দরিদ্রের ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন ।

লীলা । মেয়েটি বড়ই দেখতে ইচ্ছা হয় । ভগবান তাহার জীবন রক্ষা করুন । আজগে স্বামী বল্ছিলেন, স্বামীর দাদা চিঠি লিখেছে যে নরেশ বাবুর জমিদারীতে তারি দাদা হাক্কামা হচ্ছে । প্রজারা অনাভাবে নাকি ক্ষেপে উঠেছে । জমিদার বাবু প্রজা শাসন করবার জন্য নায়েবকে যা খুশী তাই করবার হুকুম দিয়াছেন । নায়েব ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ করিতেছে । প্রজার বাড়ী লুণ্ঠ, ঘর জালিয়া দেওয়া, বউ খিকে অপমান করা, প্রজাকে কয়েদ করিয়া তাহার হাত বাধিয়া তাহার গলা হাড়িকাঠের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখা—এই রকম অত্যাচার করছে—ওন্নে গাঁ কাটা দিয়ে উঠে ।

প্রবোধবাবু । আমাদের নায়েবের কাছে আমিও ঐ রকম পত্র পেয়েছি । যাতে এই সব গোলমাল থামিয়া যাব তজ্জন্য আমি নরেশ বাবুকে অনেক বুঝাইতেছি ।

লীলা । তিনি বলেন কি ?

প্রবোধ । আমলারা তাঁকে যা বোঝায় তাই শুনে। বিশেষত তার কাঁচারি বাড়ী পুড়িয়ে দিয়াছে, তাঁহার নায়েবের গলার দড়ি দিয়া রাস্তায় রাস্তায় প্রজারা ফিরাইয়াছে, তাহাতে তিনি রাগিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন । কলিকাতা হইতে সেপাই লইয়া গিয়াছেন, অজস্র লাঠিয়াল পাঠাইতেছেন আর নায়েবকে কেবল হুকুম দিতেছেন “যত টাকা লাগে দিব, প্রজা শাসন কর” ।

লীলা । তোমাকে এত ভক্তি করেন তবু কথা শুনিতেছেন না ?

প্রবোধ । সম্প্রতি এ বিষয় বাদানুবাদ হইতে হইতে একটু মনান্তর হইবার উপক্রম হইয়াছিল । তবে তাঁহাকে আর একবার বুঝাইব । আর কল্যাণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব । যদি প্রজাদিগের উপকার করিতে পারি ।

এমন সময় স্বী আসিয়া বলিল—“মা ঠাকুরণ বাহিরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন” ।

গৌরঙ্গ ।

(সমালোচনা)

শ্রীবৃদ্ধ প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী প্রণীত । মূল্য ১।০ দেড় টাকা । রয়েল সাইজ । ১৯২ পৃষ্ঠা । কাগজ বিলাতি রুম্ম পেপার । মলাট কবি প্রণীত “গান” পুস্তকের অনুরূপ । আমরা গ্রন্থ খানি বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করিব ।

গৌরঙ্গ খানি কাব্য গ্রন্থ । সার এডুইন্ অর্গন্ডের Asia or Light of the World এবং কবির শ্রীনবীন চন্দ্র সেনের ‘অমিতাভ’ যে প্রকারের গ্রন্থ, ‘গৌরঙ্গ’ খানি সেই ধরণের কাব্য—অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের জীবন-কাব্য ।

বৈষ্ণবেরা গৌরঙ্গকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন । আমাদের কবি বে তাহা মানেন না তাহা তিনি ভূমিকাতেই স্বীকার করিয়াছেন । কাব্য কাব্য ; কাব্য জীবন চরিত নহে । চৈতন্য দেবের জীবন বৃত্তান্ত যাহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ পড়িবেন, এবং সে পুস্তকে যতটুকু বিশ্বাস করিতে পারেন, বিশ্বাস করিবেন । কাব্য ইতিহাস বা জীবন চরিত নহে । হৃৎকের বিষয়, ইতিহাসিক ও সমালোচক, শ্রীবৃদ্ধ অক্ষয় চন্দ্র মৈত্রেয় এই ভ্রমে পতিত

হঠাৎ কবির নবীন চন্দ্র সেনের সর্বশ্রেষ্ঠ কান্য পলাশী বুদ্ধকে অবস্থা আক্রমণ করিয়াছেন । আমাদের দেশে সমালোচকদের হস্তে পড়িয়া বেচারি কবি গণ ‘তাহি তাহি’ ডাক ছাড়িতেছেন ।

বলিয়াছি আমাদের সমালোচ্য ‘গৌরাঙ্গ’ জীবন চরিত্র নহে—উহা কাব্য । কাব্য ইতিহাস অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন । কবির নিছের ভাষায়—“আদর্শের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসাধন, এবং সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় জনা, মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া, স্বীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর বেশে উপস্থিত করিতে, নিরঙ্কুশ কল্পনার রাজ্য পথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন-বিচরণের অধিকার কাব্য বা কাব্যকারের আছে । কিন্তু কবিকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে প্রৌক্ত মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিতে গিয়া দেবতা গড়িতোগিরা বানর গড়িলে তাঁহার মার্জ্জনা নাই । আমরা দেখি কবি গৌরাঙ্গের চরিত্রাঙ্কনে কত দূর কৃত কার্য্য হইয়াছেন ।

গ্রন্থে প্রথমে চৈতন্যের জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে । কবি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ শুভলগ্ন জানিয়া একদা মিশ্রের ভবনে জন্ম গ্রহণ করিলেন । অতএব তাঁহার জন্ম স্বেচ্ছাকৃত । সামান্য নরের তাহা সম্ভবে না । তাহা একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে । অথচ কবির জ্ঞানে চৈতন্যচন্দ্র শুদ্ধ অসামান্য মানুষী মহিমায় সমুজ্জ্বল । তবে যদি ইহা অনঙ্গর মাত্র রূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা গস্তীর রচনার সীমা অতিক্রম করিয়া হাস্য প্রধান রচনার রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে । আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থের প্রথমেই একরূপ হাস্যরসের অবতারণা করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না ।

তার পরে শুনিলাম যে শিশু “অদ্ভুত”, কিন্তু কেন যে তিনি অদ্ভুত তাহা কবি কিছু বলেন না । তিনি স্বেচ্ছায় তিথি লগ্ন দেখিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি অদ্ভুত ?

যাহা হউক, শিশু “স্নেহের ফুৎকারে ” বাড়িতে লাগিলেন । [ফুৎকারে যে কেহ বাড়ে তাহা এই নূতন শুনিলাম ।] তাঁহার মাতা তাঁহাকে “লালনের রসে” মিলিত করিতে লাগিলেন । কিরূপে ? যেনন-মালী চারা রোপণ করিয়া সতর্ক আসে, আবেগে, উল্লাসে সংখ্যে চাহিয়া থাকে, [মালীর বস্ত্রের সহিত মায়ের বস্ত্রের তুলনা না দিলেই ছিল ভাল ।] মাতা শিশুর হাসি কান্না ইত্যাদি দেখিয়া তাহার “কাল্পনিক বিজ্ঞতার কত পরিচয় পাইতেন” এবং “এ সব কাহিনী শেষে পড়সী মহলে নানা অগঙ্কার মনে কবিতা রটনা করিতেন ।

সংসারে কাহারো যেন হয়নি সন্তান, তারা যেন হাসে নাই, কাঁদে নাও
কেহ ।” অতি সুন্দর, মাতার মনে এষ্ট রূপট হইয়া থাকে । এ চিত্রটি
এত স্বাভাবিক রূপে চিত্রিত করিয়া কবি যথার্থ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন ।
কিন্তু “কবিতা” ইহা কি “কবিতা”র স্ত্রী লিঙ্গ ? তাহার পরে শিশুর
অনুপ্রাণনে পিতা জগন্নাথ শিশুর নাম রাখিলেন ‘বিশ্বম্ভর’ । শচী
কহিলেন “ওকি সৃষ্টে ছাড়া নাম”, কহিবাই কথা । একজন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী
কাছে দাঁড়াইয়া ছিল । সে “উৎসাহে কহিল ওকি ? আগিত বাচার নাম
রাখিলু নিমাই” । প্রতিবেশী ও শচী দেবী স্পষ্টতঃ আধুনিক বঙ্গের কবি জাতীয়
ছিলেন । তবে আধুনিক কবি হইলে বোধ হয় নামটি আরও একটু কোমল
করিয়া লইতেন, যথা “রমণী মোহন” ।

শিশু ক্রমে পঞ্চবর্ষ আসিয়া “অপোগণ্ডে অর্গাং” নিমাইকে তাদের প্রসাদ
দিয়া গেল । আর “অপোগণ্ডের” “অপরূপ ধরা পড়ে গেল” । তাহার পরে
“অপোগণ্ডের” শাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রূপবর্ণনা আছে ।

“শুনিতেন মাতা,

পুত্রের রূপের খাতি লুক্ক কর্ণ পাতি’ । .

—নেত্রে উছলিত ধারা ; অমঙ্গল ত্রাসে

কখন উঠিত কাঁপি মায়ের হৃদয় .”

ইতাবসরে “নিমাইর” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন ।
শুনিয়া হঠাৎ বিলাতের গল্পটি মনে পড়িয়া গেল । একজন কৃষকের পুত্র
কন্তা ছিলনা । কোন ব্যক্তি সে বিষয়ে তাহাকে প্রস্তাব দিল, সে গম্ভীর
ভাবে উত্তর দিল in the family way sir. নিমাই “আদরে আঁকারে” বাড়িতে
লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ মৈশব কালে যে সব কীর্তি করিতেন, নিমাইও ঠিক
তাহাই করিতে লাগিলেন । গিরিধরাবুর নিমাই চরিত্রেও নিমাইর এইরূপই
ক্রিয়া কলাপ বর্ণিত আছে । ক্রমে সে ছষ্টামি সমস্ত নবদ্বীপে ছাড়াইয়া পড়িল ।
genius বোধ হয় ছষ্টামি ভিন্ন সম্ভবে না । বাহা হউক নিমায়ের ছষ্টামিতে
কেহ কিছু বলে না । .

“কি উপায় আছে ?

অগাস্ত চন্দাস্ত শিশু নাহি মানে কাঁরে,

পিতার জকুটি আর মাতার তর্জ্জন,

পুষ্প বৃষ্টি সম গণে ! .

আমরা জানি একরূপ বালকের প্রায়ই কিছুই হয় না । তাহার পর নিমায়ের টোলে ভর্তি । নিমাই- কিন্তু ছুটামি ছাড়ে না এবং তার পাঠেও মন নাই । শেষে “অধ্যাপক শশবাস্ত শিষ্যের আলায়”, একরূপ তুমি আমি শিক্ষক হইলে সহ্য করিতাম না, কিন্তু নিমায়ের অধ্যাপক তাহা সহ্য করিতেন । আর একরূপ ছাত্রও যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে । কিন্তু নিমায়ের এমন ধীশক্তি যে

ভীক্ষ বুদ্ধি সতীর্থেরা

হটিতেছে ক্রমে প্রতিবোগিতার ক্ষেত্রে” ।

পাঠকগণ horse race দেখিয়াছেন ?—তেজী ঘোড়া অনায়াসে আগাইয়া যায়, আর মড়াথেগো ঘোড়া হাজারই চেষ্টা করুক পিছাইয়া পড়িবেই, এও সেইরূপ । গতক দেখিয়া মিশ্রকে অধ্যাপক বলিলেন—

“তনয় তোমার নহে সামান্য মানব” । মিশ্র সেই কথা শচীদেবীর কর্ণগোচর করিলেন । শচী নিহরিয়া উঠিলেন এবং স্বপ্নয়ন অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন । তুমি আমি হইলে পুত্রের একরূপ অমানুষী প্রতিভা দেখিয়া স্তম্ভী হইতাম । কিন্তু শচীদেবী অন্য ধাতুর মানুষ ছিলেন । তাহার পরে, বালক নিমায়ের আরো পরিচয় পাই যে তিনি—

“যে পথে রমণী হাঁটে, জানিত কিশোর,

তার চতুঃসীমানায় যাইত না কভু”

বিবাহের পূর্বে একরূপ অভিজ্ঞতা বিরল । তদুপরি নিমাই আবার কবি । কারণ—

“বহু ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা”

হায় সর্কচিকিৎসার অতীত ! ক্রমে নিমায়ের উপনয়ন ।

“পুত্রের উপনয়ন কর্ণবেধ কাজে

মিশ্র করিল কিছু ঘটায় ব্যবস্থা” !

—ইহা গদ্য কি পদ্য বোঝা গেলনা ।

“তারি নির্বাহের তরে অতিরিক্ত শ্রমে

গৃহকর্তা পড়িলেন ভয়ঙ্কর জ্বরে” ।

তাহাতেই মিশ্রের মৃত্যু । মরিবার পূর্বে তিনি

“প্রাণপণে, অস্তিম উৎসাহে উচ্চারিল

সঁপিলাম বৎস, তোরে হরির চরণে !”

ক্রমে গৌরাস্তের

“চিন্তা আসি বাসা নিল উদাস হৃদয়ে ।”

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“কোথা পরলোক ?

সেকি ওই নীলাঙ্গের শতস্তুর বলে ?

ভাৰ্ভদ্য এ লোক হতে ওই আচ্ছাদন ;

ও লোকের লোক চক্ষে স্বচ্ছ বুদ্ধি ইহা

তিনিও হয়ত ভবে দেখেছেন চেয়ে,

পুত্র তার আছে চেয়ে তারি ধ্যানে এবে ?

অথবা মর্ত্যের এই সুখ-দুঃখ-ঘটা

এতই সামান্য, লঘু স্বর্গের নিকটে,

নাই স্পর্শে প্রেতাশ্বারে ; কিহা তিনি ছাড়া

কেহ নহে অধিকারী ?”

—সুন্দর । কিন্তু “অধিকারী” অর্থ বুঝিলাম না । ক্রমে তাহার বিশ্বাস হইল

“বিশ্ব সৃষ্টি নহে কোন আকস্মিক ঘটনা,

মঙ্গল আরম্ভ তার সত্যে পরিণতি ।”

ঘটা অর্থ এখানে বুঝিতে হইবে ঘটনা । পরে

অচিরে হারা’ল

বিতণ্ডার কুণ্ডলীতে গাঢ় অব্যয়নে

রসের তৃষায় আর যশের নেশায়,

সে চিন্তা-বুদ্ধি ! কিশোরী যেমন ভোলে

প্রথম প্রেমের স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে !”

এ উপমাটি না দিলেই ভাল হইত । নিমাই সম্বন্ধে পরে গুটি কতক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথম প্রেতাড়িত কুকুরকে কোলে করা, দ্বিতীয় যবনকে আশ্বিন করা—উত্তম ।

—তাহার পরে যৌবনে গৌরাঙ্গের পণ্ডিত কেশবের সহিত তর্ক, এবং সহা-ধারী রবুনাথের জন্য স্বরচিত ন্যায় ভাষা খণ্ড খণ্ড করিয়া গঙ্গাজলে বিসর্জন । ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি কার্য্য মিষ্ট হইলেও বালসুলভ চপলতা জনিত হইতেও পারে, কিন্তু শেষোক্ত দুইটি কার্য্য অমানুষী ! সে দুইটি কার্য্যের গৌরাঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা করিতেছে । তাহা সহসা পাঠকের মনে একটি একটি প্রকাণ্ড ঢেউ তুলিয়া দিয়া গেল । বলিয়া গেল ঝড় আসিতেছে । কেশবের সহিত তর্কে জয়ের পরে, গৌরাঙ্গ যাহা কহিলেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ।

নিমাই কহিল শীঘ্র,—মিথ্যা মিথ্যা সব ।
 এই বক্র, সৃষ্টি হ্রস্ব তর্ক বুদ্ধি জ্ঞান,
 ভাষার এ ইন্দ্রজাল, ভাষার কোণল ;
 বিদ্যার কৈতব ক্রীড়া কুটিলে কপটে !—
 লাগিছে কিসের কাজে ? ব্যর্থ বৃদ্ধ জ্ঞান
 ছুটিছে কি কোন বৃহৎ সন্ধান তরে ?
 কর্মশূন্য ধর্ম ভাণ,—এদিকে আবার
 কর্ম-অনুষ্ঠান ছলে, অন্তঃসারহীন
 ক্রিয়াকাণ্ডে শোচনীয় বর্ষের দুর্গতি,
 —এই শুষ্ক জ্ঞান হ'তে ! শুধু দস্ত ল'য়ে
 লক্ষ্যহারা বিতণ্ডার অসার চীৎকার,
 পেচকের মত এই গাস্তীর্যের ঘটা,—
 বিশ্বেরে কি উদ্ধাপনে পারে টানিবারে ?
 কুট মস্তিষ্কের পাকে পড়েনা জড়ারে
 উর্ণনাভসম, জানে ? - স্তাবকের মুখে
 দিনক'র থাকে জাগি, জরগান তার ;
 অনন্ত তিমিরগর্ভে তার অবসান ।
 চেয়ে দেখ একবার ওই উদ্ধাপনে,
 কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোকলোকান্তরে
 কি শাস্ত্র সুন্দর সত্য হতেছে রচিত !
 —তারি নাম, শুদ্ধাভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
 মোহহং,—বে দৃষ্ট উক্তি, বে মন্ত খেয়াল,
 কুটিরাছে সেবকের মুখে,—তারো মূলে
 এই বন্ধা কিদ্যা । আমরা কূপের কীট,
 অমৃত-সাগরে যদি চাহি নস্তরিতে,
 বিশ্বাসে বাধিয়া প্রাণ, নিঃশ্বাস রুধিয়া,
 বিশ্বয়ে, বিনয়ে, ভয়ে যেতে হবে তবে
 সংসার সীমানা ছাড়ি অনন্তের দেশে ।
 তাহা শুনিয়া কেশব বিশ্বল বিমুগ্ধ হইয়া কহিলেন—
 নরোত্তম,

হেন প্রাণমিথুকরী অলৌকিক বাণী
 শুনি নাই । কেহ, হেন সাহসে বিশ্বাসে,
 অভয় আশায় ক্ষীত অমোঘ-আশ্বাস
 সহজ সরল করি, করে নি ঘোষণা ।”

তাহার পরে গৌরাক্ষের অধ্যাপনে ক্রমে উদাসীন্ধ্য ও অধ্যাপনা কার্য
 পরিত্যাগ, এবং তৎপরে তাঁহার প্রধান স্ত্রী বিরোগ । একদিন এক তর্কের
 মধ্যস্থরূপে নিমাই পণ্ডিত বসিয়া আছেন, তর্ক চলিতেছে । কিন্তু নিমায়ের—

“মন সেথা নাই ; সংসারের কোথা নাই !

বুরিছে তা মেঘে মেঘে গগনে পবনে
 বড়ই সুন্দর—

এইখানে প্রথম সর্গ শেষ হইল ।

(ক্রমঃ)

ত্রীসমালোচক ।

পঞ্চায়ৎ ।

মনু সংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যায় :—

রাজা প্রত্যেক গ্রামের একজনকে অধিপতি করিবেন, দশ গ্রামের অধিপতি একজনকে করি-
 বেন, বিংশতি গ্রামের অধিপতি ও শত গ্রামের অধিপতি ও সহস্র গ্রামের অধিপতি করিবেন ।
 গ্রামে কোন চৌধাদি দোষ ঘটিলে, গ্রামাধিপতি তাহার প্রতিকার করিবেন, যদি তিনি অক্ষম
 হন, দশ গ্রামের অধিপতিকে উক্ত ব্যাপার অবগত করাইবেন । দশ গ্রামাধিপতি যদি অসমর্থ হন,
 বিংশতি গ্রামাধিপতিকে কহিবেন, এইরূপ উপর উপর জানাইবেন, ইহা হইলে রাজা, উপদ্রব
 হইবে না” (৭২ অ। ১১৫, ১১৬, ১১৭ শ্লোক ।)

“রাজা চারি দণ্ড পর দুইপ্রহর পবাস্ত বিচার দর্শন করিবেন, (৭ অ। ১৪৫ শ্লোক) যখন
 শ্রম বিচার কার্যে অসমর্থ হইবেন তখন তিনি একজন অমাত্য শ্রেষ্ঠকে যিনি সৎকুল জাত ব্রাহ্মণ
 বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ও ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহাকে ধর্মাদিকরণের অধী প্রত্যক্ষ কার্য দর্শনের নিমিত্ত
 আসনে নিযুক্ত করিবেন ।

প্রাড় বিবাক ও অক্ষদর্শক শব্দে ঋণ দায়াদি ব্যবহারের (নালিশের)
 দর্শক বুঝায় বর্তমান সময়ে যেমন মুন্সিফ ।

অধী ও প্রত্যাধী ও সাক্ষীগণ সত্য বলিতেছে বা মিথ্যা বলিতেছে তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা
 মনু ও রাজবল্য বিচারকে উপদেশ দিয়াছেন যথা, মনু—

গঙ্গাদি স্বর ও মুখর কৃষ্ণ ও পাণ্ডুর বর্ণ বাহ্যিক নহে ও অধোনিরীক্ষণ ও ঘর্ষণ কলেবর এবং রোমাকাদি বাহ্য চিহ্নস্বর্য অর্থাৎ প্রতাপের অন্তর্গত ভাব নিশ্চয় করিবেন, (৮ অ ২৫, ২৬ শ্লোক । মহাভারতে শান্তিপর্বে দণ্ড অর্থাৎ বিচার পূর্বক বিধি ব্যবস্থানুত্ত শাসন করা রাজধর্ম ইহাও লিখিত আছে ।

ইহাতে আমরা বুঝি যে প্রাচীনকালে ফৌজদারী এবং দেওয়ানি মোকদ্দমায় অন্ততঃ কতক বিচার রাজা স্বয়ং করিতেন । এবং কতকটা বর্তমান সময়ের মত রাজ-নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে বিচার ও শাসন বিষয়ে আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায় ।

গ্রামের প্রকৃতিপুঞ্জ শাসনকার্য পরিচালনার্থে পঞ্চ বক্তিকে নিযুক্ত করিতেন । এই পঞ্চায়তের প্রত্যেকে গ্রামের প্রজামণ্ডল দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন । ইহারা সাধারণত গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিতেন । কোথাও বা প্রয়োজন মতে দণ্ড দিতেন । পঞ্চায়তের উদ্ভব হেতু অনুমান করা কঠিন নহে । রাজা স্বয়ং মন্ত্রীগণ লইয়া বিচার করিতেন । এই মন্ত্রীগণ সমুদয় রাজ্যের প্রজাদিগের প্রতিনিধি । (মহাভারত) অ ৮৫ শ্লো ৬—১২) মন্ত্রীগণ যেমন সমুদয় রাজ্যের প্রজাকুলের প্রতিনিধি, পঞ্চায়ত তেমন একটি গ্রামের প্রজাদিগের প্রতিনিধি । গ্রামাধিপতি রাজার প্রতিনিধি । পঞ্চায়ত প্রজার প্রতিনিধি । পঞ্চায়ত গ্রামবাসী । গ্রামাধিপতিও গ্রামবাসী, সুতরাং পঞ্চায়ত বাহাদিগের প্রতিনিধি গ্রামাধিপতি তাহাদিগের মধ্যে একজন । রাজা দূরে, গ্রামবাসীগণ নিকট । গ্রামবাসীগণের বাহ্য স্বার্থ, গ্রামবাসী গ্রামাধিপতির তাহাই স্বার্থ । সুতরাং গ্রামাধিপতি গ্রামের সমাজের অধীন ; সেই নিমিত্ত গ্রামাধিপতি গ্রামের পঞ্চায়তের মধ্যে ক্রমে বিলীন হইয়াছিলেন বোধ হয় ।

গ্রামের বিচার ও শাসন ভার পঞ্চায়ত বা মণ্ডলগণের উপর অর্পিত হইয়াছিল । এই মণ্ডলগণ বাহাতে গ্রামের রাস্তা ঘাটের সুব্যবস্থা হয়, বাহাতে জনাভাব না থাকে তাহারও বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেন, যখন শাসনের ভার তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন । যদি কেহ নীতিবিগর্হিত উৎকট কার্য করিত, তাহা হইলে পঞ্চায়তগণের বিধানানুসারে সে জাতিচ্যুত হইতে । দোষী ব্যক্তির সহিত কেহ একত্রে আহার করিত না, রজক ও ক্ষৌরকার নিষিদ্ধ হইত । সমাজে তাহার সহিত আদান প্রদান বন্ধ হইত । এইরূপ নানা উপায়

অবলম্বন করিয়া পঞ্চায়তগণ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতেন। পঞ্চায়ত গণের শাসনে বিশেষ কলোদয় হইত। অথচ অর্থী ও প্রত্যাখী উভয়েরই আদালতের খরচা কিছুই লাগিত না। উপরে বলা হইয়াছে যে পঞ্চায়তগণ প্রায়ই গ্রামের, স্থতরাং কে কি চরিত্রের, কি অবস্থার লোক, বা কি উপায়ে তাহারা জীবিকা নির্বাহ করে সকলই ভালরূপ জানিতেন। এই জন্য তিনি তাহার গুরুতর ভার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন। তাহারা এখনকার বিচারক দিগের স্থায় কোমিসি বা উকিলের কূটতর্কে এবং তাড়নায়, সাগরে বায়ুঘূর্ণিত নৌবৎ, দিশিহারা হইয়া, নির্দোষীকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেন না। অথবা রামের ধন শ্রামকে দিবার আদেশপত্র লিখিতেন না। মাফী বেচারী গ্রামবাসী পঞ্চায়তগণের নিকটে অসঙ্কোচে সত্য কথা বলিতে পারিত। আর পঞ্চায়তগণও পক্ষীস্থ সভাবাদী সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে বিচার্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

পঞ্চায়তের শাসন ও বিচার প্রণালী সর্বদা সুন্দর বলিতেছি না। কিন্তু ইহার দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ বেশী ছিল। আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চায়ত কর্তৃক যে দণ্ডবিধান হইত তাহাতে দোষীর দমন হইত অথচ তাহার সর্বনাশ হইত না। বর্তমান বিচার প্রণালীতে একজন আত্মজীবন সচ্চরিত্র, কিন্তু কোন সময় সহসা সাময়িক উত্তেজনার কেন আকস্মিক ঘটনা বশতঃ কোন গর্হিত কার্য করিয়া ফেলিল। বিচারক তাহার চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং কিছুই অবগত নহেন। তিনি তাহাকে হয়ত ৫।৭ বৎসরের নিমিত্ত কারাগারের কঠিন ক্লেশ ভোগ করিবার আদেশ দিলেন। মণ্ডনের বিচারে তাহা সম্ভব হইত না। অপরাধী সামাজিক শাসনে পাপ হইতে ক্রমে নিবৃত্ত হইত। কারাগারে অভ্যস্ত পাপীদিগের সংসর্গে তাহার পাপপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত হইত না।

দণ্ডের উদ্দেশ্য দুইটি হওয়া উচিত। একটি, নিবারক (preventive), অপরটি সংস্কারক (curative)। দণ্ডের ভয়ে অপরাধী পুনর্বার, এবং অন্তলোকে, অপরাধ করিবেন না ইহা দণ্ডের একটি উদ্দেশ্য। দণ্ড বিধানে দণ্ডিত ব্যক্তি এমন শিক্ষা পাইবে, তাহার নীতির এমন সংস্কার হইবে যে অপরাধীর মন আর মন্দ কার্যের দিকে যাইবে না—ইহারও প্রতি দণ্ডবিধান সময় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পঞ্চায়ত-বিচারে এই দুই উদ্দেশ্যই বিনা আড়ম্বরে সুসাধিত

হইত । পঞ্চায়তের বিচারে দয়া আপনি যেন আসিয়া দণ্ডের সহিত মিশিয়া বাইত । তাহার যথেষ্ট কারণও আছে ।

মণ্ডলগণ অপরাধীর গ্রামবাসী । অপরাধীর সহিত এক স্থানে আশ্রয় বাস করিয়াছেন, হয়ত বালাকালে একত্র খেলা করিয়াছেন, পাঠশালে একত্র পাঠ করিয়াছেন, ভোজে একত্র অহার করিয়াছেন এবং নানা বিষয়েই একভাবে এক সঙ্গে সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছেন । আবার মণ্ডলগণের স্ত্রী ও কন্যাগণ, স্নানের ঘাটের দৈনিক সম্মিলনীতে হয়ত কতদিন অপরাধীর স্ত্রী বা কন্যার সহিত সখীর স্তায় আলাপ করিয়াছেন । আজ সখীর স্বামী বা পিতা বিপন্ন, দণ্ডিত । সখীর বিপদে, বিলাপে, মণ্ডলের স্ত্রী কন্যাও দুঃখিত, স্মরণে মণ্ডলের নিকট অপরাধীর প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য কান্নার আবেদন আসিত । তজ্জন্ত দণ্ড ও দয়া হরগৌরীর স্তায় একাক্ষ হইয়া বিরাজ করিত ।

পঞ্চায়ত যে কেবল বিচার ও শাসন করিতেন তাহা নহে । অনেক স্থলে বিবাদের সূত্রপাত হইবামাত্র উভয় পক্ষকে নানাবিধ সহপদেশ দ্বারা বিবাদ হইতে ক্ষান্ত করিতেন, অসন্তোষের স্থানে সন্তোষ আনয়ন করিতেন । প্রত্যুত পঞ্চায়ত একাধারে—মধ্যস্থ, জুরি, বিচারক ।

গভর্ণমেন্ট ক্রমে আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন দিতেছেন । অবৈতনিক ম্যাজি-স্ট্রেটও নিযুক্ত করিতেছেন । আমরা যদি উপযুক্ত হই, এবং গভর্ণমেন্ট যদি পঞ্চায়তের উপকারিতা স্বার্থগ্ৰহী উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট পুরাকালের পঞ্চায়ত আবার স্থাপিত করিতে পারেন । এ বিষয় আমাদিগেরও অনেকটা স্বাবীনতা আছে । আমরা সুবোধ হইলে, গ্রামের পাঁচ জন গণ্য মান্য স্তায়পরায়ণ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া, অন্ততঃ ক্ষুদ্র বিবাদ গুলি তাহাদিগের সালীসী দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে পারি । কিন্তু পতঙ্গ যেমন আলো দেখিয়া তাহাতে পড়িয়া নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হয়, আমরাও তেমনি আদালতের আলোক দেখিয়া তাহাতে নিজে নিপতিত হইয়া আপনারাই আপনাদিগের ধ্বংসের কারণ হই,—আর শেষে— আপনাদিগের মূঢ়তার বিষময় ফলের জন্য, হয় বিধাতাকে না হয় গভর্ণমেন্টকে দোষী বিবেচনা করিয়া আবার আর একটি ভ্রমে পতিত হই ।

শ্রীদেবেন্দ্র লাল রায় ।

বিধবা বিবাহ ।

[নবপ্রভার বিগত ঔষষ্ঠ সংখ্যার শ্রীবুদ্ধ উমেশচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় বাল বিধবার একাদশাপবাসে ফলমূল ভক্ষণ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রিজ্ঞাসা করিয়াছেন । ভক্ষণ সম্বন্ধে আমার মত ত আছেই ; অধিকন্তু আমি বালবিধবার পুনর্বিবাহেরও সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাহার উপলক্ষি হইতে পারিবেক । পরন্তু যে সকল বিধবা ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইবেন, একাদশীতে নিরম্ব উপবাস তাহাদের কর্তব্য হইলেও যে স্থানে স্বাস্থ্য ও জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িবে সেইস্থানে ফলমূলাদি সেদন শাস্ত্রসম্মত, এবং ব্যবহারবিরুদ্ধও নহে ।]

যে ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বহুবৎসর বাবৎ পণ্ডশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের পদার্পণ সর্ব্বথা নিষ্ফল ইহা আমি অনবগত নহি । কিন্তু যেমন “বিষ্ণায় নমঃ” প্রভৃতি বাক্যে বক্তার মূৰ্ত্ততার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভক্তিও প্রকটিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখকের ততদূর হইলেই আশামুরূপ ফললাভ হইবেক । তদুর্দ্ধে যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাজে একটি মাত্র হৃদয়ও বিচলিত হয়, তাহা হইলে প্রবন্ধলেখকের আনন্দের সীমা থাকিবেনা ।

বিধবা বিবাহ লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে ঘোরতর বাক্বুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে । যে সকল পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের পক্ষে, তাহাদের প্রধান অস্ত্র হইল পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি বচন, যথা—

নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে পতৌ ।

পঞ্চস্বাপংসু নারীগাম্ পতিরন্তো বিধীয়তে ॥

স্বামী নিরুদ্ধেণ হইলে, মরিলে, সম্ভ্রাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ক্রীব কিংবা পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ শাস্ত্র সম্মত ।

যাহারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষে, তাহারা প্রারম্ভেই পরাশর বচনোক্ত ‘পতি’ শব্দের অর্থ করিলেন ‘উপপতি’ । কেহ কেহ আবার বলিলেন পতিরন্তো বিধীয়তে এই বাক্যের সন্ধি বিশ্লেষ করিলে পতিরন্তঃ+অবিধীয়তে এই প্রকারও হয় । তখন লুপ্ত অকার লইয়া মারামারি বাধিল । পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়ি হইতে লাগিল । এবং যখন শাস্ত্রে আর বেড় পাইল না, তখন উভয় পক্ষের

ব্যক্তিগত কুংসা কীর্তন হইয়া বঙ্গের মুখ কিছু দিনের জন্য উজ্জল হইয়া
রহিল । ফলতঃ যখন.

কৃত্যে তু মানবো ধর্ম্য স্ত্রেতায়াং গোতমঃ স্মৃতঃ ।

দ্বাপরে শত্ৰুখিলিখিতো কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥

এই বচন সর্ববাদি সম্মত, তখন পরাশরোক্ত ‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে’ ইত্যাদি
বচন যে বৈধব্য প্রথার মরণোত্তর তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না,
তথাপি বিপক্ষগণ চির প্রচলিত রীতি অনুসারে শাস্ত্র হইতে কতিপয় আপত্তি
উত্থাপিত করিলেন ।

১ম আপত্তি ।

পরাশর সংহিতা হইতে ।

জারেণ জনয়েৎ গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ ।

তাং তাজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্ ॥

পতি অনুদ্ভিষ্ট, প্রব্রজিত, কিংবা মৃত হইলে যে স্ত্রী জারের দ্বারা গর্ভ উৎপাদন
করে, সেই পাপকারিণী পতিতাকে অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আসা কর্তব্য ।

২য় আপত্তি ।

মনুসংহিতা হইতে—

• নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে কচিৎ ।

ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ ॥

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্মের কথা নাই ; বিবাহ বিধিতে বিধবার
পুনর্বিবাহও উক্ত হয় নাই ।

৩য় আপত্তি ।

বেদ হইতে—

একস্ত বহুব্যা জায়া ভবন্তি,

• নৈকস্তা বহব স্ত্রীঃ পতয়ঃ ।

এক পুরুষের বহুজায়া হয়, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি হইতে পারে না ।

৪র্থ আপত্তি ।

মনুসংহিতা হইতে—

মৃতে ভর্ত্তরি সাক্ষী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যো ব্যবস্থিতা ।

স্বর্গঃ গচ্ছত্যপুত্রাপি মধাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ •

অপত্যলোভাৎ বা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে ।
সেহ নিন্দাগবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীরতে ॥
নাত্তোৎপন্ন প্রজাস্তীহ ন চাপাশ্চ পরিগ্রহে ।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিস্তুর্ভোপদিশতে ॥

ভর্তা মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, সে অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্ম-
চারিদিগের ছায় স্বর্গে গমন করে ।

অপত্য লোভে যে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করে, সে এই জগতে নিন্দিত,
ও পতিলোক হইতে বিচ্যুত হয় ।

অতঃপর পত্নীতে অশ্রু পুরুষের উৎপাদিত সন্তান অভীষিত নহে, যেহেতু
কোন শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্তা বিহিত হয় নাই ।

৫ম আপত্তি ।

সংজ্ঞাবদ্ব্য হইতে—

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য লক্ষণাং দ্বিষমুদ্বহেৎ ।
অনন্য পূর্ব্বকাং কাস্তাম্ অসপিণ্ডাং যবীষসীম্ ॥

দান কিম্বা উপভোগের দ্বারা যে স্ত্রী পুরুষাস্ত্র্য কর্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই
এ প্রকার বয়স্থা অসপিণ্ডা কাস্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে ।

৬ষ্ঠ আপত্তি ।

পুবাণ হইতে—

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা ।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ক্বীত ভ্রাতৃজায়াং কুমণ্ডলুম্ ॥

বিধবার পুনর্বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃজায়া, কুমণ্ডলু এই সমস্ত কার্য্য
কলিতে করিবে না ।

ইহার মধ্যে প্রথম আপত্তি কিছুই নহে । ‘নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে’ ইত্যাদি
বচনে পরাশর পতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । আর শেষোক্ত শ্লোকে আর
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পরাশরের বাক্যে কোন বিরোধ নাই । তাহার
অভিপ্রায় এই যে পঞ্চাঙ্গগ্রন্থ নারীরা যদি শাস্ত্রানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ
করে তবে তাহারা অবশ্যই সম্পতি প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি
জ্বরের দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দেশান্তরে পরি-
ত্যাগ করা যাইবে ।

২য় আপত্তি সৰ্ব্বথা অমূলক । বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্ৰে নিয়োগের কথা না থাকিলে তাহাতে বিধবা বিবাহ অপ্রতিপন্ন হয় কি সে ? পতি মরিয়া গেলে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ পতি গ্রহণের নাম বিধবা বিবাহ । আর সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে আহ্বান করিয়া একবার মাত্র নিবৃত্ত করাকে নিয়োগ বলে । যখন বিধবা বিবাহ আর নিয়োগ এক পদার্থ হইতেছে না, তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্ৰে নিয়োগের অনুরোধ হইলে, বিধবা বিবাহের নিরাস হইতে পারে না । অপিচ বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্বিবাহের কথা উক্ত হয় নাই ইহার অর্থ এই যে বিধবা বিবাহ সাধারণ কন্যা বিবাহের ন্যায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; ইহার নিমিত্ত শাস্ত্রে অন্য বিধি দৃষ্ট হয় না । শাস্ত্রে ‘অথ বিধবা বিবাহ পদ্ধতিঃ’ ইত্যাকার কিছুই কথিত হয় নাই ।

৩য় আপত্তি আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে । এক স্ত্রীর বহু পতি হইতে পারে না । ইহার অর্থ এক সময়ে এক স্ত্রী একাধিক পতির পত্নী হইতে পারে না । সে যদি ভিন্ন সময়ে অর্থাৎ এক পতির মৃত্যুতে পত্যস্তর গ্রহণ না করিতে পারিত, তবে নিম্নোক্ত বেদ বচনের সার্থকতা কি ?

.. উদৌৰ্ণ নার্যাভি জীবলোক
মিতাস্থমেতমুপশেষ এহি
হস্ত গ্রাভস্ত দিধিবোস্তুবেদং
পতুর্জ্জনিভমভিসম্ভূব ।

হে নারি ! তুমি মৃত পতির নিকটে শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে এ স্থল হইতে জীবিত লোকের নিকটে গমন কর, আর যিনি তোমার হস্ত ধরিয়া তুলিতেছেন তিনি তোমার পুনর্বিবাহেচ্ছু পতি অধুনা তুমি তাহার জায়া হও ।

বিপক্ষগণ উক্ত বেদবচন তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক দেখিয়া আশ্বলায়ন গৃহ সূত্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন ।

তাস্থথাপরেৎ দেবরঃ পতিস্থানীমোহস্তবাসী অরাদাসঃ ।

দেবর শিষ্য অথবা প্রাচীন ভূতা মৃতব্যক্তির পত্নীর হস্ত ধরিয়া তুলিবেন ।

আশ্বলায়ন গৃহ সূত্র বেদের তুলনায় অতি আধুনিক গ্রন্থ । বৈদিক সময়ে ঋশানে যে ব্যক্তি বিধবার হস্ত ধরিয়া তুলিত, সেই বিধবাকে বিবাহ করিত । কালে বিবাহ রহিত হইলেও, ঋশানে হস্ত ধারণ পূর্বক উত্তালনের রীতি বহু কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল । তখন দেবর শিষ্য অথবা প্রাচীন দাস বিধবার হস্ত ধারণ করিয়া তুলিতেন ; এবং ঐ স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে পতিস্থানীয় হইয়া

তাহার পুংসবনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু বিবাহ করিতেন না । ইহাতে কি মৌলিক বেদবাক্য পচিরা গিয়াছে ?

৪র্থ আপত্তি কোন কার্য্যকারক নহে । ভর্তা মরিলে যে স্বী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে সে স্বর্গে যায় ; মনুর এই বাক্যেই প্রতীত হইতেছে যে পতির মৃত্যুতে সকল স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে না ; সমাজে বিধবা-বিবাহ ও বৈবধ্য উভয়ই প্রচলিত আছে । সংহিতাকার স্বর্গের লোভ দেখাইয়া সকলকেই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যে স্বর্গলাভ হয় একথা মনু পূর্বেও যেমন বলবতী ছিল পরেও সেইরূপ বলবতী আছে । যে ব্যক্তি পত্নীবিয়োগে দারাস্তর গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে সেও বোধ হয় স্বর্গেই যাইয়া থাকে । যে সকল রমণী পত্নীবিয়োগে পতাস্তর গ্রহণ করেন না তাহাদের প্রতি সমাজের ভক্তি চির দিন আছে ও থাকিবে । কিন্তু আপত্তি স্থলে বিপক্ষগণ এই শ্লোকের উদ্ধার করিয়া কেবল কলহ প্রিয়তারই পরিচয় দিয়াছেন । এবং পরবর্তী তইটা শ্লোকের দ্বারা স্ব স্ব মূখতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই ।

অপত্যলোভে যে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করে এ কথার সহিত বিধবা বিবাহের সম্পর্ক কি ? স্বামীকে অতিবর্তন করে ইহার অর্থ কি স্বামী মরিয়া গেলে পুরুষাস্তর গ্রহণ করে ? সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুদ্ধিতে পারিবেন যে, যে স্ত্রী পতি সঙ্গে সম্বানোৎপাদনের জন্য পুরুষাস্তর গতা হয়, তাহাকেই মনু নিন্দা করিয়াছেন। —

সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্তা কোথায়ও বিহিত হয় নাই ইহার অর্থ এক পতি সঙ্গে অন্য পতি বিহিত হয় নাই । এক পতির অবিদ্যমানতার অন্য পতি বিহিত হয় নাই বলিলে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হয় । আমরা কখনই সে প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না !

৫ম আপত্তিও নিরর্থক । কারণ অনন্যপূর্ব্বিকা এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সমাজে অন্যপূর্ব্বা রমণীর পানি গ্রহণের রীতি ছিল, নচেৎ যাজ্ঞবল্ক্যের অনন্যপূর্ব্বিকা এইরূপ নির্দেশ প্রয়োজন হইত না । সংহিতাকারের সময়ে বা তৎপূর্বে অন্যপূর্ব্বা ও অনন্যপূর্ব্বা উভয়েরই বিবাহ প্রচলিত ছিল । তন্মধ্যে তিনি একতমের পক্ষপাতী বলিয়া অন্যতমের অবৈধতা প্রতিপন্ন হয় কিমে ?

৬ষ্ঠ বা শেষ আপত্তি দ্বারা বিপক্ষগণ দেখাইতেছেন, পূর্বে হিন্দু সমাজে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরুদ্বাহ প্রভৃতি পঞ্চ বিধ কার্য্য প্রচলিত ছিল, কিন্তু কনিয়

প্রবৃতি হইতে উহার নিষেধ হইয়াছে। আমরা এ কথা বলিয়া রাখিতেছি যে উড়ারঃ পুনরুদ্বাহম্ ইত্যাদি শ্লোক পুরাণ বিশেষ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংহিতা শাস্ত্রে ঐ প্রকার শ্লোক কদাচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে প্রাধান্য কাহার তাহা সকলেই জানেন।

পুরাণে ঐ প্রকারের আরও বচন আছে,—

দেবরাচ্চ স্মৃতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা ন দীয়ত।

ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্যঃ কলৌন চ কমণ্ডলুম্ ॥

এই শ্লোকে পঞ্চবিধ কার্যের উল্লেখ না হইয়া চতুর্বিধ কার্যের উল্লেখ হইতেছে দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্লোকটাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পূর্বে এই চতুর্বিষয়ের নিষেধ হইয়া কাল ক্রমে যখন আর একটি নিষেধ করিবার প্রয়োজন হইল, তখনই “উড়ারঃ পুনরুদ্বাহম্” ইত্যাদি শ্লোক প্রণীত হইয়া থাকিবেক।

এখন “দেবরাচ্চ স্মৃতোৎপত্তিঃ” এই শ্লোকটির মূল্য কি? ব্যাকরণানুসারে যে শ্লোকের অর্থ হয়না, বাহা স্পষ্টতঃই কোন মূর্খের প্রণীত বলিয়া উপলব্ধি হয়, তাহাকে মহর্ষি বাক্য বলিয়া ধরিতে সংস্কৃতভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইতস্ততঃ করা উচিত। অপিচ ঐ শ্লোকের বলেই যে হিন্দু সমাজ হইতে উল্লিখিত প্রথা চতুষ্টয় তিরোহিত হইয়াছিল, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; লোকের ক্রটি অনুসারে যখন ঐ সমস্ত ব্যাপার সমাজে বিচ্যেয় ভাব ধারণ করিয়াছিল তখনই কোন গোমূর্খ কষ্টেস্টে একটি নিষেধাত্মক শ্লোক রচনা ও শাস্ত্র গ্রন্থ বিশেষে তাহার প্রক্ষেপ করিয়া ধন্য হইয়া থাকিবেন।

কলভঃ ঐ সমস্ত বিষয়ের নিষেধ করিবার প্রয়োজন হইলে, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উপনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাতায়ন, বৃহস্পতি পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি যে সকল সংহিতাকার ধর্ম শাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা বা তাঁহাদের অন্যতম কেহ অন্তরাসে নিষেধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

এ অগতে সমাজ কখনই শাস্ত্রের অনুগমন করে নাই; শাস্ত্রই চিরদিন সমাজের অনুগমন করিতেছে। শাস্ত্র প্রচলিত প্রথার ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধের সময় হইতে ভারতের বৈদিক ক্রিয়া কর্মের লোপ হয়; ইহাতে বাহারা বুঝেন যে বুদ্ধই ক্রিয়া কর্ম লোপের কর্তা অথবা বুদ্ধ জন্মগ্রহণ না করিলে বৈদিক ক্রিয়া কর্মের লোপ হইত না, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত

হইতেছে না । কিন্তু যাহারা বুধন বুদ্ধের পূর্ব হইতেই সমাজের লোকেরা বৈদিক ক্রিয়া কৰ্ম্ম তুলিয়া দিতেছিল বা তুলিয়া দিবার কথা ভাবিতেছিল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহারাই প্রকৃত চিন্তাশীল । বুদ্ধের মহত্ব এই যে তদীয় হৃদয়ে জাতীয় চিন্তা প্রতিকলিত হইয়াছিল । বৈদিক ক্রিয়া কৰ্ম্ম লোপ সমাজের লোকেই করিয়াছিল ; বুদ্ধ তাহার সাক্ষী ও পক্ষপাতী, নোদ্ধ শাস্ত্র তাহার ইতিহাস ।

কিন্তু শাস্ত্র সকল ইতিহাস অপেক্ষা কিছু বলবত্তর । ইতিহাসে কেবল সময় বিশেষের অবস্থা যথামত বর্ণিত থাকে । শাস্ত্রে সময় বিশেষের অবস্থা বর্ণিত হইয়া মাত্র বিধির আকার ধারণ করে । পূর্বে আর্য সমাজে বিধবা বিবাহের বহুল প্রচলন ছিল । কাল সহকারে ক্রটিভেদে যখন কতিপয় নারী পতাস্তুর গ্রহণে বিমুখ হইলেন তখন সেই ইতিহাস, শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া কাল ক্রমে বিধির আকার ধারণ করিল । পতি বিয়োগে পতাস্তুর গ্রহণ তখন বৈধ কি অবৈধ বলিয়া বিচাৰ্য্যমান হইল । সমাজ সন্ধিহীন হইয়া পড়িল । তখনও যে সকল রমণী স্বামীর মৃত্যুতে পতাস্তুর গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন, কিংবা পরবর্তী কালে যাহাদের তাদৃশ আবশ্যকতা বোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল, সকলেরই ভাগ্যে নিদাক্ষণ কুঠারাঘাত হইয়া গেল । ছদ্মবেশী ইতিহাস ভারতের কিই না সর্বনাশ সাধন করিল ।

মনুষ্য সমাজে অনেক প্রথা প্রচলিত থাকে, এবং কালে তাহার সঙ্কোচ বিস্তার, পরিবর্তন, তিরোধান সমস্তই ঘটিয়া থাকে । কিন্তু প্রথা বিশেষের তিরোধান মাত্রই তদীয় অবৈধতার প্রতিপাদক হইতে পারে না বস্তুতঃ জগতে কোন প্রথারই সম্পূর্ণ তিরোধান সম্ভব হইত না, যদি শাস্ত্রকারগণ প্রথা বিশেষের সঙ্কোচ সময়ে বসপূৰ্ব্বক তাহার সম্পূর্ণ বিলোপের চেষ্টা না পাঠিতেন । আর, তাহাদেরই বা অপরাধ কি ? জগতে এমন এক সময় অবশ্যই আসিয়া থাকে, যে সময়ে লোকের একীকরণ স্পৃহা বড়ই বলবতী হয় । তখন সমাজ ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বাধীনতার প্রতি আদৌ দৃষ্টি করে না, এবং এক ও অক্ষুণ্ণ নিয়মের দ্বারা ব্যক্তি মাত্রকে শাসন করিতে চেষ্টা পায় । মহর্ষিরা বোধ হয় সেই সময়কেই কলির প্রবৃ্ত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ঐ প্রকার সময় অবলম্বন করিয়াই জগতে ত্রীষ্ট মহম্মদ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মগণ যাকতীয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন । এবং তাদৃশ শুভক্ষণের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় ভারতে বৈধব্য ধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হইয়া থাকিবেক ।

বিধবা বিবাহে বাধা প্রদান করিয়া যিনি আপনাকে যত বড়ই পণ্ডিত বা বড় বড়ই হিন্দু বলিয়া জাহির করুন না কেন, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ জ্ঞানের চক্ষে তিনি একজন মোরা বা পাদরীর সম ধর্ম্মাক্রান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পাদরীরা যেমন বলেন, হে জগতের লোক সকল, তোমাদের বীণা ভিন্ন আর কোন উপায়ে পরিত্রাণ হইবে না, মোরারা যেমন বলেন, এই কোরাণ ভিন্ন লোকের দ্বিতীয় পন্থা বিদমান নাই, তিনিও সেইরূপ বলিয়া থাকেন, হে হিন্দু বিধবা সকল ! তোমাদের ব্রহ্মচর্যা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এইরূপ সঙ্কীর্ণ বাদ সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে ‘মা হিংস্রাৎ সর্বা ভুতানি’ বাক্যের সহিত ‘বারব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত’ প্রভৃতি বাক্য সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেই ধর্ম্মে বিধবার ব্রহ্মচর্যা ও বিধবার বিবাহ পাশা পাশি বিদ্যমান না থাকিলে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা কোথায়? যে ধর্ম্মে শাক্ত বৈষ্ণব, গৃহী সন্ন্যাসী, আন্তিক নাস্তিক, ব্রহ্ম পৌত্তলিক সকলকেই সমান অবিকার ও আশা দেওয়া হইয়াছে, সেই ধর্ম্মে বিধবাদিগকেও ছই পথ প্রদর্শন করা কর্তব্য, নচেৎ সনাতন ধর্ম্মের নামে ঘোরতর কলঙ্ক হইবে। অত্যাচার সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম যেমন ব্যক্তিমাত্রকেই বলপূর্ব্বক এক দীক্ষায় দীক্ষিত করিতে চাহে, সনাতন ধর্ম্ম তাহা কদাচ করে না, বরং সাধকের শক্তি অনুসারে তাহাকে যথাযোগ্য মার্গ প্রদর্শন করেন। এমত স্থলে যাবতীয় বিধবাকে ব্রহ্মচর্যা দীক্ষিত করার কি সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে না? আর যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ এক বাক্যে তাহাদের পুনর্বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন সামান্য লৌকিক আচারের অনুরোধে তাহাদিগকে সেই শ্রাঘ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কি যুগপৎ ভীকৃত্য ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় নহে?

কেহ কেহ বিধবাদিগকে অনৃষ্টবাদ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ছরছুটে কি কেবল এই দেশের এক চেটিয়া? যদি বলেন যে সকল দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সেই সকল দেশেও কতিপয় কন্তাকে চিরকুমারী ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। সকল রমণীই পতিপুত্র লইয়া বাস করিবে ইহা বেন প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে। আমি একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু ঈশ্বরও প্রভৃতি দেশে যে সকল কন্তা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করেন, তাহারা স্ব স্ব ইচ্ছা বা কচির বশবর্ত্তিনী হইয়াই এরূপ করিয়া

থাকেন । তাঁহাদের নিরবলম্বিতা বা নিরপত্যতার জন্য সমাজ বা ধর্ম ইহার কাহাকেও অভিধাপ গ্রস্ত হইতে হয় না ।

• অনেক বলেন এ দেশে যে সংখ্যক বিধবা বিবাহিত হইবেক, সেই সংখ্যক কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবে । আমরা এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করি না । যাহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা দেশে উৎপন্ন পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান করিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন । আমরাও উভয় সংখ্যার তুল্যতা ধরিয়া উত্তর করিতেছি । সমাজ যদি একটি স্ত্রীর জন্য একাধিক পুরুষ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহার একটি পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী ব্যয় করাও নীতি বিরুদ্ধ বলিতে হইবেক । কিন্তু এ দেশে বহুবিবাহ, ও মৃতদারের পুনঃ দার-পরিগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে । তাই জিজ্ঞাসা করি, পুরুষে একের অধিক যতগুলি দার পরিগ্রহ করে, সমাজে ততগুলি পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, এই চ্যাব্য আশঙ্কা করিয়া পুরুষেরও একাধিক দার পরিগ্রহের নিষেধ হয় নাই কেন ? অপিচ যে দেশে মৃতভার্যার পুনরায় দার পরিগ্রহের রীতি আছে সে দেশে মৃতভর্তৃকার পুনর্বিবাহ নিরতিশয় সুক্তি সম্ভব বলিয়াই উপপন্ন হয়, নচেৎ কতকগুলি পুরুষকে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হয়, এবং তদ্বারা দেশের বংশহীনতা বৃদ্ধি পায় মাত্র ।

কেহ কেহ বলেন দেশে কতকগুলি স্ত্রীলোক বিধবা থাকায় জননক্রিয়ার আংশিক রোধবশতঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত লোক সংখ্যার অনুপাত কদাচ বৈষম্য প্রাপ্ত হয় না, এবং তদ্বারা দেশের সুখশান্তি কতকটা অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে । কথাটা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও একথা বলা যাইতে পারে যাহারা হৃদয়ে ঐ প্রকার মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভাগ্যক্রমে হীনজন হইয়া পড়িলে তদ্বারা দেশের সুখশান্তি কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইল বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দিতে পারেন ত ?

অনেকে বলিয়া থাকেন দেশে বৈধব্য ধর্ম আছে বলিয়া দাম্পত্য ধর্ম অনেকাংশে দৃঢ় আছে । বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে পাতিব্রত্যের শিথিলতা ঘটিবেক । এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সহমরণ প্রথা তুলিয়া দিয়া ত বড় অন্ত্যায় কর্ম করিয়াছি । জগতে সহমরণ প্রথা যে পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না । কিন্তু কোন্ মহদয় ব্যক্তি সেই পরাকাষ্ঠার পরিহার করিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব না করিয়াছেন ? বর্তমান বৈধব্যকপিণী পরাকাষ্ঠা সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবেন ।

ইনি ও সহমরণ অপেক্ষা অল্প যত্নাদায়িনী দেবতা নহেন । সহমরণের অগ্নি নয়ন গোচর হইত, ইহার অগ্নি অদৃশ্য এই মাত্র বিশেষ । কালে এমন সময় অবশ্যই আসিবে, এবং আমার বিবেচনায় সে সময় ইতি পূর্বেই আসিয়াছে, যখন এই নিদাক্রণ প্রথার পরিহার জন্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয় সমুৎসুক হইয়া উঠিবে ।

শ্রীকেন্দার নাথ বিদ্যাবিনোদ ।

বিক্রমোর্বশী

বা

কালিদাসের প্রতিভা বিকাশ ।

মালবিকাগ্নিমিত্রের পরেই সম্ভবতঃ কালিদাসের বিক্রমোর্বশী বিরচিত হইয়াছে । মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রণয়ন সময়ে বা প্রতিভার প্রথম বিকাশে অমর কবি কালিদাসও ভীতি-জড়িত-কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ;—

পুরাতন বলিয়াই সব ভাল নয়,
অথবা নূতন নয় মন্দ অতিশয়,
সুধী সেবে ভাল মন্দ করিয়া বিচার
পরের কথায় আস্থা, চিহ্ন মুর্থতার । (১)

উদীয়মান কবির এই ভয় ভাবনা অচিরেই সমালোচক দলের সাধুবাদ প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল । বস্তুতঃ নূতন কবির নূতন রচনায় পণ্ডিত সমাজের নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত হইল না । তাঁহারা কবিত্ব সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কালিদাসের অভিনব কাব্যকে সাধারণ গ্রহণ করিলেন । এই শুভ সুযোগেই কালিদাসের মুকুলিত প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় ।

প্রতিভাবানের সিদ্ধিলাভ অবশ্যস্তাবী হইলেও প্রাণপণ যত্ন বা কঠোর সাধনার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । ক্ষণজন্ম কালিদাস ও

(১)

পুরাণ মিতোবন সাধু সর্ব্বান চাপি কাব্যং নবমিমা বদাম্ ।

সম্ভঃ পরীক্ষাস্ততরদণ্ডজন্তে, মৃতঃ পরপ্রত্যয়নেন বুদ্ধিঃ ।

মালবিকাগ্নি মিত্র ।

বিনাসাধনার মহাকবির মহার্ঘ সিংহাসন অবিকার করিতে সমর্থ হয়েন নাই । বহু সাধনা বা অবিরাম চেষ্টার পর তাঁহার সিক্কি লাভ ঘটিয়াছে । বিক্রমোর্কশী কালিদাস প্রতিভার মুকুলিত অবস্থা, অভিজ্ঞান শকুন্তলে তাহার পূর্ণ বিকাশ । তদানীন্তন স্মৃতি সমাজ যদি কালিদাসের প্রতিভামূলে উৎসাহ বা প্রশংসার শীতল সলিল সেচন না করিয়া নিন্দা বা উপেক্ষার ঘূণিত আদর্শনা নিষ্ক্ষেপ করিতেন, তবে তাঁহাদের ক্রকুটি তাড়নায় কালিদাসের জায় মহাকবির ও যে প্রতিভা মুকুলে ঝরিয়া পড়িত না, কে বলিতে পারে ? এখন ও যে অযথা ভাষী সমলোচক দলের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে শতসহস্র হতভাগ্যের প্রতিভা অঙ্কুরেই বিলুপ্ত হইতেছে না, তাহাই বা কে জানে ? তাই বলিতেছিলাম, মালবিকাগ্রিমিত্রের রচনাকালে যিনি ভীত কম্পিত হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই আজ প্রতিভার ক্রমবিকাশে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সম্পূর্ণ । তদীয় বিক্রমোর্কশী ও শকুন্তলা পাঠ করিলেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি বা প্রতিভার ক্রমোন্নতি অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় ।

আমরা দুই চারিটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব ।

বিক্রমোর্কশী ও শকুন্তলার আখ্যান বস্তু ও রচনাগত কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না । বিক্রমোর্কশীর উপাখ্যান ভাগই নামান্তরিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া শকুন্তলার পরিণত হইয়াছে ।

বিক্রমোর্কশীতে প্রস্তাবনার পরেই রাজা পুরুষা রথারোহণে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, শকুন্তলেও তদ্রূপ প্রস্তাবনাব পর রথারূঢ় রাজা দৃশ্যস্তর প্রবেশ পরিদৃষ্ট হয় । নাটকদ্বয়ের রথগতিতে ও কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না । গতি দেখিয়া রথ দুইখানি এক সারথি দ্বারা চালিত ও এক অশ্ববাহিত বলিয়া ভ্রম জন্ম ।

বিক্রমোর্কশীতে—

“রথগতিবশে চূর্ণ মেঘমালা

ধূলিসম ধায় রথের আগে

চক্রভাস্তি রচে অর মাঝে যেন

অর রাজি হেন মানসে লাগে ।

দ্বরিত গমনে বাজি শিরোপরি

চামর নিখন দীর্ঘতা লভে ।

মধ্যস্থিত কেতু রথবেগে নাহি

বুঝাযায়, মধ্যো প্রাপ্তে কি হবে । (১)

শাকুন্তলে—

“হইলে বিমুক্ত বন্গা রথবাজিগণ

পূর্ব দেহ দীর্ঘ করি

বেগে প্রসরণ কারী—

ধূলিরাশি অতিক্রম করেছে গমন ।

অতিবেগে শিরোভূষা চমের নিশ্চল

তেজে কর্ণচূতি নাই

বুঝিতে পারি না তাই,

শূন্যেতে সাঁতার দিচ্ছে, অথবা' ভূতল

আক্রমি দৌড়িছে দ্রুত ঘোটকের দল । (২)

এই শ্লোক দুইটিতে কোনরূপ প্রভেদ আছে কি ? তবে বিক্রমোর্কশী
হইতে শাকুন্তলার রথের গতি বর্ণনা অধিকতর পিরিফুট ও সরল ।

বথা শাকুন্তলে—

রথগতি দ্রুতহেতু ভাতিছে নয়নে

বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন বস্তু মিলিত বন্ধনে ।

ছোট হয় বড় আর বস্তুতঃ যে বাক্য

দেখাযায় ঠিক বেন সমরেখে আঁকা ।

(১) অগ্রে বাস্তি রথস্য রেণুপদবীঃ চূর্ণা ভবন্তোষণা

শক্রবাস্তি রথান্তরেণুবিতনোতান্যাবিহারলীন্ ।

চিত্তারম্ভ বিনিশ্চলঃ হরশিরশায়াস বচ্চামরঃ

যন্মধ্যো সমবস্থিতো ধ্বজপটঃ প্রাপ্তেচ বেগানিলাৎ

বিক্রমোর্কশী ।

(২) মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়ত পূর্বকারাঃ

শ্বেবামপি প্রসরতাঃ রজসামলজ্বাঃ

নিদ্রম্প চামরনিবায়ত কর্ণ ভঙ্গাঃ

ধাবন্তি বসন্তা নি তরন্তি নু বাজিনস্তে ।

অভিজ্ঞানশাকুন্তলম্ ।

অদ্ভুত রথের গতি, যাহা ছিল দূরে

নিমেষেতে কাছে এসে পাছে গেল সারে । (২)

• কি সুন্দর স্বভাব বর্ণনা । শ্লোকটি পড়িলেই মনে হয় যেন কোন আধুনিক কবি দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের কথা বলিতেছেন । রথের গতি বর্ণনার বিক্রমোর্কশীতে এই চমৎকারিষট্টকু পরিদৃষ্ট হয় না ।

ইহার পরে উর্কশীর সহিত রাজা পুনরবার সাক্ষাৎ হয়, এবং দর্শন মাতেই উভয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হয় শাকুন্তলে তাহারই বিস্তৃত ‘সংস্করণ’ আমরা দেখিতে পাই । রাজা দুহন্তের নিকট হইতে গমন কালে অতৃপ্ত-বাসনা শকুন্তলা “অয়ি অভিনব কুশাক্ষুরৈঃ পরিক্ষিতং মে চরণং, কুরুবক শাখায়াং পারিলম্বকবন্ধলং, তাবৎ প্রতিপালয় মাং যাবদেতৎ মোচয়িষ্যে” “ওলো নূতন কুশাক্ষুরে আমার চরণ ক্ষত হইয়াছে, এবং কুরুবকশাখায় আমার বন্ধল জড়াইয়া গিয়াছে, বন্ধল খুলিয়া লওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর” । এই বলিয়া বন্ধল মোচন-চ্ছলে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া প্রণয়িনী শকুন্তলা প্রণয়পাত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইল । উর্কশীও বিদায় কালে ঠিক সেইরূপ “অয়ি লতা-বিটপে একাবলী বৈজয়ন্তিকা মে লগ্না, সখি বিলম্বয় মোচয়ামি যাবৎ” বলিয়া বৈজয়ন্তিকা মোচনচ্ছলে সহচরী চিত্রলেখার চোখে ধুলি দিয়া আরও দুই মুহূর্ত্ত প্রণয়ীকে দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । এই প্রণয় লীলা বা চাতুরী খেলায়ও শকুন্তলাই জয়লাভ করিয়াছে, প্রহ্নন-পেলবা শকুন্তলা কমল কোমল চরণ যুগলে স্চী-তীক্ষ্ণ কুশাক্ষুরে ক্ষত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস যোগ্য চাতুরী প্রকাশ করিয়াছে । কিন্তু উর্কশী লতিকার কোমল পল্লবে বৈজয়ন্তিকা জড়াইয়া নিতান্ত বোকামীরই পরিচয় দিয়াছে । শকুন্তলার চাতুরী অনস্বীয়া কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু উর্কশীর ছলনা চিত্রলেখা সহজেই ধরিয়া ফেলিল, তাই সে উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, “অয়ি দৃঢ়ং খলু লগ্না ন শক্নোমি মোচয়িতুং” (সুখি বড় দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে কিছতেই ধুলিতে পারি-

(২) বদলোকে স্তম্ভঃ ব্রজতি সহস্রা তদ্বিপুলতাং

বদস্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসকান মিব তৎ ।

অকৃত্য বদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো

ন মৈদূরে কিঞ্চিৎ কণমপি ন পার্শ্বে রপত্রবাৎ ।

শকুন্তলা ।

তেছি না) এই নিমিত্তই বলিয়াছিলাম, কালিদাসের কালিদাসও প্রাপ্তিও এক দিনে ঘটে নাই । বিক্রমোর্কশীর ভ্রম প্রমাদ শকুন্তলায় সংশোধিত হইয়াছে ।

উর্কশীর নায় শকুন্তলাও দেবন প্রথম দর্শনেই প্রণয় ভাজনের নিকট অস্থায়ী বিক্রয় করিয়াছিল, পুরুষের নায় দুইসু ঠিক সেইরূপ একটি মাত্র কটাক্ষেই প্রেমিকার চরণতলে ষোল আনা মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । নাটক দুয়ের নায়ক যুগল এক উপাদানেই গঠিত, তাই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা কার্য্য কল্পনা অপৃথগ ভূত । পুরুষ ও দুইসু এই দুইয়েরই বরাঙ্গনা-লাভ-সুচক দক্ষিণহস্ত স্পন্দিত এবং রমণীরত্নলাভে উভয়ের হৃদয় আশঙ্কায় বাকুল ও আশায় আশ্বস্ত হইয়াছিল । এই আশা নিরাশা চিন্তা ভাবনাতেও পুরুষ দুইসুের জ্ঞান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । এই প্রকার ঘটনার সাদৃশ্য ও কবিশ্রুতিভার ক্রমোন্নতি উক্ত নাটকদুয়ের প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।

উভয় গ্রন্থের নায়কই এক ভাষা ও এক ভাবেই বিদূষক বন্ধুর কাছে কামিনীয়া কামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন । এই ক্ষেত্রেও কালিদাসের কবিত্ব শক্তি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে—বলিতে পারা যায় ।

উর্কশীর লাবণ্যসরসীতে হাবুড়ু খাইয়া পুরুষ বলিতেছেন,—

“ইহার নির্মাণে—কিলো শনী কাস্তি দাতা
অথবা মদন নিজে ? মাস পুষ্পাকর ?
নতুবা সে অতিবৃদ্ধ অরসিক ধাতা
কেমনে সৃষ্টিলা এই রূপমনোহর ? (১)

আর শকুন্তলার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া দুইসু কহিতেছেন ;—

“চিত্তে নিবেশিয়া সব সৃষ্ট উপাদান
স্বপ্নমার রাশি নিয়া
বিধাতা সে রূপ দিয়া
কৃশাদী রূপসী এই করিয়া নির্মাণ ।

(১) অস্তাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতি বভূচ্ছ্রোমু কাস্তি প্রদঃ ?

শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নমুনমনো ? মাসোমু পুষ্পাকর ?

বেদান্তাসমুদ্রঃ কথঃমু বিষয়ব্যাকৃতকৌতুহলো

নির্মাত্ত্বঃ প্রভবেন্ মনোহর বিদং রূপং পুরুষোমুনিঃ ।

এই বাল্য স্থনিশ্চর

(আমার মানসে লস)

সৃষ্টনারীররকুলে বিশেষ বিধান

তাহার শরীর, আর

শক্তি সে বিধাতার

ভাবিয়া চিন্তিয়া এই করি অনুমান । (১)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের প্রতিভার ন্যায় রুচি ও নীতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । বিক্রমোর্কশীর বিরহসমুপ্তা নায়িকা বিচ্ছেদ-বেদনা-দূরী-করণ মানসে স্বয়ংই অভিসারিকা বেশে রাজ্য পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু বিরোগবিধুরা শকুন্তলা বিরহ-বাতনা-শাস্তির জন্য স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জাহীনতার জলাঞ্জলি দিয়া অভিসারের কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই । সেই ব্রীড়া-বিনতা বিরহিনী লজ্জাবতী লতিকাটির ন্যায় ভাল-বাসার ভূষানে আপনার মনে আপনি জলিয়া পুড়িয়া শাস্ত তপোবনের নিভৃত নিবাসে কমল দলের কোমল শস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই দুঃসহ বিচ্ছেদের উপসংহারে বা মিলনের কিঞ্চিৎ পূর্বে উভয়ত্র নায়িকার প্রণয় পত্র বা আশ্র নিবেদন এক ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার পরে বিক্রমোর্কশীর মিলন বিঘাতী দেবদূতের ন্যায় শাকুন্তলেও গৌতমীর প্রবেশ নয়ন গোচর হয় । বিচ্ছেদের পরিপাকে প্রণয়ের গাঢ়ত্ব-উৎপাদন-উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এই আক-স্মিক অন্তরায়ের সৃষ্টি । এই স্থান সমূহেও আমরা শকুন্তলাতেই কবিত্বের সৌরভ অধিকতর অনুভব করিতে সমর্থ হই । তার পর এই দুইখানি নাট-কেই মিলনের পরে বিচ্ছেদের আবার একটা বিরাট ব্যবধান বর্ণিত হইয়াছে । এই দীর্ঘ বিরহের অবসান ও পুনর্মিলনের কারণও উভয়ত্র প্রায় এক প্রকার ।

উভয় নাটকেই প্রণয়িগত-হৃদয়া আশ্রবিস্মৃতা নায়িকার বিরাট বিরহ-বিপদ ক্রুদ্ধ মূর্খির অভিসম্পাতে ঘটিয়াছে এবং তাহার প্রতীকার বা

(১). চিত্রে নিবেশিত পরিকল্পিত সন্দেহোপগান্

রূপোচ্চরেন বিবিনা বিহিতা কুশাস্ত্রী

স্ত্রীরহস্যটি রপরা প্রতিভাতি সা মে

বাতু কিঁছুই সমুচিত্তা বপুল্য তস্তাঃ ।

শকুন্তলা ।

বিরহ নাশের উপায় একভাবেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, এই স্থানের কর্তনায় কিন্তু বিক্রমোর্কশীতে মহাকবি সমগ্রিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন ।

উর্কশী স্বর্গের অপ্সরা — নৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা, সুসমা সম্পদে ও ত্রিজগতে অতুলনীয়; এই ললনা ললামভূতা চিরবোবনা অপ্সরা প্রথম মিলন-দিবসে দেবদূতের আস্থানে অশ্রুসিক্তলোচনে প্রণয়ী রাজার নিকট হইতে বিদায় অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল । দেবনিবাসে সে দিন মহা ধুমধাম, দেবরাজের আলোকোদ্ভাসিত প্রাসাদ প্রান্তরে প্রসিদ্ধ নাটককার ভরতমুনির উৎসাহউদ্যোগে “লক্ষী স্বয়ম্বর” নাটক অভিনীত হইতেছিল । উর্কশী সেই নাট্যব্যাপারে লক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিল । মেনকা সাক্ষিয়াছিল ব্যাকণী, সে লক্ষী বেশধারিণী উর্কশীকে জিজ্ঞাসা করিল “এই যে সমস্ত লোকপাল পুরুষেরা কোণবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন”— কস্মিন্শ্চে হৃদয়াভিনিবেশঃ ? (ইহাদের মধ্যে তোমার হৃদয় কাহারে চায় ?) ইহার উত্তরে আত্মবিস্মৃতা প্রেমিকার (পুরুষোত্তমে ইতি ভণিতবো পুরুষ-সীতি নির্গতা বালী) মুখ দিয়া পুরুষোত্তমের পরিবর্তে পুরুষবার নাম উচ্চারিত হইল । উর্কশীর এই অশিষ্টতা দর্শনে ভরতমুনি কুপিত হইয়া “তোমার দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইবে” বলিয়া তাহাকে অভিগাপ প্রদান করেন । পরে পুত্রমুখ দর্শন পর্যন্ত অভিসম্পাতের কাল নির্ণয় করিয়া মহেন্দ্র লজ্জা-বনতমুখী উর্কশীকে আশ্রয় করেন । এই প্রণয়োন্মাদ-কাহিনী বিক্রমোর্কশীতে বেশ সজীব ও স্বাভাবিক রূপে চিত্রিত হইয়াছে । প্রেম প্রভাবে অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয়ার নাম বিস্মৃতি অসম্ভব বা অসম্ভব নহে, বরং তিলোত্তমার হিজি বিজি কথা লিখিতে লিখিতে জগৎসিংহ লেখার ন্যায় প্রণয়ীর নামোল্লেখ সময়ে পুরুষোত্তমের পরিবর্তে হৃদয় নিহিত অবিরত ধ্যাত পুরুষবার নাম উচ্চারণ করাই প্রেমবিহ্বলা উর্কশীর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছিল । এ স্থানে বেশ প্রেম-উদ্ভূত পুরস্পৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু শকুন্তলার আত্ম-বিস্মৃতি অমাজ্জনীয় ।

হর্কসার ন্যায় কোপন স্বভাব মুনি —

“অয়মহং ভোঃ” বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল তথাপি চিন্তামগ্না শকুন্তলার নিদ্রা ভাঙ্গিল না, এইটী যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয় । ইহার পুরস্কার শকুন্তলাও লাভ করিয়া ছিল,—হর্কসার ক্রোধভরে শাপ দিয়া গেলেন—

“এক মনে যাকে তুই করিয়া স্বরণ
সমাগত মুনিবরে
বুঝিতে পেলিনা মোরে ;
বলিলে ও অরিবেনা সে তোকে কখন,
প্রথম হইল যেন কথা উচ্চারণ । (১)

পরে অননুয়া ও প্রিয়বদার শিষ্টাচার ও সবিনয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া অভিজ্ঞান বস্তু দর্শনে শাপের অবসান হইবে বলিয়া চলিয়া যান । ইহার ফলে রাজা শকুন্তলাকে পরে চিনিতে না পারিয়া পরিভ্রাণ করেন এবং অভিজ্ঞান অঙ্গুরীর দর্শনেই পুনর্মিলনের কারণ শকুন্তলার নায় উর্কশীর ভাগ্যচক্র ও অভিধাপ প্রসাদে পরিবর্তিত হইয়া ছিল । কৈনাথ শিখরে নৃপ সহ প্রমোদ প্রমত্তা উর্কশী এক দিন অভিসম্পাত প্রভাবে “দিব্যজ্ঞান” হারাতিয়া কুমারীজনের অপবেশে ‘কুমার’ বনে প্রবেশ করিয়া লতাত প্রাপ্ত হয় এবং লোহিত মণি বিশেষের স্পর্শে পূর্ব রূপ ধারণ করে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, উভয়ই অভিধাপ বিচ্ছেদের কারণ এবং বস্তু বিশেষ পুনর্মিলনের হেতু । এই রূপ শকুন্তলার সর্বদমন ও উর্কশীর আয়ু নামক পুত্রের প্রতিমূর্তি । পুত্রের পরিচয় প্রাপ্তির পরেই নাটকদ্বয়ের পূর্ণমিলন বা উপসংহার । দুই নাটকেই দুই রাজার প্রতি ইন্দ্রদেব এক জাতীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অসামান্য মাদৃশের সূচনা করিয়াছেন । কাজেই বলিয়াছি, কবির কবিত্ব শক্তির ক্রমবিকাশে নিরাভরণ উর্কশীই বিদ্বজ্জন-মানসমোহিনী শকুন্তলা রূপে সাধারণ্যে পরিচিতা হইয়াছে । এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলার নায় মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কালিদাসের ক্রমোন্নতির দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিব ।

নায়িকার রূপ বর্ণনার দুই শ্লোক ইহঃ পূর্বেই বিক্রমোর্কশী ও শকুন্তলা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এখন মেঘদূত হইতেও একটি শ্লোক এই স্থলে প্রদান করিতেছি ।

(১) বিচিস্তমস্তী বমননামানসা

তপোনিধিঃ বেৎসি ন মাম্পদ্বিতম্,

স্মরিষ্যতি হ্যনন ন বোধিতোহপিসন্

কথাং প্রমত্তঃ প্রপমং কৃত্য মিথ ।

শকুন্তলা ।

(শেষ) কষিত কাঞ্চন কাষ্ঠি ক্লশ কলেবরা

শিখরি দশন পাতি

কটিদশ ক্ষীণ অতি

হরিণী লোচনা সেট সুবিশ্ব অধরা

কুচভারে নতা, তার নাভি যে বিবরে

সে গো নিতম্বের ভারে

ভরিতে যাইতে নারে

বিধাতার আদি সৃষ্টি মূরতি মাঝারে । (১)

বিক্রমোর্কশীর সম্পূর্ণ চতুর্থ অঙ্কটি উর্কশী বিযুক্ত পুরুষবার অশ্রু জলে বা বিরহের ককণ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ । এই সুদীর্ঘ বিলাপকাহিনীতে সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত ইন্দ্রিয় লালসায় অতৃপ্ত বাসনার সেবাদাস পুরুষবার অগণিত মদন বেদনার উষ্ণনিশ্বাস ও বালকের নায় অর্থশূন্য ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় । এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদব্যাপী বিলাপ প্রলাপের স্থানে স্থানে কবিত্বের গন্ধ যে না আছে, তাহা নহে । কিন্তু এই সমগ্র একটা অধ্যায়ে হরিণ ময়ূর লতা প্রভৃতির প্রতি রাজার উক্তিতে যে কবিত্ব প্রকটিত হইয়াছে, মেঘদূতের একটা মাত্র শ্লোকেই তাহার সমস্ত ভাব নিবদ্ধ রহিয়াছে । মেঘদূতের শ্লোকটি যথা—

লতিকায় দেহ যষ্টি, হরিণী লোচনে
নিরখি নয়নলীলা, চাঁদে মুখ শোভা
শিখি পুচ্ছে কেশ শুচ্ছ, তরঙ্গভঙ্গীতে
নেহারি গো জ্বলিতা তোমার স্নন্দরি,
হায় প্রিয়ে কোথাও না একস্থানে হেরি
(সমুদয় শরীরের) সাদৃশ্য তোমার । (২)

(১) তম্বী স্তামা শিখরিদশনা পকবিদ্যধরোষ্টি

মধো কামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিয়নাভিঃ

প্রোপ্তিতারাদলসপসনা স্তোজনম্ভ্রা স্তনাস্তাঃ

বা তন্ন সাদ যুগতি বিবরে সৃষ্টি রাদোবধাতুঃ ।

মেঘদূত । ২১ শ্লোক

(২) স্তান্যবিস্তঃ চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টি পাতঃ

বহুচ্ছায়ঃ শশিনি, শিখিনাঃ বহুভায়েশু কেশান্

তারপর পুরুষের বিলাপে ইন্দ্রিয় সেবার কথা ব্যতীত অন্য কথা নাহি, কিন্তু রঘুবংশের অঙ্গ বিলাপে কবি যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন । আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । যথাঃ—

“তুমি গো আমার একাদারে সতি,

সচিব গৃহিণী সখি ছিলে, আর

ললিত সঙ্গীত বিদ্যার শিক্ষায়

প্রিয় শিষ্যা ছিলে তুমিই আমার ।

তোমায় হরিয়া অকারণ বিধি,

বল মোর কোন্ হরে নাই নিধি ; (১)

এইরূপ দাম্পত্যের শিক্ষণীয় পবিত্র কথা প্রাচীন কবিদের মুখে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না । বস্তুতঃ স্বামী যদি সম্পদে বিপদে মন্ত্রীরূপে পতির পার্শ্বে দাঁড়াইতে না পারে, গৃহকত্রী যদি অতিথি আতুরের সেবা ও পুত্রকন্যার লালন পালনাদি গৃহকার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হয়, প্রণয়িনী যদি সখিতে মধুময় বন্ধনে স্বামীকে বাঁধিয়া সংসারের শ্লোক ভংগের মতো একটু সাহসনা দিতে না পারে,—তবে নারীজন্ম গ্রহণ বা বিবাহের প্রয়োজন কি ? ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনই বিবাহের চরম লক্ষ্য নহে । তাই বলিতেছি কালিদাসের এই শ্লোকটা বড়ই মূল্যবান । এই সকল সম্ভবতঃ কালিদাস পরিণত বয়সে রচনা করিয়াছিলেন । প্রাথমিক রচনা বা বিক্রমোর্বশী শাকুন্তলা প্রভৃতি যে কবি কাব্যগুলিকে কামদেবের লীলাক্ষেত্র রূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন, সেই কবিই শেষে সেই প্রিয়তম কন্দর্প প্রভুকে ভয়স্বরূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন ।

উৎপশ্যামি প্রতমুখু নদীবীচিসু কবিতাসান্

হঠাৎ কস্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্য মস্তি ।

মেঘদূত । ৪৩ শ্লো ।

(১)

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ

প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ—

ককণাবিশৃংখল মৃদুনা

হস্তা ড়াং বদ কিং ন মে হতম্ ।

রঘু ৮ম সর্গ ৬৭ শ্লোক ।

তাহার কুমার সম্ভবে,—

অমূল্যবি ইন্দ্রিয়ের বিষম বিকৃতি,

ইন্দ্রিয় বিজয় গুণে

রোধিয়া ইন্দ্রিয় গণে—

খুজিতে বিকার হেতু হেরে পশুপতি,—(ক)

দক্ষিণ অপাঙ্গে দৃষ্টি করি আকর্ষণ—

বামপাদ আঙুলিয়া

চাক্র রূপ বাঁকাইয়া—

প্রহারিতে সমুদাত কন্দর্প ভীষণ । (খ)

অতি সাহসিক কন্দর্পকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া জিতেন্দ্রিয় শব্দর সংহারকর
সংহারকর বলিয়া ক্রোধে বিশ্বধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন তাহার তৃতীয় চক্ষু
হইতে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জলিয়া উঠিল,—এবং—

“সম্বর সম্বর ক্রোধ ওহে মহেশ্বর,

এই মহা ধ্বনি যবে উঠে ব্যোম পথে,

তখনি ভবের নেত্রে লভিয়া জনম

করিল অনল কামে ভস্ম অবশেষ । (গ)

এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে
তাহা ঘটয়া উঠিতেছে না । এখন বিক্রমোর্কশী সম্বন্ধে আরও ছই একটি
কথা বলিতে হইতেছে,—অনেকে বলেন, করমর্দনের পাশ্চাত্য প্রথা
এখন দ্রব্যে অভিবাদনের স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু বিক্রমোর্কশী পাঠে
জানা যায়, করমর্দন রীতি বিদেশের আমদানী বা নিত্য আধুনিক নহে,
চিত্ররথ গন্ধর্বরাজকে সমাগত দেখিয়া রাজা পুরুষা বথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া
(রথায় অবতীর্ণ) প্রিয় সূহৃদের মঙ্গল ত (স্বাগতং প্রিয় সূহৃদে) বলিয়াই
“অন্যোহন্যং হস্তং স্পৃশতঃ অর্থাৎ পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিল । সূতরাং

(ক) অশেষশ্রিয়শ্চৈতমমুখ্যনত্রঃ পুনর্বশিষ্যঃ বলবন্নিগূহ ।

হেতুঃ স্বচেতোবিকৃতো দিব্যশ্চ দিশা মুপাস্তেবু সমর্জ্য দৃষ্টিম্ ।

(খ) স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিশ্টিমুষ্টিঃ নতঃসমাকৃষিতসবাপাদম্ ।

দক্ষিণ চক্রীকৃতচাক্রচাপম্ প্রকৃষ্টমভুদাতমাস্বযোনিম্ । ৩ম । ৬৯, ৭০ ।

(গ) ক্রোধঃ প্রভো ! সংহর সংহরেতি বাবদ গিরঃ খে মরুতঃ চরন্তি ।

ভাবৎস বাহি ভগ্ননেত্রময়া ভস্মাবশেষঃ মদনং চকার ।

কালিদাসের সময়েও এই রীতি প্রবর্তিত ছিল। কালিদাসের সময়ে ভারত-বাসীর স্ত্রী শিক্ষার প্রতি নিশ্চয়ই বিশেষ অনুরাগ ছিল, নচেৎ তাহার নাটক গুলিতে স্ত্রীলোকদ্বারা চিঠি পত্রাদি লিখিত ও পাঠিত হইত না। বিক্রমোর্কশীতে উর্কশী মায়া রচিত ভূজ পত্রে মনোবেদনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে এবং তাহা রাজমহিষীর একটি সামান্য পরিচারিকা পাঠ করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতীত দাসী বানী পর্যন্তও কখনও শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। ভারতবাসীর স্ত্রীশিক্ষা-প্রিয়তার নিদর্শন উত্তরচরিত রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে চিত্র বিদ্যা দি সূক্ষ্ম শিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পুরাতন নাটকাদি পাঠে জানা যায়, প্রেমিক প্রেমিকা বিরহ যাতনা দূর করিতে অথবা চিত্ত বিনোদন কামনায় চিত্রকলকে প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিত। ভবভূতির উত্তরচরিতে লঙ্কণ রামচন্দ্রের নিকট বলিতেছেন ;—“আর্য্য তেন চিত্রকরেণ অশ্রুপাদষ্টং অস্যাং বীথিকার্যাং আর্য্যস্য চরিতং অভিলিখিতম্” এই প্রকাণ্ড আলেখ্য সীতাদেবীর চিত্র বিনোদনার্থ চিত্রিত হইয়াছিল। রত্নাবলীতে ইহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রত্নাবলী (সাগরিকা) নিজে প্রণয়ী রাজার আলেখ্য আঁকিয়াছিল। তাহা দেখিয়া স্নসংগতা নায়ী সহচরী জিজ্ঞাসা করিল “সখি কঃ এষঃ ভ্রূয়া আলিখিতঃ ? (কাহার চিত্র আঁকিয়াছ ?) উত্তরে লঙ্কার সহিত সাগরিকা বলিল—“ভগবান্ অনঙ্গঃ” গুনরা রসিকা সখী একটু হাসিয়া বলিল, দেও রতির মূর্তি চিত্রিত করিয়া ছবি খানির পূর্ণতা সম্পাদন করি, ইহা বলিয়াই—“বর্তিকাং গৃহীত্বা নাটোন রতিব্যপদেশেন সাগরিকাং লিখতি”। এই টুকু পড়িলে বুঝা যায়, স্নসংগতা কিরূপ ক্ষিপ্তহস্তে চিত্রকলক খানি আঁকিয়া ফেলিয়াছিল, এবং সাগরিকাও কেমন রাজার অনুরূপ মূর্তি চিত্রিত করিয়াছিল। শকুন্তলার আলেখ্য দেখিয়াও রাজা হৃৎস্বস্ত ও সানুসমী সখির শকুন্তলা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। বিক্রমোর্কশীতেও বিদূষক চিত্রকলকে উর্কশীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া রাজাকে শান্তি লাভ করিতে অনুরোধ করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন কাবিগণের হস্তে এই প্রকার আলেখ্য দেখিয়া প্রাচীন ভারতে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষলাভ অনুমান করা অসম্ভব নহে। এখন কালিদাসের সৌন্দর্য্যবোধ ও চরিত্রদৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নৈসর্গিক-সৌন্দর্য্য-বিকাশনে বা চরিত্রচিত্রণে ভারতের কোন কবিই কালিদাসের পদরেণু স্পর্শ করিবার

যোগ্য নহে । কবি সুন্দরী শকুন্তলার অতুলনীয় রূপরাশি বসনভূষণের কৃত্রিম আবরণে আবৃত করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবল মাত্র বঙ্কল পরাইয়াই অধিক মনোজ্ঞা বলিয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্থলে অনেকে হয় ত বলিবেন, তপোবনবর্দ্ধিতা তাপসপ্রতিপালিতা শকুন্তলা বঙ্কল ছাড়া মূল্যবান আভরণ কোথায় পাঠবে ? কবি যদি কোন রাজকন্যাকে বঙ্কল পরিধান করাষ্টয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতেন, তবে তখন এই কথা বলা বাইতে পারিত, এই ক্ষেত্রে নহে । উহার উত্তরে আমরা বলি, কালিদাসের ভূষণপ্রিয়তা থাকিলে তিনি অবশুই তপোবনবাসিনী নারিকাকে নিবিধ বনকূলে সাজাইতে পারিতেন । তাহাতে কোন দোষ ঘটিত কি ? আমরা বিক্রমোর্কশীতেও উহার অনুকূল প্রমাণ পাইয়াছি । উর্কশী স্বর্গের অপ্সরা তাহার ধনরত্নের বসন ভূষণের কিছুই অভাব নাই ; তথাপি সে কেবল-মাত্র একগাছি—নীলমণি খচিত মুক্তা ভূষিত আভরণ পরিয়া অভিসারিকা বেশে প্রেমাম্পদের নিকট উপস্থিত হইল । উর্কশী নিজে বলিতেছে,—“অয়ং মে রেবতে মুক্তাভূষিতো নীলমণি পরিগৃহীতঃ অভিসারিকাবেশঃ” । ইহাতে উর্কশীর সৌন্দর্য্য এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে সেই সৌন্দর্য্যের উপভোগ-তৃষা চিত্রলেখার নারীহৃদয়েও অলক্ষিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল । সে বলিল,—“নাস্তি বাগ্‌বিভবঃ প্রশংসিতুং, ইদম্ চিন্তয়ামি অহ মত্র পুরুষা ভবেয় মিতি” (অর্থাৎ ইহার প্রশংসার উপযুক্ত বাক্য সম্পূর্ণ আমার নাই, কিন্তু সে চিন্তা করিতেছি, এই ক্ষেত্রে যদি আমিই পুরুষা হইতে পারিতাম) ।

কালিদাস প্রিয়ংবদা চিত্রলেখা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্য প্রাপ্ত লাভ করিয়াছেন । চিত্রলেখা কবির অপূর্ব সৃষ্টি । দুইটী মাত্র কথা শুনিলেই তাহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় ।

পুরুষা মহিষীকে দেবী শব্দে সম্মানিত করিলেন, ইহা শুনিয়া ও রাজ-মহিষীর তেজোদীপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিয়া উর্কশী কহিল, এই ওজস্বিনী, রূপসী দেবী শব্দে অভিহিত হওয়ার উপযুক্তা পাত্রী । (স্থানে খলু ইয়ংহি দেবী শব্দেন উচ্চার্য্যতে ইত্যাদি) এই মিষ্ট কথায় ভুট্ট না হইয়া বুদ্ধিমতী চিত্রলেখা যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা বস্তুতই মর্ম্মস্পর্শী ।

সে বলিল ;—‘অস্ত্যপরং মুখং মস্ত্রয়িতুং তে’ ইহার তাৎপর্য্যই এই, তোমার নিমিত্তই ইহার জগতির সীমা রহিবে না । তাহার প্রাণপ্রিয়, আরাধ্য রত্নটাকে তুমি অপহরণ করিতে বসিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে

অন্ত একখানি মুখের প্রয়োজন, এই মুখে কিছু বলা পোতা পার না । তার পর রাজা কঠিন ব্রতধারিণী পত্নীর চিত্ত প্রসাদনের স্মৃতিপ্রারে মেহসিক্ত স্বরে বলেন,—

“হে কলাগি অকারণ নিদাক্ষণব্রতে

মলিন করিছ দেহ মৃণাল কোমল । ইত্যাদি ।

ইহা শুনিয়া অন্তরালস্থিতা উর্ধ্বশী সখীকে হুঃখিতভানে কহিল. “মহান্ থন্ অস্তাং বহুমানঃ । মুহূর্ত্তে চতুর্থা চিত্রলেখা অবস্থাটা বুদ্ধিয়া লইল. তখন সে হাসিয়া বলিল, “ময়ি মুখে অস্ত্যসংক্রান্তপ্রেমকা নাগরা অবিকং দক্ষিণা ভবন্তি (অস্ত্যসক্ত নাগরেরা একটু বেশী অনুগত হয়) কথাটা নির্ভাঙ্ক সত্য, ইহার স্বার্থতা প্রায় সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি । এই সাধারণ উক্তিভে চিত্রলেখা বিশেষ বাগ্‌বৈচিত্র্য ও সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে । এই চিত্রলেখা অনস্মরা প্রসূতি কালিদাসের ‘অপূর্ব বস্তু রচনা’ নয় কি ?

কালিদাসের প্রতিভার বা বিক্রমোর্ব্বশীর আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল । কালিদাস প্রণীত গ্রন্থাবলীর পোখাপাখ্য নির্ণয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না । তবে রচনার উৎকর্ষাবকর্ষ আলোচনা করিয়া মালবিকাগ্নি-মত্ৰ, বিক্রমোর্ব্বশী, নলোদয় প্রভৃতিকে প্রাথমিক রচনা ও শকুন্তলা, কুমার, রম্ভবংশ, মেঘদূত প্রভৃতিকে শেষের রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি ।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ ।

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ ।

(৩)

এলাহাবাদ হইতে প্রচারিত হইয়া পূর্ব্বোন্নিখিত ঘোষণাপত্র কলিকাতা, মালদা, বোম্বাই, এবং প্রত্যেক জিলার সদর ষ্টেশনে তথাকার কালেক্টর সাহেব কর্তৃক ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখ বৈকাল বেলা বিশেষ সমারোহে প্রকাশ্য ময়দানে পঠিত হয়* । ঐ দিবস উক্ত স্থান সমূহে খুব ধুমধামের সহিত

* প্রচারান্তে দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ঘোষণাপত্র সহস্র ২ বও বিতরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে । এমন কি নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তিগণের হস্তেও এক এক খান দেখিতে পাওয়া

বৃটিশ পতাকা স্থাপনানন্তর সন্ধ্যাকালে নানা প্রকার আতশবাজীও প্রদর্শিত হইয়াছিল ।

সেই দিন হইতে “কোম্পানির” নাম বিনুপ্ত হইয়া “মহারাজীর” নাম চলিতে আরম্ভ হইল ; প্রকাশ্য ঘোষণাদিতে “দোহাই কোম্পানি” র পরিবর্তে “দোহাই মহারাজী” ব্যবহৃত হইতে লাগিল । এ প্রকার হওয়ার পরেও “কোম্পানির মূলক” কথাটা একেবারে উঠিল না, এখন পর্য্যন্ত উহা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় । কেবল থাকিল কোম্পানির টাকা, পরসী । * ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম খাশ ভিক্টোরিয়ার মুদ্রা প্রচলিত হয় ।

দিল্লীর বাদশাহের পত্তনীদার ও ইংলণ্ডাধিপতির ইচ্ছারাদার কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের বিপুল সাম্রাজ্য কুটনেধরী ভিক্টোরিয়ার অধীনে গেল ; প্রকৃতিবর্গের মনে বড় আশা হইল, তাহাদের সুখবৃদ্ধি হইবে ; সে হেতুক মুসলমানদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে কোম্পানির রাজপুরুষগণ ভাল হইলে ও তাহারা সওদাগরের কর্মচারী, প্রকৃত নরপালের কার্য্য বণিক সম্প্রদায়ের সাজে না ; সুতরাং খাশ মহারাজীর অধীনে কোম্পানির অপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা আশা করা অসম্ভব নয় । ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী অনুযায়ী মহারাজীর অন্যান্য মন্ত্রী ন্যায় একজন স্বতন্ত্র ভারত সচিব নিযুক্ত হইলেন । প্রথম প্রথম তাহার নিকট অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও বিশেষ সুবিচার পাওয়া গিয়াছিল । †

ভারতবর্ষ মহারাজীর খাশ হইল, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের হস্তে গেল । আমাদের ভাগ্যে তাহার ফল কিরূপ ফলিল, দেখা যাউক ।

গিয়াছিল । বাহাতে আপামর সাধারণের গোচর হয় তজ্জন্য সরকার বাহাদুর বিশেষ যত্ন পাইয়া ছিলেন । আমরা যেখানে ছিলাম ওখার কোন আমোদপ্রিয় লোক অনুসন্ধিৎসুদিগের প্রপ্রোত্তরে প্রচার করেন যে ঐ কাগজ ঘরে রাবিলে প্রত্যহ কিছু কিছু সুবর্ণ প্রসব করিবে, তাহাতে শেবকালে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোককে উহার জন্য কাড়াকাড়ি করিতে দেখা গিয়াছিল ।

* কোম্পানির টাকা পরসী আজ ও চলিতেছে ; কিন্তু এই বার উহা লোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে :—সরকারী খনাগারে উপস্থিত হইলেই টাকশালে প্রেরিত হইয়া গলাইয়া কেলা হইবে, এই রূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে ।

† আমরা জানি একজন ১২ টাকা বেতনের ডাকঘরের কেরানী কর্মচ্যুত হইয়া আপীল করিতে করিতে প্রথম ভারত সচিব স্যার চালস্‌ উডের নিকট হইতে বকেয়া বেতন সহ চাকরী কিরিশ পান । এখন সে রূপ কোথায় ?

ইহাং দুইটা পরিবর্তন বিশদ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হইল। প্রথম প্রথম কোম্পানির আমলে, তাঁহাদের যে সকল শ্বেতকার কর্মচারীকে “রাইটার” বলা হইত তাঁহারা ক্রমে “সিবিলিয়ান” নামে আখ্যাত হইলেন। ঐ সিবিলিয়ান গণ “হেলিবারি কালেক্স” নামক বিলাতের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তর কোম্পানির লণ্ডনস্থ তত্ত্বাবধায়ক সভারূপের বড় * কর্তাদের সুপারিসে তিন হাজার পাউণ্ড জমা দিয়া ভারতে চাকরী পাঠিতেন; সুতরাং সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ভিন্ন অন্তের ভাগো ঐ সকল দেবদুল্লভপদ বুটিত না। সাম্রাজ্য খাশ হইলে উক্ত কালেক্স উঠিয়া গেল, এবং প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার জন্মিল। এই নবীন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতবাসীর কি উপকার বা অপকার, লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা প্রাচীন পাঠকবর্গ উভয় শ্রেণীর সিবিলিয়ানের তুলনা দ্বারা বিচার করিবেন। + মোট কথা হেলিবারি ওয়ালারা বেগুন দেশের ছোট বড় সকলের সহিত মিশিতেন, নূতন সম্প্রদায়ের সিবিলিয়ানেরা সেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে জানেন নাই। সুতরাং ভারতবাসীর আচার ব্যবহারাদি তাঁহারা যে প্রকার বুঝিতেন ও মানিতেন ইহারা সে প্রকার পারেন নাই †; সিবিলিয়ানগণ

* Board of Directors and Board of Control.

+ তখনকার জনৈক কমিশনের লেখকের পিতাকে দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, বাবু! আর আমাদের মত লোক দেখিতে পাইবে না; এখন ডিপুটি বসাক বাবুর জাতীয় লোক আসিতে আরম্ভ হইল।

‡ শুড়ুক তামাক, সন্দেশ, খিচুড়ি ইত্যাদি ভারতীয় সামগ্রী পান ভোজন, দেশীয় ভদ্র-লোকদের বাটীতে বিনা আহ্বানে গমনাগমন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রাচীন সিবিলিয়ানদের উদারতা ও সহনশীলতা প্রকাশ পাইত। এইরূপ শিখারিশির দরুণ তাঁহারা আমাদের অনেক কথা তলাইয়া বুঝিতেন। একটা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা পাইব, ভিতরকার বাপার পর্যন্ত তাঁহারা কতদূর জানিতেন।—কোন সিবিলিয়ান মহোদয়ের সম্মুখে দুইজনে মধুরার চৌবে একটা বরকন্দাশী চাকরির জন্ত উপস্থিত হন, একের নাম শালগ্রাম, অপরের নাম তুলসীরাম। সাতের অনেক প্রকার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা জানিলেন সকল বিষয়ে উভয়ে সমান। কি করেন? কাহাকে বঞ্চিত করিয়া কাহার অর্থনা গ্রহণ করেন? বিষয় মুঞ্চিলে পড়িলেন; অবশেষে একটু ভাবিয়া তুলসীরামকে কাগজী প্রদান করতঃ শালগ্রামকে বুঝাইলেন, “বেশ! তুলসী তোমার মস্তকে স্থান পাইয়া থাকে, সুতরাং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” এনপ্রকার ঘটনা আজকাল কি আর দেখা যায়?

কোম্পানির সময়ে যেমন দণ্ডমুণ্ডের কৰ্ত্তা ছিলেন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেও তদ্রূপ অক্ষুন্ন প্রতাপের সহিত বিরাজ করিতে থাকিলেন ; অথচ আমাদের ভাব, প্রকৃতি, হৃদয়, আচার, ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হইত । দ্বিতীয় পরিবর্তন এই দেখা গেল যে কোম্পানি বাহাদুর বৃট্টিশ পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী ও অধীন থাকা হেতু অনেক সময় ভয়ে ভয়ে কাজ করিতেন, পাছে কোন প্রকার অন্ত্যায় অত্যাচার পার্লামেন্ট মহাসভার গোচর হইয়া ইজারাচ্যুত হন । অনেকবার তাহাদিগকে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল, বিশেষ মেয়াদান্তে নূতন চার্টার পাট্টা লইবার সময় প্রত্যেকবার বিশেষ তদন্ত না হইয়া বাইত না । খাশ হওয়ার পর ভারত সচিবের মন যোগাইয়া বড়লাট হইতে নব্য সিভিলিয়ান পর্য্যন্ত স্তাষান্তায় যাহা কিছু করুন না কেন, খোজখবর লইবার কেহ নাই ;—বামে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী, কাজে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতসচিব ও বড়লাটের হস্তে অপোগণ্ড ভারতকে সমর্পণ করিয়া অজগর পার্লামেন্ট নিশ্চিন্ত, কারণ স্বদেশীয় ব্যাপার সমূহে তাঁহারা সর্বদা এতই ব্যস্ত যে স্বদূরদেশস্থ অশুষ্ঠান (হিদের) ভারতবাসীর কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবকাশ নাই, তদ্ব্যবধান ত দূরের কথা ।

“দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা” একসময়ে যাহাদের রাজপূজার মন্ত ছিল তাঁহারা কোম্পানির আমলে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করিতে পাইয়াও নরপতির অভাব অনুভব করিতেন । বিদ্রোহান্তে সওদাগর কোম্পানির পরিবর্তে মাতৃস্থানীয়া রাজলক্ষ্মী ভিক্টোরিয়াকে পাইয়া রাজভক্তভারতবাসীর আশা ও প্রীতির যে সীমা ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য । এমন কি অবোধার শেষ অধিপতি ওয়াজেদ আলি শাই সিংহাসনচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আনীত হওয়ার পরেও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি কোম্পানির অন্ত্যায় অত্যাচার সমূহের বিরুদ্ধে আদাশ জানাইলে ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রতিকার পাইবেন ;—কাজে কিন্তু তাহা ঘটে নাই ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক ৬ কেশবচন্দ্র সেন বিলাত গমন করেন ; ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-প্রবেশ দিবসে তিনি তথায় প্রথম ভিক্টোরিয়াকে দেখিয়া এরূপ প্রকাশ করেন, —“Her majesty is a plain-looking woman in plain dress, simple yet dignified”—“মহারানী সাধারণ পরিচ্ছদে সাধারণ ভাবের

স্ত্রীলোক, সাদাসিধা হইলেও রবাব আছে ।” * প্রথমভাগের তাৎপর্য বোধ হয় এই যে প্রাচ্যরাজ্যে লালিত পালিত কেশব আশা করিয়াছিলেন, পৌষাক পরিচ্ছদের আর কোন জাঁকজমক না থাকুক, অস্ত্রতঃ রাজচিহ্ন ও শিরোভূষণ স্বরূপ একটা ছোট খাট মুকুট দেখিতে পাইবেন ; কিন্তু তাহাও নাই ।—অতঃপর ১৩ই আগষ্ট ভিক্টোরিয়ার সহিত কেশবের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয় । ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা প্রজাবর্গের নানাপ্রকার উন্নতিতে কুইন বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন । সহস্রগণ উঠিয়া বাওয়াতে তিনি বড় প্রীত, কিন্তু হিন্দু রমণীগণের ছুরবস্থা ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ, একথাও বলিয়াছিলেন । ভারতবর্ষ মানবসেবক মহাদেব ব্যক্তিগণের উত্তম কার্যক্ষেত্র, এবং কেশব তদ্বিত্ত বিলাতের অনেক ভদ্রমহিলাকে তথায় গমন করত স্ত্রীশিক্ষার কার্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার কন্যা বড় সুখী হইলেন । এই ক্ষেত্রে কেশব তাঁহার স্ত্রীর ছইখানি প্রতিকৃতি উঁহাদিগকে উপহার প্রদান করেন । ভারতের পুলিশ সম্বন্ধেও ছই এক কথা হইয়াছিল, তখনকার সংবাদপত্রাদিতে এরূপ প্রকাশিত হয় । ২৩ আগষ্ট এক পত্র দ্বারা মহারানীর প্রাইভেট সেক্রেটারি কেশবকে জ্ঞাপন করেন যে তাঁহার সহিত সে দিনকার কথাবার্তার কুইন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন । আর এক পত্র দ্বারা ভিক্টোরিয়া কেশবের ফটোগ্রাফ চাহেন । বিলাত পরিত্যাগের পূর্বে মহারানী কেশবকে তাঁহার নিজের একখানি বড় ছবি ও স্বকৃত ছইখানি গ্রন্থ উপহার দেন । পুস্তকদ্বয়ে স্বহস্তে নিজের ও

ভিক্টোরিয়ার বৃত্তিতে কেশব কোনরূপ বিশেষ ভাব দেখিতে পান নাই । আরও যখন এরূপ কোন স্থানে প্রথম তাঁহার দর্শন লাভ করি আমাদের চক্ষেও কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণাদি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দেখিতে পাইব বলিয়া আশাও করি নাই, কারণ স্ত্রীলোক ;—স্ত্রীলোকে রাজলক্ষণ আমাদের মনে স্থান পায় না । যখন বর্তমান সম্রাট যুবরাজরূপে এদেশে আগমন করেন, তৎকালে প্রথম বেদিন আমরা তাঁহার অতি নিকটে থাকিয়া তাঁহার সুষাম সুদীর্ঘ বপু (তিনি দণ্ডায়মান, আমরা সম্মুখে উপবিষ্ট) ও কমলীয় মুখশ্রী প্রভৃতি হৃদয়রূপে পর্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম সে সময়ে তৎসম্বন্ধে যে একটা অপূর্বভাব হইয়াছিল, এবং তাহাতে যে নবমুখ বিশেষ লক্ষণ নন্দনগোচর হয়, বিধবা রমণী ভিক্টোরিয়াতে সে সকল কিপ্রকারে সম্ভবে ? সে সময় অনেককে খুব নাহসের সহিত একথা প্রকাশ করিতে শুনাগিয়াছিল যে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের নন্দা হইতে যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে প্রিয় অবগয়েল নৃকে রাজলক্ষণক্রান্ত পুরুষ বলিয়া বাড়িয়া বাড়ির করিতে পারিবে । বাস্তবিক ওকণ সাক্ষ্য সুন্দর বৃত্তিখানি তৎপূর্বে বা পরে আমাদের চক্ষে আর ঘটে নাই ।

কেশবের নাম লিপিবদ্ধ করেন * । কেশব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে নিজবাটীতে শিষ্যবর্গকে আহ্বান করতঃ বিলাত হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী সংকালে প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে ঐ পুস্তক দুখানিও ছিল ; বখন উহা দর্শক বন্ধের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, সকলেই ভিক্টোরিয়ার হস্তাক্ষরের উপর হাত দিয়া তাহা মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন । আমরা এতই রাজভক্তিতে বিভোর !!!

মধ্যে মধ্যে কেশব চন্দ্র সেনের খবর লইতে ভিক্টোরিয়া ক্রটি করিতেন না ।

*On 9th august 1870 Duke of Argyll Secretary of State for India at the time wrote to Keshub Chandra Sen the following message :—"Dear Mr. Sen,—Colonel Ponsonby, the Queen's Private Secretary, has written to me that if you go down to Osborne on Saturday next, the 13th, Her Majesty will see you * * * ." * * * On reaching the royal residence he was very kindly received by Col Ponsonby, * * * He was then taken round the corridor to see the drawing-room and other elegant apartments ; and a vegetarian luncheon was kindly provided for him. At the appointed hour he was taken to the drawing-room in which he was to see the Queen, where Her Majesty and the Princess Louise soon came in. Her Majesty expressed much satisfaction at the progress of female education in india, and the improvements made in several respects by her Indian subjects in consequence of the spread of English education. She was glad that the *Suttee* had been abolished, and she showed great concern for the miserable condition of Hindu women. Both the Queen and the Princess were glad to hear that India is a great field for philanthropic labours, and that Mr Sen had requested many of his lady friends in England to go thither to undertake the work of female education. Mr. Sen had brought with him two likenesses of his wife. These portraits were graciously accepted by the Queen :—

On the 23rd Col Ponsonby wrote to Mr. Sen from Windsor, saying :—"I can assure you that the Queen was much pleased with her conversation with you, * * * ." A few days afterwards another letter came to Mr. Sen from Major General Sir T. M. Biddulph :—"I have been desired to intimate to you that it would be gratifying to the Queen and to Princess Louise to possess Photographs of you if you would not object to send some" :—Before Mr. Sen left England the Queen further showed her kindness by presenting him with a large engraving of herself and with her two books ("the Early Years of the Prince Consort" and her "Highland Journal"), the value of which was enhanced by the following inscription in each volume in her own handwriting. "To Babu Keshub Chandra Sen, from Victoria Rg. Sept. 1870".

— Miss. Collet.

ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১০ ।] সাহিত্য দরবার ।

৩৩১

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়া গভীর শোক ও কেশব পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বিশেষ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।

কেশবের দক্ষন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা কুচবিহারের মহারানী ও মহারাজার সহিত ভিক্টোরিয়া কুটুম্বিতা স্থাপন করেন । উহারা বিলাতে গেলে তিনি যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে ক্রটি করিতেন না ; এমন কি প্রথমবার যখন কেশবহুঁহিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ভিক্টোরিয়া তাঁহার মুখচুষন করিয়া আপ্যায়িত করিতে দ্বিধা করেন নাই । ইহাতে অনেক বিদ্বেনী এদেশস্থ ইংরাজের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল ।

(ক্রমঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন ।

সাহিত্য দরবার ।

বঙ্গ দর্শন, ভাদ্র ১৩১০ ।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্য দরবারে অল্প বয়সে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহার লিখিত “লক্ষণ” এই সংখ্যার বঙ্গদর্শনের উজ্জ্বল অলঙ্কার । তাঁহার প্রবন্ধ, তাঁহার বর্ণিত লক্ষণ-চরিত্রের স্ফায়, যেন “অনাবিল,—শুভ শৈফালিকার স্ফায় সুনিশ্চল ও সুপবিত্র” । তাঁহার উপসংহার অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ,—

“সোভাত্রেয় কথা মনে হইলে ‘লক্ষণ’ অপেক্ষা প্রশংসাই উপমান আমরা করনা করিতে পারি না । • • আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহ গুলিকে লক্ষণ-শূন্য করিতেছি । আজ বহুস্থানে সহধর্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কার পেটিকার ঘন্টীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে—
• যাহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহারা আজ একগৃহে স্থান পাঠিতেছেন না । হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাহাদিগকে বিশ্বনিরস্ত্রা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত মৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্চান ও পূণা হইতে আমরা স্তম্ভং সঙ্গ্রহ করিব একথা কি বিশ্বাস্ত ?

আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রানাদগৌর হইতে নেই দৃশ্য উপভোগ করেন ; আজ লক্ষ্মণের অন্ন ভুটিতেছেন না, রাম স্বর্ণখালে উপাদের আহার করিতেছেন । আজ আমাদের কষ্টে, দৈন্ত্য বনবাসের দুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণ বর পীড়নাময়ক । লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি । হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বায়ীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিনাবে নহে ; হিন্দু গৃহ-দেবতা-স্বরূপ তুমি এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে । আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এন, আমাদের দক্ষিণ বাহু অভিনববনদৃশ্য হইয়া উঠিলে—আমরা এ উদ্দেশ্যের অন্ত দেখিতে পাইব ।”

দীনেশবাবুর এই লেখা দূরগতদীর্ঘানিকবদন্ত মধুর, তারকার জ্যোতির আশ বিম্বক, দেবচরণে নিমিগু পুষ্পাঞ্জলির আশ পবিত্র । আমরা আশীর্বাদ করি দীনেশবাবু দীর্ঘায়ু হউন । কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি দীনেশবাবু ভাল উকীল হইতে পারিতেন, ভাল প্রাড়বিবাক হইতে পারিতেন না । যখন তিনি পূর্বে ভ্রাতৃর “ত্রিক” লইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মণের কথা রুক্ষ ও দুর্কিনীত, তখন ভরতই রামায়ণে একমাত্র আদর্শ চরিত্র । তিনি একে লক্ষ্মণের “ত্রিক” লইয়াছেন । সুতরাং তাঁহার মতে “ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্মণ রামায়ণের পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র” । এই প্রবন্ধে লক্ষ্মণের রুক্ষ ও দুর্কিনীত ভাব তিনি উল্লেখ করিলেন না । বরঞ্চ সুনিপুণ উকীলের আশ, তিনি লক্ষ্মণের চরিত্রে যে সকল দোষ আছে তাহাও বাক্যকোণে গুণবৎ বর্ণনা করিয়া অসম্ভব পাঠকের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন । লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত অনোধ্যাপুরী নির্দিষ্টপক্ষে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, ভরতকে বধ করায় তিনি কোন দোষ দেখিতে পান নাই (ভরতশ্র বধে দোষঃ নাহং পশ্যামি,) এমন কি হনিসো পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্ত মানসম্, বলিয়া বৃদ্ধপিভূবধ-মহাপাতকও ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থানে স্থান দিয়াছিলেন । এ গুলিতেও দীনেশ বাবু কিছুই নিন্দার দেখিতে পান নাই, বরঞ্চ তাহাতে তিনি এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের “বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই ।” দীনেশ বাবু যদি স্বকীয় ওকালতীর জালে জড়িত না হইতেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে তিনি বাহ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ্মণের বুদ্ধিনতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । লক্ষ্মণের অনোধ্যাপুরী নাশ করা,

তাঁহার বাহুবলে রামের অতিশয়ক সম্পাদন করা, ভ্রাতৃবধ পিতৃবধ করা
 ইত্যাদির প্রস্তাব একজন নিতান্ত উদ্ধত চপল একদেশদর্শি বালকের
 উপযোগী, অথবা ক্ষণে-ক্ষণে-ক্ষিপ্ততা-প্রাপ্ত ব্যক্তির যোগ্য । লক্ষণ যেমন
 একদেশদর্শী দীনেশ বাবু তেমনি একদেশদর্শী । লক্ষণের বাক্যে যেমন,
 অত্যাতি, দীনেশ বাবুর রচনাতেও সেই রূপ অত্যাতি । লক্ষণের চরিত্রে এবং বিধ
 দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহা যেমন মধুর ও সুন্দর, দীনেশ বাবুর প্রবন্ধও তেমনি
 ধর্ম্মাসনোচিত-নায়া-বুদ্ধি-বর্জিত হইয়াও মনোহর ও সুন্দর । বাগীব্রূম রাজ্যী
 কেরোলেটনের বিচার কালে, রাজ্যীর পক্ষ সমর্থনে, তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতাতে
 বলিয়া ছিলেন যে আমার মঞ্চের উপকারার্থে যদি প্রয়োজন হয় তাহা
 হইলে সমুদয় ইংলণ্ডকে অরাজক অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হইব না ।
 দীনেশ বাবুও, তাঁহার মঞ্চের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে
 নায়া-বুদ্ধিকে অরাজক অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিতে সঙ্কুচিত হন না ।
 সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্গন ভয় কাহাকে বলে তাহা বস্তুতই জানিতেন না ।
 লক্ষণও ভয় কাহাকে বলে তাহা বস্তুতই জানিতেন না । কিন্তু তিনি
 পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র তাহা কেমন করিয়া বলা যাঠিতে পারে ?
 তিনি স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন “আজ পুরুষকারের অক্ষুণ্ণ দ্বারা উদ্ধাম দৈব-
 হস্তীকে আমি স্ববশে আনিব” । কিন্তু দীনেশ বাবু যে যে স্থান উদ্ধৃত
 করিয়াছেন তাহাতে কোথায়ও লক্ষণের পুরুষকারের অক্ষুণ্ণ দেখা যাইতেছে না ।
 বরঞ্চ দৈবহস্তী লক্ষণকে অদমাবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ।
 তিনি রামকে বনবাসে যাঠিতে দিবেন না, রাম বনবাসী হইলেন ।
 ভরতকে তিনি বধ করিবেন, ভরত রাজা হইলেন, ইত্যাদি । কিন্তু
 দীনেশ বাবু কৈফয়্য দিতেছেন যে লক্ষণ প্রথর-ব্যস্তিহ-পালী হইয়াও কেবল
 “ভ্রাতৃম্নেহে স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন” । কিন্তু ইহা যে প্রকৃত
 কথা নহে তাহা দেখাইতে অধিক দূর যাইতে হয় না । মারীচ রাক্ষস
 যখন রামের স্বর অনুকরণ করিয়া “কোথারে লক্ষণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া
 উঠিল, তখন সীতা ব্যাকুল হইয়া লক্ষণকে রামের নিকট যাঠিতে আদেশ
 করিলেন । লক্ষণ প্রথমতঃ যাইতে অসম্মত হইলেন ; পরে সীতা তাঁহাকে
 তীব্র ভৎসনা করিলে ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া দৈবহস্তীর দ্বারা আকৃষ্ট
 হইয়া দূরে নীত হইলেন । এইস্থলে ভ্রাতার আজ্ঞাতে তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত
 হওয়া দূরে থাকুক, ক্রোধে ও অভিমানে ভ্রাতার আজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে বিলুপ্ত

হটল । দৈবহস্তীকে পুরুষকারের অঙ্কুরে দমন করা দূরে থাকুক, তিনি নারীর রসনা-অঙ্কুরে দৈবহস্তীর জায় নিঃস্র চালিত হইয়া ক্রোধে ছুটিলেন । মহাভারতে ভীমকে একমাত্র পুরুষকারের চিত্র বলিলে সে ভ্রম হয়, রামায়ণে লক্ষ্মণকে পুরুষকারের একমাত্র চিত্র বলিলে সেই ভ্রম হয় । এই প্রবন্ধটির সমুদয় ভুল দেখাইতে হইলে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয় । বাহাই হউক দীর্ঘ বাবুর লিপিকোণলের আমার ভ্রমসী প্রশংসা করি ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত বক্তৃতার খিলজীর বঙ্গবিজয় পাঠ করিলে ইতিহাস সে অধিকাংশ স্থলে অনুমান-খণ্ড তাহা অনুভব করা বার ।

শ্রীযুক্ত বিজয় নাথ ঠাকুরের সার সত্য আলোচনা পাঠ করিয়া এই অসার সংসারে সার-সত্যের দিকে সহজে যে পাঠকের মন আকৃষ্ট হইবে তাহা ভরসা হয় নাই ।

ঘুমাবুসি । পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের নবপ্রভাতে এবং New Indiaতে যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল তাহারই উত্তর । তবে ইহাতে লেখক নবপ্রভার নাম প্রকাশ করেন নাই । বাহা হউক প্রতিবাদস্থলে নবপ্রভাতে বাহা লেখা হইয়াছিল তাহা লেখক প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন ; ইহাতে লেখকেরা উদারতা প্রকাশ হইয়াছে ।

পস্থা, আঘাট ।

“পস্থা” নথার্থ পস্থাই বটে কিন্তু অতি দুর্গম । সাধারণ দুষ্কির অগম্য ।

ব্রহ্মবিদ্যা—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । যাহারা এইবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন তাহাই হীরেন্দ্র বাবু এবারে দেখাইয়াছেন । সাধন চতুষ্টয় [অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি (সাম, দাম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সন্মান) এবং মুমুক্শু সম্পন্ন না হইলে কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন না । ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা ঋষি সম্প্রদায়েই নিবদ্ধ ছিল । ব্রহ্মবিদ্যায় যে সকল অতীন্দ্রিয় শূন্য বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচর । সে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা শূন্য দৃষ্টির উন্মেষ আবশ্যক । যোগের সাহায্যে এই শূন্য দৃষ্টির উন্মেষ হয় । ঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ, তাহার ফলে তাহারা সনস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ।

পৌরাণিক কথা রাস পঞ্চাধ্যায়— [লেখক ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা তত কলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। “শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমন করিয়াছিলেন” ইহাই এবারকার বিষয়। অনেক স্থলে আমরা পূর্ণেন্দু বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অবতারগণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লেখক বলেন :—

‘ঈশ্বর মায়া আশ্রয় না করিলে মানুষ ভাসমান জীবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আবার ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইলে জীব মানুষ সমুদ্র উত্তোরণ হইতে পারেন না। এই জন্যই তিনি মানুষ হইয়া মানুষের কাছে গিয়া দাঁড়ান। এই জন্যই রামচন্দ্র মানুষ তিনি নিজ জীবনে নিকাম ধর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। অবতারের প্রয়োজন এই যে যাহাতে জীব ক্ষেত্রস্থ শক্তি অতিক্রম করিতে পারে। যাহাতে তাহার মিশ্রভাব দূর হইতে পারে। যাহাতে সে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ করিতে পারে।’

“সাক্ষাৎ সম্বন্ধের” অর্থ যেক্রপ ভাবে লওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের মনোমত হয় না। আর অবতারের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও সমর্থন করিতে আমরা অক্ষম। এমন অনেক অবতার আছেন যাহারা নিজ জীবনে নিকাম ধর্ম শিক্ষা দিয়া যান নাই। এমন কি কোন কোন অবতারের চরিত্র মানবের অনুকরণীয় বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। “মহাপুরুষ”দিগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আধুনিক মত সকলকে লেখক আশ্রয় করিয়াছেন বটে কিন্তু মহাপুরুষ ও অবতার এক নহে এটা তাহার বুঝা উচিত। অবতারের আবশ্যকতা গীতা এক কথায় বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন :—

“ব্রহ্মিতে যুক্ত নরে, নাপিতে হৃদ্যত

“ধর্ম সংস্থাপিতে (ভাবে) জন্মি যুগে যুগে ”

বৃন্দাবন সম্বন্ধে লেখক বলেন :—

“আমি নারায়ণ” বৃন্দাবনকে গোলকের ন্যায় শুদ্ধ সহ করিব। সেই শুদ্ধ সহ বৃন্দাবনে কেবল মাত্র আমার শুদ্ধ সহ প্রধান ভেদজ্ঞান রহিত ভক্ত গণ থাকিবে। তাহাদিগকে লইয়া আমি গোপনে লীলা করিব। আমি সখাদের সহিত বনরমণ করিব। সখীদের সহিত অতি নিভূতে রমণ করিব। কেবল আমার একান্ত ভক্তগণ ইহার রহস্য চিরকাল জানিতে পারিবেন।”

পূর্ণেন্দু বাবু “রমণেন্তু যেক্রপ বাখ্যা” করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। কিন্তু গোলকে রমণ হ কেবল নিজ শক্তি লইয়া স্থায়ী জগতে মায়া রচিত শরীর লইয়া ভেদের জগতে ভিন্ন দেহ লইয়া বিক্রপ সেই অমায়িক লীলা দেখাইত ? আনুায়িক প্রেম মানুষের জাতিবিশিষ্ট।

আমাদের মিলনত কেবল আত্মায় আত্মায় । কিন্তু মায়ায় জগতে মায়ায়চিত শরীর ভিন্ন আত্মায়ও মিলন চাইতে পারেনা । এই অপরিহার্য ভেদের কি ব্যবস্থা করিব ?

জানী যদি ভেদের মস্তকে পদাঘাত করে তবে সে মহাপুরুষ । ভক্ত যদি ভেদের ধর্ম দূরে রাখিয়া ভগবানকে আলিঙ্গন করে তবে সে কলান্তিনী । বস্তুতঃ দুয়ের এক উদ্দেশ্য । মানেব যে প্রপনাস্তে মায়ামেতঃ তরলিতে । কেহ নিবিশেষ ব্রহ্মকে আলিঙ্গন করে । কেহ সবিশেষ ভগবানকে আলিঙ্গন করে ।”

“শ্রীকৃষ্ণ অক্ষারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন । এ রমণে যে কিছু পার্শ্ববাংশ যে কিছু মায়ায় ব্যবহার তাহা কেবল যোগে মায়া রচিত । সে অংশ, সে ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ জানেন না গোপীরাও জানেন না ।”

রাসলীলা সম্বন্ধে নবপ্রভাতে প্রকাশিত স্বামী উত্তমানন্দের বক্তৃতা পাঠ্য ।

বিচার সাগর—সাগরই বটে । অতলস্পর্শ । ডুবিলে মণি মাণিক্য মিলিতে পারে । কিন্তু এত গভীর জলে আমরা ডুবিতে অক্ষম ।

শ্রীরামচন্দ্র—কুন্তিবাসের রামায়ণটা ছাপাইলে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা ভাল হইত । ইচ্ছা করে সোণার পরিবর্তে পিঠল লইতে কে চায় ?

ভগবদগীতা—গীতার বাঙ্গলা অনুবাদ ।

নবনূর—আঘাড । সম্পাদক মহাশয় আরও একটু বড় ও চেষ্টা করিলে ভাল হয় ।

নবপ্রতিভা—জ্যেষ্ঠ ও আঘাড । “জড় পদার্থের সংবেদন” ও “গীতা সমালোচনা” উল্লেখ যোগ্য ।

মহাজন বন্ধু—শ্রাবণ । শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানা বিষয়ক মাসিক পত্র । এরূপ মাসিক পত্রের বত অধিক প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল । এবারকার বিষয় :—দেশী ও বিলাতী সবজী চাষ, গাঙ্গার কারখানা, বায়স্কপ, জাহাজী কাজ, বিলাতী শনের চাষ, আধুনিক চিনির কণ্ট্রাক্ট ও স্বর্গীয় রামচন্দ্র সরকার । বেশ চলিতেছে ।

কৃষক—ভাদ্র । কৃষি ও শিল্প বিষয়ক মাসিক পত্র । এবারকার বিষয় :—বাগানের কার্য, কাসাড়া আলুর চাষ, বঙ্গদেশের জলতরঙ্গ, বীজ ক্ষেত্র, অন্নের আকর, পশুর বংশোন্নতি, ও পশু চিকিৎসা উত্তম ।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

শ্রাবণ, ১৩১০।

২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই। ইংরাজ ও ফরাসী উভয় জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন সন্ধি সম্পূর্ণ হয়।

৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই। পোপ ত্রয়োদশ লিওর মৃত্যু হয়। ...বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। .. সন্তোষ ইংরাজ রাজ আয়র্লাণ্ড প্রদেশে গমন করেন।

৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই। ডিউক অব মালবেরো অণ্ডার সেক্রেটারি অব কলোনিয় বা উপনিবেশিকসহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ...বঙ্গেশ্বর বোর্ডিলন বাকীপুরে আগমন করেন।

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই। মৃত পোপ ত্রয়োদশ লিওর অঙ্গা সমাধি হয়। ... ভাবী বঙ্গেশ্বর এন এনও ফ্রেজার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তার অব ল' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১০ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই। বঙ্গেশ্বর বোর্ডিলন মালদহে আগমন করেন।

১৩ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই। মৃত ইতালীয় নরপতির স্মারকোসৎসব রোমনগরে সম্পন্ন হয়। ... বঙ্গেশ্বর বহরমপুর পরিদর্শন করেন।

১৬ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। ... রাজ্য প্রতিনিধি লর্ড কীর্জন ভারতবর্ষের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার মৈনোর ব্যয় কতকংশ নাশ্ত করিবার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন জানা যায়। ... ধর্মযাজকগণ (Cardinals) নব পোপ নির্বাচনের নিমিত্ত গুপ্ত সভা (Conclave) আহ্বান করেন। ... দৈনিক স্ত্রী ককিরের অধীনস্থ স্ত্রীদিগের সহিত নিরা মুসলমান গণের তির্য পক্ষতের

নিকট যুদ্ধ হয়। স্ত্রী মুসলমান গণ পরাজিত ও বিভাড়িত হয়।

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে লর্ড কীর্জন প্রকাশ করেন তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যকাল পূর্ণ হইবার পর তিনি আরও কিছু কাল ভারত শাসন করিবেন। ... কার্ডিনাল মার্চো নব পোপ নির্বাচিত হন। ইনি আপনাকে পোপ দশম পাইয়স নামে আপা প্রদান করেন।

২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট। বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর লর্ড নর্থকোট অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন সংবাদ আসে। ...বুলগেরিয়ানগণ তুরকদিগের প্রতি অত্যাচার করে শুনা যায়।

২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট। হঙ্গারী প্রদেশের মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হয়। ...বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট। কনিয়া রাজ্যে কিছুদিন হইতে অশান্তি ও গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। গত বুধবার (২০শে শ্রাবণ) হইতে কিস প্রদেশ তিন দিন বেশ গোলযোগ হইয়াছিল। ... জানিতে পারা যায় যে বিলাসপুরের রাজা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট। কমন্স হাউসে লর্ড জর্জ হামিণ্টন ভারতবর্ষের অন্ন ব্যয়ে বিবরণী পেশ করেন। ...ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পীড়িত হইয়াছেন জানা যায়। ... বরোদা রাজ্যের ভূতপূর্ব মহিষী মহালসা বাই-এর মৃত্যু হয়। ইনি বরোদার মৃত মহারাজা মহেন্দ্রের রাত মৈকবারের পত্নী।

২৯শে, ১৪ই আগষ্ট । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় ।

৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট । কার্ণাটকের বেগম সাহেবের মৃত্যু হয় । তাঁহার স্বামী কার্ণাটকের নবাবের ১৮৫৬ সালে মৃত্যু হয় ।

৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট । সংবাদ আসে যে কপকলাযুক্ত মাসিদোনীয়া বাসীগণ জয়লাভ করে ।

ভাদ্র । ১৩১০ ।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট । মাসিদোনীয়া বিদ্রোহ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে । সোফিয়ার প্রকাশ বিদ্রোহিগণ তিন দল সৈন্য মনষ্টার প্রদেশে পরাজিত করে ।... ইরিগেশন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ।

২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট । কাশ্মীর প্রদেশে গত ২৪শে জুলাই তীক্ষণ জল পাতন হয় জানিতে পারা যায় ।

৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট । সংবাদ আসে উত্তর নাইগেরিয়ার ন্যায়া প্রদেশে ইংরাজ ও তুন্দুশীয় আর্মীর সৈন্যের সহিত ২৭শে জুলাই যুদ্ধ হয় । ইহাতে আর্মীর প্রভূতি সাত শত শত্রু সৈন্য নিহত হয় ।... নিজাম সম্পত্তি বেয়ার প্রদেশ মধ্য ভারতের সহিত শাসন যুক্ত প্রাধিকার হইতে বিচ্ছিন্নিত হয় ।

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট । ইংলণ্ডের ভূত পূর্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলসবরীর মৃত্যু হয় ।... আফ্রিকা নোপলে বিদ্রোহের স্বরূপাত হয় । বিদ্রোহিগণ ভাগিলিকো প্রভৃতি ১৩ খানি গ্রাম দখল করে ।

৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট । সাউথ ওয়াক নগরের বিশপ ফ্রান্সিস বোর্ণ ওয়েষ্টমিনিষ্টারে আর্চবিশপ নিযুক্ত হইয়াছেন ।

৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট । কুইন্সল্যাণ্ডের ভূত পূর্ব গভর্ণর লর্ড লামিংটন (Lord Lamington) বোম্বের শাসন কর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১১ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট । ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সরকারী কাৰ্য্য গোপন আইন বা অফিসিয়াল সিক্রেটস বিল

প্রভৃতি কয়েকটি নববিধির প্রস্তাব করা হয় ।

১৪ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট । ইংলণ্ডের অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে পৌঁছান ।... হংকংএর বর্তমান শাসন কর্তা সার হেনরী ব্লেক (Sir Henry Blake) সিংহলের শাসন কর্তা নিযুক্ত হইলেন ।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর । শান্তিপুর মিউনিসিপাল কমিশনার দিগেব হস্ত হইতে মিউনিসিপাল কার্য্য ভার রাণাঘাট সব ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের হাতে এক বৎসরের জন্য অর্পিত হয় ।... আনামের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হয় ।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর । শুনিতে পাওয়া যায় তিন দল বুলগেরিয়ান ভেনিজিয়ানা মেলনিক ও ক্রিসরা স্থানে পরাজিত হয় ।... ইংলণ্ডের ভিয়ানা নগর পরিভ্রমণ করেন ।

২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর । বরগাওগণ এক দল ফরাসী সৈন্য আলজি রয়ারলা মনগার নিকট আক্রমণ করে এবং তাহাতে ৩৭ জন ফরাসী সৈন্য নিহত হয় ।... উজ্জয়িন নগরে বার শত মুরীম সৈন্য আপনাদিগের রাজ সিংহাসনের সিংহাসনাদানী কারকের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে ।

২২শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর । গোল্ডকোষ্টের শাসন কর্তা মৈজর সার ম্যাথিউ ন্যাথান হংকংয়ের, এবং মিঃ জন, এ, রবার্ট গোল্ডকোষ্টের শাসন কর্তা নিযুক্ত হইলেন ।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, কার্তিক ১৩১০ সাল

[২য় সংখ্যা।]

ধর্ম্যকথা।

“ধর্ম্যং চর। ধর্ম্যাপরং নাস্তি।

ধর্ম্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥”

প্রবন্ধের নাম পাঠ করিয়াই পাঠক নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতেছি এ সংসারের সার বস্তু “ধর্ম্য”। ধর্ম্যালোচনা করিলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই মঙ্গল হইতে পারে। আর অর্থনীতি বল, সমাজনীতি বল, রাজনীতি বল, স্বদেশহিতৈষিতা বল, জাতীয় উন্নতি বল সকলই ধর্ম্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জগতে মনুষ্যের চেষ্টার যোগ্য যত কিছু মহৎ কার্য্য আছে সকলের মূলেই ধর্ম্য। ধর্ম্যসাধনার ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং সকলে ধর্ম্যানুসারে চলিতে শিখিলে সামাজিক উন্নতিও অবশ্যস্বাভাবিক। বলা আবশ্যক ধর্ম্যসাধনা বলিতে আমরা অরণ্যবাস বা গিরিশুভা আশ্রয় বুঝি না। আমাদের ধারণা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনাও ধর্ম্যালোচনার অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে যজ্ঞাদি ধর্ম্যশাস্ত্র প্রণেতারা এবং বেদব্যাসাদি পুরাণকর্তারা জগতের কোন্ বিষয় আলোচনা না করিয়াছিলেন? আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশের উন্নতি-কল্পে মানাপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন—অনেক সভাসমিতি গঠন করিতেছেন—অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইতেছে না কেন? শিক্ষিতগণের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গভাষার জীবৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাহ্যতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে সেই জাতীয় জীবন গঠিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। আমি বিগত

জৈষ্ঠের “নবপ্রভা” নিরতিশয় আনন্দের সহিত পাঠ করিলাম যে উক্ত পত্রিকার সুবিজ্ঞ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় আমাদের রাজনৈতিক মহাসম্মিলনী কংগ্রেসকে জাতীয় ধর্মমন্দিরে পরিণত করিতে চাহেন। এইরূপ সকল প্রকার সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানই ভগবানের নামে উৎসৃষ্ট এবং ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ বোধ হয় একথা তত চিন্তা করেন না। শিক্ষিত সমাজে অটল ধর্মবিশ্বাস নাই, এবং ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষীণতা হেতুই দেখিতে পাই, শিক্ষিতগণের মধ্যে উদ্দেশ্যের স্থিরতা এবং কার্যো আন্তরিকতার অভাব। একজন ধর্মপ্রাণ বিদ্বাসী ভক্তের দ্বারা জগতের যে পরিমাণে উপকার হইতে পারে, শত শত অস্থিরমতি বক্তা বা লেখক দ্বারাও তাহা হইবার নহে। জীবনের দায়িত্ববোধ, কর্তব্যকর্মের নির্ভা, নিঃস্বার্থ পরোপকার কেবল ঈশ্বরগতপ্রাণ ধার্মিকগণের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত ধর্ম লোককে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন করে না। বে ধর্ম প্রেমের পরিবর্তে অপ্রেম লইয়া আসে, উদারতার পরিবর্তে সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, লোকহিতকর কর্মের পরিবর্তে আগ্রহ ও বিলানিতা উৎপন্ন করে, তাহা ধর্মের নামে অধর্ম, প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। সর্বত্রই দেখা যায়, প্রকৃত ধার্মিক নিজের সুখ দুঃখাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবের দুঃখে কাতর হন, এবং জীবহিতার্থে মন প্রাণ উৎসর্গ করেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আমরা বেশ বুদ্ধিতে পারিতেছি যে শুধু ব্যক্তিগত সুখশান্তি লাভের নিমিত্ত নহে, কিন্তু তাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন লইয়া সংসার করিতে হইলে এবং ক্ষমতানুসারে সমাজের বা দেশের কোন হিতসাধন করিতে হইলে কোন প্রকার অকপট ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সংসারে যত মহৎলোক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই কোন না কোন প্রকার ধর্ম অটল বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, কিম্বা বাদ প্রতিবাদ, কিম্বা প্রবন্ধরচনা বা বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত ধর্মবিশ্বাস থাকা উচিত একথা বলিতেছি না। ধর্মবিশ্বাসের অভাবেও প্রাপ্তকৃত বিষয় সমূহে সিদ্ধিপক্ষে কোন বাধা নাই। লোকে ধার্মিক না হইয়াও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, ভক্ত বা বিশ্বাসী না হইয়াও তর্কিক লেখক বা বক্তা হইতে পারে। তবে একথা নিতান্তই সত্য যে, লোকে বাহিরে যতই কেন ভদ্র বা চরিত্রবান বলিয়া গণ্য হউক না, ধর্মবিশ্বাসের অভাবে তাহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন, সশংসুকুলিত, এবং প্রকৃত প্রেম

ও মধুরতা বর্জিত । কলতঃ আমরা সকলে স্বীকার করি বা না করি, ধর্ম বাতীত একদিনও সংসার চলে না । পণ্ডিতেরা বলেন বাহ্যিক সকলকে ধরিয়া রাখা বা বাহ্যিক সংসারের স্থিতির কারণ তাহাই “ধর্ম” । কথা নিতান্ত সত্য । যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি ধর্ম সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে । ধর্মের অভাবে একপদও চলিবার নো নাই । গৃহ, বিদ্যালয়, বিপণি, সভাস্থল সর্বত্রই ধর্মের কার্যকারিতা । প্রত্যেকে বা পরোক্ষে ধর্মশিক্ষা ও ধর্মজ্ঞান না থাকিলে পুত্র পিতৃসেবা করে না, স্ত্রী স্বামীভক্তি করে না, ছাত্র গুরুকে সম্মান করে না, বিচারকর্তা ত্রায় বিচার করে না, ক্রেতা বিক্রেতাকে বিশ্বাস করে না । মনুষ্য মনুষ্যের ইষ্টচিন্তা করে না । যদিচ অপরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিম্বা অপরের সেবা বা মঙ্গল চিন্তা করার মূলে অনেক সময়ে আমাদের স্বার্থজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে, তথাপি একথা সত্য যে, যেখানে অকপট শ্রদ্ধাভক্তি, যেখানে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, যেখানে প্রকৃত প্রেম সেইখানেই “ধর্ম” বর্তমান । প্রেম ভক্তি বা উপচিকীর্ষার মানব যখনই আত্মহারা হয়, তখনই আমরা ধর্মের অলস্তু ছবি সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই । আমরা মুখে ধর্মস্বীকার না করিলেও শিক্ষা বা স্বভাববশে যখনই ঐ সকল স্বর্গীয় বৃত্তি সমূহ দ্বারা পরিচালিত হই তখনই কার্যতঃ ধর্মপালন করিয়া থাকি । এইরূপে দেখা যায়, অনেক বাকচতুর বা রচনাকুশল ধার্মিক “ভণ্ডতপস্বী” মাত্র, এবং অনেক নির্দাক, নগণ্য, নিরক্ষর মানবও প্রকৃত ধার্মিক । ধর্মজ্ঞান অনুদীপন দ্বারা পরিষ্কৃত হয় সত্য, কিন্তু কোন অবস্থায় ইহা মনুষ্যের এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান । যে সকল মনুষ্যের আদৌ ধর্ম-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় নাই তাহারা পশ্বাদি হইতে অধিক উন্নত নহে ।

অনেকে বলেন—“আমরা ঈশ্বর স্বীকার নাই করিলাম, কিম্বা কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় ভুক্ত নাই হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি ? মুখে ধর্ম ধর্ম করিয়া কি হইবে ? আমরা সমাজনীতি পালন করিব, এবং জাগতিক ব্যাপারের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইব । ধর্ম বা পরকাল লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া কি ফল ? যে সকল ব্যাপার কেহ কখন প্রমাণ করিতে পারে নাই এবং পারিবে না, তাহা লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বাস্তব ব্যাপারের আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য । কলতঃ “ধর্ম” “ধর্ম” করিয়া চীৎকার করা কতকগুলি অলস, ক্ষীণমস্তিষ্ক, বাতিল প্রস্তু ব্যক্তির “ধর্ম” মাত্র ।

উত্তরে আমরা বলি, তোমার ধর্ম বিশ্বাস না থাকিলে তুমি কি গৃহ, কি পরিবার, কি সমাজ, কি স্বদেশ কাহারও কোন প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না । তুমি যতই কেন বুদ্ধিমান হও না, ধর্ম বিশ্বাস না থাকিলে তোমার সে বুদ্ধি অজ্ঞানতা মাত্র । তুমি যতই কেন নীতিবান হও না, তোমার সে নীতির মূলে ধর্ম-বিশ্বাস না থাকিলে তাহা কেবল লোক ঠকাইবার কৌশল মাত্র । তুমি নিজের জ্ঞানতঃ প্রবঞ্চক না হইতে পার, কিন্তু তোমার গোড়ায় গলদ থাকায় তোমার মঙ্গলেচ্ছা লোকের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে অপারগ হইয়া লোকের অকল্যাণ সংঘটন করিবে ।

ধর্ম বিশ্বাসিগণের মধ্যেও যে ভ্রান্ত লোক নাই এমন নহে । ধর্ম বিশ্বাস লইয়া জগতে এ পর্যন্ত কত গড়গোল হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন । তথাপি ইহাও সত্য যে জগতে জ্ঞানাবস্থার সভ্যতা-বৃদ্ধি এবং সর্বদ্বন্দ্বী শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোন না কোন প্রকার ধর্মবিশ্বাসে বলীয়ান মনস্বী পুরুষেরাই চিরকাল অগ্রণী ও প্রবর্তক হইয়াছেন ।

কলতঃ অকপট ধর্মবিশ্বাস নিজের ও অপরের মঙ্গলের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক ইহা বোধ হয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে না । এক্ষণে কথা হইতেছে সংসার করিতে হইলে, জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, মুখ শান্তি লাভ করিতে হইলে, অপরের হিতচেষ্টা করিতে হইলে, ধর্মবিশ্বাসের নিতান্ত আবশ্যিকতা । এখন ধর্মবিশ্বাস কাহাকে বলে ? “ধর্মবিশ্বাস” অর্থে কি, হরিহরাদি কোন দেবতার বিশ্বাস, না বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক চৈতন্যাদি মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত কোন সম্প্রদায় বিশেষে বোগদান ? আমরা বলি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম লইয়া আমাদের কোন গোলবোগ নাই । যাহার যে ধর্মে অভিক্রটি বা শ্রদ্ধা হয়, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই । তবে এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে শুধু বুদ্ধি তর্কের সাহায্যে ঈশ্বর নির্ণয় করিয়া একটি “মন গড়া” ধর্ম খাড়া করা অপেক্ষা বহু লোকের অবলম্বিত প্রচলিত ধর্মগতের কোন একটি আশ্রয় করা মন্দ নহে । কিন্তু কিরূপ ধর্ম আশ্রয় করা যায় ? গোড়া ও অর্ধাচীন ব্যক্তিগণের দৌরাণ্ড্যে সকল প্রকার ধর্মগতই এবং প্রচলিত সকল প্রকার ধর্ম সম্প্রদায়ই অল্পবিস্তর দূষিত ও অশ্রদ্ধের হইয়া পড়িয়াছে । অনেকেরই সম্প্রদায়ে বিশেষকে আশ্রয় করিতে সমূহ লজ্জা ও ঘৃণা উপস্থিত হয় । আমরা বলি যাহারা প্রাকৃত চিত্তে ও অশুদ্ধচিত্ত হৃদয়ে কোন ধর্মসম্প্রদায় আশ্রয় করিয়া আছেন বা করিতে ইচ্ছা

করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাহি । কথা হইতেছে সম্প্রদায়-নিষেধিগণের জন্য । শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মতো যাহারা শক্তিশালী তাঁহারা চেষ্টা করিলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম সকলের সংস্কার করিতে পারেন । সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মমতেই কিছু না কিছু সত্য আছে । কাল য্রোতে সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিত যে সকল জ্ঞান জুটিয়াছে, শক্তিশালী পুরুষগণের আন্তরিক চেষ্টায় সে সকল সর্বতোভাবে না হউক কিয়ৎপরিমাণেও দূরীভূত হইতে পারে । বহু ও অমুরাগের সহিত নিজ নিজ আশ্রিত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা কর্তব্য । তাহা করিতে হইলে সর্বাগ্রে সেই ধর্মটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, এবং ভাল করিয়া বুঝা হইলে তাহাতে আন্তরিক আস্থা স্থাপন করিতে হয় । তাহার পর তাহার উন্নতি করে কার্যমনো-বাক্যে পরিশ্রম করিতে হয় । ধর্মবিশ্বাস বলিতে আমরা ইহাই বুঝি এবং এই ধর্মবিশ্বাসের কথাই আমরা এতক্ষণ বলিতেছি । কিন্তু যাহারা কোনও সম্প্রদায়কে স্বীকার বা আদৌ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, তাঁহাদের বলি তাঁহারা সেই সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস হারাইতে বসেন কেন ?

আমাদের ধারণা নাস্তিক্য আর এ যুগে প্রকৃত ভাবে কোথাও নাই । অতি উচ্চ চিন্তাশীল দার্শনিকেরাও এখন আর নাস্তিক নহেন । কেহ কেহ এখনও সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রকারান্তরে মনুষ্য বুদ্ধির হীনতারই পরিচয় দিতেছেন ।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে আর পূর্ববৎ নাস্তিকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হয় না ইহা অতীব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই । কিন্তু নাস্তিকতা সূখে না থাকিলেও কার্যে অনেক সময়ে আদৌ যায় নাই । ধর্মচর্চা বিষয়ে শিক্ষিত সমাজে তেমন আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয় না । দুই চারি জনের কথা অবশ্য স্বীকৃত, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্ম লইয়া জল্পনা ও কল্পনা করেন মাত্র । তাঁহাদের জীবনে ধর্মের সাধনা দেখিতে পাওয়া যায় না । শিক্ষিত সমাজে সংস্রম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের বড়ই অভাব । শিক্ষিত সমাজ অদ্যাপি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার মোহ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই ।

শিক্ষিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান নহেন ইহা মানিয়া লইয়া, আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করি যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের সংশয় নাই থাকিল, ঈশ্বরের বিশ্বাস যখন ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের জন্যই তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তবে ঈশ্বরের

সহিত ভাল করিয়া যোগ স্থাপন করিতে, ভাল করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণা করিতে, সংক্ষেপে ভগবানে ভক্তি লাভ করিতে আর তাঁহাদের আপত্তি কি ? প্রাণ ভরিয়া পরমেশ্বরকে ডাকতে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ভগবানের সেবা ও পূজা করিতে তাঁহাদের লজ্জা কি ?

বাঁহারা উচ্চজ্ঞানের ভাণ করিয়া কহিয়া থাকেন—“জগতের যিনি আদি কারণ, তিনি নিগুণ বা নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, স্মৃতরাং তাঁহার আবার পূজা ও উপাসনা কি ? তাঁহাদিগকে আমরা ধর্মের একদেশদর্শী বা ভ্রান্ত মনে করিয়া থাকি । এক পক্ষে দেখিতে গেলে সেই ধ্বংস-নিয়ন্তা নিগুণ বা নিষ্ক্রিয় বটেন, কিন্তু অপর পক্ষে তিনিই সত্ত্ব, তিনিই কস্মঠ তিনিই সর্বদা জাগ্রত সর্বব্যাপী পরমচৈতন্য । কবি কালিদাস বিস্মৃতব করিতে বাইরা ভগবানের বার্থ স্বরূপই বর্ণনা করিয়াছেন :—

হৃদয়স্তমনাসন্নঃ অকামঃ ত্বাং তপস্বিনম্ ।

দয়ালু মনস্পৃষ্টঃ পুরাণ মজ্জরং বিহঃ ॥

সর্বজ্ঞ স্তমবিজ্ঞতঃ সর্বযোনিঃস্বমাত্মভূঃ ॥

সর্বপ্রভুরনীশত্বং একত্বং সর্বরূপভাক্ ॥

অজসা গৃহতো জন্ম বিরীহসাহতদ্বিষঃ ।

স্বপতো জাগরুকসা বার্থ্য্যং বেদ কস্তব ॥

শব্দাদীন বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং হৃচ্চরুং তপঃ ।

পর্যাপ্তোহসি প্রজাঃ পাতুম ঔদাসীন্যেন বর্তিতুম্ ॥

স্মৃতরাং অকাম বা নির্লিপ্তমুক্তিকামী মহাপুরুষগণের পক্ষে উপাসনাদির প্রয়োজন না থাকিলেও—আমাদের ন্যায় ভয়বিপদব্যাকুলিত—শোকামোহাচ্ছন্ন জন্মমৃত্যুজরাগ্রস্ত সকাম সংসারিগণের পক্ষে ভগবানের পূজা উপাসনাদির অবশ্যই প্রয়োজন আছে । আমাদের ন্যায় প্রবৃত্তিতাড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানী বা যোগী হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । আমাদের একমাত্র পন্থা ভগবানে নির্ভর এবং নালকের ন্যায় সরল প্রাণে তাঁহাতে বিশ্বাস । আন্তরিক নির্ভর ও বিশ্বাস রাখিলে, ভগবান আশ্রিত জনের হৃদয়ে একটি শুভ আলোক প্রেরণ করেন । সেই ভগবদ্রুত আলোকানুযায়ী কর্তব্য পথে চলিয়া যাওয়ার বোধ হয় কোন বিপদ ও ভয়ের আশঙ্কা নাই ।

শ্রীঃ—

ভীমরতি ।

আমরা অদ্য যে প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ইহা জনসাধারণের নিকট উপহাসের কথা বলিয়া কিখনস্তু আছে । কিন্তু পাঠকগণ সন্দেহ নীরস বিষয় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না । কিঞ্চিৎ সুখপ্রদ হইলেই এবং কিঞ্চিৎ উপদেশ থাকিলে উপহাসের কথাও পাঠ করিতে লোকের অকণ্ঠি হয় না । তাই আমরা অদ্য ভীমরতির কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

পাঠক ! গুনিয়াছেন আরোরা পঞ্চাশ বৎসর পরেই বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বন গমন পূর্বক ঈশ্বর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন । এক্ষণে গড়ে ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম সমাজের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ লোকেরই হয় না । ৪০ বৎসর পরমায়ু প্রায় সাধারণ । তবে নিশ্চিত, ধার্মিক, কৃষ্টি-বিরহিত চিন্তা-শূন্য ব্যক্তির বয়ঃক্রম ৫০এর উর্দ্ধ ইয়া থাকে ; তাহাও মহেশ্বরের মধ্যে ৫৭ অপেক্ষা উচ্চ নহে বরং নূন । তাহাদের মধ্যেও অনেকে নপুংসক অতি-ক্রম করিতে পারেন কি না সন্দেহ ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের অতি দীর্ঘ জীবন চির প্রসিদ্ধ আছে । কুলীনগণের অনেকেও দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং শরীরের সারতা ও স্বাস্থ্য নিবন্ধন পূর্বে কুলীন মহাশয়গণের মধ্যে ২৪ জনের ৩৬-টা বিবাহ শুনা যায় । তাহাদের বংশ পরম্পরা অদ্যপিও যেতে বিশ্বনাথের পৌত্র প্রপৌত্র বা অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাহারা চতুর্থ শ্রেণীর । বাহারা অষ্টোত্তর শত রামকৃষ্ণের দ্বারা বলিয়া পরিচয় দেন তাহারা বহু বিবাহীর তৃতীয় শ্রেণী বাহারা এক দিন গতে এক দিন নূতন স্বস্তরালয়াশ্রম এবং এক দিন পথিক অর্থাৎ সার্কশতাব্দিক দারপরিগ্রহী বাহাদের পথে আতিথা গ্রহণে এক দিন ও এক দিন স্বস্তরবাটী এইরূপে বৎসর কাটিয়া যাইত ; তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু বিবাহী । তাহাদের সন্তান মধ্যে অনেকেই ছমেসে রামভদ্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন । যে সকল কুলীন মহাপুরুষের ৩৬-টা বিবাহ ছিল তাহারা প্রতি দিন পর্যায়ক্রমে নূতন স্বস্তর গৃহ এবং নূতন কলত্রের মুখচন্দ্র সন্দর্শন পূর্বক এবং তাহাদের অমৃতময় বাক্যে পরমাপ্যাসিত হইতেন । এই সকল মহাপুরুষেরা অনেকেই চর্কা চোষা লেহু পেষ এবং ষড় রসাদি সুভাগ্য বস্তুর আশ্বাদ পূর্বক স্বস্তর গৃহের সুখভোগ করিতেন ইহাদিগের নাম করণ করিতে সমর্থ হইলাম না ।

কেহ কেহ ইহাদিগকে বলদেব পঞ্চানন অপভ্রংশে বলদ পঞ্চানন বলেন অথ
তিনটির নাম আমাদের কল্পিত । স্বত্তর গৃহে থাকা যে কি সুখ তাহা তাঁহারা
জানিতেন :—

অসারে খন্সু সংসারে সারং স্বত্তর মন্দিরং

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

ইহা প্রমাণ হলে পাঠ করিয়া থাকেন ।

উপহাসের কথা যাহাই হউক । পূর্বে কুণীন মহোদয়দিগের বয়ঃক্রম
অনীতি নবতি ও শতাধিক বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ ।
ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বে সুখস্বচ্ছন্দতা, নিশ্চিন্ততা, এবং ধর্ম্মানুরাগিতা
শয়ন উপবেশন ভোজনাদির পারিপাট্য হেতুই মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয় । এখন
এ সমুদয় বিষয়ের একান্ত অভাব । স্মরণ্য গড়ে চত্বারিংশৎ বৎসর অতিক্রম
করা হিন্দু সমাজের পক্ষে সহজ নহে ।

তাই ৫০ বা তাহার উর্দ্ধে বয়ঃক্রম হইলে আমরা বলি “বাওয়াই ভাল” ।
কারণ তখন পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতির সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্ত পিতা পিতামহ
প্রপিতামহের চিন্তা ও দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হয় ।

এ সময়ে প্রপিতামহ হওয়ার কাল ৫০ বা তাহার ২।৪ বৎসর উপরেই ধরা
যায় । সেই জন্তই বোধ হয় অতি ক্ষমদর্শী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ৫৫ বৎসরের পরই
তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীবর্গকে কার্য্য হইতে অবসর দেন এবং নিতান্ত অকর্ম্মণ্য
জ্ঞান করিয়া থাকেন । যাহারা পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র চারি পুরুষ একত্রে
দেখিয়াছেন তাঁহাদের কি আর উৎসাহ অব্যবসায় কার্য্য ক্ষমতা থাকে ?
ইহাই গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস । তবে কদাচিত্ কোন ব্যক্তির পক্ষে ষষ্টী বৎসর
পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ দেখাইয়া থাকেন কিন্তু সাধারণত কর্ত্তৃপক্ষ ৫৫ বৎসরের
পরই আর সে অনুগ্রহ দেখাইতে ইচ্ছা করেন না । অনুগ্রহপ্রার্থীর
শরীরের সবলতা কার্য্যপটুতা অভিজ্ঞতা ও মান সম্মান এবং পুরিবার প্রতি-
পালনের প্রয়োজনীয়তা কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহাদিগকে
অপদার্থই জ্ঞান করেন । কিন্তু কোন কোন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রবীণ
বঙ্গবাসীদিগকে বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন । তদনুসারে
তাঁহাদিগকে সরকারী কার্য্যে সপ্ততি অনীতি ও নবতি পর্য্যন্তও এমন কি
তাঁহাদিগের জীবনকাল পর্য্যন্ত সর্বদাই সংস্থাপিত রাখিতে অমনোযোগী হয়েন
নাই । তাঁহারাও নবাগণ অপেক্ষা সূচাক্রমে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন ।

আমাদের এ দেশে পূর্বতন রাজগণ যত বেশী বয়ঃক্রমের লোক পাইতেন ততই তাঁহাদের প্রতি সমাদর দেখাইতেন । এক্ষণে কতকগুলি কার্যের সুখ্যাতি-বাক্য বিপরীত অর্থে ব্যঙ্গোক্তিভেদে ব্যবহৃত হওয়ার অভিধেয় অর্থের ব্যাঘাত জন্মিয়া গিয়াছে । এই হেতু আখ্যাদিগের সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীকে ভীমরতি যুক্ত বয়ঃক্রমের মানুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে কেহ কেহ বিদ্রূপ তাচ্ছনা করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ অভিধেয়ার্থ দরিলে উহা এখনও প্রচলিত বিষয় । যেমন “রাম রাম” “মহাভারত” “সত্য সত্য” “নারায়ণ নারায়ণ” ইহা বিপরীত অর্থে মন্দভাবে লওয়া যায় । এবং প্রকৃতার্থে পবিত্রতা-বোধ হয় । তেমনি কোন ব্যক্তির উনপঞ্চাশ অতীত হইলেই পঞ্চাশে বনগমনের বিধান হেতু লোক ঐ সময়কে অকর্মণ্যতা আরম্ভের সোপান মনে করেন । অর্থাৎ তাঁহারা সাত সাততে উনপঞ্চাশ বায়ুকেও উনপঞ্চাশ বৎসর আরোপ করিয়া ঐ কালকে বায়ু রোগের উপক্রম এবং ৭২ বৎসরে বায়াত্তুরে অর্থাৎ বায়ু রোগের অত্যাধিক্য জ্ঞান করিয়া লোককে নিতান্তই অকর্মণ্য জ্ঞান করেন । এক্ষণে অবস্থায় বায়াত্তুরে মনুষ্য ইতিহাসিত জ্ঞান শূন্য মানব মধ্যেই পরিগণিত হইবেন না । বস্তুতঃ আখ্যোরা তাহা বলেন না । তাঁহারা ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন অতিক্রান্ত পুরুষকে বিষ্ণুর অংশ জ্ঞান করিয়া থাকেন । এক্ষণে বয়স অতিক্রম করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না । সেইরূপ পুরুষের যদৃচ্ছা ক্রমে গতি । বিষ্ণু প্রদক্ষিণের যে ফল তাঁহাকে প্রদক্ষিণেরই সেই ফল বলেন । এবং তাঁহার জন্মনা বিষ্ণুর মস্ত স্বরূপ জ্ঞান করেন । তাঁহার সাধারণ কথাও মন্ত্রণা মধ্যে গণ্য, তৎকৃত নিদ্রা বিষ্ণুর ধ্যান বলিয়া পরিগণিত এবং তৎকর্তৃক পঞ্চাশ বিষ্ণু আরাধনের সুখ বলিয়া খ্যাত । সুতরাং এক্ষণে আখ্যার নামই “ভীমরতি” যাহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন অতীত হইল তাঁহারই ভীমরতি হইয়াছে বলা উচিত । এক্ষণে পুরুষ বা স্ত্রী নচরাচর দেখা যায় না । দেখিতে পাইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট কত উপদেশ পাই । এবং তাঁহারা ভক্তির পাত্র বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন । বস্তুতঃ বায়াত্তুরে উনপঞ্চাশে এবং সাতাত্তুরে অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন । স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রে যে প্রমাণ আছে তাহা এই—

“সপ্ত সপ্তত্যধিকৈ বর্ষে সপ্তমেয়ামি সপ্তমী ।

রাত্রিভীমরতিনাম নরাণাং ভক্তি দুর্লভা ॥”

গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোঃ জলনং মদ্রভাষিতং ।

ধানুংনিদ্রা স্বাচানং ভীমরতাকলক্রতিঃ ॥

শ্রীলালমোহন শর্মা ।

বঙ্গের শেষবীর ।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত (রায় সাহেব) প্রণীত ।

[শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের
সহিত তুলনায় সমালোচনা ।]

লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব মহাশয় অনেক দিন হইল “বঙ্গের শেষ বীর” নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত । গ্রন্থখানি সাহিত্য-সংসারে উত্তরোত্তর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে এবং অনেক গুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসাও বাহির হইয়াছে । হারাণ বাবুর এই প্রশংসনীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ওটিকতক কথা বলিবার ক্ষণই এই প্রবন্ধের অবতারণা ।

প্রথমতঃ এই গ্রন্থের ভাষায় ও ভাবে বঙ্গীয় বাবুর অনুকরণ ও তাঁহার বিবিধ গ্রন্থের ছায়াবলম্বন পরিলক্ষিত হয় । প্রতাপাদিত্যের “পিতৃদ্রোহিতা” সীতারামের শ্রীর “প্রিয়প্রাণহস্তিতা” হইতে গৃহীত । সীতারাম যেমন ভয়ে ভয়ে শ্রীকে দূরে রাখিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যও তেমনই কৌশলক্রমে আত্মজকে দিল্লী প্রেরণ করিয়াছেন । কিন্তু শেষে বিধির বিধানে পিতৃহত্যা না হইয়া প্রতাপ কর্তৃক পিতৃব্য হত্যা সংসাধিত হইল । শ্রীও ভ্রাতৃহত্যার কারণ হইয়াছিলেন । “সীতারাম” ও “বঙ্গের শেষবীর” এই দুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দুইটা বিষয় একইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । পূর্ববর্তী গ্রন্থের ছায়াবলম্বন না করিয়া, উপন্যাস লেখক বসন্তরায়ের হত্যার পথ অন্তরিক্তে উন্মুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার কল্পনার স্বাধীন ভাবে প্রকাশিত হইত ।

শঙ্করের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ, “সীতারামে” বর্ণিত সীতারাম প্রভৃতির মুক্তিলাভের বর্ণনার অনুরূপ । উড়িষ্যার পথে ফুগজানি ও বর্ষায়সীর প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলে সহসা জয়ন্তীও শ্রীর দৃশ্য আমাদের মানসপটে প্রতিফলিত

কার্তিক, ১৩১০]

বঙ্গের শেষবীর ।

৩৪৯

হয় । পুরুষোত্তমের পথে জয়ন্তী ও শ্রী এবং বর্ষীয়সী ও কুন্দজানি ;—এই দুইটি পরিচ্ছেদ মিলাইয়া পাঠ করিলে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে । তার প্রভেদ যথাক্রমে আনো ও ছায়া । যশোহরেশ্বরীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্তির বাণী, “আনন্দমঠে”র চিকিৎসক ও “মৃণালিনী”র মাধবাচার্য্যের কথার ঠিক অনুরূপ । মৃণালিনী ১০ম পৃষ্ঠা :—

“হেন । তাহা হইতে পারে । কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে ?—আর কাহা কর্ছ ?

মাধবা । তাহাও গণিয়া দ্বিষ্ট করিয়াছি । যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে আগ্রহারণ করিবে তখন যবন রাজ্য উৎসন্ন হইবেক ।” ইত্যাদি ।

আনন্দ মঠ ১৭৮ পৃঃ—

“চিকিৎসক কহিলেন ‘সতানন্দ কাতর হইও না।—ইংরেজ রাজ্যে প্রজা স্বাধীন হইবে—নিষ্কটকে ধর্ম্মাচরণ করিবে ।’”

সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করিতে গেলে স্থান সংকুলান হয় না ,

অতঃপর [উদ্ধৃত উভয় অংশের সহিত ‘বঙ্গের শেষ বীর’ হইতে] উদ্ধৃত অংশ পাঠ করুন ।

বঙ্গের শেষবীর—২৮৪ পৃঃ—যশোহরেশ্বরীর বাণী :—

“বৎস ! নিরাশ হইও না । তুমি রাজ্য ত্রুটি হইলে বটে, কিন্তু মুসলমানও এ রাজ্যে অধিক কাল ভোগ করিতে পারিবে না । ভারতের হিন্দুশক্তি ও আত্মসভাতার পুনরুদ্ধাপন করিতে, হৃদয় যত্নোপ হইতে যেতকায় ও হৃদয় একদল জীবিত জাতি নীত্বই এখানে আগমন করিবেন । তাহার। একহস্তে সত্য ও সত্য এবং অপর হস্তে করুণা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলাইয়া, দেবতার স্মৃতি, প্রত্যেক ভারতবাসীর ভক্তি, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন । হিন্দু তখন স্বাধীন হইয়াও সর্ববিধ স্বাধীনতা স্থলের আশ্রয় পাইবে । হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য—তখন আপন আপন পথ পাইবে । তুমি সমগ্র ভারত একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া (৩) ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিয়াছিলে—কিন্তু সে সৌভাগ্য—যেত-
বোপ হইতে আগত হৃদয় পশ্চিমবাসী সেই সর্বগুণালঙ্কৃত জাতি ভিন্ন আর কাহারও হইবে না । তাহারাই ভারতের ভাবী সম্রাট । সেই স্মরণীয় রাজ্যপ্রথমকে গুরুপদে আসীন করিয়া তোমার বংশধরগণ স্থখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবে ।”

এক্ষণে আমরা দেখাইব যে এই গ্রন্থে প্রকাশিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত “মহারাজ প্রতাপাদিত্য” গ্রন্থের আংশিক ব্যাখ্যা । স্থানে-স্থানে তাহার ভাবাও অবিকল গৃহীত হইয়াছে । দুই একস্থান উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব । উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পড়িলে, আমাদের উক্তির সম্পূর্ণতা উপাধি হইবে । শাস্ত্রী মহাশয় তাহার গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলিলেন :—“একজন ব্রাহ্মণ মহা-

রাজের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্যকে প্রার্থনা করেন ।” ইত্যাদি । এ কথাটিত আছেই ; ইহা বাতীত এই ৮ । ৯ লাইন অবলম্বন করিয়া একটা পরিচ্ছেদের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে । ১৬৭ । ১৬৮ পৃষ্ঠা অবলম্বনে যে ১২শা পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে, তাহার ঘটনা ও বর্ণনায় বিষয় উভয়গ্রন্থে এক । উপন্যাস লেখক কোন নূতন কথার উল্লেখ করেন নাই ; কেবল শাস্ত্রীর উক্ত কথার কথোপকথনচ্ছলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র । ইহাতে কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হয় নাই । “মহারাজ প্রতাপাদিত্য” গ্রন্থের ৩৯ পৃঃ ২য় অঙ্কে ৩ ৪৩—৪৬ পৃষ্ঠার কতকাংশের ব্যাখ্যা, বঙ্গের শেখদীরের দ্বিতীয়খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ । ইহাতে স্থানে স্থানে উভয় গ্রন্থের ভাষাও মিলিয়া যায় । গঙ্গার দৃশ্য, গোড়ের বর্ণনা, দিল্লির কর্মচারিগণের সহিত প্রতাপের সম্মিলন ও সমস্তাপূরণ প্রভৃতি বর্ণনায় ভাষার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে । ফলতঃ শাস্ত্রী মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন, অল্পবিস্তর ভাব ও ভাষা গ্রহণ করার প্রলোভন হারাণ বাবু কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই । আর একস্থান দেখুন :—

“মহারাজ প্রতাপাদিত্য” ৮২ পৃঃ—

“মহাবীর বলবন্ত ঈশা খাঁ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে প্রণতি পূর্বক কহিলেন ‘দেব ! মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেইরূপ সত্যবাদী । আমি নমন করিয়াছি যে, একাকী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কিছু গোপনীয় বস্তুবা আছে বলিয়া তাহাকে কেনি নিভৃত স্থানে লইয়া যাইব এবং সুযোগক্রমে তাহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া আমার অধীনস্থ করিব, সেই সময় তিনি যদি আমার কোনরূপ অপকার না করিয়া কচুরায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিব, অন্যথা তাহাকে সংহার করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই নগর দেহ স্বামীকার্যে অর্পণ করিব ।”

“বঙ্গের-শেখবীর” ৩য় খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ—১৭৫ পৃঃ—

“বলবন্ত বলিল ‘ভাষণ ! প্রতাপাদিত্যের অন্য সহস্র দোষ থাকিলেও, শুনিয়াছি তিনি বড় সত্যবাদী । সত্যসঙ্গার অন্য তিনি নাকি সকলই করিয়া থাকেন । তাই আমি মনস করিয়াছি ‘কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে’ বলিয়া, আমি নিভৃতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ; এবং সেই অবসরে হঠাৎ তাহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিব যে সে সময় তাহার জীবন মরণ সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিবে ।” ইত্যাদি

বলবন্তসম্পর্কীয় ঘটনা অবিকল শাস্ত্রীর কথায় বর্ণনা করা হইয়াছে । সব সাদা, কোথায়ও নৈপুণ্য নাই । যেমন ইতিহাসে, তেমনই ঐতিহাসিক উপন্যাসে । শাস্ত্রী মহাশয় বে বে অংশগুলির গীমাংসায় উপনীত হন নাই, হারাণ বাবুও সেই সেই অংশগুলি সহজে প্রথমতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া,

অবশেষে “মহাজন যেন গন্তঃ সংপদ্য” এই স্থির করিয়া নথানথ শাক্তী মহাশয়ের ছায় অমীমাংসিত রাখিয়া গিয়াছেন । শাক্তীর ইতিহাসের ৩২ । ৩৩ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গের শেষ বীরের ২৪ । ২৫ পৃষ্ঠায় শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের প্রতাপাদিত্যের সহিত সম্মিলন অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে ।

শাক্তীঃ—৩৩ পৃঃ—

“এই সময় আর একটি বালক ইহাদিগের সহিত মিলিত হন, তাঁহার নাম সূর্য্যকান্ত গুহ ।”

রক্ষিতঃ—২৫ পৃঃ—

“নেথিতে নেথিতে, কোথাইতে, আর একটি তেজস্বী বালক আসিয়া ৩ ছুটিল । প্রতাপ তাহাকেও কোল দিলেন—তাহার সহিত অস্বহৃদর বিনিময় করিলেন । এই সৌভাগ্যবান বালকের নাম সূর্য্যকান্ত গুহ ।”

“সিরাজদ্দৌলার” গ্রন্থকার শ্রদ্ধাম্পদ বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক ক্ষালনার্থ বিপুল গবেষণা দ্বারা প্রমাণ পরম্পরা সংগ্রহ করিয়া স্বকীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন । হারাণ বাবু ৩ তাঁহার পথানুসরণে, বলবতী স্পৃহার বশবর্তী হইয়া, প্রতাপ চরিত্র সমর্থন করিতে গিয়া পার্শ্ববর্তী কেবল কতকগুলি মহৎ চরিত্র কলুষিত করিয়াছেন । এক্ষণে আমরা তাহারই ছুই একটার নমুনা দেখাইব ।

প্রতাপাদিত্য যখন তাঁহার খুড়ীমার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন, তখন যেন তাঁহাকে একটি দুর্কিনীত সাধারণ বাঙ্গালী বালক বলিয়া অনুমান হয় । বঙ্গের শেষবীর বাল্যাবস্থায় পাকশালায় উলুনের ধারে বসিয়া, আগুণ পোহাইতে পোহাইতে বর্ষীয়সী পিতামহীর নিকট আপনার বাহাদুরী দেখাইতেছেন । কখন আবার হাবা খুড়ীমার কাছে গিয়া, ইংরেজী শিক্ষিত অভদ্র যুবকের ছায়, তিনি পিতা-পিতৃবোর কার্যো উপহাস প্রদর্শন করিতেছেন । খুড়ীমা তালুক মল্লকের লোভ দেখাইতেছেন, প্রতাপ হাস্য করিতেছেন । পিতা তালুকদার, ইহা তাহার হাস্যের বিষয়ীভূত । শিবজীও এইরূপ পিতার পুত্র ছিলেন ।

ইহার পর খুড়া বসন্ত রায় আসিলেন । প্রতাপের সহিত অনেক কথোপকথন হইল । পরে প্রতাপ বলিলেন “বলিলে কিছু কড় হইবে, আমার মনোগত অভিপ্রায় আপনারা ধারণা করিতেই পারিবেন না । ৪৭ পৃঃ । কথটা ঠিক বিবাহ বিভ্রাটের মত হইল ;—“তুমি সেকলে Junior, Senior—তুমি Science এর কি বুঝব ?” অথচ শাক্তী বলিলেন—“বসন্ত রায় একজন

রাজকার্যে নিপুণ প্রজ্ঞারঞ্জক নরপতি ছিলেন ।” প্রতাপের মনোগত অভি-
প্রায় তিনি না জানিতে পারেন, কিন্তু জানিতে পারিলে কি তাহা বুঝিতেই
পারিবেন না ? বসন্তরায় এত নির্কোষ !! তৎপর প্রতাপ যখন ঈর্ষিতে
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তখন বসন্তরায় বুঝিতে পারিলেন এবং “হুর্গানাম
জপ করিয়া চারিদিক চাহিয়া (?) ভয়ে ভয়ে কহিলেন ‘তবে কি তুমি দেশকে
স্বাধীন করিয়া, স্বাধীনরাজ নান লইতে চাও ?’” প্রতাপ বলিলেন “সে
কথা আপনাকে আজ বলিব না, আর একদিন বলিব ।” কিন্তু হায়, আর
বলা হইল না । উপন্যাসে বঙ্গের শেষবীরের বাল্যজীবন একরূপ শোচনীয়
ভাবে বর্ণিত হওয়ায়, কেবল কাব্য-সৌন্দর্য্য লবু হয় নাই, বীরচরিত্রও হাশ-
জনক হইয়াছে ।

বসন্তরায় লোকটা একটা বেকুব পটনের চিত্রিত হইয়াছেন । যে বসন্তরায়
সম্বন্ধ ঘটককারিকা গ্রন্থকর্তা বলিয়াছেন :—

“শুগানকঃ পুণ্যবংশে শাস্ত্রচতা দ্বিজর্চকঃ ।

হৃতহস্ত মহাজ্ঞানী জ্ঞানকীবল্লভ স্বতঃ ॥

বভূব খালিশাবীপঃ গোড়াকোষাদিপস্তথা ।

দিল্লীশ্বর প্রসাদেন প্রচণ্ড বলবিক্রমঃ ॥

বসন্তরায় সম্রাট রাজোপাধিঃ তথৈবচ ।

প্রাপ্নুয়াৎ সমরশ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্র বিশারদঃ ॥

* * * * *

তৎপিতৃব্য মহাজ্ঞানী বসন্তরায় ভূপতিঃ ।

মহাতৈজস্ মহামানী সর্বধর্ম্ম ভূগাবরঃ ॥

সরস্বতী সমো বাগ্মী বুদ্ধৌ সাক্ষাৎ বৃহস্পতিঃ ।

মহাশক্তঃ ইষ্টভক্তঃ সর্ব শ্রেষ্ঠৈশ্চ সংবৃতঃ ॥

অধ্যায় জ্ঞানবিৎ সোপি ব্রাহ্মণশ্চ প্রিয়ঃ সদা ।

সর্বশাস্ত্রবিদান্শ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥

এ হেন বসন্তরায় একটি নিভাস্ত নির্কোষের ছায় বর্ণিত হইয়াছেন । সে
বসন্তরায়, প্রতাপ দিল্লী গমন করিলে, তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভীত ;
যে বসন্তরায় স্নেহবশতঃ প্রতাপের সহিত বহুদূর গমন করিয়া, তাঁহাকে
দিল্লীর পথে রাখিয়া আসিয়াছিলেন ; যে বসন্তরায় প্রতাপের বিপদ আশঙ্কা
করিয়া, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে দিবার পক্ষপাতী

নহেন,—সেই বনসুরায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধাচারী !! শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ৭৯৮০ পৃষ্ঠায় বনসুরায়ের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করুন । সে চরিত্রে হিংসা কখনই থাকিতে পারে না । তবে তিনি দিল্লীশ্বর-ভয়ে ভীত । কিন্তু তাই বলিয়া, জাতিহিংসার বশবর্তী হইয়া, তিনি কখন প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করেন নাই বা প্রতাপের বিপক্ষ পক্ষকে লোক-জনদ্বারা সাহায্যও করেন নাই । জাতিহিংসার বীজ সর্বপ্রথমে প্রতাপ হৃদয়ে উৎপন্ন হয় । প্রতাপ, পিতা কর্তৃক (পিতৃদ্রোহিতা-ভয়ে) দিল্লী প্রেরিত হইয়া স্থির করিলেন, ইহা পিতৃবের পরামর্শক্রমে সংশোধিত হইল । “প্রতাপ এই হইতে বনসুরায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ ভ্রমধারণাহৃদয় মধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন ।” শাস্ত্রী ৩৯ পৃষ্ঠা । চাক্ষুরি পরগণা না পাইয়া প্রতাপের রোষ-বহিঃ প্রকাশিত হইল । রামচন্দ্রের পলায়নে সে বহিতে ঘৃণাভিত্তি পড়িল । “তিনি (প্রতাপ) প্রত্যেক ঘটনাতে খুল্লতাতে কুটিলতা দেখিতে লাগিলেন । তিনিই (বনসুরায়) পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উৎপন্নের মূলকারণ স্থির করিলেন ; তিনিই চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পিতৃশত্রুত্ববশিত এবং দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তিনি রাজ্য মধ্যে উত্তম স্থান সকল গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন ।” শাস্ত্রী ৭৬ পৃঃ । এই সকল অপরাধে বনসুরায় কতদূর অপরাধী, তাহা শাস্ত্রীর গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যায় । বিক্রমাদিত্য যখন তনয়কে দিল্লী প্রেরণ করেন, তখন বনসুরায় বাধা দেন । রাজ্য বিভাগ বিক্রমাদিত্য কর্তৃক হয় । প্রতাপাদিত্য যে কুসংস্কারের বশবর্তী এবং চাক্ষুরি পরগণা লাভে অকৃতকার্য হইয়া বনসুরায়ের-হত্যা সাধন করিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট সন্দেহ নাই । বনসুরায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে বত-গুলি ধারণা, সকল গুলিই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং নিজ অস্তুরে গঠিত । ধারণা-গুলির কোন মূল নাই । বনসুরায় এবং তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য যে কলঙ্ক রাশি অর্জন করিয়াছেন, তাহা দূরপন্থায় নহে । বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয় বীর বলিয়া তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করিতে পারি, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং অকোণী বলিয়া কখনই তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না ।

হারাগণাবুর প্রতাপকে অনেক স্থানে দেখা যায়, তিনি কেবল কাঁদিতেছেন । শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত ও তদ্রূপ ! •কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর এবং ভক্তিবীর তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া কেবল কাঁদিতেই আছেন । তাঁহাদের চক্ষু যেন পার্শ্বীয় নিষ্কারিণী ।

‘বাগ্মীপ্রবর’ শঙ্কর ‘বঙ্গের শেষবীর’ গ্রন্থে একজন প্রায়ক মাত্র । এই জ্ঞানবীরের জ্ঞানের বিকাশ উক্ত গ্রন্থে কোথায়ও দেখি না । কেবল গান গাহিয়া থাকেন এবং দরবিগলিত অশ্রুত্যাগ করেন । শাস্ত্রীর শঙ্কর ও রক্ষিতের শঙ্কর দুইটি বিভিন্ন জীব । শাস্ত্রীর শঙ্কর বাগ্মী, লোকরঞ্জন পটু, বীর ;— রক্ষিতের শঙ্কর-চরিত্র সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত । রক্ষিতের সকল চরিত্রেই ক্ষুণ্ণতার অভাব । সকলেই শোকা, কিন্তু সমর-কৌশল-বর্জিত ।

ফুলজানি লেখকের অদ্ভুত সৃষ্টি । সাতের মিশ্রণে এক রং প্রতিকলিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে । ফুলজানিকে প্রথম যখন আমরা তোরাবের গৃহে সূর্য্যকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখি, তখন “নবীনা জননী” উপন্যাসের মলিনার কথা মনে হয় । তদুপর ফুলজানি ‘শাস্তি’ রূপে অবিদ্বিতা ; কিন্তু শাস্তির ক্ষুণ্ণতা তাহাতে বিদ্যমান নাই । সর্বশেষে ফুলজানি “মৃণালিনীর” মনোরমা । প্রভেদ এইটুকু যে মনোরমা পরিণীতা ছিলেন, ফুলজানি তাহা নহে । সংসারে সে সূর্য্যকান্তকে চিনিয়াছিল । সে বিশ্বজনীন প্রেম শিখে নাই ; তাহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ । অভাগিনীর মর্ম্ম-কাতরতা অসহনীয়রূপে বিস্তৃত, কিন্তু তাহা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে না । তবু এই ফুলজানিকে বাদ দিলে “বঙ্গের শেষবীর,” অবিকল পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত “মহারাজ প্রতাপাদিত্য” বলিয়া অনুমিত হইবে ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় যেমন তাঁহার গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় প্রতাপ কর্তৃক রামচন্দ্রের প্রতি অত্যাচারের কারণ সমূহের সত্য নিরূপণ করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত বিবৃত করিয়াছেন, হারাণবাবুও তদ্রূপ তাঁহার উপন্যাসের ২২৭ পৃষ্ঠায় প্রতাপ চরিত্র সমর্থনের জন্য কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কটাক্ষ করিয়াছেন ।*

শ্রী অভয়া কিশোর ভট্টাচার্য্য ।

* এই সমালোচনায় লেখক রায় সাহেবের গ্রন্থের গুণের কথা কিছুই বলেন নাই । সম্ভবতঃ তাঁহার মতে হারাণবাবুর গুণ গান অতিবাজায় হইয়া গিয়াছে ।* এক্ষণে অন্তদিক আলোচনা করা প্রয়োজন । অন্তদিক আলোচনার ভার তিনি লইয়াছেন । বাহ্য হউক যদি কেহ প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধে রায় সাহেবের পক্ষ সমর্থন করেন* আমরা আন্তরিক সহকারে তাহা চাপাইব । নঃ সঃ

কার্তিক, ১৩১০]

একখানি উইল নামা ।

৩৫৫

একখানি উইল নামা ।

পূজ্যপাদ নবপ্রভা সম্পাদক মহাশয়,

কিয়দিন হইল আমি একজন কাগজীর দোকানের নিকট দিয়া বাইতেছিলাম । তাহারা ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে কয়েক খণ্ড গোটা কাগজ পাওয়া ছই তিন জনে টানাটানি করিতেছিল । আমাকে দেখিয়া কাগজ কয়েকখানি আমার হাতে দিয়া পড়িতে অনুরোধ করিল, তাহারা শুনিয়া কতক বুদ্ধিল, কতক বুদ্ধিল না, আমাকে কাগজ গুলি দিয়া বলিল— “আপনি বাহা ভাল বোধেন করিবেন ।” আমি উহার একখণ্ড নকল রাখিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকে উইল কর্তা বা তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট মূল উইল খানি পাঠাইয়া দিলাম আর নকল খানি আপনার নিকট পাঠাইতেছি, ইহা দ্বারা যদি কাহার বিন্দুমাত্র উপকারদর্শে বোধ করেন তাহা হইলে আপনার সর্বজন প্রিয় “নবপ্রভা” প্রকাশ করিবেন ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত ।

উইল নামা ।

নিখিতং শ্রী * * * পিতা ৬ * * * জাতি * * *
পেশা * সাং * খানা সবরেজিষ্ট্রী ও চৌকি * * * জেলা ও
রেজিষ্ট্রী * * কন্ত উইল নামা পত্র মিদং সন * * * মালের * *
তারিখে লিখনং কার্য্যাকাগে । একেই তো মনুষ্য জীবন প্রাতঃ-কুন্দ-প্রভব-
শিথিলঃ অর্থাৎ প্রভাত কালীন কুন্দ কুমুমের বৃন্তের স্তায় আলগা । মৃহ্মাক্রম
সঞ্চারের সম্ভাবনা হইতে না হইতেই খসিয়া পড়ে—অতএব এ জীবন কখন
আছে, কখন নাই বলা যায় না । বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলের পক্ষেই
এইরূপ—একবার ভেদ, একবার বমন, অথবা এতহুভয়ের মধ্যে কোনটী বা
অতি মাত্রায় শারীরিক অস্ত্র যে কোন প্রকার আব দ্বারা বসিয়া থাকিতে
থাকিতে বা পথে চলিতে চলিতে হাঁচট খাইয়া, না হয়, ঘুমাইতে ঘুমাইতে
কোন আকস্মিক কারণে হুৎপিণ্ডের ক্রিয়াবরোধ মাত্রেই ইহজীবনের অবসান

হুইতে পারে । তাহাতে আবার আমার বয়স হইয়াছে, জরা আসিয়া দেহ অবিকার করিয়া বসিয়াছে । শরীর যন্ত্র স্বভাবতঃ বিকৃতি ঘাইতেছে, এ অবস্থায় আর কাল বিলম্ব চলে না, এক খানি উইল নামা লিখিয়া দস্তখত করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়াছে ।

২। আমার পুত্রকন্যায় পাঁচটি—দুইটি পুত্র, তিনটি কন্যা । পুত্র দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠটি বয়ঃপ্রাপ্ত, কনিষ্ঠটি এখনও অপ্রাপ্তবাবহার । কন্যা তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠটি পুত্রবতী, অপর দুইটি অবিবাহিতা । নিম্নের তপশীল লিখিত বিষয় বৈভবের মধ্যে “মানস ক্ষেত্র” নামে যে একটি ভূসম্পত্তি, তাহারই মধ্যে “মনোমন্দির” নামে একটি অট্টালিকা, আর “শান্তি সরোবর” নামে সরোবর তাহার তীরে একটি উদ্যান, এবং পূর্বোক্ত অট্টালিকা ও সরোবরের চতুর্দিক বেঠেন করিয়া শস্ত্র ক্ষেত্র আছে । তাহাতে শালি গুনা হরেক রকমের জমি আছে, ঐসকল জমিতে ধাতু, যব, গম, বিরি, বরবটি, বুট, মুগ, আক, আলু ইত্যাদি কসল জন্মে । সমগ্র মানস ক্ষেত্রের সীমা সরহদ মা পা ছোখা নাই—যতদূর ইচ্ছা বাড়াইয়া লইতে পারা যায় । মালিকের সহিত এইরূপ সর্ব্বোই বন্দোবস্ত করা আছে ।

৩। শান্তি সরোবরটি সুবিস্তৃত, ও সুগভীর, অনাবৃষ্টিতে উহার জল শুকাই না, সলিল স্বচ্ছ সুমিষ্ট ও স্বাদু—পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, শরীর ও মন জুড়াইয়া যায়, উষ্ণ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হইলে তাহাতে উর্ধ্বরতা জন্মে । উহাতে জলজন্তুর ভয় নাই, স্নান করিতে নাগিয়া, ডুব দিয়া তলাইয়া যাইলেও প্রাণের ভয় থাকে না, মৎস্য সুপ্রচুর—নানা জাতীয় । বার মাসই কমল কুমুদ কল্লারাদি জলজ কুসুমে শান্তিসরোবর শোভার ভাণ্ডার, সলিল সৌরভময়, হংস কুহরকাদি নানা রকমের জলচর পক্ষীর মধুর কণ্ঠস্বরে, ভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জনে স্নাতকের মন অনির্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপ্লুত হয় । শান্তি সরোবর যে সকল সুখের আকর তাহা বলাই বাহুল্য—তীরস্থ উদ্যানভূমির কথা কি বলিব, বৃক্ষবল্লীর শোভা নয়নমনোমাদিনী, কাহার কিসলয়, কাহার কুসুম, কাহার মুকুল, কাহার ফলে বার মাসই চক্ষু জুড়ায়, কোন ফল কাঁচা, কোন ফল ডাঁসান, কোন ফল পাকিয়া রহিয়াছে, সেই সকল ফলে ক্ষুধা তৃষ্ণা মার্শ করে, মনের ক্ষুধা জন্মে, শরীরে বল সঞ্চার করে । মনোহারিণী নানাবিধ লতাশুল্কের কন্দ ফলাদিও তরুণ । শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা ভেদ নাই, গাছের ডালে ডালে কোকিল কুহরিতেছে, পাখিয়া ফুকারিতেছে, বৌ-কথা-কও মধুরে আলাপ করিতেছে ;

কার্তিক, ১৩১০]

উইল নাগা ।

৩৫৭

শ্রামায় শিশ টানিতেছে ; কলকঠ কত বিহঙ্গের নাম করিব । আপনার সম্পত্তি বেশী করিয়া বলিতে লজ্জা করে, বিবর কাম্বুর কথা সনস্তই লেখার পড়ায় থাকি চাই, তাই না লিখিলে চলে না, বাধ্য হইয়া লিখিতে হইল ।

৪ । অতঃপর হৃদয় মন্দিরটীর কথা উপরে যে সকল সম্পত্তির কথা বলিলাম, এবং সেটীর কথা বলিতেছি সকলগুলিই আমার পৈতৃক, উত্তরাধিকার সূত্রে বখন চিহ্নিত বাটোয়ারা করিয়া পাঠি তখন উহার অনেক ছোট ছিল, পূর্ক্সাভ সর্ভানুসারে তলহ ভূমি খুব বাড়াইয়া লইয়াছি, এবং অট্টালিকাটীরও সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছি । এই অট্টালিকাতে ছোট বড় অনেকগুলি কুঠরি আছে । যেটা সর্ক্সাংশে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেইটীতে আমি নিজে বাস করি, তাহার ঠিক উপরের ঘরেই একটি বিগ্রহ আছেন, তাহার সেবাবন্দোবস্ত উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে বলিব । অত্যাশ্র প্রকোষ্ঠ গুলিতে বিবেক, উৎসাহ, সাহস, স্বাবলম্বন, সভা, সংযম, মিতাচার প্রভৃতি কতকগুলি পরমায়ীর এবং বুদ্ধি বাসনা আশা, অহিংসা, দয়া, স্মৃতি স্মৃতিতা প্রভৃতি পরমায়ীয়াগণকে স্থান দিতে হইয়াছে । তাহার সকলেই আমার শুভার্থী—সর্বদাই আমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন । আপদে বিপদে, সুখে সম্পদে তাঁহারাি আমার প্রধান সহায় । তাঁহাদিগকে লইয়া আমি সুখে স্বচ্ছন্দতায় বসবাস করি, কিন্তু এহেন সুখের সৌখণ্যে বিপদসঙ্কুল, সর্বদা সতর্ক না থাকিলে পদে পদে বিপদ—স্বাপদ জন্তুগণ, সর্পবিশ্চিকাদি সরীসৃপ ও পিণাচেরা তাহাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে বিপন্ন করিবার জন্য সদা সুযোগ সন্ধান করে । গৃষিক ঘরের দেওয়ানে গর্ত খোলে, সর্প তাহাতে আগ্রহ লয় ; পিণাচেরা বায়ুভরে গৃহ প্রবেশের চেষ্টা থাকে ।

৫ । বাড়ী বাগান বেড় বাগিচা পুরিণীর কথা বলা হইল । অতঃপর তাহাতে কল শস্তাদির উৎপাদন ও ভোগ দখলের কথা একে একে বলিতেছি—
জুমি ও বাগান কদাপি ভাগ জোতে বা খাজনায় বিলি করা হইবে না, নিজ জোতে আবাদ করিতেই হইবে । আবাদ তিন প্রকারে হইতে পারে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ উপায় । আবাদের অবস্থা সম্বন্ধে অগ্রে কিছু বলা উচিত । মানবমনক্ষেত্র অতি উর্বরা, ইহাতে যে কোন বীজ বপন কর, বপন মাত্রই অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ-লতা-শুল্কোষধি উৎপাদন করে, ফসল ও ফল আনা জন্মে, কিন্তু কৃষকের কৃষিজ্ঞান থাকি চাই, আর সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, তাপ ও আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু কখন তাহার অভাব নাই—এক প্রকার নয় ত্রিবিধ

তাপে ভূমি প্রায়ই সরস থাকিতে পার না—সুজন্মার জন্ত বারিপাতেই সর্বদা আবশ্যক, কেন না, সূর্যের তাপ কেবল দিনমানেই থাকে—প্রাতঃ ও সায়াহ্নে মৃদু এবং রাত্রিতে একবারেই থাকে না ; কেবল মধ্যাহ্নেই খরতর হয়, খাত্ত বিশেষে আবার তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু উপরি উক্ত ত্রিবিধ তাপ শীত গ্রীষ্ম, প্রাতঃ সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ও নিশীথ সকল সময়েই সমভাবে সকলেরই পীড়াদায়ক । সত্য বটে শান্তি সরোবরের বাগানের মাটি সহজে শুষ্ক হইতে পার না বলিয়া বৃক্ষলতাদি সহজে শুকায় না, কিন্তু কোমল প্রাণ উষ্মবিশুলি অল্পেই ঝলসাইয়া যায়, তাই প্রীতিক্রম সৃষ্টির সর্বদা প্রয়োজন, আমরা হিন্দু, আমাদের দেশ ও ভূমি দেবমাতৃক, দেবতা প্রসন্ন না হইলে বৃষ্টি হয় না, প্রীতির সঙ্কারেও দেবপ্রাধান্য আছে, সেই দেবপ্রাধান্য পূর্বজন্মের সঞ্চিত স্মৃতি বই আর কিছুই নহে । তাহাই কি সকলের ভাগ্যে ঘটে—বাহাদের ভাগ্যে না ঘটে, তাহাদিগকে চেষ্টা ও বহু সহকারে শান্তি সরোবরের সলিল সেচন করিতে হয় তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । তাহাতেও বে প্রত্যবার আছে পশ্চাৎ তাহার কথা বলিব ।

৬। পূর্বে বলিয়াছি ত্রিবিধ উপায়ে আবাদ হয়, কশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—ফসলও ত্রিবিধ—শস্ত্র, কন্দ, এবং কন্দ জাতীয় । আমার এই উইলে আমি বলিতে চাই যে কশ্মের দ্বারা শস্ত্র, জ্ঞান দ্বারা কন্দ ও ভক্তি দ্বারা ফল উৎপাদন হয় । সত্য বটে ত্রিবিধ আবাদের উপর দ্রব্যকে ফল বা ফসল বলা যায় । তথাপি আবাদের বোধসৌকর্য্যার্থ আমি উহাই স্থির রাখিলাম । আমরা গৃহী,—আমাদের প্রথমোক্তবিধ ফসলউৎপাদনের অনুষ্ঠানই সর্বপ্রথম প্রয়োজন, কিন্তু কেবলমাত্র শস্ত্রে পোষণ-সাধন হইলেও বিনা বাঞ্ছনে কে কোথায় অন্ন প্রস্তুত করে, এজন্যই আমার বোধ হয়, কশ্মের সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির আবশ্যকতা হয় । নতুবা কেবলই চাউল চিবাইতে কি প্রবৃত্তি জন্মে । ফসল আবাদজন্ত “অধ্যবসায়কে” কৃষাণ এবং “বিবেককে” মালীর কাজে নিযুক্ত করিলেই ভাল হয় । কৃষাণের শ্রম এবং মালীর বিবেচনা ইহাতেই আবাদের কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । তাহারা পতিত জমিতেও পূরা ফসল জন্মাইতে সক্ষম । আর নিজের চেষ্টা বহু ও শ্রমতো চাইই চাই । না থাকিলে, তাহারা খাটবে কেন ।

৭। বহুকষ্টে আবাদ হইলেও ঈতি ভয় আছে । তাহাতে সুজন্মা হইলেও ফসল পাকিতে পারি না, নষ্ট হইয়া যায় । এই ঈতি কানক্রোধাদি

রিপুকুল, ইহারা ফসলের বোর শত্রু—অঙ্কুর খাইয়া ফেলে, মূল কাটিয়া দেয়, আর
বহুবিধ ক্ষতি করে । বিবেক ও অব্যবসায় উভয়েই ইহাদের প্রতীকারে সমর্থ ।

• ৮। আর একটা অভ্যপাতের কথা বলিব—সেটা চাষের জমিতে আগা-
চার উদ্ভব, আগাছাও নানা জাতীয়—তাহাদের অনেকেরই দৃশ্য বড়ই নয়ন
মনোরঞ্জন—পত্র পুষ্প ফল দেখিলে শত্ৰুজননী ওষধি অপেক্ষা আদর বড়
করিতে প্রবৃত্ত হয়, আগ্রহ জন্ম, মনে হয় উহাদের ফলে অমরত্বই বা আছে ।
বাহ্য সৌন্দর্য্য এতই মনোমদ—কিন্তু তাহারা যে জাতীয় ফসলের সঙ্গে জন্মিবে,
অধিকন্তু শত্ৰু জাতীয়েরই সহিত জন্মিয়া থাকে, জন্মিলে মৃত্তিকার সমস্ত রস
আপনারাই শোষণ করিয়া তাহাদিগকে শুষ্ক শীর্ণ ও বিবর্ণ করিয়া তুলে, বাড়িতে
দেয় না, শেষে একবারেই শুকাইয়া ফেলে । পূর্বে যে মালীর কথা বলিয়াছি
সে তাহাদিগকে অঙ্কুরেই চিনিয়া গইয়া অঙ্কুরেই উৎপাটন করিয়া দেয় ।
ঐ সকল আগাছা পানদোষ, কুমতি, কপটতা, বারবিলাসিতা প্রভৃতি ।

৯। উৎপন্ন ফসল ভোগদখল করিবার পক্ষে কামনাশূন্য হইতে হইবে ।
অট্টালিকার সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে যে আমার পূর্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের
কথা উল্লেখ করিয়াছি ; তিনি রত্নালঙ্কার ভূষিত হিরণ্ময় বপু, রত্নসিংহাসনোপরি
উপবিষ্ট, শঙ্খচক্রগদাপদাধারী, মস্তকে কিরীট, করচতুষ্টয়ের হীরকবলয়, গলে
বনমালা, পরিধানে পীতাম্বর, বক্ষঃস্থলে কোমলভ, কর্ণে কুণ্ডল, শ্রীপাদপদ্মনূলে
মণিময় স্বর্ণনুপুর । জগদ্বৃদ্ধাণ্ডেও তাঁহার বিশ্বরূপের বিস্তৃতির কুলান হয়
না, এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট । কিন্তু আমাদের
মানস মন্দিরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে তাঁহার সেই বিশ্বময়ী মূর্তির
স্থান সংকুলান ক্ষমতাও সম্ভবাতীত বলিয়া সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে
মাত্র । যে হিসাবে পাঁচ ছয় ফিট উচ্চ মানবমূর্তির বা তাহার শত গুণ
উচ্চ মনুমণ্ট বা পাহাড় পর্বতের ছায়াচিত্র অর্দ্ধহস্ত পরিমিত কাচখণ্ডে লইতে
পারা যায়, তাহাতে সেই নরদেহের চক্ষু কর্ণ নাসা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ ও চিহ্নাদি বিদ্যমান থাকে—মনুমণ্টের দ্বার, উপরের
রেলিং সমস্তই থাকে, পাহাড় ও পর্বত গাত্রের বঙ্কুর স্থানে গুহা ছিদ্র সমস্তই
প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকে, প্রয়োজনমত সেই সকল চিত্রকে তাহাদের প্রকৃত
আকারে বাড়াইয়া লইতে পারা যায় বা বৃহদর্থা (Magnifying) কাচখণ্ড
দ্বারা দেখিলে তাহাদের সমস্তই সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়, ঐ বিগ্রহ মূর্তিও
সেই রূপ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে । প্রতিদিন শুদ্ধান্তঃকরণে সংযত মনে ভক্ত্যত

চিন্তে মানস ক্ষেত্রের সাবভীষ উৎপন্ন ফসলে নৈবেদ্য রচনা করিয়া তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়, চাষের ফসলে কোনমতেই আপনার ফলভোগ কামনা করা হইবে না । এইরূপে উৎসর্গ করিয়া দিবার সময় একাগ্র চিন্তে সাহিত্যিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তাহাতে মন বুদ্ধি স্থিরতর করিয়া বলিবে “হে জগন্নিবসে ! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ মনের মন—তুমি আমার মনোমন্দিরের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আসীন থাকিয়া আমাকে যেক্রমে নিবৃত্ত কর যাহা করাও আমি তাহাই করিয়া থাকি, তুমি আমার সর্ব সর্ব—তোমার তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট—তুমি আমার যাহা কর তাহাই হয়, যাহা না কর তাহা হয় না, যাহা কর তাহা ভালর জন্যই কর—ভাল বই মন্দ কখন কর না, যদি কখন আমি তাহার রহস্যভেদ করিতে না পারি, আমাকে মার্জনা করিবে । আমি সর্বদাই মোহাচ্ছন্ন, আমার মোহজাল-মুক্ত কর । তুমি আমার জীবন, নরণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম সমস্তই, ইহ সংসারে আমি উপলক্ষ মাত্র—তুমিই কর্ত্তা” । এইরূপে স্তব করিতে করিতে শান্তি সরোবরের মোহানা ছুটিয়া আপনা হইতে শান্তি-বারিতে মানস-ক্ষেত্র ভাসিয়া যায়, শান্তিজল সেচন করিবার প্রয়োজন হয় না । ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি হয় । এইরূপে উপাসনা করিতে করিতে মনো-মন্দিরের প্রকোষ্ঠটি ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে থাকে । যতই উহা প্রসার প্রাপ্ত হয়, ততই বিগ্রহ মূর্ত্তিও বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া অনন্তমূর্ত্তি দারণ করেন । তখন আর সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি মনে স্থান পায় না চিন্তা করিতেও লজ্জা বোধ হয় । এখন বুঝিয়া লও যে মানস ক্ষেত্র নিষ্কর নহে, মোরস মোকররী স্বত্ববিশিষ্ট—হিন্দুরাজাদের আমলে উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ, মুসলমানদিগের আমলে চতুর্থাংশ রাজস্ব ছিল, কিন্তু এই মোকররী বন্দোবস্ত উৎপন্ন ফসলের সমস্তই রাজার, চাষীর অংশ কিছুই নাই । তবে ফলাইতে পারিলে লাভ চতুর্ধর্গ । আর কি চাই । ফসল পূরা ষত দিন না হয় ততদিন কিছুই তাহার নহে । উপরে দেবসেবার ও ফসল ভোগের যেক্রম ব্যবস্থা করিলাম আমার পুত্রেরা তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না ।

১০ । ধনী কেন আজি কালি অনেক গৃহস্থ লোকেও কোম্পানীর কাগজ রেলওয়ে শেয়ার, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার ও অন্যান্যবিধ পলিশি কিনিয়া থাকেন, আমার নে সকলের কিছুই নাই যে পুত্র ছুইটিকে দিয়া যাই, পলিশির মধ্যে আছে সত্যতা—তাহাই ভোগ করিতে পাইলে ভীদনা থাকিবে না, সকল কষ্ট দূর হইবে ।

১১। উইলে আর অনান্য অশ্রাবর সম্পত্তির কি উল্লেখ করিব, সকলই তাহারা অবগত আছে, তবে পূর্বোক্ত অটালিকার দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে চিলের উঠিবার বাম দিকের ঘরে লোহার সিন্দুক মধ্যে নিয়োক্ত নয়টি বহুশূন্য রত্ন অতি বহু সহকারে মাজিয়া বসিয়া পরিকার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি; কতক গুলি ব্যবহার করিতে পারি নাই বা ব্যবহার করিবার সুবিধা পাই নাই, বহু কষ্টে সংগ্রহ মাত্র করিয়াছি। তাহাদের সকল গুলিতেই আগার পুত্র উইটার তুল্য স্বয়ং রহিল। তাহারা পিতার উপার্জিত সম্পত্তি জানে আদর যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে আমি সার্থক হইব।

ক। সুনোং পাইলেই পরোপকার করিবে, কিন্তু কখন কোন মতে প্রতাপকার প্রাপ্তির আশা রাখিবে না।

খ। কদাচ শত্রু সৃষ্টি করিবে না, সত্য বটে কখন কখন শত্রু স্বতঃ সম্ভব হয়, সেরূপ স্থলে আত্মরক্ষায় সতর্ক হইবে, কিন্তু তাহাকে তাহা জানিতে দেওয়া হইবে না।

গ। অভাবে স্বভাব নষ্ট হইতে না পায়। পরধনে লোষ্ট্রে জ্ঞান থাকিবে।

ঘ। কদাচ স্বার্থের সহিত সত্যের বিনিময় করিবে না। প্রাপ্যপণে সত্যের সম্মান ও সমাদর রক্ষা করিবে।

ঙ। উপার্জন যত অল্প হউক তাহাকে তদপেক্ষা অল্প মনে করিয়া সঞ্চয় করিবে, কদাচ সঙ্গতিহীন হইবে না।

চ। ভ্রাতার তুল্য বন্ধু নাই, ভ্রাতৃত্ববের মূল্য নাই—ইহা অতি মহৎ বলিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবেরই আশ্রিত, মনুষ্য হইয়া ইহাতে বাহার অনাস্তা জন্মে তাহাকে মনুষ্যোত্তর জ্ঞানে আপন মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবে, ভাইকে আপনাই হইতে অভিন্ন বোধ করিবে।

ছ। যেমন কুলাইবে তেমনি খরচ করিবে। কখন ধার করিবে না, বা ধার দিবে না।

জ। অপরকে বিশ্বাস করিবার পূর্বে যাহাতে আপনাকে বিশ্বাস করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। আত্মবিশ্বাস না জন্মিলে পরকে বিশ্বাস করিবে না। সকলের মন আপনার মনের মত একরূপ বিশ্বাস করিবে না, এজন্য অপরকে বিশ্বাস করিবার পূর্বে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবে।

ঝ। সদা সত্যকে আশ্রয় করিবে—সত্য মিথ্যা বুঝিতে না পারিলে বিবেকের আশ্রয় লইবে।

১২ । এখনও আমার আসবাব পত্র বা বিলাসদ্রব্য সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় না, অতঃপর তাহাই করিতেছি । দ্বীলোকের সীমন্তে সিন্দূর এবং হস্তে লৌহকঙ্কন যেমন সাধব্য সূচক, আজি কালি ঘড়ী ও চেন তদ্রূপ পুরুষের অবস্থাজ্ঞাপক । আমার এসকলের কিছুই নাই, তবে কাজ আটকার না—আমার সময় জানিবার জন্য দিনে সূর্য্য ও রাত্ৰিকালে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তাহাতে আমি যেমন ঠিক সময় জানিতে পারি রাদারহামেও তাহা জানাইতে হারি মানে । ঘড়ী আটকাইয়া রাখিবার জন্যই চেন, আমি বে ঘড়ীর কথা বলিলাম তাহা ঈশ্বরের নিয়মরূপ শৃঙ্খলে ঝুলান আছে ।

১৩ । অনুলায়ের ঝাড লঠন আমি কখন ব্যবহার করি না, পূজা পার্বণেই আলোকোৎসবের প্রয়োজন হয়, আর বিদেশে বড় মানুষদের চক্ষে বাতির আলোক ভিন্ন অন্য আলোক ঠাণ্ডা লাগে না, তাই তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন । আমরা হিন্দু পৌর্ণমাসীকে প্রধান জ্ঞান করি, সেইদিন রাত্ৰিতে আকাশে চন্দ্রমা সমস্ত রাত্ৰি স্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তার করিয়া অমৃত ধারা নিষ্কন করে । বড়মানুষের মজ্জালেশের আলোক আমাদের উহা অপেক্ষা কখন ভাল লাগে নাই বলিয়া—আমি ঐ রোসনাইই ভালবাসি । আমার পুত্রেরাও যেন আলোকোৎসবের জন্য বুখা অর্থব্যয় না করে, চাঁদনি রাত্ৰি দেখিয়াই যেন পুতকন্যার বিবাহের দিন স্থির করে ।

১৪ । তুরস্ক দেশজ কার্পেট পাতিয়া আমি প্রায় বসি নাই—কখন বাড়ীর বাহিরে বসিতে হইলে আমি শম্পাবৃত ভূখণ্ডে বসিতেই বড় ভাল বাসি । কার্পেটের সৌন্দর্য্য মলিন হয়, কার্পেট পোকায় কাটে, আমার আসন কখন মলিন হয় না, কাদা লাগিলে ঝাড়িয়া ফেলিলেই চলে, যদি পশুতে খায় এক রাত্ৰিতেই গছাইয়া ঠিক হয় । আমার পুত্রেরা উহাকেই যেন সখের আসন গণ্য করিয়া সময়ে সময়ে তাহাতে বসিয়া তৃপ্তি লাভ করে, আর তাহাদের জামাতৃগণ বাড়ীতে আসিলে অস্তুতঃ একদিনও আদর করিয়া তাহাতে বসায় ।

১৫ । টানা পাথার হাওয়া খাওয়া আমার অভ্যাস নাই । গ্রীষ্ম প্রথমনার্গেই উহার প্রয়োজন, কিন্তু বখনই গ্রীষ্মের দুঃসহতাতিশয়া অনুভূত হয়, তখনই স্নানস্পর্শ সমীরণ আমার শরীর শীতল করে, তাহাতে আমার গ্রীষ্মাতিশয়া যেমন নিবারণ হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না ।

১৬ । বড় মানুষরা পরস্পর খরচ করিয়া কুস্তিগীরের কুস্তি দেখেন, মনে আনন্দ লাভ করেন, আমার বখনই কুস্তি দেখিয়া চিত্ত বিনোদন করিবার

কার্তিক, ১৩১০ ।]

উইল নামা ।

৩৬৩

প্রয়োজন হয় আমি তখনই বাড়ীর বাহির হইয়া দেখি শাখামৃগগণ বে কুন্তি করিতে থাকে তাহার মত কুন্তি কেহ কখন দেখে নাই । তাহারা যেমন বৃক্ষের শৃঙ্গ-শাখার খেলা করিতে পারে মানুষে তেমন পারে না ।

১৭ । রাফেলের ছবি কখন দেখি নাই, রবি বর্ম্মার ছবি টাকা দিয়া কিনিতে ইচ্ছা হয় না, বহুক্ষণ একদৃশ্য দেখিয়া নয়নের ক্লান্তি জন্মিলে আমি মাঠে, নদীতীরে বা বনের ভিতর গিয়া প্রকৃতির পটে বিশ্বশিল্পীর অঙ্কিত বে চিত্র দেখি তাহার কাছে রাফেল বা রবি-বর্ম্মার চিত্র কোশল কি করিবে । আর মনুষ্য-চিত্র দেখিয়া চিত্র বিনোদনের প্রয়োজন হইলে অন্তঃপুর ও গৃহস্থলী মধ্যে যে সকল বিকচকমলের জায় প্রকৃত্তামর পুত্র কণ্ঠ, ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র-পুত্রীগণের ছবি নিরন্তর দেখি তাহা অপেক্ষা অধিক শ্রীতিকর চিত্র আর কি হইতে পারে !

১৮ । টাকা দিয়া কখন ফ্লুট হারমোনিয়ম ক্রয় করি নাই, অথচ তাহাদের অপেক্ষা সুস্থর লহরীতে চিরদিন শ্রুতি রঞ্জন করিয়া আসিয়াছি—অরুণোদয় ও অরুণাস্ত কালে যখন প্রকৃতির প্রসন্নতাময়ী মূর্ত্তি মনকে অনির্বচনীয় শ্রীতিরসে পরিপ্লুত করে সেই সেই সময়ে এবং কোমুদীময়ী গুরু বামিনীর মধ্য ভাগে নানা জাতীয় বিহঙ্গমরবে যে শ্রুতি সুখের সঞ্চার হয় তাহা কি সংসারের আর কোন সুমিষ্ট স্বরের সহিত তুলনার যোগা । এই সকল প্রাকৃতিক বৈভবে মানব পুরুষানুক্রমে বৈভবান্বিত, পৈতৃক বিভব সুখে বাহার মন সুখী হয় না, তাহার মনুষ্য জন্মই বিফল ।

১৯ । আমি এই উইলে আমার যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ করিলাম তাহা আমার পুত্র দুইটিকে তুল্যাংশে ভোগ দখল করিবার অধিকার দেওয়া হইলেও বিভাজ্যতা দোষে দূষিত নহে । শতধা বিভক্ত হইলেও উহা সমষ্টির তুল্য । আমি যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লাভ করি তখন উহা চতুর্থ বিভক্ত হইয়াও বিভাগান্তে দেখি ঘোল আনায় পূর্ণ ।

২০ । উইলের লিখিত সম্পত্তি উইল কর্ত্তার পরলোকান্তে উইল গৃহীতা-গণের দখলে আসিয়া থাকে, এবং উইল ও প্রোবোন্টের পর বলবৎ হয়, কিন্তু আমার এই অপূর্ব উইলের অপূর্ব সম্পত্তির প্রায় সকল গুণিই আমার পুত্রগণের ভোগাধিকারে আসিয়াছে, আমার কর্ত্তব্যাবধীনে তাহারা বিষয় কার্য্য দেখিতেছে, শিখিতেছে, তবে যে উইলনামা লিখিত করা তাহা কেবল তাহাদিগকে যদৃচ্ছাচারী হইতে না দিবার জন্য ।

২১। আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্ঞানানন্দকে এই উইলের এগজিকিউটার নিযুক্ত করিলাম । আমার পুত্র দুইটি উপরিউক্ত সমস্ত সর্ব অর্গত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকটি পালন করিবার পক্ষে ক্রটি না করে—এবং দৈবের কথা বলা যায় না, আমার কনিষ্ঠ পুত্রের নাবালকবস্থায় যদি আমার দেহান্তর ঘটে তাহা হইলে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার প্রতি জ্যেষ্ঠের বান্ধী কৰ্ত্তব্যতা পালন করিয়া সে নাবালক হইলে তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেয়, এবং কন্যা দুইটির বিবাহ যদি আমি দিয়া যাইতে পারি ভালই নতুবা সে পক্ষে পুত্র দুইটিতেই আপনাপন কৰ্ত্তব্যতা সম্পাদন করিবে । আরও আমার ইচ্ছা যে আমার অন্যান্য বংশধরগণও তাহার কোন সর্ব লঙ্ঘন না করে ।

২২। এই উইলের মর্মার্থ অবগত হইয়া যদি কেহ তাহার ফলভাগী হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহ কখন তাহাতে কোন প্রকারে দাবি দাওয়া করিতে পারিবে না, করিলে তাহা সর্বত্র সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে ।

আমি সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিনা অনুরোধে এই উইল করিলাম । ইহাই আমার শেষ উইল ।

(সাঃ) শ্রীজীবানন্দ চক্রবর্তী ।

মায়া ।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

জমিদারের অন্তঃপুর ।

পারিসম্বাহনঃ চক্ৰঃ কেচিৎশ মহাশয়নঃ ।

অপরে হত-পাপ্যানো ব্যজটনঃ সমবীজয়ন ॥

কেহ সেই মহাশয়ের পা টিপিয়াছিলেন, আর নিম্পাপ আর এক জন তাহাকে পাখা দ্বারা আঘাত আঘাত বাতাস করিয়াছিলেন ।

নরেশ বাবুর জীর নাম হীরাননি । হীরাননি পরম সুন্দরী, কথঞ্চিৎ কৃপা, গৌরাঙ্গী, আরতলোচনা, রসরসিতাধরা । কিন্তু কুসুমে কট । তিনি নিত্যই

অমুহ, অমৃতঃ তিনি নিজে এট কথ প্রচার করেন । সুতরাং সেই বরাদ্দনার আলস্ত-প্রতিভা কুমুম-কোমল দেহ হৃদয়-ফেন-নিভ-শস্যের দিবারাত্র লুপ্তিত হইত । অদ্য এক জন দাসী তাহার পদসেবা করিতেছে, আর এক জন ব্যজন সঞ্চালন করিতেছে, আর এক জন ছনিয়ার লোকের কুংসা কীৰ্ত্তন করিতেছে । পরের কুংসা শুনিতে হীরামণির বড় সাধ । এমন কি, যখন তিনি কুংসারূপ সরস উপাদেয় খাদ্য কর্ণদ্বয় দ্বারা গ্রাস করেন, তাহার মনে এক অপূৰ্ণ হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনমুতদেহ সজীবিত হয়, এবং নিজের অমুহতার কথা ভুলিয়া গিয়া প্রাণ ভরিয়া হাস্ত করেন । যে দিনকার কথা বলিতেছি, সে দিন অনেকের সুনামের প্রাপ্ত করিয়া কুংসাকীৰ্ত্তনী দাসী হীরামণিকে বলিল “মা শুনেছ, একটা ভারী মজার কথা ?”

হীরামণি । কি ?

দাসী । তোমার কাছে শীঘ্র একটা সতী সাধবী বৌ আসিবে ।

হীরামণি । কেমন ?

দাসী । সে নিজেই বলিবে ।

হীরামণি । ওলো, লোকটা কে ?

দাসী । কে জানে । তার নামটী ভাল—মনে হচ্ছে না—সৌদামিনী না কুমুদিনী ।

হীরামণি । কার বৌ ?

দাসী । মরেশ, না পারেশ, তারই বৌ ।

হীরামণি । (হাসিয়া) যদি পারেশের বৌ হয়, তা হইলে সেও মিষ্টি ?

দাসী । কেমন মিষ্টি, তা না কি তোমাদের নায়েব নটবর বেশ জানে ।

কিন্তু,

নাকি খেতে খেতে মিষ্টি ।

তার পিটে পড়েছিল ঘটি ॥

হীরামণি । (হাস্য) বেশ, বেশ । কিন্তু সব কথা ভেঙ্গে ভাল করিয়া বল ।

দাসী । ভূমি ত সব শুনেছ ।

হীরামণি । আমি ত শুনেছি ঐ মাগীর স্বামী তারি বজ্জাত । সেই ডাকরা প্রজাবিজোহের গোড়া । তাহাকে শাসন করিবার জন্য নটবর নায়েব তাঁর বোকে গুমি করিয়াছিল, প্রজারা বোটাতে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ।

দাসী । ভিতরের কথা বুঝি শুননি ?

হীরামণি । বল্ না নো ।

দাসী । গোড়া থেকে ?

হীরামণি । যেখান থেকে মিষ্টি সেখান থেকে শুরু কর ।

দাসী । এক দিন সেই গ্রামে পদ্মা নদীর ধারে তোমার নটবর—

হীরামণি । মর্ । আমার নটবর কেন ?

দাসী । তোমার নায়েব নটবর—

হীরামণি । তাই বল্ ।

দাসী । তাই ত বল্ছি । —নটবর পদ্মা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিল ।

হীরামণি । নটবর ত যমুনার তীরে বাঁশী বাজাইতেন । পদ্মার তীরে কেন ?

দাসী । যমুনা, পদ্মা, গঙ্গা—সকল নদীর ধারেই আমাদের সেই পুরাতন রসিকশেখর-কৃষ্ণ ঠাকুরকে পাওয়া যায় । আর সকল গ্রামেই ব্রজগোপী পাওয়া যায় । আহা ব্রজগোপীর সাধনা কেমন মিষ্টি । মা ঠাকুরণ্ ! না ?

হীরামণি । তার পর কি হইল বল্ । ধান ভানতে শিবের গীত—

দাসী । অত ব্যস্ত হইয়া না । বল্ছি—তার পর, ইঁ, মোহন বাঁশী বাজাচ্ছে । এমন সময়ে বোঁটা কলসী কঁাকে,—হাত দোলাতে দোলাতে, উঠতি বরসের রূপ ছড়াতে ছড়াতে, ঘাটে নামিল । এদিকে নটবর বাঁশী ধুব সুর তুলে বাজাতে লাগলো—“ও বোঁ—ও বোঁ—বোঁ—ফোঁ ফোঁ—” (হীরামণির হাস্য) যেমন এক দিন কালিন্দী-কূলে, কৃষ্ণঠাকুর মোহন বাঁশী বাজিয়েছিলেন—“রাধা—রাধা—ধা—ধা—ধা—”

হীরামণি । সাবাস নো, সাবাস, তারপর ?

দাসী । নিপটে, চাসার মেয়ে, ব্রজগোপী ত নয়—রাধার মত অত সেন্ধানী ও নয় । বাঁশীর ইসারা বুঝলো না । তখন নায়েব মহাশয় বাঁশী ছেড়ে একটা গান ধরে দিলেন ।

হীরামণি । একটা গান ধরে দিল ? গানটা বল্ না ।

দাসী । আমি কি নিজে সে গানটা শুনেছিলাম তাই বল্ ?

হীরামণি । এত কথা শুন্নি, আর গানটা শুনিম কি ?

দাসী । তবে বলি—

“ এখন ও এল না সই—”

হীৰামণি । গান করে বল্ না লো ।

দাসী । তবে কি নটবর সাজতে হবে নাকি ?

• হীৰামণি । ভালই ত, এক বার ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে, খোপাটা চুড়া করে বেঁধে, বাঁশী হাতে করে, দাঁড়া দেখি ।

রসময়ী । না, না, ছি !

রামী ও শ্যামী কী খুব হাসিয়া বলিল, “রসময়ী ! এক বার দাঁড়া না ।”

রসময়ী । আমি থিয়েটারের মেয়ে নাকি ?

হীৰামণি । তা না হলি, এক বার নকল কর্ না, তুই দিবি নকল করতে পারিস্ ।

রসময়ী ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া এক খানি পাখা বাঁশীর মত ধরিয়া, অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া বলিল—হয়েছ ত এখন ?

হীৰামণি । বাহবা ! বাহবা ! এখন গানটা গা ।

দাসী । না না বাবু এসে পড়বেন ।

হীৰামণি । মিহি সুরে গা—শ্যামী তুই একটু বাহিরের দিকে গিয়ে দাঁড়া । বাবু আসেন যদি সাড়া দিস্ (শ্যামী চলিল) এখন গান কর ।

রসময়ী নটবর সাজিয়া, দ্রবৎ প্রকৃষ্টিত করিয়া, ভ্রমর গুঞ্জনে গান করিতে লাগিল ।

গান ।

এখনও এলো না সে, সেই লো সেই ।

ধৈর্য ধরিতে নারি সই লো সেই ॥

সেই কাল শশী, বড় ভাল বাসি,

প্রাণে প্রাণে মিশি, সেই লো সেই ॥

যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,

বাজাইয়া বাঁশী, সেই লো সেই,

হরিল পরাগ—গেল কুল মান,

তারে ভরা আন, সেই লো সেই,

মধু নিধুবনে, তাঁহার চরণে,

ঢালিব পরাগে, সেই লো সেই ॥

রসময়ী খুব ভাল গান করিতে পারিত, তার গলা বড় মিষ্ট । সে অল্প অল্প হুলিয়া হুলিয়া, চোখ ঢ়নু ঢ়নু করিয়া, মৃদু-অনন্দ ইন্দ্রিয়াসক্তির ঢেউ তুলিয়া

কলকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল । হীরামণি ও তাহার ছই বী “রাধাভাবে”র বিস্তৃতা বিস্তৃত হইয়া (পণ্ড ভাবেই) মদালসা হইল ।

হীরামণি । বেশ, বেশ, “সই লো সই—মধু নিধুরনে, তাহার চরণে, ঢালিব পরাণে সই লো সই” ঐ খানটা বড় ভাল ।

বামী । কিন্তু গানটা রাধার—কৃষ্ণ বা নটবরের মুখে ভাল লাগে না ।

রসময়ী । তুই ত ভারি বুজি নু ।

হীরামণি । গানটা শুনে বৌ কি করিল ?

রসময়ী । কি আর কর্বে । গানটা শুনে, তার মনটা একবারে গলে গিয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিশে গেল । তার পর চারি চক্ষু এক—বেই চোখোচোখি হলো, বোটা ভেবুড়ে কেঁদে উঠিল ।

হীরামণি । কাদিল কেন ?

দাসী । ওটা কাচ—অর্থাৎ আমি খুব ভাল—আমাকে ও রকম ইসারা করায় আমার বড় অপমান হয়েছে ।

হীরামণি । বিড়ি ত খুব চাতুরী জানে । (পাঠক দেখিতেছেন—মন্দ লোকের কল্পনা কি রূপে ভাল লোকের কুৎসা সৃজন করে—আর আবিলা চিত্র সেই কুৎসা কি আগ্রহের সহিত পান করে) ।

দাসী । তার পর, সেই গায়ে একটা নামজাদা পুরান পাপী, বিসি নামে একটা ঘট্‌কী আছে । তাকে ঐ বোটার কাছে নায়েব পাঠিয়ে দিল । কিন্তু বোটা নাকি প্রথমে রেগে কঁই হলো ।

[পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, পাপিষ্ঠা বিসি—সতী কুমুদিনীর নিকট পাপ-প্রস্তাব করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু কুমুদিনীর পবিত্রতাতে পাপিষ্ঠার মন এমনি পরাভূত হইয়াছিল যে, সে নায়েবের ঘৃণ্য কথা প্রস্তাব করিতে আদৌ সাহস করে নাই ।]

হীরামণি । কেন ?

দাসী । বুঝ্‌ছো না ? গহনা ও টাকা নেবার ফিকির । নায়েব মশায় খুব বুঝমান্‌ লোক কিনা । চট্‌ক'রে বুছে ফেল্‌লো । নায়েব মশাত টাকার কাঁড়ি । তখনই একখানি ডায়মন্ড কাটা চক্‌চকে সোণার চিক পাঠিয়ে দিল, আর নগদ ৪০ টাকা । গরিবের বৌ গহনা আর টাকা পেলে কতক্ষণ ঠিক থাকতে পারে ? (বুঝমান পাঠক বুঝিয়াছেন যে এই কথা গুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রসময়ীর সৃষ্টি) ।

কার্তিক, ১৩১০ ।

মায়া ।

৩৬৯

হীরামণি । তা বটেইত, তার পর ?

দাসী । তার পর বিসি আসে বায়—বৌকে নুকিয়ে নুকিয়ে নটবরের কুঞ্জে নিয়ে যায় । (পাঠকের বোধ করি মনে আছে, যে কুমুদিনী নিজে নায় নাই, নায়েবের লাঠিরালগণ বনপুঙ্কক তাহাকে লইয়া গিয়াছিল) ।

হীরামণি । তখন তাহার পোড়ামুখো স্বামীটা কোথায় ?

দাসী । ছেলে ! তাতেইত নায়েব মশায়ের খুব সুবিধা হইছিল ।

হীরামণি । তার পর ?

দাসী । তারপর, মাঠাকুরাণ. একরাত্রি নটবরের বাগান বাড়ীতে যখন ছুটু ছেনেই মন্ত—(পাঠকের মনে আছে বোধ করি যে কুমুদিনী বীরাসনার জায় আপনার সতীত্ব রক্ষা করিতেছিল, এবং নায়েবের উদরে সজোরে পদাঘাত করিয়াছিল)—তখন প্রজারা মুগুড় দিয়া ধমাস করে ছুয়ার ভেঙ্গে ফেলিল—নায়েব লাফিয়ে ছুয়ারে দাঁড়াল—অমনি মিসেরা ধপাধপ লাঠি—নায়েবের পিঠের উপর ।

হীরামণি । কি রে ? আমাদের নায়েব, তার পিঠে লাঠি ! প্রজাদের এত বড় আশ্পর্ক ! আজগেই বাবুকে বলিব, সব প্রজাদের ঘর আলিরে দেও, ভিটেতে লাঙ্গল চনবে । বাবু তাদের মুণ্ড নিয়ে ভেঁটা খেলা করবে, তা তারা জানেনা বুঝ ?

দাসী । তাত সত্যিই, প্রজারা কি আর কেউ আগে বেচে থাকেন ? কথায় বলে—

পিপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে ।

কাক চিল আর ফিংয়ে বরে খায় তারে ॥

হীরামণি । তার পর ?

দাসী । তার পর, যখন নায়েবকে ঐ রকম লাঠি চড় কিল দিতে লাগলো—ছুড়ীটে বলে কি না,—“নায়েব মশায় আমার প্রাণ, বরঞ্চ আমাকে খুন করো, তবু ওঁকে মেরো না” । চাসার মরদ তাকি আর শুনে । তারা নায়েবের গলায় দড়ি বেঁধে হাতাং নাস্তাং কর্তে কর্তে নিয়ে গেল ।

হীরামণি । বোটা তখন কি করিল ?

দাসী । বোটা পিছে পিছে যেতে লাগল আর টেচিয়ে বলতে লাগলো—“ওগো আমি নায়েব মশায়কে ছেড়ে থাকতে পার না—ও—মা—গো—মা—ওগো আমার কি হলো গো—মা” ।

হীরামণি । বলিস কি ? বিটিত ভারি বেহায়া !

দাসী । বেহায়া নয় ? কলিকালের মেয়ে, বয়সকাল, গরিবের বো । টাকা পেলেনই অজ্ঞান । জানইত ।

হীরামণি । সব চাসার বো—সব গরিবের বো কি টাকা পেলেই বশ হয় ?

দাসী । নয় ? ধর্ম বল, সতীত্ব বল, সবই বড় মানুষদের সাজে । সতীত্বটা বড় মানুষদের একচেঁটে । গরিবের কি আর ধর্ম আছে, না ধর্ম থাকতে পারে ?

হীরামণি । তুই ত গরিব । তবে তোরও ধর্ম নাই ? তুইও টাকার বশ ?

দাসী —টাকারত বশ । রূপ যে নেই । টাকা দেবে কে ?

হীরামণি । ওলো আর চালাকি করিস নে । তার পর ।

দাসী । তার পর, বোটা “নায়েব মহাশয়, নায়েব মহাশয়” বলে বেজায় কান্ধে লাগলো । এক জন চাসা, তা দেখে রেগে গেল, বলিল—“চাষার ঘরের বো, এত বেহায়া” এই বলেই তার মাথার এক লাঠি । লাঠিতে মাথা কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো, বিটি মুখ খুঁড়ে মাটিতে পলো ।

হীরামণি । আচ্ছা হয়েছে । বিটির স্বামী আবার জমিদারের সঙ্গে লড়তে গিইছিল, তার পর ?

দাসী । তার পর, বিটি ত মুখ খুঁড়ে পড়ে থাকলো । চাষারা নায়েবকে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল । এমন সময় এক বাবাজি প্রিং প্রিং কর্তে কর্তে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ।

হীরামণি । নারদ মুনি নাকি ?

দাসী । নারদ নয়—বিশ্বামিত্র ।

হীরামণি । বিশ্বামিত্র কেন ?

দাসী । সম্মুখ মান্কা (মেনকা) বিদ্যাধরী ।

হীরামণি । তার পর কি হ'ল ?

দাসী । বাবাজির নিরিবিণিতে মেয়ে মানুষ দেখলেই অজ্ঞান । তার সাক্ষী বুড়ো পরাশর, একটু মেছুনী নিয়ে কি ঢলানিই ঢলিয়েছিল ! তাঁরা হলেন গেষানী । আর আমরা অবলা, মূর্থ যদি এক পা ভুল করে ফেলি, অমনি সর্বনাশ, আর রক্ষা নাই, অমনি বিস্তর শাস্তরের কথা উঠে, অমনি আমাদের পোড়াবার জন্য নরকের আগুন ধুঁ ধুঁ করে জ্বলে উঠে, নরকে কড়ার তন্তু ঘিতে কলঙ্কিনী ভাজা হয় তাও শুনে পাই —

হীরামণি । ওলো ও সব কথা থাক । রসের কথা বল ।

দাসী। বাবাজি বোটাকে দেখেই এলে মেলো—(এ সব কথা নিখা। ধার্মিক সন্ন্যাসীরাই কুমুদিনীকে উদ্ধার করিয়া কামুক-কালসূৰ্পদংশন হইতে কৃষকবধূকে রক্ষা করিয়াছিলেন)

হীরামণি। আবল্ তাবল্ বক্তে লাগিল?

দাসী। তা কেন? সন্ন্যাসী ঠাকুর—এক তারা না ফেলে—মহাদেব যে ভাবে মরা সতী দেহ কাঁধে কেলিয়াছিলেন—সেই রকম একটা চং করে বোটাকে কাঁধে ফেলে সটান দৌড়—দৌড়—দৌড়—দৌড়। এক লম্বা দৌড়ে এক খানি দিকি বজরায় বোটাকে নিয়ে উঠলো। দিন কতক তাকে নিয়ে বজরায় ঘুরিল। ইতি মধ্যে এক দিন কিন্ কিন্ করে বোটার কাণে কাণে মস্ত দিয়ে তাকে শিন্মি করে ফেলিল। কি রকম শিন্মি তাহা ভগবান জানেন। তখন বোটা বলে “তুমি সন্ন্যাসী আমি তোমার সন্ন্যাসিনী হব। তুমি যখন ভিক্ষা করতে যাও, তখন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব”—বাবাজি পলেন মহাকাঁদে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়ে মানুষ দেখলে কি লোকে ভিক্ষে দেয়?

হীরামণি। বাবাজী সন্ন্যাসিনীকে বুঝিয়ে, এক কুঁড়েতে লুকিয়ে রেখে দিলেন?

দাসী। না, তা নয়, সন্ন্যাসী ঠাকুর এক ফিকির করিলেন। ফকিরের ফিকির কে বুঝিতে পারে? কাছে প্রবোধ বাবুর নায়েবের কাছারী, সেখানে তাকে রেখে এল।

হীরামণি। কি বলিয়া?

দাসী। এই জ্বীলোকটি বড়ই বিপদে পড়েছিল, নামজাদা বদমায়েস নায়েব নটবর ইহার উপর অত্যাচার করে গিইছিল। আমরা সন্ন্যাসী তা জানতে পেত্রে এর ধর্ম রক্ষা করেছি। এর স্বামী বিদ্রোহী প্রজাদের দলপতি, তাই নায়েবের এর উপর বিশেষ রাগ। আপনার কাছে একে নিয়ে গেলাম যাহা ভাল বুঝেন করবেন।

হীরামণি। ঐ নায়েবের নাম কি?

দাসী। শিবনাথ।

হীরামণি। লোক কেমন?

• • সত্য কথা এই যে কুমুদিনীকে একটা সন্ন্যাসিনীর হস্তে দিয়া এক খানি নোকা করিয়া এক জন সন্ন্যাসী তাহাকে প্রবোধ বাবুর নায়েবের পরিবারের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

দাসী । ভক্ত বিটেল—ঠিক প্রবোধ বাবুর মত । (মিথ্যা)

হীরামণি । শিবনাথ কি করিল ?

দাসী । দিন কতক গোপন রোলো । তার পর গিল্লি রকম সকম বুঝ্তে পেরে গাঁ মাথায় ক'রে দিল । তখন শিবনাথ নায়েব বাবু বেগতিক দেখে প্রবোধ বাবুর নিকট পাঠিয়ে দিল ।

হীরামণি । কি বলিয়া পাঠাইয়া দিল ?

দাসী । সে সব বাজে কথা । কি এক খানি পত্র লিখে দিইছিল । অত দূর আমি জানি না ।

হীরামণি । প্রবোধ বাবুও তাকে দেখে ভুলিলেন বুঝি ?

দাসী । ভুললেন ? একবারে গোল্লায় পেলেন । তুমি ত জান, ওটা একটা মস্ত ভণ্ড । প্রবোধ বাবু তার নিজের স্ত্রীকে একেবারেই ভুলে গেলেন, বাগানেই থাকেন বাড়ী আর যান না । দিন কতক পরে তার স্ত্রী অবশ্যই সব টের পেলো । তখন প্রবোধ বাবু বৌটাকে বল্লেন—“তোমাকে আমি আর রাখতে পারি না । তোমাকে কিছু নগদ টাকা দিচ্ছি তুমি আমার জমিদারিতে গিয়ে বাস কর” । সে কি তার সার ! ভারি জাঁহাঁবাজ মেয়েমানুষ । সে বলে “তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে, আমি বাড়ী বাড়ী গিরে, সব ভদ্র লোকের কাছে, বেবাক কথা বলে দেব । তখন তোমার মুখ খানা কোথায় থাকবে” ? (এ সব মিথ্যা এবং রসমরীর সৃষ্টি ।)

হীরামণি । প্রবোধ বাবুর স্ত্রীর এবার কেমন দর্প চূর্ণ হয়েছে । মাগীর কতই ঠেকার ! একটুত লেখা পড়া জানেন । আমাদের মত বড় জমিদার হ'লে না জানি কি কর্তেন !

দাসী । ও ছুঁড়ির কেচ্ছা এক দিন বল্বে ।

হীরামণি । বল্, বল্, কিছু শুনিচিন্ নাকি ?

পরের নিন্দা, বিশেষতঃ বাহাদের সূখ্যাতি আছে তাহা শুনিলেই হীরামণির মন আনন্দে উৎফুল্ল হয় ।

দাসী । সেত অনেক দিনই শুনা । কেন ? তুমি কি তা জান না ? সে কথা আর এক দিন হবে ।

হীরামণি । ভাল ।

দাসী । পতিব্রতা লীলা ঠাকুরাণী প্রবোধ বাবুকে ও বৌটাকে এমন ঝাঁটা পিটে করলো, যে প্রবোধ বাবু সেই দিনই বৌটাকে একটা বাড়ী ভাড়া করে

দিন । আর মানহারা বন্দবস্ত করে দিন । লীলাঠাকুরাণীর শাসনে প্রবোধ বাবু আর নেই বোটার সঙ্গে দেখা শুনো হবার মো নেই । প্রবোধ বাবু লোকটা খুব চালাক । একগ মানহারাটা কোন রকমে আমাদের বাবুর উপর চাপাতে পারেন, তারই চেষ্টা করেন । আমাদের বাবু যে সুপুরুষ ছুঁড়ি তাকে দেখলেই খেঁপে উঠবে—আর, বাবু যদিও খুব ভাল,—রাগ করো না—তবে পুরুষের মন, কি জানি—আর রাজা রাজিরার পক্ষে দোষই বা কি ।

হীরামণি । বটে ? হারামজাদি ! তোর মুখে মারব ঝাঁটা ।

দাসী । মা ঠাকুরন ! গরিব লোক ত ঝাঁটা খেতেই আছে । তবে তুমি রঙ্গ রন বুঝ না এই ত ভয় । রঙ্গ রনের সময় দাসীর মত ভয়ে ভয়ে কথা ক'লে তাত কি পুরা আশ্রয় হয় । অতঃপর দেও, আবার রাগও করো । না, আর কোন কথার কাজ নেই । আমি চুপ করে থাকব ।

হীরামণি । না । বল্ বল্ । রাগ করি নু নে । আমি ও তামাসা ক'রে বল্ছিলাম ।

দাসী । আমরা কি সকলেই জানি না যে, আমাদের বাবু সাক্ষাৎ মহাদেব, মহাদেবেরও অধিক ।

হীরামণি । রঙ্গ তামাসা ?

দাসী । রঙ্গ তামাসা কেন ? মহাদেবের মনও এক দিন টলেছিল । মন টল্‌লো নিজের, রাগ হলো পরের উপর । গরিব কন্দর্পঠাকুরকে রাগে নিপট্ট পুড়িয়ে ফেললেন । আর রতি বেচারী আপসে আপসে কৈদে কৈদে মলো । আমি দেখছি, কি ঠাকুর, কি মানুষ, বড় যারা তাঁরা পোড়েন না ; পোড়েন আশ পাশের গরিব লোক ।

হীরামণি । সে কথা বাউক । তুই বলছিলি সতী সাক্ষী বোটা আমার কাছে আনবে । আবার বলছিস বাবুর কাছে আসবে ।

দাসী । বুঝলে না, ঠাকুরন ! তোমার কাছে আনা গোনা কর্তে কর্তে, বাবুর নজরে এক দিন পড়ে যাবে—এই প্রবোধ বাবুর মতলব ।

হীরামণি । এতক্ষণে বুঝলাম—সে কালামুখী আমার কাছে এলে, এমন ঝাঁটা দেব যে সে আর কখনও এ মুখো হবে না ।

এমন সময় এক জন কিং বলিল—“বাবু আনুছেন” । হীরামণি এতক্ষণ বসিয়াছিল । সে এই কথা শুনিয়া অমনি গেল, আর বলিতে লাগিল—“ওরে,

পাখা কর, তুই মাথা টেপ—ওমা মাথার বেদনায় যে গেলাম—আর যে পারি নে—কেউ খবর নেয় না গো—মলেই বাঁচি ।”

মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী প্রকৃতই সতী সাধবী, তাহা পাঠককে আমরা পূর্নই বলিয়াছি । দাসী বাহা বলিল, তাহাতে বাহা মিথ্যা বটনা হইয়াছিল তাহাও আছে, আর কতক রসিকা দাসীর নিজের কল্পনা প্রসূত ।

হীরামণি পরের কুৎসা শুনিতে খুব ভাল বাসিত । তাই তাহার কাছে কুৎসা-কীৰ্ত্তনী রসিকা পরিচারিকা আপনি আসিয়া জুটিয়াছিল । প্রবোধ বাবুর স্ত্রী লীলার নিকট এরূপ ঋী অথবা এরূপ কুৎসা স্থান পায় না । বাহাদের নিজের মন খারাপ তাহারা ভাল লোককেও প্রায়ই ভণ্ড বিশ্বাস করে । তাই রসময়ী দাসী ও তাহার কৰ্ত্তী হীরামণি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, কুমুদিনী ও লীলা ও প্রবোধ বাবু সব খারাপ । কুমুদিনী, প্রবোধ বাবু ও তাহার স্ত্রী লীলা এত বিগুহ্ন যে, হীরামণি ও রসময়ী তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না ।

রসময়ীর কথাতে হীরামণি সিদ্ধান্ত করিল, মহেশের স্ত্রী নরেশ বাবুর সম্মুখে পড়িলে বিপদ হইতে পারে, সুতরাং তাহা বাহাতে না হয় তাহা করিতে হইবে । আর বিদ্রোহী প্রজাদিগের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য ; তদ্বিষয় তাহার স্থানীকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

Next where the *sirens* dwell you plow the seas

Their song is death and make destruction please.—Pope.

নরেশ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—“ কি হইয়াছে ?”

হীরামণি । কি আর হইছে ? মলেই বাঁচি । তুমি কি আমার পানে তাকাবার সময় পাও ? কেবল উকিল, আর আমলা, আর মামলা, আর হাজামা, আর কেসাদ, আর গান, আর বাজনা । আমি যে বেয়ারামে নরছি—তার খোজ করে কে ?

নরেশ । আমি ত ভাল ডাক্তার দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাইতেছি ।

হীরামণি । তোমার ডাক্তার কি আমার ভাল করে দেখে ?

বস্তুতঃ হীরামণির বেয়ারামের ১৫ আনা যে কাচ তাহা ডাক্তারের মনে সন্দেহ হইয়াছিল । তজ্জন্ত তিনি বলিয়াছিলেন, নিয়মমত আহাৰাদি করিলে আরোগ্য লাভ হইবে । তবে বাবু ছাড়েন না ; এলেই দর্শনীর টাকা পাওয়া যায় ; ভাল মন্দ কথায় থাকা তার দরকার কি ? সুতরাং তিনি আনিতেন, হাত দেখিতেন, হীরামণির নাকিসুরে ছোটো কথা শুনিতে, রোগের লক্ষণগুলি শুনিয়া, নাড়ী টিপিয়া “নাড়ী ভাল, বাহিরে গিয়া বিশেষনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি” এই বলিয়া চলিয়া যাঠিতেন । সুতরাং হীরামণি ঐ ডাক্তার-টার উপর ক্রমে ক্রমে চটিয়া গিয়াছিল, তাই সে বলিল “তোমার ডাক্তার কি আমাকে ভাল করে দেখে—আর ও ভেড়া ডাক্তারের কাজ নাই—আমি তোমাকে বলি সাহেব ডাক্তার আন—তা ষোল টাকা ভিজিট দিতে হবে, আনবে কেন ?

হীরামণি বুঝিয়াছিল মাঝে মাঝে সাহেব ডাক্তার না আনিলে পুরা বড়মান্‌সি হয় না । আর সাহেব ডাক্তার এলেই একটা নল দিবে বুকেটা দেখে, জিহ্বা দেখিবার জন্ত মুখটা দেখে, লাল মুখে হেঁসে হেঁসে “অপনি অজ্ঞ কিমন আছে’ন, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে, তাও হীরামণির একটা মজা বোধ হয় । নরেশ বাবু বলিলেন “তোমাকে দেখতে মাঝে মাঝে সাহেব ত আসেই” আজ ঔষধ খেয়েছ কি ?

স্ত্রী । ঔষধ খাই না ফেলে দেই ? যার কষ্ট সেই বুকে, অথো কি বুঝবে ? কি বলে, মাথা নাই ত মাথা বাখা—উঃ মাথা ব্যথার গেলাম । সমুদায় দিনটা বিছানায় পড়ে ছট ফট করছি—একবার কি কেউ উকি মারে না গো ।

নরেশ । আমি তোমার জন্ত এক ছোড়া নূতন ফান্সনের জড়িয়া বালা এনেছি দেখবে ?

স্ত্রী—অমনি হর্ষোৎফুল্লা । অমনি উঠিয়া বলিল । নিজের পীড়ার কথা ভুলিয়া গেল, নাকিসুর ভুলিয়া গেল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—র’য়া র’য়া বালা ? দেখি দেখি । বেশ, নেব । কিন্তু আমার হীরার মুকুট কই ?

নরেশ । হবে, হবে ।

স্ত্রী । কবে ? মরে গেলে ?

নরেশ । গহনা দিচ্ছিই ত । হীরার চিক্, হীরার চুরি, হীরার তাবিজ, হীরার অনন্ত, মুক্তার সাতনর—কোন্ গহনা তুমি পাও না ? কেবল বাকী হীরার মুকুট ? হীরার মুকুট মুকুট করে যে আমায় খেয়ে ফেললে !

শ্রী । (নরেশ বাবুর মুখের কাছে দুই হাত তুলিয়া) তোমার যে নাম খানা এত বড় । আমার আর কি ? আমি ত গরিবের মেয়ে । তোমার নামের জন্তই বলি । মল্লিকদের বাড়ী সে দিন নিমন্ত্রণে গিইছিলাম । শীলেনদের বৌ এমন হীরার মুকুট পরে এসেছিল, যে সব হক্চকিয়ে গেল । তোমার এত বড় নাম তা কোথায় থাক্ণ ? আমি তখন মাথা হেট করে সুর সুর করে চলে এলাম । সমুদায় রাত্রিটা কঁদে কঁদে আমার বালিশ ভিজে গিয়েছিল । তুমি তা টের পাবে কেমন করে ? তোমার প'লেই নাক ডাকিয়ে ঘুম । (পার্শ্ববর্তী কক্ষে দাসীর দল গাঁটা দিয়ে সব শুনিভেঁছিল । রসময়ী দাসী বামী ঝির কাণে কাণে বলিল—“বাছারে এত হুঃখ !” বামী মুখ টিপিয়া হাসিল) ।

নরেশ । প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছে, তা জান । এক পরমা আদায় নাই । তার উপর মোকদ্দমায়—মোকদ্দমায় দিন এক হাজার করে মফঃস্বলে খরচ হচ্ছে । আমার লাঠিয়ালরা একটা খুন্সী মোকদ্দমায় পড়েছে । তাতে বিশ হাজার টাকা ত খরচ হবেই । হাইকোর্টে আর একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা আছে তাতে বিপক্ষেরা ব্রান্সন কোম্পলিকে নিযুক্ত করেছে, আমাকেও—

শ্রী । আমি ব্রান্সন ব্রান্সন বুঝি না । আমি হীরার মুকুট চাহি, আমি বলছি আমি হীরার মুকুট চাই । অবাক করেছে, যখনই আমি হীরার মুকুট চাই, তখনই তুমি মোকদ্দমা খরচ এ খরচ ও খরচ বলে কেবল আমার মেজাজ খারাপ করে দেও, আরও মাথা ধরিয়ে দেও । তোমার মতলব আমি বুঝি না ? কোন প্রকারে আমার কথাটা চাপা দেওনা ।

নরেশ । প্রিয়ে তোমার মুকুটই কি এত বড় হ'ল । আমার এত বিপদ, তার জন্ত কি তুমি একটুও ভাবিতেছ না ।

শ্রী । তোমার বিপদ তুমি জান, তোমার দেওয়ান জানে আর উকিল জানে, আর আদালত জানে । আমি অবলা, তার কি জানি ?

নরেশ । বল কি ? আমার বিপদ তুমি তার কি জান ?

শ্রী । সত্যই ত । আমি গরিবের মেয়ে, যদি হীরার মুকুট না পুর্তে পাব, তা হলে বাবা তোমার সঙ্গে বে দিয়েছিল কেন ?—ওরে খীরা কে আছিল ? বাতাস কর—উঃ মাথা কেটে গেল—আমি মলেই তুমি বাঁচ ।

নরেশ । দেখ, আমার ভারী বিপদ । বে.খুনি মোকদ্দমায় কথা বলছি—লাম তাতে নাকি আনাকেও আসামী করবে । ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার

কার্তিক, ১৩১০ ।]

মায়া ।

৩৭৭

উপর ভারী খাপা । আগাকে যদি আদালতে কাটার দাঁড়াতে হয় তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে মরিব । তা হলে তুমি কি করে মুকুট পরবে ?

• স্ত্রী । সে বাহা হউক হীরার মুকুট শীঘ্র এনে দেও ।

নরেশ স্তম্ভিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন “মানবী না পিশাচী” ।

হীরামণি অধম হইলেও চতুরা । নরেশের মুখ দেখিয়া ভাবিল আকাশে মেঘ উঠিতেছে । তখন মায়াবিনী সজল নয়নে তাহার মৃণাল-কোমল বাহুলতাতে নরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, “প্রাণেশ্বর ! তোমাকে কি আমি ভাল বাসি না ?” এই কথা বলিয়া নরেশকে চুষন করিল এবং অপনার উরসে নরেশকে টানিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল—পর নরেশের কাঁধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল । “গরিবের মেয়ে বলিয়া আমাকে হেনস্থা করিও না । তুমি আমার প্রাণ, তবে মেয়ে মানুষ গহনা ভাল বাসি, গহনার জন্য পাগল—তাই বলিয়া কি তোমাকে ভাল বাসি না ? মেয়ে প্রথমে বাপের কাছে আবদার করে, তার পর স্বামীর নিকট । হৃদরেশ্বর ! আমি তোমার দাসী, তুমি আমার প্রাণ সর্বস্ব” । হীরামণির বড় বড় চোখের বড় বড় ফোটা টপ টপ করিয়া নরেশের স্বক্ক দেশে পড়িতে লাগিল । নরেশ বিমোহিত হইল, একটু পরে বলিল, কালই হীরার মুকুটের ফরমাসেস দিব । যত টাকা লাগে, প্রিয়ে তোমাকে হীরার মুকুট পরাইয়া ইহ জীবন সার্থক করিব ।”

অপর কক্ষে স্বীয়া নিঃশব্দে সমুদয় কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল । একটা বিছয়ারের চাবির ছিদ্র দিয়া সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিল । এখন তিন জনে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে ও ঘর হইতে অন্য ঘরে গিয়া চুপি চুপি তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল ।

• রামী বলিল “বাবু কি নিটোন বোকা” !

• বামী বলিল বাবুকে “শুণ করেছে ।”

• রসময়ী বলিল “কামরূপে গেলে মানুষ ভেড়া হয়ে যায় ।”

রামী । কামরূপ কোথায় ?

• রসময়ী । “রূপ” বাবুর স্ত্রীতে । “কাম” বাবুতে । “কাম” আর “রূপ” যখন এক হয়ে যায়, তখন হয়ে যায় “কাম রূপ” । তখন কামরূপে পুঙ্খ ভেড়া ।

• বামী । স্ত্রী ?

• রসময়ী । মেদী ভেড়া অর্থাৎ ভেড়ী ।

।। ইহার অর্থ ?

রসময়ী । ইহার অর্থ ; তখন মনুষ্যজন্ম বার্থ । তখন উভয়ে জানোয়ার ।
জানোয়ারের মত ।

রামী । ওলো বামী, রসীকে (রসময়ীকে) বিদ্যালঙ্কারের টোলে বসিয়ে
দিলেই হয় ।

রসময়ী । আমি ভাবি, এই রকম ভেড়া ভেড়ীকে চিড়িয়েখানাতে
রাখে না কেন ।

বামী । আস্তে আস্তে পাবে ।

ছবি ।

(মা)

“আমি চাঁদ আরে
চিক্ দিয়ে যারে ”
নূতন মেয়ে কোলে
মাতা, মধুর বোলে,
কতনা আফ্লাদে,
ডাক্ছে পূর্ণ চাঁদে—
“আমি চাঁদ আরে
চিক্ দিয়ে যারে ।”

সুনীল সন্ধ্যাকাশে
শরচ্চন্দ্র ভাসে,
পূর্ণাঙ্গনে ধীরে,
সুমনস্ক সমীরে,
পুষ্পগন্ধ মধুর
ভেসে আসছে, অদূর
ফুলের বাগান হতে,
অস্তঃপুরে ! পথে
বালকবৃন্দ চলে,
উচ্চ কোলাহলে,

উজ্জ্বল হাসামুখে,
চিস্তাশূন্য মুখে !
গাছের উপর থেকে
উঠছে ডেকে ডেকে
পাপিয়া এক । দূরে
প্রবল মিঠে সুরে,
বোসে কোন চাষী,
বাজার মেঠো বাশী ।
বাশীর ধ্বনি ধেয়ে,
সুনীল আকাশ ছেয়ে,
পড়ছে গিরে শেষে,
ধরার উপর এসে,
ছড়িয়ে ইতস্তত—
তারাবাজির মত ।

এমন সময় বোসে,
বাড়ীর মধ্য, ও সে
নূতন মাতা,—কোলে
একটি পুষ্প দোলে—

ডাকছে মধুর ডাকে,
পূর্ণ চন্দ্রমাকে—

“আয় চাঁদ আ’রে
চিক দিয়ে বারে।”

চাঁদের কিরণ এসে,
অনাবৃত কেনে,
কোমল মুখে, দেহে,
পড়েছে সে, ছেয়ে।
চাঁদের কিরণ এসে
টলে’পড়েছে নে

মেয়ের ক’চ মুখে
মেয়ের কচি বুকে।

ডাকছে মাতা চাঁদে,
বড় মনের সাথে,
বড় আদর ভরে,
বড় মধুর স্বরে।

“আয় চাঁদ আ’রে
চিক দিয়ে বারে।”

চাঁদটি বোসে হাসে
শান্ত নীলাকাশে—
জানি না কোন্ প্রাণে
রয়েছে সেখানে

এ ডাক শুনেও বসি
কঠিন শরৎ শশী।
ডাকে মা “চাঁদ আ’রে
চিক দিয়ে বারে”
এক বার তাকায় সাথে
আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় মুখে
কোলের চাঁদের মুখে।
হাসে মেয়ে! ডাকে
শরচ্চন্দ্রমাকে
সঙ্গে সঙ্গে—“আ’রে
চিক দিয়ে বারে”
হাসে মেয়ে। হাসে
চন্দ্র নীল আকাশে।
হাসে মা।—এ ধরায়,
তিনের হাসি গড়ায়।

ছুকিয়ে ছুকিয়ে আমি
মেয়ের মায়ের স্বামী
ছুকিয়ে আমি কবি
ভূলে নিলাম ছবি।

শ্রীধিজেন্দ্র নাল রায়।

সমালোচনা।

“ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত”।

(বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১০।)

“ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত” প্রবন্ধে লেখক এট কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়াছেন, যথা,—(১) ইংরেজ বা ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের

নিকট শিকশালাভে আমাদের আত্মসম্মানের অবমাননা হয় ; কারণ তাঁহারা আমাদের মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন ; সুতরাং উপনিষদের বাক্যসূ-
সারে “অকরা দেয়ম্ অশকরা অদেয়ম্”, যাহা অক্ষর সহিত দেওয়া হয় তাহাতে
ফল আছে, আর যেটি অশকর সহিত দেওয়া হয় সেটি নিফল হয় । ইহা
জানিয়া শুনিয়াও আমরা কেবল মাত্র বিগত ইংরেজি উচ্চারণের খাতিরে
ইংরেজের স্কুলে পাঠাইতে লালসিত ; (২) সাহেবদের তথা কথিত সাহস ও
নির্ভীকতা আন্তরিক নহে, অর্থাৎ সে কেবল বাহাদুরী বা বাহবা লাভের জন্ত,
আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্ত নহে ; (৩) ইংরেজরা নির্ভর ও অনুকম্পা
বিহীন ; (৪) ইউরোপীয়েরা যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের সর্বস্ব জালানিয়া দেয়
এবং রাজনীতিতে সত্যের সর্বদা অপলাপ হইয়া থাকে ; (৫) ভারতবর্ষে
পূর্বে (সকলেই) মাংসাদী ছিল এখন একেবারে নিরামিষাণী অর্থাৎ ঘোরতর
রক্তারক্তি শত্রু হইলে একেবারে গেরুয়াবসনধারী বৈষ্ণব ; লেখকের মতে,
এ প্রকার আশ্চর্য্য পরিবর্তন এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে আর কখন দৃষ্ট
হইবে না ; (৬) এবং এই উদ্ভিদ আহারের ফলে আমাদের ভিতর আর
ভাট ভাট ঠাট ঠাট নাই, সাজের মা গঙ্গালাভেরও আর বিদ্য নাই, এক কথায়,
লেখকের মতে, ~~এই~~ শাক ~~এই~~ কলায়ের ডাল খাইয়া আমাদের জাতিটা
সজোরে একটানা উন্নতির দিকে চলিতেছে ; (৭) “আমরা যদি বহির্বিশয়ে
দুর্বল হইয়া থাকি,—সেই ~~কারণেই~~ শত্রুর কাছে আমাদের পরাজয় ঘটে,
তথাপি, আমরা স্বর্গ ও সুবিহার উপরে ধর্ম্মের আদর্শকে জরী করিবার চেষ্টায়
বে গৌরব লাভ করিয়াছি, ~~এই~~ ~~কারণেই~~ বর্ষ হইবে না, একদিন দিন
আসিবে” ।

ইউরোপীয়গণের তথাকথিত নৈতিক অবনতির কারণ নির্দেশ করিতে
গিয়া লেখক বলিয়াছেন যে, “ধর্ম্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয় নহে
স্বর্গরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে” ।
আমরা নীতি বিষয়ে যে পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার কারণ “আমাদের
দেশে ধর্ম্মের যে আদর্শ আছে, ~~এই~~ অস্তরের সামগ্রী তাহা বাহিরের গতির
মতো প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে” ।—লেখক বাহলা যে “ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত”
সুচিহ্নিত ও সুলিখিত নহে ।

(১) আমরা অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের নিকট শিকশালাভ কুরি-
বাছি ; তাহাদিগের অধিকাংশই ছাত্রদিগের উপর প্রকাসম্পন্ন দেখিয়াছি ।

তাহারা যাহাতে ছাত্রবর্গ ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে প্রকৃতরূপে সুশিক্ষিত হয় তাহার জন্য বিশিষ্ট প্রয়াসী দেখিয়াছি। কাথেন ডি. এন্. রিচার্ডসন, অধ্যাপক কাওয়েল, ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতির নাম শিক্ষা-বিভাগে প্রাতঃস্মরণীয়। অধ্যাপক ইলিয়ট, মান, লেথব্রিঙ্ক্ প্রভৃতির নামও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান দেশীয়গণ পরিচালিত ইংরেজি স্কুলের তথাকথিত নিরানুযায়ী দেশীয় শিক্ষকগণ যে মাংসাদী পাশ্চাত্য শিক্ষকগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বা অধিকতর স্নেহবান্ তাহাত দেখি নাই। অভিভাবকেরা বিগত ইংরাজি উচ্চারণের খাতিরে ছেলেদের ইংরেজের-স্কুলে পাঠান না, যেখানে অল্প খরচে পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাস হইতে পারে এবং পাস হইয়া ছুপয়সা রোজগার করিতে পারে, সেইখানেই পাঠাইয়া থাকেন।

(২) লেখক, সাহেবেরা যে আমাদের অপেক্ষা সাহসী ও নির্ভীক তাহা স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু একটি উজ্জ্বলদারা ~~দিয়েছেন~~ ^{দিয়েছেন} যে, সে সাহস আন্তরিক নহে, বাহ্যিক, অন্তর্মুখী নহে, বহির্মুখী। এই মন্তব্যটি পরনিন্দা-প্রিয়তার কথা বোঝায়। যাহারা চিরকাল স্বাধীন এবং বর্নসম্পন্ন তাহারা যে আত্মসম্মান রক্ষার্থে চিরপদদলিত দুর্বল জাতি অপেক্ষা খর্ব হইবে ইহা সম্ভবপর নহে। নিষ্কামভাবে সাহেবদের জুতো ও গুতো খাওয়াটা, যদি আত্মসম্মান রক্ষার আভ্যন্তরিক নিদর্শন হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতি আত্মসম্মানসম্পন্ন। যশোলিপ্সা একটি সাধারণ ~~প্রবৃত্তি~~ ^{প্রবৃত্তি} এবং অনেক সময়ে নিন্দনীয় নহে। মহিষ বাঙ্গালী বাহবা লাভের জন্য ও যদি পাশ্চাত্য পদাঘাত হইতে নিজের পৈত্রিক প্রাণটাকে বাঁচাইবার নিষিদ্ধ কোমর বাঁধিতে পারিত, তাহা হইলে তথাকথিত প্রবুদ্ধ-প্রাচীর-বোধ, বোধ হয়, লাঞ্চিত হইত না। গৌতর আংশিক শিক্ষার উপর ঝোক দিয়া আমাদের ভীক ও দুর্বল জাতিকে অরিও নিষ্কর্মা, নির্জীব, ও নিস্তেজ করিবার প্রয়াস, দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

(৩) ও (৪) বুঝে জয়লাভে, আমরা বাঙ্গালী কি করিতাম, বিরুদ্ধ পক্ষের ঘর জালাইয়া দিতাম কিনা তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কারণ বঙ্গীয় ইতিহাস, বাঙ্গালীর বুকের ছুরাকাকার কলঙ্কিত হয় নাই। তবে ভাই ভাই এ লাঠালাঠি, প্রতিবেশীর ঘর জালানর জন্য আদালতে হাজীর অভাব নাই।

(৫) ও (৬) লেখক বলিতেছেন “ভারতবর্ষ এক সময়ে মাংসাদী ছিল,

মাংস আঙ্গ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ । মাংসানী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। জগতে বোধ হয়, ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই ।” আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরা দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত ডাল খাতিতে পার না, সুতরাং মাংস আঙ্গ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । এখানে এখন মাংস আহারের দারিদ্র্যমূলক অপ্রচলন, গীতোক্ত নিকাম নিবৃত্তির ফল নহে ।

(৭) ভারতের নিস্বার্থ ধর্মের গৌরবময় আদর্শ চিরপদদলনে, চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও উজ্জ্বল থাকিবে, লেখকের এই বিশ্বাস নিতান্ত শৈশবমূলভ ও সরল হইলেও, সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অনশনে, হিন্দুর নাম ও হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয় হইলেও, তাহার একটা সীমা আছে । নিতান্ত শাস্ত্রপ্রকৃতি ধরিত্রীও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া, মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠেন । মানবচরিত্রে সহিষ্ণুতা যেমন একটা আবশ্যকীয় উপাদান, তেমনই বীৰ্য্য শৌর্য্যও অন্য একটা আবশ্যকীয় উপাদান । সহিষ্ণুতা বখন বিনাশের পথকে সোজা ও সরল করিয়া দেয় তখন উহা প্রশংসনীয় নহে ।

কোন এক ইউরোপীয় পর্য্যটকের নির্ধরাচরণের জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা নিন্দিত হইতে পারে না ; কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের উক্তি বা কোন একটা সংবাদ পত্রের অভিমত লইয়া সমস্ত ইউরোপীয়দিগকে গালি দেওয়া চলে না । যদি কেবল মাত্র তান্ত্রিকদের ব্যভিচার, হরিবংশ নিবদ্ধ কৃষ্ণের সমুদ্র বিহার ব্রহ্মট্যবর্ড পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ ও ইক্সিলিপ্সা বিচার করিয়া, হিন্দুদিগের হিন্দুত্বের আদর্শ নির্ণীত হইত, তাহা হইলে আমাদের বেদান্ত উপনিষদের গর্ব কোথায় চলিয়া যাইত । কোন জাতিকে অন্য জাতির সহিত তুলনার সমালোচনা করিতে হইলে, উভয় জাতির আদর্শচরিত্রকে (type) বিচারকের সম্মুখে আনিতে হয় । এবিষয় জন্মরলি তাহার অত্যাংকষ্ট গ্রন্থ কমপ্রোমাইসে (Compromise) বাহা বলিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য ।

ক্রাইষ্টের আদিষ্ট ধর্মই পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের ধর্ম । এই ধর্ম কঠোরনীতি সংযুক্ত । এই ধর্মের আদর ও অনুশীলন পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে । তবে আত্মকাল, সকল দেশেই ধর্ম অপেক্ষা অর্থ অধিকতর সম্মান লাভ করিতেছে, ইহা সত্য । অধুনা ভারতের শিক্ষিত সভ্য সমাজও, টাকা টাকা করিয়া প্রাণপাত করিতেছেন । টলনুটই, ইক্সিলিপ্স, কাল হিল,

কার্তিক, ১৩১০]

সাহিত্য দরবার ।

৩৮৩

রসকিন্, রুসো প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এই অর্গলোলুপ প্রতিযোগিতার
 যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন । জারমান দার্শনিক, সপেনহার এই সকল
 দৈখিয়া শুনিয়া, সংসার অনঃপাতে বাটতেছে ও বাটবে এই নিন্দাস্ত্র উপনীত
 হইয়াছেন । সহনয় করাসী লেখক জোন ধনীকুলের অত্যাচারে ব্যথিত
 হইয়া ধর্ম্ম আস্থা বিহীন হইয়া পড়িয়াছেন । হারবার্ট স্পেনসার বর্ত্তমান
 ইউরোপীয় সভ্যতাকে পুনরাবৃত্ত পাশবপ্রবৃত্তির প্রসার (Re-barbarization)
 বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে) এই পাশব
 প্রবৃত্তির প্রসার, প্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শের হীনতার জন্ম নহে, ধর্ম্ম বিচ্যুতি
 সম্ভাত । হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও,
 নীতিগত পার্থক্য বড়ই কম । সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই অনুজ্ঞা করে যে সভ্যকথা
 কও, পরদার করিও না, মানুষের প্রতি নির্ক্লেশেষে প্রীতিপরায়ণ হও ।
 আমাদের উপনিষদের ধর্ম্ম অত্র ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইলেও ভারতের
 বর্ত্তমান নৈতিক অবনতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই । উপনিষদের ধর্ম্ম
 ক্রমেই আগাছা পরগাছার ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, নানা প্রকার উপধর্ম্মে
 কলঙ্কিত করিয়াছে । হিন্দুধর্ম্মে সর্ব্বভূতে ভগবদর্শন উক্ত হইলেও ফলে
 আমাদের দেশ, আভ্যন্তরিক কলহবিবাদ, বিদ্বেষ হিংস্রা শ্রীভ্রষ্ট । বঙ্গীয়
 মিছা আত্মস্তুতিবাদে ফল বড়ই কম ; স্নেহ পরবশ হইয়া ব্যাধিকে লুকাইয়া
 রাখা, রুগকে সদল প্রতিপন্ন করা, প্রকৃত হিতার্থীর কার্য্য নহে । “ধর্ম্মবোধের
 দৃষ্টান্ত” প্রবন্ধে, পাশ্চাত্যজাতির যথেষ্ট কুংসা আছে ; কিন্তু উহার ভাষা, চং ও
 ভঙ্গিমা, একেবারে প্রতীচ্য অর্গাৎ বিলাতী, ইংরেজি-অনভিজ্ঞের পক্ষে একে-
 বারে অগম্য ।

শ্রী—

সাহিত্য দরবার ।

বান্ধব আষাঢ় ১৩১০

কিশোর গৌরাঙ্গ । গৌরাঙ্গের বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস :—

গৌরাঙ্গ গঙ্গাদাসের ছাত্র । তিনি সর্ব্বকর্মাচার্য্য প্রণীত কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া
 পটিলেন । তখন নোপদেবের মুক্তবোধ বঙ্গদেশে চলন হয় নাই । চরিত্রায়ত্ত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ
 গোস্বামী খয়ং অতি প্রবীণ বৈয়াকরণ ছিলেন . . . গৌরাঙ্গ ব্যাকরণ ও বাদার্থের কুটকল ।

লইয়া কোনরূপ একটা বিচার মনস্তা পাইলেই মন্ত হইতেন । মোলবৎসর বয়সে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের ছাত্রগণের পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনে সাহায্য করিবার অর্থাৎ “পুঁথি চিহ্নার” ভার পান । ইহাতে মুরারি গুপ্তের ঈর্ষা হইয়াছিল । কিন্তু শীঘ্রই কারণ মুকুল সঙ্কয়ের চণ্ডীমণ্ডলে গৌরঙ্গ টোল খুলিলেন । পিতৃহীন গৌরঙ্গ মোল বৎসর বয়সের সময়ই অধ্যাপক হইয়া শত শত ছাত্রের মধ্যে সম্মানের উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন ।

অল্প বয়সে জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পিতার নিকট পাঠ করিতেন ও তাঁহার ভ্রাতাগণকে পাঠ দিতেন । এবং মিল যে সকল পুস্তক বিবিধ ভাষায় পাঠ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় গৌরঙ্গ বাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা নগণ্য । তবে মিল মোল বৎসর বয়সে অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই । গৌরঙ্গের অধ্যাপনার মূলে জগতের অধ্যাপনার আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল । ইহা বালিকার নকল ঘর কন্না । কেশবচন্দ্র ভারতকে তাহার শিষ্যস্থানীয় করিবার জন্য যে মানস করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্থাপিত বঙ্গুতা-বিদ্যালয়েই বুঝা যায় । যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রভু, যে ঈশ্বর প্রেরিত দূত, যে নিসর্গের নিয়োজিত শিক্ষক তাহার দিকে চোখকাকুট লোহর স্তার লোকে স্বতঃই অকুট হয়, অন্ধকারে শৈলশিখরস্থিত প্রদীপ্ত শিখার স্তায় সেই ব্যক্তি লোকের দৃষ্টিগোচর হয় । এই সকল কথা লেখক তাঁহার বঙ্গদেশবিশ্রুত বাগ্‌বৈভবের সজ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন । বতদূর কিশোর গৌরঙ্গ পাঠ কয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় লেখকের পাণ্ডিত্য ও লিপি কোশলের অভাব নাই ; বাহা কিছু অভাব, তাহা আগ্রহের । তাঁহার লেখার ভক্তের আবেশ বা দার্শনিকের অন্তদৃষ্টি, বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভাবনা শক্তি দেখি নাই । তাঁহার গৌরঙ্গ গ্রন্থরাশি হইতে সংগৃহীত একটা সংকলন মাত্র । তাঁহার নিকট ইহার অপেক্ষা ভাল বস্তু আশা করি ।

পাচো জাতির বিবরণ । সুসঙ্গ মহারাজা শ্রীকুমারচন্দ্র শর্মা বি এ লিখিত । রাজা মহারাজা বঙ্গ ভাষার সৈনিক হইলে আমরা আহ্লাদিত হই । কিন্তু আমাদের দেশের রাজা মহারাজাগণ কবে প্রিন্স ক্রোপটকিন বা ডিউক অব আগাভনের স্তায় উচ্চ শ্রীর লেখক হইবেন ? মহারাজা স্বর্য়কান্ত আচার্য্য বাহাদুর বাঙ্গালা মানিকীতে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাও আমরা বঙ্গ সাহিত্যের নোভাগ্য বিবেচনা করি ।

ছাত্রাদর্শন । ভূতের গল্প । বাল্যকাল হইতে তাহা পাঠ করিয়া ও শুনিয়া আশিত্বেছি । কিন্তু এত অধিক প্রতিষ্ঠিত ভূতের গল্প লিখিয়া পূরণ করা ভাল ।

কার্তিক, ১৩১০ ।]

সাহিত্য দরবার ।

১৩৮৫

পদ্মা । ভাদ্র ও আশ্বিন : ১৩১০ ।

পৌরাণিক কথা । “রাস অভিনয়” এবারকার বিষয় । পূর্ণেন্দু বাবু বলেন —

পতি ভাবে ব্রহ্মপোষ্য যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের অনুরাগ এত গাঢ় এত তীব্র হইত না । পতিভাব সহজ, আয়তন-সূত্র । উপপতি ভাব দাক্ষিণ্য-সূত্র, তাগ-পেক্ষী । পতিভাবে বিধি আছে, বন্ধন আছে । উপপতি ভাব অবিধ, বেদ-ধর্মের বন্ধন দ্বারা অনংকীর্ণ । পতিভাব সাপেক্ষ । উপপতি ভাব নিরপেক্ষ । পতিভাবে ভেদের ছায়া আছে । মিলনের পরিচ্ছেদ আছে । বাহ্যের অনুপ্রবেশ আছে । উপপতি ভাব বাত শূন্য, কেবল বিত্তক অন্তরঙ্গ ।”

চমৎকার । তবে লেখক নিজেই নিজের তর্ক নষ্ট হইতে পারেন না । তাহার প্রমাণ :—

“এ উপপতি ভাব ভেদের জগতে আদর্শ নহে । যাহা শ্রীকৃষ্ণ শোভা পায়, তাহা ভেদের জগতে শোভা পায় না । যাহা পশুর ধর্ম, তাহা মানুষের ধর্ম নয় । আনন্দের ধর্ম নইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম বলা অত্যন্ত ধৃষ্টতা নাত্র ।”

এই এক কথা বাললেই ত সমস্ত মিটিয়া যাতত । এত তর্কের আবশ্যক ছিল না । ব্যবহারজীবী পূর্ণেন্দু বাবুর “উপপতি ভাবের” “বিত্তক অন্তরঙ্গ”—মহিমা ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী অসাধারণ বাগ্মী লর্ড আরস্কাইনের কথা মনে পড়িল । একটি মোকদ্দমায় তিনি পারদারিক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন । তাহাতে তাঁহার বক্তৃতা শুধু প্রতিবাদীর গুরুতর দণ্ড হইল । আর একটি মোকদ্দমায় তিনি ব্যভিচারী প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থনাথ নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ব্যভিচার প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বক্তৃতা শুধু প্রতিবাদীর নষ্ট হইয়াছিল । আদালতে “রূপক ব্যাখ্যা” খাটে না । ঐ মোকদ্দমায় ব্যভিচারের প্রমাণও অকাটা । সুতরাং আরস্কাইন অসাধারণ বাগ্মিতার মোহ জাল বিস্তার করিয়া অদ্ভুত মত স্থাপন করিলেন যে তাঁহার মঞ্চের ব্যভিচার বিধিবিবুদ্ধ হইলেও তাহা স্বাভাবিক, তাহা মার্জ্জনীয়, তাহা নির্দোষ পবিত্র-প্রণয়-পুত্র । সুতরাং তাঁহার মঞ্চের উপপতি হইয়াও দণ্ডনীয় নহেন বরঞ্চ পতিবৎ শ্রদ্ধেয় ; এবং বাদীর সহিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রণয় না থাকায় তাহাদিগের দাম্পত্য সম্বন্ধ অপ্রতিপাল্য অশ্রদ্ধেয় সুতরাং পতি উপপতিবৎ অশ্রদ্ধেয় । এখানে অর্থোপার্জনের পক্ষায় ব্যবহারজীবী আরস্কাইন পাপের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় । কিন্তু পূর্ণেন্দু বাবুর জায় সাধুব্যক্তি ধর্মপ্রচারের “পদ্মা”র কিরূপে উপপতি ভাবের “বিত্তক অন্তরঙ্গ” বাক্যাতুরীময় অসার যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ ।

আশ্বিন, ১৩১০ ।

২৪শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর । রিসনাতে বুলগেরিয়ান ও তুরস্কীয় বিদ্রোহ গণের যুদ্ধ হয়; ইহাতে ১০৩ জন বুলগেরিয়ান হত হয় ।—বেরটে ভালি পদচ্যুত হন এবং তাঁহার স্থানে দামস্কসের ভালি নিযুক্ত হন ।

২৫শে ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর । ইংলণ্ডে ভীষণ ঝটিকা হয় তাহাতে অনেক কতি হয় ।—বেরার মধ্যপ্রদেশের কমিশনারের দাসনাধীনে আসে জানা যায় ।

২৬শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর । পঞ্জাব এবং কাশ্মীরে ভয়ানক জলপ্লাবন হয় ।

১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর । ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী সভার উপনিবেশিক সচিব চাম্বারলৈন, ভারত সচিব জর্জ হার্মিটন এবং রিচি আপনা-দিগের পদত্যাগ করেন । ইংলণ্ডের সর্ব প্রধান মন্ত্রী বালফোর অবধি বানিজ্যনীতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া তাহাদিগের পদত্যাগের কারণ ।—কর্ণপুরতলার মহারাজ জাপান যাত্রা করেন ।—ভারতবর্ষীয় বাবদ্বাপক সভার অধি-বেশন হয় ।

৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর । পালোপ প্রেস্তা, পিরাইন হন্টকান প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে ২৪ জন বুলগেরিয়ান ও ১০ জন তুরস্ক নিহত হয় ।—লর্ড বালফোর অব বার্নো এবং আর্থর ইলিয়ট মন্ত্রী সভার সভ্য পদ ত্যাগ করেন ।

৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর । মরক্কোর বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়াছে । ইউরোপীয় দিগের জীবন নিরাপন্ন নহে বলিয়া, ইংরেজ ও ফরাসীগণ ফেজু পরিত্যাগে আদিষ্ট হইয়াছেন শুনা যায় ।

৮ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর । শ্রীযুক্ত

বিনোদ বিহারী বন্দোপাধ্যায় লাইবেরিয়ার কলিকাতা কনসল নিযুক্ত হইয়াছেন জানা যায় ।

১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর । সার জেনস খনসম রিচি লণ্ডন নগরের লর্ডমেরর নির্বাচিত হইয়াছেন ।

১৫ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর । তুরস্ক ও বুলগেরিয়ানগণ রক্তস্রব, মেলনেক, ডেমিরহি এবং নেত্রোকোটা প্রদেশে যোদ্ধার যুদ্ধ করিতেছে জানা যায় ।—সার সূত্রাকনিয়া আয়ার সার আল ও হোয়াইটের স্থানে মাল্লাজ হাই-কোর্টের প্রধান বিচারক নিযুক্ত হইলেন ।

১৮ই আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর । নূতন মার্তিয়ান মন্ত্রী সভা গঠিত হয় এবং জেনারেল গিস (General Guich) ইহার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন ।—মাল্লাজ এবং বোম্বাই এর ইরান-গিরির সম্বন্ধে স্থানে জল প্লাবনের সংবাদ আসে ।—ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী সভায় (Cabinet) নিম্নলিখিত সভ্য সমূহ নির্বাচিত হইয়াছেন :—মিঃ উডরিক ভারতসচিব, অষ্টিন চেম্বারলৈন অর্থ সচিব, অনগ্রেবল আলফ্রেড লিটলটন উপনিবেশিক সচিব আরনল্ড ফষ্টার সমর সচিব, গ্রেহাম মরে স্কটল্যান্ডের মন্ত্রী এবং লর্ড ষ্টানলি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন । ডিউক অব ডিভনশায়ার পদত্যাগ করেন ।

২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর । আগ্রা নগরে ভীষণ ঝটিকা ও বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যায় ।

২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর । ইংলণ্ডে অনেক স্থানে অধিক বৃষ্টি ও জলপ্লাবন হইয়াছে সংবাদ আসে ।—কেপ কলনোত্তে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে জানিতে পারা যায় ।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল [১০ম সংখ্যা।

ঋগ্বেদ ও তৎসাময়িক রত্নান্ত।

মহান ঋগ্বেদ শাস্ত্র দশ “মণ্ডলে” বিভক্ত। প্রত্যেক মণ্ডলে কতগুলি করিয়া “মুক্ত,” ও প্রত্যেক মুক্তে কতগুলি করিয়া “ঋক্” আছে। এক একটি ঋক্ এক একটি বচন বা কবিতা স্বরূপ। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন মুক্তের অনেক ঋষি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডল, এক এক জন ঋষি বা ঋষিবংশের বিরচিত। মনুর্ষি গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল রচনা করেন, বিশ্বামিত্র তৃতীয়, বামদেব চতুর্থ, অত্রি পঞ্চম, ভরদ্বাজ ষষ্ঠ, বসিষ্ঠ সপ্তম, কণ্ঠ অষ্টম ও অঙ্গিরাস নবম মণ্ডল প্রণয়ন করেন।

এই সমস্ত ঋষি বা ঋষিবংশের কতিপয় সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়; কেননা ইহাদের উপাসনা, ভাষা ও বাক্যরচনা প্রণালীতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, আর কুত্রাপি পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতারও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রবংশীয়দিগের পরম্পর বৈরিতা প্রবাদ স্বরূপ। “হে ইন্দ্র! বিশ্বামিত্রগণ বসিষ্ঠগণের সহিত পার্থক্যই জানে, একতা জানে না, তাহারা পরম্পর অশ্ব প্রেরণ করে, ও ধনুর্বারণ করে।”

বসিষ্ঠগণের হস্তে বিশ্বামিত্র অশ্ব প্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তথাপি বসিষ্ঠরা বিশ্বামিত্রের সমকক্ষ হইতে পারেন না। বিশ্বামিত্র জানে সমধিক

উন্নত, জিতক্রোধ, এবং মৌনাবলম্বী ঋষি ছিলেন । বখন বসিষ্ঠেরা তাঁহাকে বাদিয়া লইয়া যান, তখন তিনি মহিমাক্ষরে বলিয়াছিলেন, “হে জনগণ ! তোমরা বিশ্বামিত্রকে জ্ঞান না ! দেখ আমি তপঃকর্যে ভয়ে শাপদানে নিবৃত্ত, তাই আমাকে পশুবৎ লইয়া যাইতেছি । বিদ্বান্ নাক্তি মূর্খের সহিত বিবাদ করে না, আমারও ইহাদিগের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে ।”

পঞ্চ জনপদের (পাণ্ডাব) রাজা সুদাস বসিষ্ঠের আশ্রয় বিশ্বামিত্রকেও পোহো-হিত্যে বরণ করিয়াছিলেন । বিশ্বামিত্র রাজসজ্জা সমাপন করিয়া যে রথে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা বদির ও শিশম্পা কাষ্ঠ-নির্মিত ছিল, বলীবর্দে উহা আকর্ষণ করিত । শিল্প কার্যের অসম্পূর্ণতা বশতঃই হউক, বা পথের বন্ধুরতা বশতঃই হউক, তাঁহার সময়ে রথের গমনাগমন বড় নিরাপদ ছিল এরূপ বোধ হয় না ।

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন :—

“বনম্পতি আমাদিগকে কেলিয়া দিও না, আঘাতও করিও না । আমাদের গৃহগমন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক ; রথবেগের অবসান ও পশুর বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক ।”

“কীকট সমূহের মধ্যে যে সকল গাভী আছে, তাহারা তোমার কি উপকারে আসিবে ? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না ; বরং হে মধবন্ ! আমাদের নিকট প্রমগন্ধের ধন আনয়ন কর, নীচ বংশীয় দিগের ধন আমাদের হউক ।” প্রাচীন কালে মগধ দেশবাসীরা কীকট নামে অভিহিত হইত, এবং প্রমগন্ধ উহাদিগের রাজ্য ছিলেন ।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই প্রদেশে অনার্যাদর্শ বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত থর্বাকৃত হয় নাই ; পরন্তু, ইহারা বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীন করিয়া এক দিন আর্য্য-ভেদকেও মলিনীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

বিশ্বামিত্র কলমূল্যাহারী বনবাসী ঋষি ছিলেন না । বোধ হয়, তখন ঋষি-দিগের বনবাস প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই । তিনি পুত্রকলত্রগণের সহিত সংসারাত্মক বাস করিতেন । যুদ্ধ-বিদ্যার পারদর্শিতা থাকাতো তিনি প্রথমে রাজা হইতেন ; কিন্তু অনতিবিলম্বেই পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপ্ত হইতেন । তপস্তাচরণ ও অশেষবিধ যজ্ঞ সমাপন করেন । তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়া যে প্রবাদ আছে, তাহার বোধ হয় এই কারণ ।

বসিষ্ঠ ।

মহর্ষি বসিষ্ঠ সে সকল সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, নিজে তাহার কতিপয় উদ্ধৃত হইল ।

“বিদ্বান্গণের বিদিত হউক যে সত্য এবং অসত্য বাক্য পরস্পর স্পর্ধা করে; বাহা সত্য এবং ঋতু, সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন ।

“দেবতারা পাপকারীকে প্রবর্তিত করেন না; বলবান্ মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না; তাহার কেবল সত্যকেই রক্ষা করেন ।

“পুত্র যেমন পিতাকে আহ্বান করে, আমিও সেইরূপ ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি । যে ব্যক্তি সংকল্পের দ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, সে অনেক প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ।”

বসিষ্ঠের সময়ে নৌকাযোগে সমুদ্র গমনের রীতি ছিল । একদা তিনি স্বয়ং সমুদ্র গমন করিয়া, দিকু-তরঙ্গে দোলায়মান তরঙ্গিতে, দোলারোহণের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন ।

মৎকালে বসিষ্ঠগণ সূদাসের যজ্ঞ ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন বরতের পুত্র পাশুপত নামক রাজাও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন । কথিত আছে, বসিষ্ঠের মন্ত্র বলে ইন্দ্রকে শেবোক্ত যজ্ঞ পুরিত্যাগ করাইয়া সূদাসের যজ্ঞে আনয়ন করেন, ইহারা যে বিত্তুক মন্তুবান্ ও যজ্ঞ সম্পাদনে ছুনিপুণ ছিলেন, নিম্নোক্ত ঋকেও তাহা প্রকাশ পাইতেছে ।

“হে বসিষ্ঠগণ ! তোমাদিগের স্তোম সূর্য্যের জ্যোতির আয় প্রকাশিত হয় । তোমাদিগের স্তোম বায়ুবেগের স্তায় অস্ত্রের অঙ্গুগমনের অশক্য । তোমাদের মহিমা সমুদ্রের স্তায় গভীর ।”

বসিষ্ঠবংশীয়রা খেতকার, দেখিতে অতি সুন্দর, কশ্মিষ্ঠ ও সর্ষপপ্রিয় পুরোহিত ছিলেন । তাহার মস্তকের দক্ষিণভাগে চূড়া ধারণ করিতেন ।

গৃৎ সমদ ।

যাহারা স্থির ভাবে মানব প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহার দেখিয়াছেন, যে সমুদ্রের চিরকাল এক বিষয়ে এক ভাবে নিপ্ত থাকিতে পারে না । পরিবর্তন ও নদীনতার জন্ত সমুদ্রা নতনই বস্তু । ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত,

মহুঘোরা চির দিন এক ভাবে উপাসনা করে নাই, বা আরাধ্য বস্তুকে একভাবে ভাবনা করে নাই ; শীঘ্র বা বিলম্বে অবশ্যই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে ।

এই ভাবান্তর কখনও সহজে সংসাধিত হয় ; কখনও বা ইহার প্রাক্কালে লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া জাতীয় সম্মিতিকে বিব্রত করিয়া ফেলে । যে সকল মহাপুরুষেরা এই সন্দেহের নিরাকরণ পূর্বক ভাবান্তর সংস্থাপন করিয়া দেন, তাঁহাদিগকেই আমরা ভক্ত, এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হইলে অবতার, বলিয়া পূজা করি । মহর্ষি গৃৎসমদ এইরূপ এক জন ভক্ত ছিলেন ।

বৈদিক সময়ের কোন ভাগে যখন লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা “ইন্দ্র কোথায়, কে তাহাকে দেখিয়াছে” ? এই প্রকার প্রশ্ন করিতেছিল, সেই সময়ে গৃৎসমদ প্রাদুর্ভূত হইলেন । তিনি অঙ্গিরার বংশোদ্ভূত সুনন্দোদ্ভূত পুত্র । অঙ্গিরাকুলে ইন্দের উপাসনা ছিল না বলিয়া গৃৎসমদ ঐ বংশ ত্যাগ করিয়া ভৃগুবংশে যোগ দান করেন । নিম্নলিখিত ঋক্ সমূহ পাঠ করিলে, তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ।

“হে মহুঘাগণ ! বে ভরদ্বজ দেব সম্বন্ধে লোকে স্খিত্যসা করে, তিনি কোথায়, এবং যাহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই, তাহাতেই বিশ্বাস কর, তিনি ইন্দ্র ।

“হে মহুঘাগণ ! দুই দল সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যে একজনকে আহ্বান করে, বিশ্বাস কর তিনিই ইন্দ্র ।

“তিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, তিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও অক্ষয়, তিনিই ইন্দ্র ।

“তিনি অপূজকদিগকে বজ্রদ্বারা বিনাশ করেন, গর্জিত মনুষ্য যাহার নিকট সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, হে মহুঘাগণ ! বিশ্বাস কর তিনিই ইন্দ্র ।

“তিনি সূর্য্য ও উষাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পর্ব্বত সমূহকে নিয়মিত করিয়া পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ যাহার রচনা, প্রালোক যাহার ভয়ে স্তম্ভিত, হে মহুঘাগণ ! বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র ।”

এই সময়ে ধুনি ও চুমুরি নামক দুইজন ভরদ্বজ দম্পত্য আঁখা সমাজে বিবাহ উপলব্ধ আরম্ভ করিয়াছিল । তাহারা নগর অনরোধ পূর্বক অধিবাসীদিগকে অশেষনিধি কণ্ঠে নিপাতিত করিত । কথিত আছে, তাহারা গৃৎসমদর মঞ্চশালায় উপনীত হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয় । জানুনিষ্ঠ

অগ্রহায়ণ, ১৩১০ । ঋত্থেদ ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত ।

৩৯১

ঋষি যোগবলে নিস্তার লাভ করেন । ধূনি ও চুমুরি রাজর্ষি দভীতির পুরী লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

গৃৎসমদ স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা, স্বর্ণালঙ্কার, ফোণী ও কর্কর নামক বীণা ও বাদ্যযন্ত্রবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন ; স্মৃতবাং তাঁহার সময়ে আর্য্য-দিগের সামাজিক অবস্থা তাদৃশ হীন ছিল না ।

অঙ্গিরা ।

পুরাকালে ঋষিরা সোমরস পান করিতেন । সোম পর্কতাদিতে উৎপন্ন লতা বিশেষ । উহা যজ্ঞস্থলে প্রস্তুত নিপীড়িত হইলে, রমণীরা অঙ্গুলিদ্বারা চট্কাইয়া উহার রস বাহির করিতেন । ঐ রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেঘ-লোম-নির্মিত ছাকনি দ্বারা ছাকা হইত । পরে ঋষিরা তাহা দুগ্ধ বা ক্ষীর সহযোগে পান করিতেন ।

সোম পানে বল, উৎসাহ, চিত্তসংযম ও মনের একাগ্রতা, সাধিত হইত বলিয়া, ঋষিরা পরমার্থসাধনের হেতুভূত সোমের পূজা করিতেন । অঙ্গিরা বংশোদ্ভব ঋষিরা সোমস্তুতির জন্যই বিখ্যাত ।

কেহ কেহ মনে করেন,—ঋষিরা সোমপানে চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিমন ও পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতেন,—এই সৌমাদৃশ্য বশতঃ চন্দ্রও সোমনামে অভিহিত হইয়াছেন ।

অঙ্গিরা বংশ, মনু ও ভৃগু বংশের ন্যায়, অতি প্রাচীন । অনুমান করা যাইতে পারে, যে সময়ে আর্য্যেরা সর্বপ্রথমে ভারত আশ্রয় করেন, তৎপূর্ববর্তী কালে ইহারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । মহর্ষি অঙ্গিরা আশ্রয় যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

- কিন্তু অঙ্গিরাগণের সমধিক ষড়্ ও অমুরাগ সম্বন্ধে, ভারতে সোমপান প্রথা চিরস্থায়িনী হইতে পারে নাট । সোম শীতপ্রধান দেশের সামগ্রী । ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্বে আর্য্যেরা ইহাতে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন । ইরানীয় ধর্মশাস্ত্রে, হাওয়া নামে সোমের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় । যতদিন আর্য্যগণ ভারতের শীত প্রধান ভাগে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যে সোমপানের বিলক্ষণ প্রচলন ছিল । অঙ্গিরাগণও বথা তথা পরম সমাদরে পূজিত হইতেন, কাল সহকারে আর্য্যগণ পূর্ব ও দক্ষিণ ভূভাগে বিস্তৃত হইলে, নৈসর্গিক তাপের আধিক্যবশতঃ, সোম ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ।

বামদেব ।

যে সময়ে আর্গার্গণ সরস্ব অতিক্রম করিয়া পূর্বাঙ্গাগে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, অনার্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন, আর্যরাজগণের মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়াছে, সরস্ব পূর্বাঙ্গারে অর্গ ও চিত্ররথ নামক দুই জন পরাক্রান্ত আর্য-ভূপতি সময়ে নিহত হইয়াছেন, সেই সময়ে মহর্ষি বামদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন ।

বামদেব একস্থানে বলিয়াছেন, ‘হে উরু ! তুমি দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র দম্বা বিনাশ করিয়াছিলে ।’ এখন দভীতি যে গুৎসমদের সম-সাময়িক, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে, কেন না যে সকল দম্বা দভীতির পুরী লুণ্ঠন করে, তাহারা গুৎসমদকেও বধ করিতে উদ্যুক্ত ছিল । অতএব বামদেব গুৎসমদের পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ।

বামদেব ত্রসদম্বা নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন । ইনি পুরুকুৎসের পুত্র এবং অতীব বলবীৰ্য্য সম্পন্ন আর্যভূপতি । ইহার নৈশবাবস্থায় যখন পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হইলেন, সাতজন ঋষি রাজ্যের অরাজকতা নিবারণ করিয়াছিলেন । ত্রসদম্বা বোবনে পদার্পণ করিয়া অনার্যজাতির ত্রাস স্বরূপ হইয়া উঠেন । তিনি অতি জ্ঞানবান্ বশস্বী ও দাতা ছিলেন । ছুইশত দশটী ধেনু তদীয় বিস্তৃত রাজ্য পরিবারের জন্ত দান করিত ।

মহর্ষি বামদেবের রচনা অতি সুন্দর ও গভীর ধর্মভাবে পরিপূর্ণ । তাঁহার রচিত একটি ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

“হে সবিভূদেব ! আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ, প্রমাদ বা ধনজনগর্ভবশতঃ, দেব ও মনুষ্যের প্রতি যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি তাহা মার্জনা করিয়া আমাদের পুনরায় নিষ্পাপ কর ।”

বামদেব অনেক স্থলেই এই কথা বলিয়াছেন, “ঋতগামী শ্রেনপক্ষী অন্তরীক্ষে উৎপত্তি হইয়া আমাদের জন্ত অমৃত আনয়ন করেন” । ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, ‘বামদেব ঋষি যতদিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা অনুভব না করিয়াছিলেন, ততদিন আপনাকে পিত্তরাবদ্ধ পক্ষীর স্থায় জ্ঞান করিতেন । পরে আত্মাকে অনাবৃত জানিয়া তাহাকে শ্রেন পক্ষীর স্থায় উৎপত্তিকর করেন । শ্রেন স্বর্গে বাইরা তাঁহার জন্ত অমৃত আনয়ন করে ।’ — আত্মার বুদ্ধমুক্ত অবস্থাতেই তাঁহার আনন্দানন্ত লাভ হয় ।

ধর্মের ইতিবৃত্তে কোন মহাত্মা কি করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে । যদি বাস্তবিক বামদেবই সর্বপ্রথমে আত্মার বুদ্ধমুক্ত অবস্থা অনুভব ও জ্ঞাপন

অগ্রহায়ণ, ১৩১০। ঋত্বিক ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

১৩৩

করিয়া থাকেন, তবে তিনিই যে ধর্ম জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, কে অস্বীকার করিবে ?

অত্রি।

মহর্ষি অত্রি অধিক স্তুতির প্রণেতা নহেন। তদীয় স্তুতি শুনিও উপাসনা-
শ্রদ্ধা। একটি স্থানে কেবল ত্রাক্ষর নামক রাজর্ষি ও ত্রনদস্যু রাজার উল্লেখ
আছে। “সাধুগণের রক্ষক ধনবান্ ত্রাক্ষর আমাকে শত স্বর্ণ, বিংশতি গো,
এবং শকটবহনকর্ম অশ্বযুগ প্রদান করিয়াছেন। ত্রনদস্যুও অগ্নির স্তব করিতে
অভিনাবী হইয়া, আমাকে দান করিতে ব্রত প্রকাশ করিয়াছেন।” অত্রি
বামদেবের পরবর্তী নহেন।

তদ্বংশীয় শ্রাবাস্থ ঋষি রথবীতি নামক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন। “এই
ঐশ্বর্যশালী রথবীতি গোমতী তীরে বাস করেন। পর্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার
গৃহ অবস্থিত আছে।” বোধ হয় অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী নদী যে স্থানে
হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই স্থানেই রথবীতির রাজধানী ছিল।

শ্রাবাস্থ আর একজন আর্য ভূপতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম
তরঙ্গ। তদীয় মহিষী শশীমসী, শ্রাবাস্থের স্তব পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অনেক
পুত্র ও ধনদান করত, নিজ অমুগ্ন পুরুষোত্তর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঋষি বলিতেছেন,—

“তদন্ত দুইটি লোহিতবর্ণ অশ্ব আমাকে ষণ্মসী ও বিজ্ঞ পুরুষোত্তর নিকট
বহন করিয়াছিল। বিদদশ্বের পুত্র পুরুষোত্তর আমাকে ধেনুপত ও তরঙ্গের স্তব
অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করিয়াছিলেন।”

মহাত্মা অত্রি সূর্য্য সম্বন্ধে তৎপূর্ববর্তী ঋষিদিগের অপেক্ষা অধিকতর চিন্তা
করিয়াছিলেন। তাঁহার সূর্য্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় স্তুতিপাঠে প্রতীতি হয়, যে তিনিই
সর্বপ্রথমে সূর্য্যগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেন।

• অনন্তর তদ্বংশীয় ঋষিরাও সেই চিন্তাশীলতার ভাগী হইলেন। তাঁহারা
উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি, তাহাকে সবিতা, এবং উদয় হইতে অস্ত গমন পর্য্যন্ত
যে মূর্তি, তাহাকেই সূর্য্য নামে অভিহিত করিলেন। সবিতৃদেবের উপাসনার্থে
— কৃতিপন্ন স্তুতিও প্রণীত হইল।

• ঋতবিদ কহিলেন, ‘আমি সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়াছি, সেই স্থানে সহস্র
সংখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে, দেব মূর্তি সমূহের মধ্যে সেই এক
শ্রেষ্ঠ মূর্তি আমার নয়নগোচর হইয়াছে।’

‘ফলতঃ এই মাহাত্ম্য অতি প্রথম, যদ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য্য, দৈনিক গতির পরিমাণে বহু জনরাশিকে দোহন করিতেছেন ।

এইরূপ চিন্তা সকল উদ্ভিত হইতে লাগিল । দারুণ দেববুদ্ধি ও অসামান্য ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুবন্ধিৎসার স্রোতঃ প্রবাহিত হইল ; অস্তুরে অস্তুরে সৌর প্রকৃতির পর্যালোচনা হইতে লাগিল । অবশেষে অত্রি-কুল-তিলক প্রতিপদ যে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানও তদপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে সমর্থ নহেন ।

“হে ঋতুগণ ! এই সম্মুখস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অতিশয় সুবাহু ; ইহা হইতেই নদী সকল প্রবাহিত হয়, এবং ইহাতেই বারি-রাশি অবস্থান করে । দিবা ও রাত্রি ইহা হইতেই উৎপন্ন, ইনিই ঋতুগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ।”

ভরদ্বাজ ।

আমরা যখন ঋষিদিগের বিষয় পর্যালোচনা করি, তখন তাঁহারা কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য কতই উৎসুক হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা জানিবার অতি অল্পই উপায় বিদ্যমান আছে । প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রই উপাসনাত্মক ; উহা ঋষিদিগের পবিত্রতা, সংকল্পনিষ্ঠা, এবং ঈশ্বর-পরায়ণতার যত পরিচায়ক, ঐতিহাসিক তথ্য তত নিবৃতি-কারক নহে ।

বিশেষতঃ ভরদ্বাজ ইতর বিষয়ের অধিক উল্লেখ করেন নাই । তিনি যে একটি মাত্র বৃক্ষের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উপলব্ধি হওয়াও দুর্ঘট ।

“হরিবৃক্ষীয়া নদীর পূর্ব্বকূল আশ্রয় করিয়া বৃক্ষীবানের বংশধরেরা বাস করিত । অভ্যবর্তী নামক রাজা তিন সহস্র বর্ষধারীর সহিত উহাদিগের বিনাশ সাধন করেন । ইনি আমাকে অনেক ধন ও গবাদি পশু দান করিয়াছিলেন ।”

এখন অভ্যবর্তী কে ? বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র চয়মান, চয়মানের পুত্র অভ্যবর্তী । বসিষ্ঠ বা তাঁহার অপত্যগণ সূদাসের তুঙ্গনায় ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন । অতএব ভরদ্বাজ বসিষ্ঠদিগের সময়ে বা তৎপরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ।

মহর্ষি ভরদ্বাজের যে পৌরহিত্য একটি অতি মহৎ কর্মের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইনি ~~সকল~~ ~~ঐ~~ ~~থানে~~ ~~গোবর্ধ~~ নিবারণের চেষ্টা পান। জীবকাকণ্যশালী মহর্ষি এই সময়ে যে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিরদংশ উদ্ধৃত হইল।

“হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদিগকে পোষণ কর; তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীবুদ্ধ কর। তোমরাই আমাদের গৃহের সমৃদ্ধি।

“ধেনুগণ সেন বিনষ্ট না হয়, তদ্বরগণ সেন তাহাদিগকে অপহরণ করে। শত্রুর অস্ত্র সেন তাহাদের অঙ্গে নিপতিত না হয়। তাহারা বজ্র বলিদানাদি সংস্কারও প্রাপ্ত না হউক। হে মনুষ্যাগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, বাহাকে আমি মনঃ ও প্রাণের সহিত কামনা করি।”

কণ্ঠ ।

মহাত্মা কথ কতিপয় উপাসনা বাক্য ব্যতীত আমাদিগের জ্ঞাত আর কিছুই রাখিয়া বান নাই। কিন্তু যে সকল পুত্ররত্নে তাহার গৃহ অনন্দিত ছিল, তন্মধ্যে সোভরি, মেধাতিথি ও প্রগাথ পৌরহিত্য ও কবিদ, উভয় স্তম্ভেই ভূষিত ছিলেন। প্রগাথ অর্জাকিরা নদীর উত্তর করিয়াছেন। এই নদী পরবর্তী কালে বিপাশা নামে অভিহিত হয়, এক্ষণে ইহার নাম বেয়া। প্রগাথ ঐ প্রদেশে অত্যাগ্র সোমরস ব্যবহারের বিষয় অবগত ছিলেন।

মেধাতিথি পঞ্চজনের কথা বলিয়াছেন। সিন্ধুর পঞ্চশাখার তীরস্থিত পঞ্চ প্রদেশই ঐ নামে অভিহিত হইত। মেধাতিথি ‘ঐ প্রদেশ ইন্দ্রের অনুপবৃত্ত’ বোধে বজ্রস্থলে প্রার্থনা করিতেছেন, “ইন্দ্র দূরদেশ হইতে পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন।”

মেধাতিথি বোধ হয় সরস্বতী তীরে বাস করিতেন। পঞ্চাব আৰ্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থান ছিল; তৎপরে সরস্বতী ও দৃবদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূভাগই আৰ্য্যনিবাসের প্রকৃষ্টতর স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মাবর্ত। মেধাতিথির সময়ে ব্রহ্মাবর্তে শ্রীবুদ্ধি ও ধনজনবাহিনী সংঘটিত হইয়াছিল।

কথপুত্র সোভরি ত্রসদম্বা রাজার ভবনে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি অত্রির সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে, পুরুকুৎস তনয় ত্রসদম্বা তাঁহাকে আশ্রয়ার্থ পঞ্চাশ জন বন্ধু প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সরস্বতী তীরে চিত্র নামক রাজা মহাবজ্রের অনুষ্ঠান

করেন । সোভরি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সেই যজ্ঞে সরস্বতী
তীর বসি কাঁচতীর : আৰ্য্যভূপতি নিমন্ত্রিত, ও ধনরত্ন সহকারে অর্চিত
হইয়াছিলেন ।

যদিও আৰ্য্যবিজয়, স্রোতঃ তৈতিপূর্বেই যমুনাতট অতিক্রম করিয়াছিল,
তথাপি বহুকাল পর্যন্ত ব্রহ্মাবর্তই মহতী আৰ্য্যসমিতির কেন্দ্রভূত ছিল ।
পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা পূর্বদিগবর্তী সমরাস্রমে দাসের যে ধনরত্ন লাভ
করেন, তৎ সমস্তই অবিলম্বে ব্রহ্মাবর্তে নিকামে বাহিত, ও তথাকার পরি-
শোধার্থে কলিত হয় । সরস্বতী তীরে লোকারণ্য দেখিয়া দূরদর্শী ঋষিদিগের
অন্তঃকরণে এক অভিনব চিন্তার উদয় হয় । তাঁহারা দেবনদীকে সম্ভাষণ
করিয়া বলেন, “সরস্বতি ! আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে বেন কোন
অপকৃষ্ট স্থানে বাইতে হয় !”

শ্রীকেন্দারনাথ বিদ্যাবিনোদ ।

কাটোয়ার পথে ।

(প্রথম প্রস্তাব)

অনেক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় বসিয়া সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত
নানা বিষয়ে কথোপকথন দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম, এমন সময়ে
ডাকঘরের পিয়ন (পেয়াদা) আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিল ;
পত্র খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে—

“আমি ছশ্চিকিৎসারোগে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল শয্যাগত আছি ।
চিকিৎসকেরা আমার জীবন সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়াছেন ; আমারও বিশ্বাস
এই যে, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে । এই কঠিন পীড়া হইতে
রক্ষা পাইবার আশা খুব কম । মৃত্যুর পূর্বে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ
করিতে ইচ্ছা করি, তুমি এই পত্র পাঠমাত্র বর্ধমানের রওয়ানা হইবে, তথা
হইতে অশ্বশকটে বা বলদশকটে কাটোয়া আসা যাই । বর্ধমান রেলওয়ে
স্টেশনের এক কোশ দূরে আমার আশ্রয় শ্রীযুক্ত—বাবুর বাটী, তুমি তাঁহার
বাটীতে পৌছিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তোমার কাটোয়া

আগমনের সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন । তাহার সহিত তোমার অবস্থা পরিচয় আছে, তাহাকেও আমি কল্যাণ পত্র লিখিয়াছি ।”

শ্রী—

কাটোয়া ।

এই পত্র পাঠ করিয়া আমি সেই রাত্রির রেলগাড়ীতে বহুমান্নে রওয়ানা হইলাম ; রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্তী দোকানে নিশি ধাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পীড়িত ব্যক্তির আত্মীরে বাটীতে উপস্থিত হইলাম । আত্মীরে সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন “আমিও কাটোয়া বাইব, আমরা উভয়ে বলদ শকটে একসঙ্গে রওয়ানা হইব । কাটোয়া নগরী অনেক দূরে অবস্থিত এবং পথ নিরাপদ নহে ; সে পথে অত্যন্ত দক্ষ্য ভয় আছে ; একজন বলবান ও সাহসী লোক সঙ্গে লইয়া বাটীতে ইচ্ছা করি ।” এই কথা বলিয়া তিনি সেই গ্রামের পরাণ বাগ্‌দী নামে এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন । পরাণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, বাবু কহিলেন “পরাণ ! তোমাকে আমাদের সঙ্গে কাটোয়া বাইতে হইবে ; শীঘ্র প্রস্তুত হও, শ্রান করিয়া আমার বাটীতে আহাৰ কর । আমরা আহাৰাদির পরেই রওয়ানা হইব ।” আমরা ভোজনাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে পরাণ বাগ্‌দী আসিয়া আহাৰে প্রবৃত্ত হইল, আমি নিকটে দাঁড়াইয়া পরাণের চেহারা ও আহাৰের প্রণালী দেখিতে লাগিলাম । দেখিলাম, অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে শ্রীমান পরাণচন্দ্র বাগ্‌দী এক সের চাউলের অন্ন, তছপুক্ক ডাউল এবং তৎসঙ্গে পঞ্চ প্রকার তরকারী ও অর্ধসের দধি অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়া বসিল । পরাণের বয়স তখন ২৮ বৎসরের অধিক হয় নাই ; মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর রূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং সবল ও সুঠাম । তাহার বাঁশের লাঠি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । বাহা ইউক, আমরা অপরাহ্নে বলদশকটে আরোহণ করিয়া কাটোয়া রওয়ানা হইলাম । বাবু, আমি এবং গাড়োয়ান গাড়ীর উপরে রহিলাম ; পরাণ পদব্রজে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল । একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে সূর্য্যদেব অস্ত হইলেন, আমরা সেই গ্রামে রাত্রি বাপন করিলাম ।

দ্বিতীয় দিবস প্রভাতে আমরা আবার বলদ শকটে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম । গ্রীষ্মকাল ; মধ্যাহ্ন সময় ; বিশেষতঃ অনেক মাস বৃষ্টি হয় নাই ; এজন্য বোধ হইতে লাগিল যেন সৈন্য পৃথিবী অগ্নিতাপে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে । পথের মাটি এমন গরম হইয়াছিল যে,

জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া গেলেও জুতা গরম হইয়া যায় । কাটোয়ার পথ তখন খুব বিপদ জনক এবং ভয়পূর্ণ ছিল । ডাকাইতি, রাহাজানী, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতির জন্য এই পথ তখন প্রসিদ্ধ ছিল । বিশেষতঃ সে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরে সে অঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ ও অনরুপ উপস্থিত হওয়ায় দস্যুতা ও রাহাজানীর বিশেষ ভয় ছিল । মধ্যাহ্ন সময়ে আমি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, চারিদিকে কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ বিস্তৃত, মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তপ্ত কিরণমালায় সমস্ত পৃথিবী নেন ধু ধু করিতেছে । কোথাও লোক বা লোকানর নাই, একটি পখিককেও আসিতে বা বাটতে দেখিলাম না । বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম “ইহা কোথাকার মাঠ ?” বাবু বলিলেন “তুমি এই সামান্ত মাঠ দেখিয়াই আশ্চর্য হইয়াছ ! ! এখনও আমরা কর্জনার মাঠে আসিনাই, বোধ হয় একটু পরেই কর্জনার মাঠে আসিয়া পৌছিব । তথাকার মাঠ দেখিলে, তবে মাঠের প্রকৃত জ্ঞান তোমার জন্মিতে পারে ।” অনেকক্ষণ পরে আমরা কর্জনার মাঠে আসিয়া পৌছিলাম, বাবু কহিলেন “ঐ দেখ, ঐ দেখ, আমরা কর্জনার মাঠে আসিয়া পৌছিরাছি । এত বড় মাঠ এতদঞ্চলে আর নাই, ইহা অতীব ভয়ঙ্কর স্থান ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “ভয়ঙ্কর কেন ?” তিনি কহিলেন—“দস্যুরা এই পথে পখিকদিগকে আক্রমণ করিয়া বখানকস্বর কাড়িয়া লয় এবং তাহাদিগকে মারিয়া কেলে পুনীশে তাহাদের কিছুই করিতে পারে না । নিকটে লোকালয় বা গ্রাম নাই ; দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের অধিবাসীরা ডাকাইতী, রাহাজানী, নরহত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে । এদেশে নাহারা পখিকদিগকে আক্রমণ করে তাহাদিগকে লোকে ~~শেফ~~ বলে ।” আমি বলিলাম “কর্জনা গ্রাম কোথায় ?” বাবু কহিলেন “আরও অনেক দূরে গেলে, এই প্রকাণ্ড মাঠেরই এক দূরবর্তী স্থানে ক্ষুদ্র কর্জনা গ্রাম দেখিতে পাইবে । সেই গ্রামের অধিকাংশই দস্যু । কর্জনার মাঠে আসিলে শতকরা ৯৮ জন পখিক আর ঘরে কিরিয়া আইসে না, দস্যুগণ কর্তৃক নিহত হয় । এই জন্য এদেশে একটা প্রবাদ আছে—

যদি মানি কর্জনা

লেয়ে ধূরে ঘর বা না ॥

অর্থাৎ, যদি কেহ কর্জনা বাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (লেয়ে ধূরে) স্থান করিয়া বস্ত্র পরিচ্যাগ পূর্বক অগ্নে হইতেই নিজের শ্রদ্ধা নিজে করিয়া

রাখা উচিত, অথবা তাহার আশ্বীয়েরা তাহার শ্রদ্ধ করিলে, কারণ কৰ্জ্জনা গেলে আর ঘরে কিরিয়া আনিবার আশা অতি অল্প ।”

বাবুর কথা শেষ হইলে আমার মুগ্ধমান হইল, আমি ভীত হইলাম । আমার বয়স তখন খুব কম, বালক বলিলেই হয় । আমাকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া বাবু আমার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন “তোমার অমুমাতি ভয়েরও কারণ নাই ; পরাণ বাগ্দি আমাদের সঙ্গে আছে এবং বিশেষতঃ গাড়োয়ানও একজন খুব বলবান মানুষ, তত্ত্বিন্ন আমি নিজে লাঠি ধরিলে ছয় সাত জনের মাথা কাটাষ্টরা দিতে পারি । পরাণ একাকী বিশজন দস্যুর সমতুল্য ।” বাস্তবিক ইহারা কয়জনেই খুব বলবান ও সাহসী ছিল ।

কিছুক্ষণ পরে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি পুনঃ পুনঃ পরাণ বাগ্দির প্রশংসা করিয়াছেন । পরাণ বাগ্দির কিছু পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি ।” বাবু কহিলেন “পরাণ বাগ্দির পিতা একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল, তাহার ভরে এদেশে বাঘে ছাগে একঘাটে জল খাইত । সরকার বাহাদুর ঠগীর হাজামার সময় এক মোকদ্দমায় পরাণের পিতাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসি দিয়াছিলেন । পরাণের বয়স অধিক নহে, কিন্তু বলে ও সাহসে এ অঞ্চলে এ ব্যক্তি অদ্বিতীয় । কয়েক বৎসর পূর্বে বাবুড়া জেলার এক জমিদারের বাটীতে পরাণ চাকুরী করিত ; জমিদার বাবু ইহার হস্তে অনেক টাকা সমর্পণ করিয়া কালেক্টরীর খাজানা দিতে পাঠাইয়াছিলেন ! পশ্চিমদ্যে এক খালের ধারে তিনজন বলবান দস্যু পরাণকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরাণ তাহাদের দুই জনকে নিহত করিয়া প্রভুর জমিদারীর খাজনা দখল সময়ে খাজনা-খানায় পৌঁছাইয়া দেয় । এই অদ্ভুত কথা তুমি পরাণের নিজের মুখেই শুনিতে পার ।” পরাণ বাগ্দি গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল ; আমাদের অনুরোধে ঐ অদ্ভুত ঘটনা সংক্ষেপে বলিতে লাগিল ।

পরাণ বলিল “জমিদার বাবু আমাকে বখন টাকা সমর্পণ করিয়া রওয়ানা হইতে হকুম দিলেন, তখন বেলা তিনটা । পথে আসিতে আসিতে এক গ্রামে স্থা অস্ত হইল, সেই গ্রাম আমাদের বাবুর জমিদারী, সুতরাং সেই গ্রামের কাছারীতে গিয়া রাত্রি যাপন করিলাম । তখন গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, দিনের বেলায় প্রচণ্ড রৌদ্র । এইজন্য রজনী প্রভাত হইতে আড়াই ঘণ্টা যখন নাকি ছিল, তখন শয়ন হইতে উঠিয়া মূখ হাত ধুইয়া গৌমস্তার নিকট হইতে টাকা লইয়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আমি রওয়ানা হইলাম । পথে একটা খাল

পার হইতে হয় ; কর্জনার মাঠ যেমন ভয়ানক স্থান, সেই খাল ও তেমনি ভয়ঙ্কর । এই খালে বোধ হয় লক্ষ মানুষের মাথা আছে, দস্যুরা এই খালে পশ্চিম দিগকে আক্রমণ করিয়া নিহত করে । আমি সে সময়ে গাঁজা খাইতাম, এখন তাহা খাই না । খালের এশারে একটা বড় বটবৃক্ষ ছিল, তাহাই তলে বসিয়া কল্কার গাঁজা সাজিয়া, চক্ৰকির পাখরে লোহা ঠুকিয়া, “সোলা”র আশ্রয় প্রস্তুত করিলাম । চক্ৰকির ঠুকতে ঠুকিতে আমি জানিতে পারিলাম রাত্রিতে কাছারী হইতে উঠিয়া আসিবার সময় আমার লাঠি আমি ভুলিয়া আসিয়াছি । কাছারীতে আমি গাঁজা খাইয়াছিলাম, বুকের ঘোরে এবং গাঁজার নেশায় একরূপ ভুল হইয়াছিল । কিন্তু অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এতদূর হইতে আর ফিরিয়া যাওয়া কঠিন, এই জন্ত লাঠির কথা আর মনে ভাবিলাম না । গাঁজা খাইয়া, উর্দ্ধে এক বিরাট ও বিকট লক্ষ প্রদান পূর্বক, বটবৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড ডালে হাত দিয়া, সেই ডালটাকে নিমেষ মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, এবং তাহাই লাঠি স্বরূপে স্বন্ধে লইয়া খালের দিকে চলিতে লাগিলাম । গ্রীষ্মকালবশতঃ খালের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সামান্য জল এবং প্রচুর বালি ছিল । বিপদ উপস্থিত হইলে, বালির উপর দৌড়িয়া যাওয়া বড়ই কষ্টকর হয় । আমি অতি সাবধানে যাইতে লাগিলাম । দেখিতে দেখিতে তিনজন দস্যু তিন দিক হইতে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল ; তাহাদের হাতে মোটা মোটা বাঁশের লাঠি এবং এক এক বোঝা “ফাপড়া” * ছিল । তাহারা প্রথমে ফাপড়া ছুড়িতে লাগিল, আমি বটবৃক্ষের সেই প্রকাণ্ড শাখা অনবরতঃ বুঝাইতে লাগিলাম, ফাপড়া গুলি পাতায় ঠেকিয়া ভূমিতে পড়িয়া বাইতে লাগিল । ফাপড়ার লড়াইয়ে তাহারা হতাশ হইয়া, লাঠি হাতে আমার নিকটে উপস্থিত হইল । আমি তাহাদিগকে চালাকী করিয়া বলিলাম “ভাই ! আমার সঙ্গে আর লোক নাই এবং এক গাছি লাঠিও নাই, আমি এমতাবস্থায় তোমাদের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি ? আমার সঙ্গে যে টাকা ও নোট আছে তাহা তোমাদিগকে আমি অকাতরে দিতেছি, তোমরা টাকা লইয়া চলিয়া যাও এবং আমাকে ছাড়িয়া দাও । অকারণে নিরপরাধীর প্রাণ হত্যা করা ভাল নহে । উপরে ভগবান আছেন,

* খালের ছাত্রেরা অপবা অকিনের শ্রেণীরা যে কুল ব্যবহার করেন, দস্যুদের ফাপড়া প্রায় সেইরূপ । ইহা ছুড়িয়া মারিলে ইহার আঘাত পশ্চিম এশারাই কাবু হইয়া যায় । —লেখক ।

নৌচে রাজা আছেন, এবং হুবয়ে মা কালী আছেন—দোহাই তোমাদের !! নরহত্যা করিওনা ।” কথা শুনিয়া দস্যুরা বলিল “আচ্ছা, তবে তুমি টাকার পুটুলি খোল এবং টাকা দাও ।” আমি কোমর হইতে গামোছা খুলিয়া টাকা ও নোট সমেত সেই গামোছাখানি বালুকার উপরে রাখিয়া বলিলাম “এই স্থান হইতে টাকা উঠাইয়া লও ; আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করিবার ইচ্ছা করি না । এই দেখ, বটগাছের ডালটাকে আমি ফেলিয়া দিতেছি । এই বলিয়া নিকটে ঐ ডালটাকে ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু আমি মনে মনে নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছিলাম, ইহারা কেবল টাকা লইয়াই ক্ষান্ত হইবে না, নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে । তাহার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, ইতাবসরে দক্ষিণ দিকের দস্থা বামদিকের দস্যুর পাশাপাশি ভাবে দাঁড়াইল । আমি সুবিধা বুঝিয়া নিমেষকাল মধ্যে অতি দ্রুত তীরের স্থায় অথবা মেঘের বিজলীর ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া এই দুইটা দস্যুর মধ্যে একটার গলায় হাত দিয়া গলা টিপিয়া ধরিলাম, এবং আর একটার গলা চাপিয়া ধরিলাম, তাহার পর দ্বিতীয় মুহূর্তেই উভয়ের মাথা এমন জোরে ঠুকাঠুকি করিলাম যে, উভয়কে প্রায় বে-দম্ করিয়া ফেলিলাম এবং কথাটি কহিবার অথবা হাত নাড়িবার অবকাশ দিলাম না । তাহার পরে দুই জনকে বালিতে ফেলিয়া, একজনের পেটে পা দিয়া কনুর ঘণির মত তাহাকে ঘুরাইতে লাগিলাম, তাহার মুখ দিয়া ও গুহদেশ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল । আমি বলিলাম “থাক্ বেটা থাক্, এই খানেই মরণ পর্য্যন্ত থাক্, এই খাল ছাড়িয়া তোকে আর একটি পাও অগ্রসর হইতে হইবে না ।” দ্বিতীয় দস্থাটা অর্দ্ধমৃতাবস্থায় চাহিয়া চাহিয়া এই ব্যাপার দেখিতে ছিল, এবারে তাহার পেটে পা দেওয়ার সে অনেক কাতরোক্তি করিল, কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িলাম না, প্রথম দস্যুর স্থায় তাহারও মুখদিয়া রক্ত বাহির করিলাম । তাহার পরে তৃতীয় দস্যুর দিকে চাহিয়া দেখি, সে ব্যক্তি তথায় নাই । মাঠের দিকে তাকাইয়া জানিলাম, অতীব উৎসাহে সে দৌড়িয়া পলাইতেছে । আমি আর তাহার পশ্চাত্তাপন করিলাম না ; টাকা ও নোট লইয়া আমি গন্তব্যস্থানাভিমুখে রওয়ানা হইলাম ।” ইত্যাদি । পরাণের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী ।

মেঘদূত ।

খ। কাব্যে ভৌগলিক বিবরণ ।

(৩) দশার্ণ বা পূর্বমালবের অধিত্যকা ।

বৈশাখ মাসের “নবপ্রভায়”, দশার্ণরাজ্য তার রাজধানী বিদিশা, ও তৎ-
সন্নিহিতবর্তী “নীচ” পাহাড়ের বর্ণনা করা গিয়াছে। বিদিশার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে
কাদম্বরীতে বাণভট্ট যথেষ্ট লিখিয়াছেন যথা—

“তস্য রাজ্ঞঃ.....বিস্তীর্ণা মজ্জন্মালববিলাসিনীকুচতটাফালনজର୍জরিতোর্মি-
মানরা...বেত্রবত্যা পরিগতা বিদিশাভিধানা নগরী রাজধান্যাসীৎ।” পূর্ব-
ভাগ পৃ-১১-২।

সেই রাজা শূদ্র-কর বিস্তীর্ণ ও বেত্রবতী নদীকর্তৃক ঘূর্ণা বিদিশা নামধেয়া
নগরী রাখানী' ছিল । (“মজ্জন” ইত্যাদি বেত্রবতীর বিশেষণ) ।

(iv) “वननदी” (२१ श्लोक) ।

টীকাকারগণের মধ্যে ইহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; মল্লিনাথ মতে “বনে
হরণ্যে যা নদাস্তাসাং”, সারোদ্ধারিণী মতে, “অথবা মানবদেশে...বননদীনালী
সরিদস্তীতি” । শাস্ত্রী মহাশয় মল্লিনাথ মতানুযায়ী “ছোট নদীটি” এই অর্থ
করিয়াছেন (পৃ-২৯) । আমার মতে ইহাকে বিশেষ নদীর নাম (একবচন)
স্বীকার করিলে ভাল হয় । তাহা হইলে বনন্ নদীর শাখা পার্শ্বতীর সহিত
ইহাকে চিহ্ন করিব । পার্শ্বতী বেততার পশ্চিমে প্রবাহিত, ২২০ মাইল
ধাইয়া চম্বলে মিশিয়াছে ।

(৪) অবন্তী বা পশ্চিম মালবের অধিত্যকা ।

(i) “উজ্জয়িনাঃ” “নক্রঃপশু” (২৮ শ্লোক)।

কবি এতক্ষণ মেঘকে উত্তর বা উত্তরপশ্চিমাভিমুখে লইতেছিলেন ; এখন
 তিনি বলেন যে যদিও তোমার পথ বক্র হইবে, অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখী
 হইবে, তবু তোমার একবার উজ্জয়িনীটা দেখা উচিত । ২৮ হইতে ৪১ শ্লোক,
 উজ্জয়িনীর পর বর্ণনা, উজ্জয়িনীর প্রশংসা, ও উজ্জয়িনীর উত্তরে অবস্থীরাজ্যের
 অন্যান্য অংশের বর্ণনায় পরিপূর্ণ ।

অবস্থাদেশ ও তাহার রাজধানী উজ্জয়িনীর প্রতি কবির এত আগ্রহ কেন ? ইহা কি তাহার স্বদেশ ছিল ; তাই কি এত খুঁটি নাটি আঁকিয়াছেন ?

(ii) “নির্ঝিক্সায়াঃ” (২৯ শ্লোক) ।

বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী যাইতে গেলে নিম্নলিখিত শ্রোতস্বতীগুলি পথে পড়ে :—

১ম—পার্বতী

২য়—নিভাজ

৩য়—অনাসিক সরিৎ

৪র্থ—কালিসিদ্ধ

৫ম—অমাসিক সরিৎ

৬ষ্ঠ—শিপ্রা

পার্বতীকে আমি “বননদীর” সহিত চিহ্ন করিয়াছি, সুতরাং নির্ঝিক্সাকে নিভাজের সহিত চিহ্ন করা শ্রেয়ঃ । নিভাজ চব্বলের শাখা নদী । এটি সকল সরিৎ বিদ্যা পর্বতমালার সর্বপশ্চিমাংশ মাণ্ডু range হইতে উদ্ভব ও অনেক ঘুরিয়া, বেকিয়া চব্বলতে পড়িয়াছে । মাণ্ডু পর্বতশ্রেণী উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে ঢালু হইয়া আস্তে আস্তে নামিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণে নর্মদার দিকে অত্যন্ত খাড়া । তাই তহুড়া নদীগুলির গতি উত্তরাভিমুখে । অধিত্যকার সাধারণ উচ্চতা ১৫০০ ফুট ।

নির্ঝিক্সা পূর্ণাতোয়া শ্রোতস্বতী । ভাগবতে, বায়ুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে ; চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে চৈতন্যদেব তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন ।

(iii) “সিদ্ধুঃ” (৩০ শ্লোক)

মল্লিনাথ অন্য টীকাকারগণ হইতে পৃথক মত দিয়াছেন । তিনি ‘অসাবতী-তস্ত’ পাঠ করিয়া “অসৌ পূর্বোক্তা সিদ্ধুনদী নির্ঝিক্সা” এই রকম অর্থ করেন । কিন্তু পার্শ্বভূদয় ও অন্যান্য টীকাকারেরা “তামতীতস্ত” পড়িয়া সিদ্ধুনদী অপর একটি নদীর উল্লেখ করেন । শেবোক্ত অর্থ ষথার্থ, কেন না উজ্জয়িনীর পথে কালিসিদ্ধনামে এক শাখা নদী পাওয়া যায় । ইহা বিদ্যাত্রির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উদ্ভব হইয়া ২২৫ মাইল গমনের পর চব্বলে পতিত হয় ।

(iv.) “শিপ্রা” (৩২ শ্লোক) ।

উজ্জয়িনী শিপ্রা নদী তটে থাকায়, ইহার নাম স্প্রসিদ্ধ । ২২°-৩৭' অক্ষাংশ, ৭৬°-১২' দ্রাঘিমাংশে, বিদ্যা পর্বতের উত্তর ভাগে ইহার উৎপত্তি । প্রায় ৫০ মাইল গতির পর উজ্জয়িনীর পদধৌত করিয়া অনেক আকিয়া বাকিয়া ১২০ মাইলে চব্বলে পড়িয়াছে ।

(v.) “অবন্তীন্” “শ্রীবিশালাং” (৩১ শ্লোক) ।

এতক্ষণে অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী, অপর নাম বিশালায় আসা গেল ।

অবন্তী (আদন্তা)র নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত । পাণিনী, অথর্ব-
পরিশিষ্ট বৌদায়নধর্মসূত্র, মহাভারত, হরিবংশ, মৃচ্ছকটিক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎ
সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম পাওয়া যায় । কালিদাস নিজেই
রঘুবংশে (৬৩১-৫) ইহার প্রশংসা করিয়াছেন । প্রাচীন কালে ইহা এক
সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল সন্দেহ নাই ।

অবন্তীর রাজধানী বিশালার নাম দশকুমার চরিত, বরাহপুরাণ, কথাসরিৎ-
সাগর প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায় । তবে উজ্জয়িনী বা উজ্জয়িনীর নাম কি
সংস্কৃত সাহিত্যে, কি ভারত ইতিহাসে উভয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ । অশোকের
শিলালিপিতে, নাসিকের গুহালিপিতে, ভারাহৎ ও সাক্ষির বৌদ্ধ দান লিপিতে,
খৃঃ পূঃ প্রাচীন মুদ্রা সমূহে, পাশ্চাত্য পেরিপ্লস ও টলেমীর ভৌগোলিক বর্ণনায়
ইহার নাম জাজ্ঞ্যমান ; পাণিনীর গণাদিতে, বৌদ্ধ ত্রিপিটকার টৈজ্ঞন প্রাচীন
শাস্ত্রে (ভগবতীসূত্র, নন্দোদ্র প্রভৃতি) উজ্জয়িনীর ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে ;
হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে উজ্জয়িনী দ্রাঘিমাংশের আরম্ভ স্থানরূপে গণিত হয় ।

উজ্জয়িনী সম্বন্ধে কবি দুইটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন :—

প্রথম,—৩১ ও ৩৪ শ্লোকে বৎসরাজ উদয়ন ও তৎকর্তৃক অবন্তীরাজ
প্রদ্যোতের কন্যা হরণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন । ইহা সম্ভবতঃ বৃহৎ কথা হইতে
উদ্ধৃত । বৃহৎকথা গ্রন্থ এখনও আবিষ্কার হয় নাই । তবে কথা সরিৎসাগর
তাহার এক রকম পাঠ বলিলে অভুক্তি হয় না । কথাসরিৎসাগরে ২য় লঙ্ক
৪-৬ ভরঙ্গে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তবে তথায় অবন্তীরাজের নাম চণ্ড মহাসেন
(প্রদ্যোত নয়) ।

দ্বিতীয়,—৩৩ শ্লোকে কবি বলিতেছেন :—

“উজ্জয়িনীর বিপনীশ্রেণীতে কোটি কোটি গুহ বৃহৎ তরল গুটিকা (মহারত্ন)
শঙ্খগুহা (মুক্তা), বালতপের দ্বায় শ্যামল মরকতমণি, ও প্রবালখণ্ড সমূহ
বিস্তৃত দেখিয়া মনে হয় যে সমুদ্রতে কি কেবল জলমাত্র অবশিষ্ট রহিল ।”

এই বর্ণনা হইতে অনুভূত হয় যে উজ্জয়িনী, মণি, মুক্তা প্রবাল প্রভৃতির
বিপুল ক্রয় বিক্রয় স্থান ছিল, ও সেই ধারণা মৃচ্ছকটিক ও কাদম্বরী দ্বারা দৃঢ়ী-
কৃত হয় । পেরিপ্লস (১ম খণ্ড) লিখিয়াছেন :—

In the same region eastward is a city called Ozene, formerly the

capital wherein the king resided. From it there is brought down to Barugaza every commodity for the supply of the country and for export to our own markets—Onyx stones, porcelain, fine muslins, mallow-coloured muslins and no small quantity of ordinary cottons. At the same time there is brought down to it from the upper country by way of Proklais, for transmission to the coast, Kattybourine, Patfopapigic, and Kabalitic spikenaid, and another kind which reaches it by the way of the adjacent province of Skythia ; also kastus and ledellium.” Mc. Crindle, Indian Antiquary, Vol VIII, p. 143.

৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ শ্লোককে মল্লিনাথ প্রক্ষিপ্ত বলেন ; সম্ভবতঃ সেই কারণে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই । কিন্তু এই তিন শ্লোক পার্শ্বভূদয়ে পাওয়া যায়, এবং বলভ, সারোদ্ধারিণী প্রভৃতি টীকাকারেরা অপ্রক্ষিপ্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তবে ৩৫ শ্লোকটি পার্শ্বভূদয় ও অধিকাংশ টীকাকার মতে উত্তর মেঘে । আধুনিক উজ্জয়িনী শিপার দক্ষিণ তটে অবস্থিত ।

অক্ষাংশ ২৩°-১১', দ্রাঘিমাংশ, ৭৫°-৫২' । ইহার আয়তাকার, চতুর্দিকে প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত, ঘেরে প্রায় ছয় মাইল । ইহার এক মাইল উত্তরে প্রাচীন উজ্জয়িনীর বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ ।

(vi) “গন্ধবভ্যাঃ” (৩৭ শ্লোক) । } মল্লিনাথ ৩৪ শ্লোক ।
“মহাকালম্” (৩৮ শ্লোক) । } ঐ ৩৫ শ্লোক ।

এখন মেঘের গতি আবার উত্তরাভিমুখী হইল । আধুনিক উজ্জয়িনীর তিন ক্রোশ উত্তরে গন্ধবতী নামী ক্ষুদ্রা নদী তটে মহাকাল নামক প্রসিদ্ধ শিবস্থান । দ্বাদশ বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে মহাকালেশ্বর একটি বিখ্যাত শিবলিঙ্গ । শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতাস্থ ৪৬ অধ্যায়ে (৩ পদ্যপুরাণে) মহাকালের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে সুষেণ নামক দৈত্য অবন্তীদেশীয় একটি বার্ষিককে উৎপীড়ন করে, তাহাতে ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ শিবের স্তব করায় হঠাৎ মহাকাল লিঙ্গ আবির্ভূত হন ও সুষেণকে সসৈন্ত বধ করেন । মহাকালের কথা কালিদাস রঘুবংশেও উল্লেখ করিয়াছেন ।

(vii) “গম্ভীরায়ঃ” (৪৪ শ্লোক) । মল্লিনাথ ৪১ শ্লোক ।

• মহাকাল পীঠস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে চম্বল নদী পার হইতে গেলে মধ্যে গম্ভীরা পার হইতে হয় । প্রাচীন টীকাকারেরা বা আধুনিক লেখকেরা কেহ এখনও ইহাকে চিহ্নিত করিতে পারেন নাই ; আমিও এ পর্য্যন্ত পারি নাই । গম্ভীরা নদীর নাম জিনসেন কৃত আদি পুরাণে (২৯ অধ্যায়ে) পাওয়া যায় ।

(viii) “দেব পূর্বঃ গিরিঃ” (৪৬ শ্লোক) ।

দেবগিরি, স্কন্দের পৌঠস্থান, উৎস্বর কানন ময় । ইহার সম্ভাষ জনক চিহ্নই এ পর্য্যন্ত হয় নাই । উইলসন্ সাহেবের মতে ইহা চম্বলের দক্ষিণে মালবের দেবগড় নামক স্থান হইতে পারে । অন্য প্রমাণাভাবে কিন্তু ইহাতে সন্দেহ আছে ।

(ix) “শ্রোতোমূর্ত্যাভুবি পরিণতাঃ

রস্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্” (৪৯ শ্লোক) ।

রস্তিদেবের কীর্ত্তি যাহা পৃথিবীতে মূর্ত্তিমান শ্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছিল—তাহা চম্বতী বা চম্বল নদী । ইহা মার্ত্তনগরের ৮৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিষ্ণু গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া, প্রায় ৫৭০ মাইল বাঁকা চোরা গিয়া যমুনাতে পড়িয়াছে । ইহা দ্বারা ও ইহার শাখা নদী গুলি দ্বারা মালব অধিত্যকার অধিকাংশ জল নিঃসারিত হয় । রস্তিদেব ও চম্বতী সম্বন্ধে, মহাভারতের বনপর্ক প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য ।

(x) “দশপুর” (৫১ শ্লোক) । (৪৬)

চম্বল নদী পার হইলে দশপুর । ইহাকে ডাক্তর ক্রীন সাহেব সম্ভাষ জনক রূপে আধুনিক মান্দানোরের সহিত চিহ্ন করিয়াছেন [Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. iii, p. 79]. মান্দানোর উজ্জয়িনী হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে, ও চম্বলের এক শাখা নদীর উপরে স্থিত ।

দশপুর প্রাচীন স্থান । বৃহৎ সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে ; কয়েক প্রাচীন খোদিত লিপিতে ও ইহার নাম পাওয়া যায় । দশপুর সচরাচর অবন্তি দেশের মধ্যে যায় ।

পাঠক দেখিবেন যে মালব দেশের বর্ণনা অন্য দেশের তুলনায় মেঘদূতে কত বেশী ও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামে পরিপূর্ণ । ইহা হইতে কি অনুমান করা যাইতে পারে না যে কবি এই দেশ ভাল রকম জানিতেন, সম্ভবতঃ স্বদেশ বলিয়া ?

চম্বলের ডেনেজ বেসিনে মালব অন্তর্গত, সুতরাং তাহার পৃথক বর্ণনা করিলাম না ।

শ্রীমন্মোহন চক্রবর্তী ।

অধ্যম ।

ঢেলে দিতে নাহি পার স্নিগ্ধ পরিমল,
 নিভা তিক্ত বিষাদিত, জীবনের মূলে,
 স্বর্ণ রৌপ্য মণিমালা চিস্তার সম্বল,
 রেখেছ স্বার্থের বোঝা শিরোপরি তুলে ।
 অস্থি বন্ধ কুটীরেতে, অন্ধ 'আমি' বসি
 স্মৃথ স্মৃথ স্মৃথ বলি উঠিছে গর্জিয়া—
 চুরি করে ফাকি দিয়া উঠিছ বিহসি
 শাস্তি বলি উঠ ফুলি অশাস্তি কিনিয়া ।

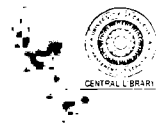
পিশাচের যত কিছু ঘৃণিত বিভব
 করেছ আপন শৌর্য্যে সব অধিকার,
 অবসরবে পরিচ্ছদে দেখায় মানব,
 ভদ্র নামে অভিহিত সমাজ মাঝার,
 একধারে নর পশু, পিশাচ, তস্কর
 পিণ্ডন, দুর্ন্যতি কূট, খল ভয়ঙ্কর ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী ।

(স্মরলিপি ।)

নতুন কিছু করো ।

- নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।
- নাক গুলো কাটো, কাণ গুলো ছাটো,
 পা গুলো সব উঁচু করো মাথা দিয়ে হাঁটো ;
- হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি স্বাও, ওড়ে,
 কিছা চিৎপাত হয়ে পা গুলো সব ছোড়ে ;
- ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ে ;
- নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।—



ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রক্ষা,
কর লীগগির ধুতি চাদর নিবারিণী সভা ;
প্যান্ট পরো, কোট পর, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতাস্ত সেকেনে ;
কাঁচকলা ছাড়া, এবং রোষ্টে চপ্ ধরো ;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

কিছা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম প্রচার কর্তে আমেরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেষ্টাও, কিছা খুব খানিক লেখো ।
Bain Mill ছাড়া, আবার ভাগবত পড়ো ।
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধোরে মারো ;
কিন্মা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো ।
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক ।
বা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনভরো ;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

হয়েছি অবীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব ;
মর্ক্স না হয় মর্ক্স,—একটা নতুন হবে খুব ।
নতুন রকম বাঁচো, কিছা নতুন রকম মরো ;—
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।

উদারা—স র গ ম প ধ ন
মুদারা—সা রা গা মা পা ধা না—
তারি—সো রো সো . সো . রো ধো নো
কড়ি— ; কোমল—ং ।

১

সা সা রা গা, রা রা সা সা ; সা ধ সা রা : সা সা — — ।
ন তুন কি ছু ক র এক টা ন তুন কি ছু ক র — — ।

২

সো সো সো সো, না না না না ; ধা ধা ধা ধা : পা পা — — ।
না ক্ গু লো কা টো — — কা গ্ গু লো ছা টো — —
পা পা* পা পা, পা ধা পা পা গা মা গা রা : না গা — — ।
পা গু লো সব উ চু ক রে মা খা দি রে হাঁ টো — —
ধ সা সা সা, সা সা সা সা ; সা ধ সা রা ; রা রা — — ।
হা মা গু ডি দা ও লা ফাও ডিগ বা জি খাও : ও ডো — —
গা গা* গা গা, গা গা গা গা ; রা- রা মাঃ মাঃ : পা পা — — ।
কি স্বা চিৎ — পা ত্ হ য়ে পা গু লো সব ছো ডো — —
রা রা* গা মা, গা গা গা গা ; সা- ধ সা রা সা সা — — ।
পা গু লো সব ছো ডো — — পা গু লো সব ছো ডো — —
পা পা পা পা, পা পা গা গা ; গা গা সো সো সো সো — — ।
ঝো ডা গা ডি ছে ডে এ খন উ টের ও পর চ ড — —
রা রা গা মা, গা গা রা রা ; সা ধ সা রা : সা সা — — ।
ন তুন কি ছু ক র এক টা ন তুন কি ছু ক র — —
সা সা রা গা রা রা সা সা ; সা ধ সা রা : সা সা — — ।
ন তুন কি ছু ক র এক টা- ন তুন কি ছু ক র — —

অন্য চারি চরণ উপরি প্রদর্শিত ২ নং স্বরলিপি অনুসারে গেল ।

• “পা পা” “গা গা” “রা রা” এখানে প্রত্যেক স্বরের মাত্রার সংখ্যা একদর্শিত হইয়াছে । নৈরূপ গাহিলে চলে । অথবা (ঠিক ষে রূপ গীতটির রচয়িতা গাহিয়া থাকেন) এখানে “পা পা” “গা গা” ও “রা রা” র যথাক্রমে প্রথম “পা,” “গা” ও “রা” র মাত্রা ১½ এবং দ্বিতীয় “পা” “গা” ও “রা” র মাত্রা ১ ধরিতে হইবে । তাহার স্বরলিপি যথাক্রমে “পা পা-পা,” “গা গা-গা,” এবং “রা রা-রা” এইরূপ লিখিত হইবে ; হাইফেন (-) দিলে তাহার উভয় পার্শ্ববর্তী স্বরের মাত্রা “অর্দ্ধ মাত্রা” বুঝিতে হইবে ।

গৌরঙ্গ ।

(সমালোচনা) ।

গৌরঙ্গের দ্বিতীয় সর্গের নাম “সন্তানী” এই সর্গ খুলিয়াই আমরা দেখি যে গৌরঙ্গের চপল স্বভাব দূরীভূত হইয়াছে । তাঁহার মাতা তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিলেন ।

“সোণার শৃঙ্খল, বেড়ী নিষ্পাইল শচী
কল্লনায়,—গড়াইয়া মায়ার পিঞ্জর
ধরিতে নিমাই-পাখী সংসার বন্ধনে”
“গোরা ধরা দিল ছুটি ভুজবলী পাশে
হুজুর সৈনিক বেন শেষতক বুঝি
করিল সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ ।”

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গৌরঙ্গের বিবাহ একবার হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সে পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । ক্রমে গোরা মাতৃ আন্তায় গম্মার পিতার পিণ্ড দিতে গেলেন । “পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম” । [এ উপমাটি ঠিক হয় নাই । পোষা পাখী আকাশ দেখিয়াই উড়িয়া যায় না । যে পাখী উড়িয়া যায় সে নিশ্চয়ই পোষা মানে নাই । “পোষাপাখীর” স্থলে “পিঞ্জরের পাখী” বলিলে ঠিক হইত] গম্মার পাদপদ্ম দেখিয়া গোরা ভাবে মুচ্ছা হইয়া পড়িলেন । সংজ্ঞা পাইয়া হরি বোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন । পরে “বিকল” হইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন । প্রিয়ার “অবত্ননসূত শাস্ত কাস্ত রূপরানি” দেখিয়া “গোরা তার ভারে” “পড়িয়া বন্ধনে ছটফট করে গোরা বিহঙ্গের মত ।” এখানে দেখা যায় যে গৌরঙ্গের সংসার ছাড়িবার ইচ্ছা মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে । কিন্তু অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে “ছুটিতে শক্তি নাই পুনাইতে সাধ ।” অবশেষে এক দিন এক মানসিক ব্যাধি আসিল—

নহে তাহা সকলে, সকল কালের ।
নিমেষের তাহা ; কিন্তু করে সে স্মৃতি
সে প্রাণের সে বুগের মহাপরিণাম”
—অতি চমৎকার বর্ণনা ।

তার পরে চৈতন্তের সন্ন্যাস বর্ণনা । ইহা সেরূপ গম্ভীর, তরুণ মধুর ।
একটি উচ্চ অঙ্গের চিত্র ।

“কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি উদিল সে দিন
নবদ্বীপে ;

* * *

গোরা জাগিলা চমকি,

ভ্রমিতে লাগিল কক্ষে চঞ্চল চরণে ।”

তাহার পর গৌরাঙ্গ বাহা বাহা দেখিলেন, বাহা বাহা ভাবিলেন, বাহা বাহা
বলিলেন তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা । ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উদ্ধৃত
করা চলে না । মূলে পড়িতে হয় ।

গৌরাঙ্গ চলিয়া গেলেন । জননী “একি স্থান শতবার করি” পুজিতে
লাগিলেন । কি স্বাভাবিক ! বিষ্ণুপ্রিয়া স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন ।
এদিকে গৌরাঙ্গ কেশবকে ডাকিয়া বৈরাগ্যে দীক্ষিত হইয়া মুণ্ডিত মস্তক
সংসার পরিত্যাগ করিলেন ।

জটনৈক সমালোচক কোন পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া একটা গুড়
তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে গৌরাঙ্গ শুক্রপক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া যান ! কবি
“কৃষ্ণা চতুর্দশী” কোথায় পাঠিলেন ? ইহা না আছে চৈতন্তচরিতামৃত,
না আছে চৈতন্ত ভাগবতে, না আছে Stewartএর ইতিহাসে ।—সর্বনাশ ! “হে
কবি ! আপনি এ কথা মা জানিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন, কি সাহসে !
এখন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গৌরাঙ্গ পুস্তক খানি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিউন ।
ক্রম প্রমাণ হইয়া গেল যে উহা কাবাই নহে ।

তৃতীয় সর্গে গৌরাঙ্গ “সাধক,”

“কোন অখণ্ডিত সত্য গুহ্য তব বীজ

উপ্ত হয়ে গেল ধর্ম্মে ; অক্লান্ত হল ;

দৈখিতে দেখিতে ফল ফুল বিকাশিত

প্রকট হইল শেষে হৃদয়ের পটে ভক্তি

যার ভরত্ত্বি প্রেম যার প্রাণ”

গৌরাঙ্গ ডাকিয়া উঠিলেন “পাইয়াছি” ! পাইয়াছি” ! এখানে কুতূহনী পাঠক
অমনি বলিয়া উঠিবেন কি ? “কি ? কি পাইয়াছেন ?” কিন্তু তাহার উত্তর
শ্রীচৈতন্য দেব দেন নাই । তিনি “সাধনার ধন” পাইয়াছেন । কিন্তু সে

ধন তত্ত্বজ্ঞান না ঈশ্বর ? পূর্বে উদ্ধৃত পংক্তি হইতে বোধ হয় যে কোন সত্য “ভক্তি যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ” তাহাই তিনি পাঠিয়াছেন । একটু অস্পষ্টে রহিয়া গেল ।

গৌরঙ্গ একদিন বাসন্তী পূর্ণিমায় [ইহার বর্ণনাটি অতি সংক্ষিপ্ত মধুর] চন্দ্রমাকে দেখিয়া কহিলেন তুমি বস্তু এত সুখা তুমি “অকুণ্ঠিত মনে জলে স্থলে চরাচরে আধারে পাধারে” বিলাটয়া দিতেছ । আমাকে আশীর্বাদ কর যে আমার বিভা আমি এইরূপ বিলাটিতে পারি” ।

তাহার পরে তিনি সেই ভাবভঙ্গ প্রচার করিয়া ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিলেন । সে ভাবতত্ত্ব কি ?

উঠিতেছে মহাবাহী গন্তীর নির্ঘোষে
“ভক্তিছাড়া প্রেমহারা তপস্যা মলিন ।”
গৃহীর গার্হস্থ্য পণ্ড ; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব, গুণীর প্রতিভা,
স্বদেশ বাৎসল্য বার্থ !

পরে একদিন “নিভাই মিলিল আসি নিমায়ের সাথে” “আলোকে অনলে যেন হন সম্মিশ্রন” । [উপমাটি বোধগম্য হইল না । আলোক কি অনল বহির্ভূত ? অনল অর্থে বোধ হয় এখানে “উত্তাপ”] নিমাই নিভাইকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন । শেষে একদিন নিভাই তত্ত্ববৃন্দসহ লক্ষ্মীপূজার দিনে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন । এইদিনে নবদ্বীপ বর্ণন কবির একটা নূতন সৃষ্টি । সংবত রসিকতার চেষ্টা আছে । তাহা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই ।

তাহার পরে মাতার সহিত নিমায়ের সাক্ষাৎ । এইস্থলে কবি তাঁহার কল্পনার সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন । এই চিত্রটি এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র ; ইহাতে তেজস্বিতা ও কোমলতা, একদিকে মাতার অভিমান, ও দ্বীর সহিষ্ণুতা, অপর দিকে পুত্রের দৃঢ়তা সুন্দর ভাবে বিমিশ্রিত হইয়াছে ।

এইরূপ দৃশ্য কল্পনা করা এবং এরূপ দৃশ্য চিত্রিত করা শুদ্ধ কবির সাধ্য, আর কেহ তাহা পারে ? প্রমথ বাবুর নিন্দাবাদীদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন একবার গৌরঙ্গের তৃতীয় সর্গটি ৮৫ পৃষ্ঠা হইতে ৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়েন । তাঁহাদের নিন্দা স্তম্ভিত পৰিবর্তিত হইবে ।

মাতা নিষ্ফল অভিমানের পরে ঘরে আসিয়া দরোজা বন্ধ করিলেন । তখন

বারেক কি স্নেহমোহে ভাবেন নি মাতা ।

পুত্র তাঁর কোনক্ষণে কল্প দ্বার ঠেলি’

দাঁড়াইবে সহসা, কাঁদিয়া সাধিব তাঁরে

মা জননী, ডেকে লও ছালালে তোর ।”

বারেক কি দ্বার পানে চান নি কুহকে

উৎসুক নয়নে, মাতা উন্মুখ শ্রাণে

গুরু গুরু বহে শ্বাস ছক ছক বুক ।

একবারে জাজ্ঞান্যমান প্রকৃতির ছবি পড়িতে পড়িতে সংসার ভুলিয়া বাই,
মগ্ন হইয়া বাই, চক্ষে জন আসে । কবি যদি আর কিছু না লিখিয়া শুধু
গৌরাঙ্গের তৃতীয় সর্গ লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ
কবি বলিয়া সম্মান করিতাম ।

চতুর্থ সর্গের নাম “শিক্ষক” । উপেক্ষিতা মাতার সহিত উপেক্ষিতা বধূর
সম্মিলন । উভয়ের সমবেদনার ও সহবেদনার ক্রন্দন ; পরিশেষে বিষ্ণুপ্রিয়া
বারমাস্যা ব্রত অবলম্বন ; এ সমস্ত ব্যাপার অতীব স্বাভাবিক । বিষ্ণুপ্রিয়ার
একটি উক্তি বড়ই করুণ, বড়ই তেজস্বী

“জান না কি দেবী

সুখ সুষুপ্তির স্বপ্ন ; দুঃখ জাগরণ ;

দুঃখ নহে দুঃখ শুধু, দুঃখ বড় সুখ”

তাহার পরে শচীর সহিত নিত্যানন্দের দেখা ও শচীর নিত্যানন্দকে
আশীর্বাদ ।

“যে অবধি নিত্যানন্দ সংসারীর মত

রহিল স্নেহের কাছে বেচ্ছাবন্দী হয়ে”

এই সর্গে একটি বারাজনার গৌরাঙ্গের প্রতি আসক্তি, ব্যাপার বর্ণিত আছে,
এটি আমাদের মতে অস্বাভাবিক হইয়াছে, বারাজনার “প্রতিশোধ” অস্বত ।
পরে শিষ্যদিগের নিকট গৌরাঙ্গের ধর্ম ব্যাখ্যা হয়ত তাহা খুশী শাস্ত্রীয় এবং
বৈজ্ঞানিক । কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহা নীরস ও বর্জ্যনীয় । এক খানি দর্শন
শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে কাব্যরস পিপাসুর দমন আটকাইয়া যায় । এই
সর্গের শেষ ঘটনা গৌরাঙ্গ শ্রাবদেও দণ্ডিত অপরাধীকে বিচারকের সহিত
ভর্ক করিয়া মুক্ত করিলেন । তাঁহার বৃত্তি —

“কে করে বিচার কার ?

অতুল অমূল্য হেন মানব জীবন
সর্ব শক্তিমান যিনি তাঁরো শ্রেষ্ঠ দান
নহে বিচারের বধা ক্ষুদ্র মানবের”

চাহিয়া রহিল শুদ্ধ যবন ক্ষণেক
কহিল গদগদ কণ্ঠে কে তুমি শিক্ষক
কি কথা শিখালে—কে করে বিচার ;
বন্দী—মুক্ত তুমি ।”

যবন বিচারক এই যুক্তি ওনিয়া কেন যে “গদগদ কণ্ঠ” হইলেন, তাহা বিচারকই জানে । প্রথমতঃ এ যুক্তি ভ্রমাত্মক । ইহা ঠিক হইলে হত্যাকারীও বেকসুর খালাস পায় । সমাজ আত্মরক্ষার্থে আইন করিয়াছে, বিচারের নিয়ম করিয়াছে, বিচারক নিযুক্ত করিয়াছে । সমাজের বিপক্ষে অপরাধের বিচার সমাজে করিতেছে । “কে করে বিচার কার” ইহা সত্য নহে । দ্বিতীয়তঃ এ যুক্তিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে হৃদয় আলোড়িত হয়, চক্ষে জল আসে, কণ্ঠ কঁদে হয় । বাহ্য হউক—

এরূপে আর্ন্তের হিতে দীনের সেবায়
রত রহিলেন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে
এদিকে গোরার নাম শতরূপ ধরি
দূর হতে দূরাস্তরে লাগিল ছড়াতে”

ক্রমশঃ

শ্রীসমালোচক ।

—

মায়া ।

(গল্প)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

May be true what I had heard—
Earth's a howling wilderness
Truculent with fraud and force.

—Emerson

নরেশ বাবুর স্ত্রী হীরামণি তাহার পরিচারিকা রসময়ীর নিকট বাহা শুনিয়া-
ছিল, তাহার মধ্যে অনেক কথা রসময়ীর রচনা ও কবিত্ব তাহা পাঠক অবগত
আছেন । হীরামণি সেই রচনার উপর আরও রং চড়াইয়া নরেশ বাবুকে
কুমুদিনীর কথা বলিল । তাহাতে নরেশ বাবু বুঝিলেন, মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী
একটা ধড়িবাঁজ কুলটা স্ত্রী ; ফাঁদ পাতিয়া নটবর নায়েবকে, শিবনাথ
নায়েবকে, ও প্রবোধ বাবুকে মজাইয়াছে, এবং অবশেষে কলিকাতায়
আসিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য একটা ফাঁদ পাতিয়াছে । নরেশ বাবু আরও
স্থির করিলেন, নটবর নায়েবের কোন দোষ নাই, দোষ কুমুদিনীর । তাঁহার
আদেশ মত সদর নায়েব পরগণার নূতন নায়েবকে পত্র লিখিলেন :—

“বিদ্রোহী প্রজাদিগের কঠিন ভাবে শাসন করিতে না পারিলে তোমার
নায়েবি কাজ থাকিবে না । মহেশ যদি খালাশ হয় বাহারা মোকদ্দমা তদ্বির
করিতেছে তাহারা এবং তুমি বরতরফ হইবে ।” পরগণার নায়েব এই আদেশ
পাইয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল ; প্রজাদিগকে কাছারীতে
ধরিয়া আনে, টাকা আদায় করে, নতুবা জুতা মারে । সেই অল্প সময়ের মধ্যে
অনেক প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া ছই পয়সা বেশ সংস্থান করিয়া লইল ।
জমিদার একথা কিছুই জানিতে পারিলেন না ; প্রজারা ঐক্যে নিরুপায় ।
যদিও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কতকটা প্রজাদিগের পক্ষে—তথাপি তিনি শাস্তি রক্ষা
করিতে বাধ্য, এবং নরেশ বাবু একজন বড় সাহেব দ্বারা সরকার বাহাদুরকে
বিশেষত চিফ্ সেক্রেটারিকে বুঝাইয়া ও অনুরোধ করিয়া কতকটা সরকার
বাহাদুরের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন । গবর্ণমেন্টে শাস্তি রক্ষার জন্য একটা

উত্তাহার জারি করিলেন * এবং ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন । ৩০২ জন কৃষক গ্রেপ্তার হইল । দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিত ৫৪ টা ফৌজদারি মোকদ্দমা হইল । † অনেকের জেল হইল ।

এদিকে ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে বিদ্রোহী প্রজাদিগের মধ্যে তাহাই ঘটিল । হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হইল । মোকারিম সৈন্য যদিও লোক ভাল, তথাপি সে মধ্যে মধ্যে যত্ন কাজে অসম্মত হইতে লাগিল । বলিতে লাগিল, “যত্ন ভীকু এবং স্বার্থপর ।” যত্ন বলিল “মোকারিম গোয়ার এবং মুসলমানদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহে ।” বস্তুতঃ মহেশের মত একজন নিঃস্বার্থ, সুনিবেচক, সমদর্শী ও দূরদর্শী, অসাধারণ বীরপুরুষের অভাব হইয়াছিল । ভীম ও ষড়ানন কয়েকটা লুঠ পাঠ করিয়া অনেক টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল । এক্ষণে প্রজাদিগের একমাত্র সহায় শূরমহাশয় কালীকৃষ্ণ । সে উকীল মোক্তারের নিকট যায়, প্রজাদিগকে পরামর্শ দেয় । প্রজাদিগের প্রতি প্রবোধ বাবুর পূর্বেও যেমন দিয়া ছিল, এক্ষণেও তেমনি দিয়া আছে ।

* On the 4th. of July 1873, the following proclamation was issued by the Government of Bengal to the cultivators in Pabna District.

“Whereas in the District of Pabna, owing to attempts of *Zaminders* to enhance rents and to combinations of *rayats* to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in riotous and tumultuous manner, and serious breaches of peace have occurred : this is very gravely to warn all concerned, that while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion and the *Zaminders* must assert any claims they may have by legal means only, on the other hand the Government will firmly repress all violent and illegal action on the part of the *rayats* and will strictly bring to justice all who offend against the law to whatever class they belong. The *rayats* and others who have assembled are hereby required to disperse, and to prefer peaceably and quietly any grievances they may have, etc.

† “Under the Lieutenant Governor’s instructions a party of Faridpore police, well armed was despatched from Goalando with the Pabna Magistrate. A body of one hundred armed police was also got together from the reserves of other Districts, and posted under an Assistant Superintendent at Kushtia to be at hand if required”.

“Altogether there were 54 cases before the criminal courts in connection with these riots, and 302 persons were arrested, some of whom were concerned in several casses.”—*The Bengal Administration Report for 1872—73.*

তিনি নরেশ বাবুর নারেশ যে বড় অত্যাচার করিতেছে, তাহা নরেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, এবং এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তাহাকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছিলেন । নরেশ বাবু অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে তাহা বিশ্বাস করিলেন না । বিদ্রোহী প্রজা শাসন করিতে হইলে নেক্রপ কঠিন ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক তাহাই হইতেছে এই মনে করিলেন । প্রবোধ বাবু যখন দেখিলেন, নরেশ একান্তই তাহার কথা শুনিলেন না, তখন তিনি নরেশ বাবুর অনিষ্ট না হয়, অথচ প্রজাদিগের অত্যাচার নিবারণ হয় এইরূপ ভাবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন । মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রবোধ বাবু পরামর্শ মতে নরেশ বাবুর নুতন নায়েবকে একদিন খাস কামরায় তলব করিলেন, খুব ধমকাইলেন, যদি অত্যাচার ফের করে তাহাকে জেলে পাঠাইবেন বলিলেন, এবং তাহার মুচলেখা লইলেন । নুতন নায়েব জমিদারের নিকট লিখিলেন, “ধর্মাবতার, অধীন হুজুরের পূণ্য বলে সমুদয় প্রজা শাসন করিয়াছিল, কিন্তু প্রবোধ বাবু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হুজুরের এবং অধীনের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া যাহাতে অধীনের অবিনশ্বে জেন হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন । উকীল ও মোক্তারের পরামর্শে অধীন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাস কামরায় গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া হুজুরকে মাজিষ্ট্রেটের কোপ হইতে আপাততঃ রক্ষা করিয়াছে এবং অধীনও নিকৃতি পাইয়াছে । কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধীনের মুচলেখা লইয়াছেন । এবং দারোগা বাবু অধীনকে গোপনে বলিলেন, কোন্ না কোন মোকদ্দমায় অধীনকে চালান দিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্কই দারোগা বাবু উপর হুকুম দিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি কৃষ্ণপুর গ্রামের হানেফ মোল্লা তাহার ভাইকে অধীন গুমি করিয়াছে বলিয়া দারোগার নিকট মিথ্যা এজাহার করিয়াছে । একদা দারোগা বাবু ডায়েরি লেখেন নাই, ৫০০ শত পাইলেই তিনি এ সমুদয় মিটাইয়া দিতে পারেন । টাকা না দিলে যে মোকদ্দমা হইবে তাহাতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বিস্তার খরচ হইতে পারে । এবিষয় কি করা কর্তব্য বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয় । অধীনের কর্তব্য কার্যের জ্ঞান হইবে না । হুজুর মালিক ।”

এই গুমির কথা নায়েবের রচনা—তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় । নায়েবের ৫০০ শত টাকা লাভ হইল । প্রজাদিগের এবং প্রবোধ বাবুর উপর নরেশ বাবুর ক্রোধ বাড়িল ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

এদিকে নরেশ বাবু একটা ভয়ানক নূতন বিপদ উপস্থিত : নরেশ বাবুর মাতার নাম দুর্গা । দুর্গার প্রথমে রামলাল নামক যুবুর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল । গাত্র হরিদ্রা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল । কিন্তু বিধির নিরীক কে খণ্ডাইতে পারে । এই সময় নরেশের পিতার প্রথম পক্ষের জীর্ণ মৃত্যু হয় । তাহার জ্ঞাত স্নন্দরী বয়স্কা কন্যার অনুদান হইতে লাগিল । সন্ধান করিতে করিতে দুর্গার পিতার নিকট ভূপেশবাবুর ঘটক আনিল । দরিদ্রের গৃহে এই মনোমোহিনী কন্যার দৃশ্য দেখিয়া সে দুর্গার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল । দুর্গার পিতা বলিল, “গাত্র হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, এখন কেমন করিয়া হয়” ? কিন্তু ঘটক বলিল, “২০ হাজার টাকা পাইবেন ।” দুর্গার পিতা লোভে পড়িয়া তাহাতে সম্মত হইল । রামলাল গরিব, এই বিবাহে বাধা দিতে পারিল না । দুর্গার পিতা ২০ হাজার পাইল না, ১০ হাজার টাকা পাইল, বিবাহ হইল । কিন্তু পাপ অপাত রমণীয় হইলেও পরিণামে সুখজনক হয় না । এ পর্যন্ত ভূপেশের পুত্র হয় নাই । একটা মাত্র দৌহিত্র সন্তান ছিল, তাহার নাম শ্রামটাদ । তাহাকেই পুত্র নিরীক্শেষে পালন করিয়া আসিতে ছিলেন । নরেশের জন্ম হইল । শ্রামটাদের চক্রান্তে ভূপেশ তখন মাসে মাসে বেনামী চিঠি পাইতে লাগিলেন । তাহার মর্ম্ম এই—“দুর্গার বিবাহের পূর্বে রাম লালের সহিত তাহার অসম্মত ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণ আছে” । এই কথাতে ভূপেশের মনে চঞ্চলতা হইত, কখন কখন সংশয় হইত । কিন্তু দুর্গার রূপ-রাশি যখনই দেখিতেন, তাহার সংশয়-তাপিত হৃদয় শীতল হইত । কাল ক্রমে দুর্গার রূপের ভাটা পড়িল । একদিন তিনি দুর্গাকে বলিলেন “দেখ বিবাহের পূর্বে তোমার চরিত্র দোষের কথা শুনা যায়, প্রমাণও পাওয়া যায় । তাহার পর রামলালের সহিত তোমার এক প্রকার বিবাহও হইয়া গিয়াছিল—এবং আমার সহিত যে বিবাহ হইয়াছে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, সূত্রাং সিদ্ধ নহে । আমি তজ্জন্য একখানি উইল করিয়াছি । তাহাতে আমার সমুদয় বিষয় আমার দৌহিত্রকে দিয়াছি । উইলে তোমাকে এবং নরেশকে মাসিক দুই শত টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ।” দুর্গা অবাক । পরে সে কাঁদিল কাঁটিল, শপথ করিল, পায়ে ধরিল । ভূপেশ অটল । ভূপেশ বাহিরে গেলেন, দুর্গা নিজের শয়ন ঘরের

দ্বার বন্ধ করিল, খাইল না, কেবল একলা কাঁদিল । অবশেষে তৃতীয় দিবস দ্বার খুলিল—বিষ খাইবে স্থির করিল । কিন্তু পুত্রের মারাত্মক তাহা পারিল না নিজের হৃৎকের কথা সমুদয় ললিতাকে বলিল । ললিতা শ্রামটাদের চর, শ্রাম-টাদকে তাহা বলিল ।

এদিকে ভূপেশ বাবু প্রবোধ বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন । প্রবোধ বাবু যদিও ওকালতি ব্যবসায় করেন না, তথাপি তিনি B, L. খুব আইনজ্ঞ, অল্প বয়সে অতি বিচক্ষণ লোক । তাহাকে ভূপেশ বাবু উইল দেখাইলেন প্রবোধকে নরেশ “দাদা” বলিত । প্রবোধ বাবুও নরেশ বাবুকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন । প্রবোধ ভূপেশ বাবুকে বলিলেন “আপনি ব্যস্ত হইবেন না । আমি ধীরে স্নেহ বিবেচনা করিয়া আমার মত দিন । এমন গুরুতর ও কঠিন বিষয়ে সহসা একটা কাজ করা উচিত নহে ।” কিছু কালের মধ্যে প্রবোধ বাবু, হুর্গা সম্বন্ধে যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন । তখন একদিন ভূপেশ হাসিতে হাসিতে হুর্গার নিকট আসিয়া নিজের ভুল তাহা স্বীকার করিলেন ও ক্ষমা চাহিলেন । হুর্গা আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল । ভূপেশ বলিলেন আমি যে উইলের মুসবিদা করিয়াছিলাম, তোমার সাক্ষাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি । হুর্গা তাহার হাত হইতে উইল খানা লইয়া বলিলেন, “প্রাণেশ্বর, আমি উহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব ।”

এই বলিয়া বালিশের নীচে তাহা রাখিয়া দিলেন । স্বামী ও স্ত্রী আবার নবীভূত প্রেমে রজনী যাপন করিলেন । পরদিন পোড়ামুখী ললিতা সুবোগ পাইয়া এই উইল চুরি করিল ও শ্রামটাদকে দিল । শ্রামটাদ যত্নে তাহা রাখিল । বহু বৎসর পরে নরেশ বাবু উত্তরাধিকারী হইলে তাহার সদর কাছারীর জালিয়ত পেকার সেই উইল খানিতে ভূপেশ বাবুর এবং ছই একটি মৃত লোকের নাম জাল করিল এবং নিজে ও আর একজন আমলা, শ্রাম-টাদের টাকা ও আশ্বাস বাক্যে বাধ্য হইয়া, সেই জাল উইল সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিল । শ্রামটাদ ঐ জাল উইলের প্রোবেটের জন্য আদালতে দরখাস্ত করিল । নরেশ বাবু এই উইলের মোকদ্দমার বিষয় জানিয়া বিপদের উপর মহাবিপদ অনুভব করিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন । এমন সময় প্রবোধ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

বড়লাট সম্বন্ধে গ্রন্থ ।

THE FAILURE OF LORD CURZON.
An Open Letter to the Earl of Rosbery
A Study in Imperialism.

BY

Twenty-Eight years in India.

Rs 2—as 4.

“Give us men. A time like this demands

Great hearts, strong minds, true faith and willing hands ;”

—*Oliver Wendell Holmes*

“It should not be forgotten, however, that but for the protest of Lord Curzon, the starving peasantry of India would with the assent of the Unionist Cabinet have been saddled with half the cost of the garrison which the war has rendered it necessary to maintain in South Africa.”

“লর্ড কর্জনের বিফলতা” নামক পুস্তকে বিলাতে একটু আন্দোলন হইয়াছে লেখক অষ্টবিংশতি বৎসর ভারতে বাস করিয়াছিলেন তাই আপনার নামের পরিবর্তে—“অষ্টবিংশতি বর্ষ” ব্যবহার করিয়াছেন । গ্রন্থকার সহৃদয় ব্যক্তি, ভারতবাসীর ব্যথার ব্যথী, ভারতের ককরণ আর্ন্তনাদে দ্রবিত-হৃদয় । অনশন-মৃত-ক্লষককঙ্কাল-বিকীর্ণ, দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত ভারত ক্রমেই সমৃদ্ধি সোপানে আরোহণ করিতেছে—এই যে মারাত্মক ভ্রম ব্রিটিশ রাজনীতিকে অন্ধ করিয়া, ভারতের ঘোর দুর্দশা দিন দিন ঘোরতর করিতেছে, তাহা এই পুস্তকে প্রমাণ পুঞ্জ প্রদর্শিত হইয়াছে । বিলাতের আধুনিক বাদশাহিষ্টানা যে জাতীয় অধর্মাচরণের নামান্তর মাত্র,—পরস্বহরণ-লিপ্সা, পামর-স্বদেশিকতা—তাহা গ্রন্থকার অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন । তিনি বলেন অধীন জাতিগণের অর্গশোষণ করিবার জন্ত, অথবা নিযুত নিযুত লোককে অনাহার-মৃত্যুর অশেষ যন্ত্রণা দিয়া, বিপলা চমু রচনা করিবার জন্ত-জগদীশ্বর ইংলণ্ডকে সাম্রাজ্য দেন নাই । *

*“Imperialism has been defined, as the policy of doing unto others what you would die rather than have done to yourself or a kind of rogue patriotism, that regards the love of country, one of the noblest of human

ব্রিটিশশাসিত ভারতে যে কোন কোন স্থানে সুখ সমৃদ্ধি আছে, তাহা গ্রন্থকার স্বীকার করেন । কিন্তু তাহা কেবল মাত্র রেলপথ বা মহারথ্যা পার্শ্বস্থিত নগরে বা গ্রামে । *

বেতনভোগী বা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যাহাদিগের আয় বার্ষিক এক সহস্র টাকার অধিক নহে, তাহাদিগের এক্ষণে আদৌ টেক্স দিতে হয় না । কিন্তু কৃষকের বার্ষিক আয় ১০০ বা ৫০ বা ১০ বা যতই কম হউক না কেন, তাহাকে ভারতের প্রায় সর্বত্রই শতকরা ৫৫ টাকা করিয়া বার্ষিক আয়ের উপর কর দিতে হয় । †

জিজ্ঞাসা করি এখানে শ্রীযুক্ত এডাম স্মিথের ও শ্রীযুক্ত মিলের কর-মূল্য (maxims of taxation) কোথায় রহিল ? ‡

গ্রন্থকারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই ;—ভারতের কৃষিজীবীব্যক্তিগণ যদিও ঘোর দারিদ্র্যে নিমগ্ন তথাপি তাহারা অতিশয়করভারে নিপেষিত,—

feelings only as a commercial asset and a cloak for international dishonesty. * * * When God gave empire to England, it was not in order to fleece subject races nor in order to buildup great armies at the cost of such a mass of human misery as the slow starvation of millions and millions of people in India involves (pp. 10-11.) *

* "Civilisation and an appreciable degree of comfort mark the cities and hamlets along the rail roads and main high ways. The commercial activity of many markets, the sleek native trader and sleeker European merchant, the smartly dressed railway servants, the grainladen carts, and the general appearance of well-being, are noticeable on every side in such localities. The ordinary traveller, the three months-in-India-tripper, is naturally deceived. But out on the veldt, not only in remote villages, but in the suburbs of the towns, the huts of the peasantry are squalid and empty, oppressed by a dire poverty, which all the highest authorities on Indian administration feel to be the most anxious question of the future. Two thirds of the Indian population some 200,000,000 of human beings, are made up of ever hungry cultivators and day labourers (pp. 11-12)

† "And yet it is a fact that in prosperous India the annual taxation on land over nearly all its provinces is equivalent to at least a 55 per cent income tax" (p. 13)

‡ The subjects of every state ought to contribute to the support of the Government as nearly as possible in proportion to their respective abilities ; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state." (*Mill)

ইহা সর্বস্বত্ব বহিষ্ঠৃত ব্যবস্থা,—আর বর্তমান ভারত গবর্ণমেন্টে এই সর্বনাশিনী নীতির পোষণ ও বর্ধন করিতেছেন ।*

বখন মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য ব্রিটিশ শাসনের অধীন হয়, অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভূমির কর ৮০ লক্ষ মাত্র ছিল, তাহার পর লক্ষ লক্ষ এই কর বৃদ্ধি ক্রিপ কর হইল দেখুন :—

উঃ সালে	কর
১৮১৭	৮০ লক্ষ
১৮১৮	১১৫ লক্ষ
১৮২৩	১৫০ লক্ষ (ছয় বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ)
১৮৩৬-১৮৭২	২০৩ লক্ষ

১৮৩৬ হইতে আবার কর বৃদ্ধি হইতেছে । ১৮২৩ সালের করবৃদ্ধি ক্রিপ কীষণ উপায়ে সংসাধিত হইয়াছিল তাহা ইংরাজ শাসনকর্তার মুখে শুনি—

“Every effort was made—lawful and unlawful—to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to torture in some instances cruel and revolting beyond description if they could not or would not yield what was demanded.” (p. 21).

এই বর্ণনা বর্ক বা সেরিডনের অগ্নিময়ী বক্তৃতার অতিরঞ্জিত ভাষা, একথা কেহ বলিতে পারিবেন না । ইহা দারিদ্র-শূন্য ব্যবসায়ী আন্দোলকগণের অনুলক বাক্য নহে । ইহা দেশীয় সংবাদ পত্রের “ছুটে বিদ্রোহকার” নহে । ইহা বঙ্গ গবর্ণমেন্টের ১৮৯২-৯৩ সালের শাসন বিবরণীর ৭৬ পৃষ্ঠে লিখিত আছে । হতভাগ্য দীনহীন প্রজাকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া যে কর বৃদ্ধি সম্পাদিত হয় তাহাই প্রজাদিগের সৌভাগ্য-বৃদ্ধির প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত ও ঘোষিত হয় । বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৩০ বৎসরে শতকরা ৩০ টাকা খাজনা বৃদ্ধি হওয়াতে দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল । মাদ্রাজে ২০ বৎসরে শতকরা ৩২ খাজনা বৃদ্ধি হওয়াতে দুর্ভিক্ষাদি ঘটয়াছিল । দুর্ভিক্ষ ও আত্মসংকট কর

* “My chief thesis in the following pages is that the agricultural classes, who are sunk in poverty are taxed beyond all reason, and that present Government of India is continuing and accentuating a desolating policy.”

বৃদ্ধির মধ্যে যে কতকটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এ কথা ইংলিশম্যান সংবাদ পত্রও আলোচনা করিয়াছেন । *

• গ্রন্থকার যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, যে করভারতন্ত্রে ভারতের দীন হীন প্রজাবৃন্দ অনমনে মরিতেছে, তাহা লর্ড কর্জ্জন ভারতে আসিবার অনেক পূর্বেই প্রবর্তিত হইয়াছে ; এবং লর্ড কর্জ্জন ইচ্ছা করিলে যে ভারতের এই কৃষি-স্রাব বন্ধ করিতে পারিতেন, তাহা বোধ হয় না । লর্ড রিপণ ১৮৮৩ সালে মাদ্রাজের অনুচিত কর বৃদ্ধি কতকটা নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । কৈ, পারিলেন না ? বিলাতে ভারত সচিব গয়ংগচ্ছ করিয়া কাল যাপন করিলেন এবং যখন লর্ড রিপণ কার্যা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার নিভাস্ত্র ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব ভারত-সচিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল (p. 28) । লর্ড রিপণ আমাদের প্রতি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কার্যা করিবার জন্য চেষ্টা করাতে, তিনি বড়লাট হওয়া সত্ত্বেও, স্বদেশীয়েব নিকট তাঁহাকে কত অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল ।

আমরা অতিশয় নির্যোধ ও নিরুপায়, তাই যেখানে যাহা পাইবার কোনই প্রত্যাশা নাই, সেখানে সজলনমনে কর-ঘোড়ে তাহাই প্রার্থনা করি । শিয়ালদহ ষ্টেশনে লর্ড রিপণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যখন ভারতবাসী কলিকাতার চতুর্দিক হইতে স্রোতের ন্যায় ধাবিত হইয়া ষ্টেশন-গৃহ প্রাঙ্গণ রাজপথ লোকাকোণ করিয়াছিল—বাপ্পবান লর্ড রিপণকে বন্ধে করিয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল—অমনি দাসজাতি বৃথা উল্লাসে ঐকতানিক বাদ্য

* "In that year, 1858-59, the land revenue of Madras was under 3¼ millions sterling, and its average during the previous five years, had been under 3½ millions. In 1876, the year before the late famine it was 4½ millions ; and this may be taken as its lowest average at the present time, excluding seasons of dearth. Twenty years of British rule have, therefore increased the government demand upon the agriculturists of Madras by over one million or one third of the whole land revenue paid by that Presidency to the Company in 1858. There are not wanting those who affirm that this increased taxation had much to do with the late calamity. The husbandmen were less able according to this view, to bear the strain of bad seasons, in consequence of the enormous increase in the revenue taken from them"—The Englishman, February 17, 1880)

বাজাইল—তাহা শুনিয়া আমাদের দৈন্ত ও হীনতার গভীরতা অনুভব করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই ।

ভারতের বড়লাট বিলাত হইতে যেরূপ আদেশ পান, সেইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য । সিপাহী বিদ্রোহের সময় হুস্বদর্শী প্রশান্ত লর্ড ডার্বি (the late Lord Derby) ভারত-সচিব না থাকিলে, লর্ড ক্যানিংকে লাহিত হইতে হইত । সার চার্লস উড (Sir Charles Wood পরে Viscount Halifax) গবর্ণর জেনারলকে ভরননা করিয়া তাহার মন্ত্রণা উন্টাইয়া দিয়াছিলেন । ভারতবাসীর প্রতি লর্ড নর্থব্রুক (Lord Northbrooke) অতিশয় সদয় ছিলেন । কিন্তু লর্ড সলসবেরি (Lord Salisbury) এমন তীব্র ভাবে লর্ড নর্থব্রুককে কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়াছিলেন যে মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সার হেনরি ফাউলার যখন ভারতসচিব হইয়াছিলেন তখন তিনি আমাদের বড় লাটকে তাহার হাতের পুস্তিকা বিবেচনা করিতেন ।

ভারত বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রাইট সাহেবকে একবার ভারত সচিব করিবার প্রস্তাব হয় । তাহাতে তিনি অস্বীকার হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন “আমি ভারত সচিব হইলে আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিব । আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিলে আমাদিগের এই লিবারেল মন্ত্রী-সভা অচিরে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইবে ।”

আমাদিগের হস্তা কৰ্ত্তা বড়লাট নহেন, ভারত সচিবও নহেন, আমাদিগের কৰ্ত্তা সমুদয় ইংরাজ জাতি । তবে ভারতের কোন বিষয় যখন ইংরাজদিগের মধ্যে দুই দলের ভিন্ন ভিন্ন মত হয়, এবং তাহার মধ্যে একটি মত ভারতের হিতজনক, আর একটি মত অহিতজনক, তখন বড়লাট ভারতের হিতজনক মতের পোষকতা করিলে, তিনি ভারতের উপকার করিতে পারেন । যেমন লর্ড কার্জন প্রতিবাদ না করিলে, দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্তের ব্যয়ভারের অর্দ্ধেক ভারতের হুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকদিগকে বহন করিতে হইত । ইংরাজ জাতির গৌরব এই দেখিতে পাই, যেমন একদিকে স্বার্থের অন্ধ তমিস্রা তাহার রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি অন্যদিকে কোথা হইতে সত্যপরতা-দীপশিখা জলিয়া সেই ঘোর তমিস্রাকে বিদূরিত করে । একদিকে স্বার্থসিদ্ধ ডিঙ্করেনি (Lord Beaconsfield) আর একদিকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বরেনা ব্রাইট—একদিকে লর্ড কার্জন হামিণ্টন আর এক দিকে মহাত্মা উদারবর্ন (W. Wedderburn)—এক দিকে বরোড্রেক (Brodrick) অন্য দিকে লর্ড কার্জন (Lord Curzon)—

আবার এক দিকে কার্জন (Lord Curzon) আর এক দিকে উদনল (C. J. O. Donnell) । অনেক ইংরাজকর্মচারিগণ, ভারতের মঙ্গলের জন্য সময় সময় নিজের পদোন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া যেরূপ উপরি-
তন কর্মচারীর মতের বিরুদ্ধে স্বকীয় মত প্রকাশ করেন, তাহা বোধ করি বাঙ্গালীকর্মচারীর মধ্যে অল্পই দেখা যায় । মহামুভব কটন সাহেব (Sir Henry Cotton) আসামকুনিদিগের মঙ্গলার্থে বঙ্গেশ্বরের উচ্চপদলাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত মাকেনজী সাহেবও অহিফেন সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের মঙ্গলার প্রতিবাদ করায় বখা সময়ে ছোটলাট হইতে পারেন নাই । প্রসিদ্ধ ভারতবন্ধু হিউম সাহেবও ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে গবর্ণমেন্টের প্রতিবাদ না করিলে ছোট লাটের পদ পাইতে পারিতেন । এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে । ইহা ইংরাজজাতির গৌরবের বিষয় ।

Sir Walter Raleigh সম্বন্ধে Cecil বলিয়াছেন “He can toil terribly” । আমরাও বলি “লর্ড কার্জন ভরানক পরিশ্রম করিতে পারেন” । তাঁহার প্রতিভাও সর্বমুখী । কিন্তু তাঁহার এই প্রতিভা ও পরিশ্রমের আধিক্য ভারতবাসী ব্যথিত । ১ । যে করতারে অসুত অসুত ভারতক্লষক দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরিতেছে, তিনি তাহাই সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা নিবৃত্ত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত ডিগ্‌বি (Digby), মহাত্মা ওয়েডারবার্ন (Wedderburn), সহদয় ওডনল (C. J. O. Donnell), সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র (R. C. Dutt Esq), সুধী গোখল (Gokhale) প্রভৃতি মহোদয়গণ মারাত্মক করবৃদ্ধি উপশম করিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিতেছেন, লর্ড কার্জন তাহার সহিত যোগ না দিয়া, তাহা নিষ্ফল করা পক্ষে সহায়তা করিতেছেন ।*

২ । তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার রোধ করিয়াছেন ।

৩ । তাঁহার নিষোধিত বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের মস্তব্য কার্যে পরিণত হইলে দেশীয় কলেজগুলির ধ্বংস হইবে, দরিদ্র লোকের পক্ষে শিক্ষালাভ করা নিতান্ত কঠিন হইবে । বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সম্প্রতি বে বিল বা পাণ্ডুলিপি বাহির হইয়াছে তাহা আশাশ্রয় নহে ।

* See his famous Resolution of the 16th January 1902 on the land revenue policy of the Government of India.

৪। করভারশীর্ণ, অশ্রুসিক্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, দীনকৃষকপুঞ্জ হইতে যে অর্থ কত কষ্টে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাই তিনি দিল্লীর দরবারে বৃথা আড়ম্বরের জন্ত জলের মত ব্যয় করার চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসী নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন ।

৫। গত ২৫ বৎসর খাদ্যের মূল্য শত করা ৪৪ টাকা বাড়িয়াছে কিন্তু আসামে চা বাগিচার কুলীদিগের বেতন বাড়ে নাই । তথাপি আসামের ভূতপূর্ব কমিশনের ন্যায়পরায়ণ শ্রীবুদ্ধ কটন সাহেব (Sir H. Cotton) কুলীদিগের যে সামান্য বেতন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও লর্ড কর্জেন বিফলীকৃত করিয়াছিলেন । লর্ড কর্জেন আমাদিগের যে অপ্রিয় বা বাখানক কার্য্য করিতেছেন তাহা স্বজাতির স্বার্থের চাপে তাঁহাকে করিতে হইতেছে বোধ হয় । ইংলণ্ডে এক্ষণে বাদশাহিয়ানার বন্যা আসিয়াছে । লর্ড কর্জেন সেই বন্যার গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি গঙ্গাস্রোতে ঐরাবতের স্থায় ভাসিয়া যাইতেন । রাজনীতির কথা, গবর্ণমেন্ট প্রজাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা । ধর্ম্মনীতির কথা, প্রজাদিগের কর্ম্মই নিজের হর্ত্তা কর্ত্তা । হিন্দুদিগের এই প্রাচীন “কর্ম্মফল” ইংরাজ কবিও গাহিয়াছেন—

“Man is his own star ; and the soul that can
Render an honest and a perfect man,
Commands all light, all influence all fate,
Nothing to him falls early or too late ;
Our acts our angels are or good or ill
Our fatal shadows that walk by us still.”

Epilogue to Beaumont and Fletcher's Honest Man's Fortune.

সাহিত্য দরবার ।*

স্বপ্না, ভাদ্র ১৩১০

শক্তিবাদ—লেখক শ্রীবুদ্ধ বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু । বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র ইহাদিগের মধ্যে কোন্ শাস্ত্র শক্তিবাদের মূল তাহাই নিরূপণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এই প্রবন্ধটিতে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রমাণ

* “সাহিত্য দরবারে পুস্তকের প্রবেশ নিষিদ্ধ” নহে । উপর্যুক্ত পুস্তকের আগমন হইলে সদস্যের দরবারে স্থান পাইবেন । নঃ প্রঃ সঃ

অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ।

সাহিত্য দরবার ।

৪২৭

পাওয়া যায় । লেখকের মতে পুরাণই শক্তিবাদের মূল । বেদ সংহিতায় এই শক্তিবাদ কোথাও পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ হয় নাই । ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত ও দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত (দেবীসূক্ত) শক্তিবাদের আভাস আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শক্তিবাদ বাহা তাহা কোন স্থলে পরিষ্কৃত ভাবে ধারণা করা হয় নাই । কোন কোন শাক্ত পণ্ডিত বলেন বেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র হইতেই এই স্ত্রীকূপে চিত্রবীর আদি শক্তির আভাস পাওয়া যায় । কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র যে ব্রহ্মকে নির্দেশ করে ইহা সর্ববাদী সম্মত ও সেই জন্য গোপভাবে কেহ বিষ্ণুকে, কেহ শিবকে, কেহ গণেশকে, গায়ত্রী দেবতা বলিয়া কল্পনা করেন । সুতরাং গায়ত্রীকে শক্তিবাদের মূল বলিয়া স্পষ্টে পরিচিত পারা যায় না । অতএব প্রমাণ হইল যে বেদে শক্তিবাদের আভাস থাকিলেও শক্তিবাদের মূল বেদ নহে ।

উপনিষদের মধ্যে দশ খানিই প্রাণ ও মূল বলিয়া গণ্য । এই মূল উপনিষদ কথখানির মধ্যে কোথাও শক্তিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না । এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় সাক্ষিহীন উপনিষদ আছে । কিন্তু ইহারা আধুনিক ও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইহাদিগের সৃষ্টি । কালী উপনিষদ, তারা উপনিষদ, ভূবনেশ্বরী উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ শক্তিবাদের তত্ত্ব লিখিত থাকিলেও যখন ইহারা শক্তিবাদ প্রচারিত হইবার পর লিখিত তখন তাহা-দিগকে শক্তিবাদের মূল বলা যাইতে পারে না ।

মূল বর্ষতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচারিত থাকে কোন না কোন দর্শন গ্রন্থ তাহা যুক্তিবলে সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করা হয় । যখন কোন দর্শন গ্রন্থই শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন সম্ভব, বেদ কিম্বা উপনিষদ শক্তিবাদের মূল নহে ।

স্মৃতি ব্যবস্থাপক ধর্মশাস্ত্র, ইহাতে শক্তিবাদের উল্লেখ থাকা অসম্ভব । শক্তিবাদ বুদ্ধাইবার জন্য তত্ত্বের সৃষ্টি ; সুতরাং তত্ত্ব কখনও শক্তিবাদের মূল হইতে পারে না ।

পুরাণই যে শক্তিবাদের মূল তাহার বখেই প্রমাণ পাওয়া যায় । মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে যে উপাখ্যান আছে তাহা হইতে জানা যায় সুরথ ও সমাধি প্রথমে চণ্ডীপূজা প্রারম্ভিত করেন । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতেও এই কথা প্রতীপন্ন হয় ।

‘ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, পূর্বে চণ্ডীপূজা প্রচলিত ছিল না । বেদে চণ্ডী কি

হুগী বলিয়া কোন দেবীর উপাসনার ব্যবস্থা নাই। দৈনিক কালের পরে কোন সময়ে এই চণ্ডী দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহার পর সেই চণ্ডী দেবীর পূজা হইতে ক্রমে ক্রমে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চণ্ডী গ্রন্থের প্রচারের পূর্বে শক্তিবাদ কতদূর পরিণত হইয়াছিল অথবা আদৌ প্রচারিত ছিল কি না তাহা জানিবার আমাদের উপায় নাই।”

“এই ক্ষণে আমরা বলিতে বাধ্য যে শক্তিবাদের মূল পুরাণ। অব পুরাণ মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণই শক্তিবাদের মূল গ্রন্থ। আর মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।”

অব্যবসায়ী ইংরাজীনবিগ্ন সংখ্যক পণ্ডিতগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা বিশ্লেক ভাবে গ্রহণ করা নিরাপদ নহে অনেকেরই এই সংস্কার আছে। ইংরাজ পণ্ডিতগণও এই বাঙ্গালী লেখকের স্তায় ভ্রান্ত মত প্রচার করেন। নবপ্রভায় এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। স্বার্থের দেবীমুক্তই লেখকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

বঙ্কের দারিদ্র্য ও তন্নিবারণোপায়। লেখক বলেন,—

“এখন চাকুরি ছাড়া সেই অল্প জীবিকা কি হইতে পারে? স্বাধীন কৃষি ও শিল্প ব্যবসারে ধনোৎপাদন, বানিজ্য ধনাগম। ইহাতে আপন হইতেই দারিদ্র্যের কারণ দূরীভূত হইবে।”

ব্যবহারিক বিষয় প্রবন্ধ দেখিলে আমরা আহলাদিত হই। “সান্ত্বনন” “ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্ড” প্রভৃতি প্রবন্ধ অপেক্ষা ব্যবহারিক প্রবন্ধ বর্তমান কালে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে না আছে চিন্তাশীলতা, না আছে অনুসন্ধানের পরিচয়। যখন ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের কথা হয়, তখন যে সকল দেশীয় মহানুভব ব্যক্তি ইহাতে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন প্রথমে তাঁহাদিগের পরামর্শ আলোচ্য। এ বিষয় শ্রীযুক্ত টাটা বা শ্রীযুক্ত ওয়াচা প্রভৃতি যাহা বলেন তাহা লেখক সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া দিলে পাঠক অধিকতর উপকৃত হইতেন; আর ওরাণাদের স্তায় বহুদূর গভীর চিন্তাশীল মহানুভব ব্যক্তি তাঁহার Indian Economics নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রবন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলে ভাল হইত। ওয়াচা বলেন (১) মূলধন সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করা আবশ্যিক, (২) নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ও নিতান্ত প্রয়োজন, (৩) এ বিষয়টি যত সহজ অনুমিত হয় তত সহজ নহে।†

• “Where not even five per cent of the population is literate, could we expect that there could be any industrial development without education even assuming that capital was forthcoming?”—*Mr. Wacha.*

† “The subject is not so simple as it is light-heartedly imagined to be”
—*Mr. Wacha.*

দিকে স্বর্গী রূপাদে দেখাইতেছেন যে, ভারতে প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং ৯ কোটি টাকা মূল্যের রৌপ্যের আমদানী হয়। (১৮৯০) তাহার মধ্যে ৭ কোটি টাকার রৌপ্য মাত্র টাক দ্বালাে যায়, অবশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য দেশে সঞ্চিত ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ৮ কোটি টাকার দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি হইতে পারে। (২) দৌখ কারবার নিয়মানুসারে মূলধন বৃদ্ধি হইতে পারে। (৩) বিদেশীয় শিল্পী ও যন্ত্র আনিয়া এক্ষণে কার্ষ্য করিতে শিক্ষা করা আবশ্যিক। কালীপ্রসন্ন বাবুর মতে “ভদ্র সম্ভান অপেক্ষা বাঙ্গালী চাষার অবস্থা ভাল।” কিন্তু দেশের বার আনার অধিক লোক কৃষি কার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাহা হইলে দেশের বার আনা লোকের অবস্থা ভাল অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের অবস্থা ভাল। যদি এই কথা সত্য হইত তাহা হইলে দেশের অবস্থা মোটের উপর ভাল বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। চাষাদের অবস্থা ভাল নহে। তাহারা ঋণে আকণ্ঠ নিমগ্ন, এমন কি অনেকেরই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পার না। তাহার পরে কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন “বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজা ভূমিকরভারে ক্লান্ত নহে”। যদি “দরিদ্র প্রজা ভূমিকর ভারে ক্লান্ত নহে” তবে বাকী খাজনার নালিশে আদালতে নিত্যা বাকী পড়া ক্ষমী নিলাম হয় কেন? যদি কোন সনে অজন্মা হয় প্রজাদিগের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উখিত হয় কেন? লেখক যখন সুখে “সুখা” পান করেন তখন অন্ন না পাইয়া পল্লীগ্রামে প্রজা পঞ্চদ প্রাপ্ত হয় কেন? “অস্তান্ত নানাবিধ কর যাহা আছে তাহাও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের স্বন্ধে। পথকর প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরাই দেন” তাহার অর্থ কি প্রজারা পথকর দেয় না? প্রজারা পথকর দেয় এই সম্ভ্রান্ত কথা তাহাও কি লেখক জানেন না? লেখক ধনতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন “ইংরাজরাজ বঙ্গ হইতে বহু অর্থ স্বদেশে নিতেছেন” “কিন্তু * * * টাকা কড়ি প্রভৃতি ধন নহে”—“দেশের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া গেলেও ইংরাজ আমাদিগকে কিছু অসুবিধার ফেলিতে পারেন বটে.....” অর্থাৎ লেখকের জ্ঞান আছে ইংরাজ ভারত হইতে স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া যায়। বার তের কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য যে ভারতে আমদানি হয় এবং কম বেশী এক কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি হয় তাহা কি লেখক

“This hoarding at least proves that nearly eight crores of Rupees may be each year turned to capital account, if they are only resolved to use it”—*Mr. Ranade.*

অবগত নহেন ? ইংরাজ যে টাকা ভারত হইতে লয়েন তাহার পরিণাম ফলে ভারত হইতে টাকা স্বর্ণ বা রৌপ্য মোটের উপর কমিয়া যায় না, কারণ treasure যে পরিমাণে রপ্তানি হয় তাহার বার গুণ অধিক পরিমাণে আমদানী হয় । ইংরাজের অর্থশোষণে প্রায় ১৪ কোটি টাকার শুল্ক প্রতিবৎসর বাহির হইয়া যায় । শুল্ক আহ্বার করিতে না পাইয়া পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারত কুনক ঝাঁকে ঝাঁকে অনশনে মরিয়া যায় । এই প্রবন্ধটির নাম দেওয়া যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, পাঠ করিয়া তেমনি হুঃখিত হইলাম । প্রথমে মনে করিয়াছিলাম সম্পাদক কেন এমন অমার্জ্জুনীর ভ্রান্তি পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন । কিন্তু হুঃখের বিষয় পরে দেখিলাম যে ইহা সম্পাদকের নিজের লেখা । আর কি লিখিব । পক্ষপাতশূন্য সমালোচকের কর্তব্য কাজ করিতে গিয়া পাছে বৈহারী আমাদের দয়া করেন তাঁহাদিগের দয়া হইতে বঞ্চিত হই এই আশঙ্কা । কিন্তু সমালোচক প্রকৃত কথা বলিতে বাধ্য ।

নবনূর । ভাদ্র ।

“কার দোষ” উল্লেখ যোগ্য । বলিয়াদৌর প্রসিদ্ধ ভূমাবিকারী শ্রীবুদ্ধ কে, এ, সিদ্দীকী ইহার লেখক । কার দোষ বিচার করিবার জন্য পাঠকগণের সম্মুখে নকদ্দমার নখি পেশ করিলাম ।

আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?
তুমিই আপন হাতে চিঠির শেষের পাতে,
লিপিতে লিখালে মোরে ‘হেমলতা বোন’ ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

২

প্রতিদিন নিজ হাতে নিন্দুর নুছিয়া দিতে,
ঘোমটা পুলিয়া দিতে—সাধের নুখোন্ ।
এখনো পরিলে শাড়ী তুমি বল দেয়ে নারী,
গাউন্ বডী পরে তাই মিটাই আপশোন্ ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

৩

প্রভাতে সন্কার বেল—যর জেপা দীপ জ্বালা,
ফিল দেব নিত্যকর্ম পরম সন্তোষ,

তুমি ত লিখালে সখা কাদা ও গোবর মাখা
অতিশয় অসভ্যতা—জাতিগত দোষ !
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

৪

আমিত ভাবিনি কত ওহে রমণীর প্রভু,
বাটনা বাটিতে যায় নখের খোলন্ ;
রাধিতে দাওনি মোরে গায়ে যদি কালি তরে,
কাজেই হয়েছি যুড়ে এই তরপোব ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

৫

তুমি ত লিখালে মোরে উঠিতে হবেনা ভোরে,
মধু হাওয়া-হানি করে ব্রত ও উপোন্ ;
চিঠি লেখা, বই দেখা, শেলাই, বুনন শেখা,
আতর গোলাপ মাখা, আমোদ নির্দোষ ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

রং মেখে নং সেজে কভু ছাড়ে কভু মেজে,
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অবশ;
প্রতিদিন সে সময়ে গৃহস্থের বউ মেয়ে
পুকুরের ঘাটে যায় ভরিতে কলন।
আমি যে পারিনা তাহা, সে কাহার দোষ?

মিছে আনোনে, প্রলাপ—ভূনাওছে দেবতায়ে,
প্রাণের ইতিহাসে করেছ বেহন।
এখন এখন আর কেন কর তিরস্কার,
বহুনে উঠেছে বিন পিয়ো আত্মতাব।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

মকদ্দমাটি বড়ই সঙ্গিন। পাঠকদিগের মধ্যে এমন কি কেহ উকিল নাই
যিনি অনুগ্রহ করিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন?

সাহিত্য-পরিধে-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক) ১০ম ভাগ, ১ম সং।

খনা—লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—বলেন;—খনা নামী কোন রমণী
ছিলেন কিনা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের জ্যোতিষী
প্রজাপতি দাস ও যশীদাস খনার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রজাপতি দাস
রঘুনন্দনের ‘জ্যোতিষতত্ত্ব’ নাম করিয়াছেন, সূত্রাং রঘুনন্দনের পরবর্তী—
১৫৬৭ খৃঃ পরে ছিলেন। অতএব অন্ততঃ কতকগুলি খনার বচন ৩০০ বৎসরে
পুরাতন। খনা বাক্য প্রধানতঃ কেরলী বলিয়া বোধ হয়। অক্ষর গণনা দ্বারা
শুভাশুভের নির্দেশ করা কেবলের প্রধান লক্ষণ। যশীদাস খনার ঞ্চর
বাক্যলায় কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বলেন বঙ্গীয়
বীর পাজির দোহাই দিত, তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্তা শুমিয়া কার্যের
ফলাফল নির্ণয় করিত। কিন্তু বৈদিককালে থাকুনশাস্ত্র এবং “বৌদ্ধকালে”
কাকবার্তা ছিল। বঙ্গীয় বীর নহে, ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধযাত্রার পূর্বে গণনা
করাইতেন। ভীষ্ম উৎপাত দর্শনে চিস্তিত। দিগ্বিজয়ের পূর্বে কালিদাসের
রঘুবাহুগণের নৈরাজনা করিয়াছিলেন। গর্গমুনি পুনীপতন সরোটপ্ররোহণ
ফল লিখিয়াছিলেন। সূত্রাং বঙ্গবীরের হাঁচি টিকটিকির ভর আর্থা ঋষিগণ
হইতে কুলক্রমাগত।

এ প্রবন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য ও বিবেচ্য কথা আছে।

জীববিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা—লেখক উক্ত যোগেশ বাবু—এইরূপ
প্রবন্ধে ক্রমে ভাষার অনেক অভাব দূর হইবে আশা করা যায়—মহারাজ

নন্দকুমারের পত্র কৌতুহল জনক। ৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত পত্রিকাতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একরূপ নগণ্য ও
হীন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হুঃখিত হইলাম ।

• উদ্বোধন আশ্বিন ।

ইহা সেবাত্রয়ধারী কৰ্ম্মীগণের পত্র । যেখানে কৰ্ম্ম বিদ্যমান সেখানে
চিন্তা ভেজস্বিনী, সেখানে সাহিত্যের সামগ্রীর অভাব নাই । কৰ্ম্ম চিন্তাতে
পরিণত, কৰ্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত । আবার কৰ্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েই
ভক্তি কাণ্ডে বিকশিত । বিত্তক কৰ্ম্ম উপাসনা, জ্ঞান ও উপাসনা । উপাসনা
ঈশ্বর সামুখ্য । বিহিত কৰ্ম্ম যে পরিমাণে জাতীয় জীবনকে অধিকার করিবে
সেই পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য উন্নতি লাভ করিবে ।

৮বিবেকানন্দের উদ্দেশে লিখিত “তর্পণ” উদ্ধৃত হইল—

পর পর বলি নাই যে গো কেহ
সকলই আনন্দময়ের ছবি !
তাই পরসেবা, দিলে মহামন্ত্র
বাহে কুটে উঠে আগের রবি !
তাই সেবাশ্রম অনাথ আগার
তাই ছুর্ভিক্ষের মোচনে আশ ।
তাই অশ্বৈত্তের মহিমা ঘোষিতে
চাণ্ডিকাকে অগ্নি “অশ্বৈত বাস” ।
তাই সিকুতীরে, ভূধর শিখরে,
দ্বীপ দ্বীপান্তরে, নূতন কপা !
কুমার সন্নানী ধার উপবাসী,
দিতে জনে জনে নূতন গাথা !
তাই উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ ভূমি,
অবুদ্ধ ভারত জাগার সবে, .

তাই ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মের মহিমা
প্রচারে জগতে মহান্ হবে !
চিকাগোর সেই ধরম সভায়
হঠাৎছিল সেই শব্দের ধ্বনি,
আজ্ঞে চারিদিকে বাজে মোর কাণে
সে অপূর্ব শুভ শিবের বার্তা !
বেদান্তের প্রথা হৃদে হৃদে গাঁথা,
বেদান্তের জ্ঞানে প্রাণিত তুমি
বেদান্তের সেই পূর্ণ অবতার
“ব্রাহ্মকৃষ্ণ” ছিল তোমার স্বামী !
“দাও দাও দাও কিরে নাহি চাও”
এই মহামন্ত্র দিয়াছ জীবন,
চূর্ণ স্বার্থ মান হৃদয় অশান,
তবে ত তাহাতে নাটবে শিবে” ।

The Dawn—এই মাসিক পত্রিকাতে ব্যবহারিক সমরোপযোগী ও
অজ্ঞাত চিন্তাশীল প্রবন্ধ থাকে, দেশের উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের,
ইংলণ্ডের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীন্তন বাহা
লিখিতেছেন তাহা অচূর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া সুপণ্ডিত সম্পাদক অনেক
সময় নিজের মস্তব্য প্রকাশ করেন । বাঙ্গালার মাসিক পত্রের যে সকল সম্পাদক

অগ্রহায়ণ ১৩১০

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

১৪৫৩

বা লেখক মূল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুবিধা বা সমর করিতে না পারেন তাহারা এই পত্রিকা খানি নিয়মমত পাঠ করিলে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে পারিবেন এবং তাহা আলমদন করিয়া প্রাক লিখিলে তাহাদিগের পাঠকগণও শিক্ষা লাভ করিবেন ।

The Indian Magazine—ক্ষুদ্র মাসিক পত্র । উত্তম ।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ ।

আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩১০ ।

আশ্বিন ২৭শে, ১৪ই অক্টোবর । লর্ড লণ্ডন ডারী মন্ত্রী সভার লর্ড প্রেসিডেন্ট এবং বিঃ আর্থর লি সিভিল লর্ড অব অডমিরাল্টি নিযুক্ত হন । ইতালীর রাজা ও রাণী পারী নগরে পৌছান । আর্জেন্টিনাস সীমান্ত প্রদেশ ধর্ম ঘট দেখা দেয় ।

২৯শে আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর দিল্লিতে দুই বার অত্যধিক ভূকম্প হয় ।

৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর মাদ্রিদে নৌকা বিদ্রোহে দলপতি জেরস আরা ফেরের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় ।

১লা কার্তিক, ১৮ই অক্টোবর । চার্লস স্কট ডিক্সন লর্ড আডভোকেট এবং ডেভিড ডগাস স্কটলাণ্ডের সলিসিটর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন ।

৪ঠা কার্তিক, ২১শে অক্টোবর । টেলিগ্রাম মাসুলের হার হ্রাস সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় । অফিসেট বা অস্তাবস্তকীয় টেলিগ্রাম দুই টাকায় এবং অর্ডিনারী বা সাধারণ টেলিগ্রাম এক টাকায় ঠিকানা সহ বোল কথায় যাইবে । ডেস্কর্ড বা বিলম্বে প্রেরিত টেলিগ্রাম চারি আনায় চারি কপা যাইবে, ছয়টি কথা সংযুক্ত ঠিকানা বিনা মূল্যে যাইবে ।—ইতালীর মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হয় ।

৬ই কার্তিক, ২৩শে অক্টোবর স্পেনিষ্ট ইতিহাসিক মিঃ লেকির (W. E. H. Lecky) র মৃত্যু সংবাদ আসে । জন্ম ১৮৩৮ খ্রিঃাব্দে ।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কৃষি ব্যাকবিধি প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বিধির পাণ্ডুলিপি পেশ হয় ।

৯ই কার্তিক, ২৬শে অক্টোবর । কসিয়ার বহু স্থানে শস্ত অদৌ হয় নাই এবং দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা দিয়াছে ।—জনরন আল অব মিটু লর্ড কর্জনের পর বড় লাট হইবেন ।

১১ই কার্তিক, ২৮শে অক্টোবর । স্পেনের বিলবাও সহরে ৪০ হাজার শ্রমজীবী ধর্মঘট করিয়া দাঙ্গা হান্ধামা করিতেছু জানা যায় ।

১৩ই কার্তিক, ৩০শে অক্টোবর । পারী সহরে শ্রমজীবীগণ ধর্মঘট করিয়া ভয়ানক উৎপাত করিতেছে জানা যায় ।—ইতালীর নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হয় । সিগনর জিয়লাইটি (Signior Ciolitti) প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন ।—স্পেন বিদ্রোহের শাস্তি হয় ।

১৪ই কার্তিক, ৩১শে অক্টোবর । মালদ্বের কইষাট্ট নগরে প্লেগ নিবারক বিধি প্রবর্তিত হওয়াতে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হয় ।

১৫ই কার্তিক, ১লা নভেম্বর । ইংলণ্ডে

অত্যধিক বারিষাত বশতঃ অত্যন্ত জলপ্লাবন হইয়াছে। ইউরোপে লন্ডাউ ও ভিনিসিয়ায় জলপ্লাবনে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে জানা যায়।— বৈজ্ঞানিক শক্তির গোলযোগ হওয়াতে ইউরোপে স্থানে স্থানে তড়িত বার্তা বন্ধ থাকে।—প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক থিওডোর মোমসেনের মৃত্যু হয়।

১৬ই কার্তিক, ২রা নভেম্বর। পোপের আদেশে ভয়ানক অগ্নি সংযোগে তিনটা ঘর ভস্মনাশ হয়।—আমেরিকার ইণ্ডিয়ানাপলিসের নিকট রেনওয়েটেণ সংঘর্ষে প্রায় ৮০ জন হত ও আহত হয়।—নিউইয়র্কের এন্টা বাটীতে অগ্নি লাগিয়া ২৫ জন লোকের মৃত্যু হয়।—সুর এনড্রুজ্জার সিং বোর্ডিনের হস্ত হইতে রসের শাসন ভার গ্রহণ করেন। সিং বোর্ডিন উহার স্থায়ী পদ গ্রহণ বাননায় বাঙ্গালোরে গমন করেন।

১৭ই কার্তিক, ৩রা নভেম্বর। কলম্বিয়া এবং আমেরিকায় পতঙ্গের নিবাদের সূত্রপাত দেখা দিয়াছে জানা যায়। পানামাবাসীগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। আসাম প্রদেশের মৌসিংরাবের রাজা সিংবারাই (Raja Symbarai, the ruling Chief of Mansymram), উহার ভ্রাতা এক অস্ত্রাস্ত্র কএক জন হত্যা বাপারে লিপ্ত থাকি সন্দেহে ধৃত ও বন্দী হইলেন।

১৮ই কার্তিক, ৪ঠা নভেম্বর। ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাঁচুলিপি (The Universities Bill) পেশ হয়।

১৯শে কার্তিক, ৫ই নভেম্বর। আয়োনা-হীপে আমেরিকাবাসীদিগের গোলাবারুদের ঘরে অগ্নিলাগায় বিভ্রাট হয়। ইহাতে অনেক লোক হত ও আহত হয়।—আমাদের ভূত-পূর্ব অস্থায়ী ছোটলাট বোর্ডিন বাঙ্গালোরে পৌছান ও ন্যাসিওনের রেনিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন।

২০শে কার্তিক, ৬ই নভেম্বর। আমেরিকার পানামার নতুন শাসন প্রণালীতে সম্মত হইয়াছেন জানা যায়। ডাক্তার এডমন্ড নর ডাক্তারের

বিশপ নিযুক্ত হইয়াছেন।—ইংলণ্ডের নতুন মন্ত্রী সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

২১শে কার্তিক, ৭ই নভেম্বর। রেক্সনে অত্যন্ত ভূমিকম্প হয়। মালদ্বে অত্যন্ত বড় ও বৃষ্টি হয়।

২২শে কার্তিক, ৮ই নভেম্বর। পানামার নতুন শাসন তত্ত্ব সেনার বিরোধারিসাকে পানানা খাল নির্মাণ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

২৩শে কার্তিক, ৯ই নভেম্বর। ফরালের শাসনকর্তা বড়নাট লর্ড কর্জাকে অস্ত্রঘাত করিবার অস্ত্র বুনাগারে প্রেরিত হইয়াছেন।— বড়নাট নভা নগরে গমন করেন।

২৪শে কার্তিক, ১০ই নভেম্বর। অর্গেন্টিনা প্রদেশে ধর্ম্মবন্দির বা চর্চ সম্পত্তির ফ্রোকেস আদেশ প্রচারিত হওয়া অশান্তি দেখা দিয়াছে জানা যায়।—সিঃ ক্. ই. চ্. ইলিয়ট এথেন্সের মন্ত্রী এবং ই. চ্. এগার্টন নোফিয়ার কনসল জেনারেল নিযুক্ত হন।—বড়নাট স্থানে গমন করেন।

২৫শে কার্তিক, ১১ই নভেম্বর। পনর শত হটেকট বিদ্রোহী হইয়া আফ্রিকার কেপ মোমাল প্রদেশ আক্রমণ করে, কিন্তু পুনর্বিজিত কর্তৃক বিতাড়িত হয়।—আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হয়।

২৬শে কার্তিক, ১২ই নভেম্বর। কাপ্তেন উইন্টার তরবৎ হারবারির কনসল এবং কর্ণেল মিকিন মেনিদের কনসল নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য এই দুই স্থান পারস্যের অন্তর্গত।— মালদ্বে ভয়ানক বন্যা হইয়াছে জানা যায়।— বড়নাট ভাওয়ালপুরে পৌছান। তথায় ভাওয়ালপুরে নবাবকে উহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

২৭শে কার্তিক, ১৪ই নভেম্বর। পিটার্সবারো এবং নিলটে রুমের মধ্যে দুইজন মৃত্যু ঘটে। উঠিয়া দশ সহস্র পাউণ্ড চুরি করে। অন্য মাহন!—বড়নাট খানপুর হইয়া হারবারাবাদ গমন করেন।

নবপ্রভা ।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড]

কলিকাতা, পৌষ ১৩১০ সাল

[১১শ সংখ্যা ।

বিপদের প্রতি ।

হে বিপদ ! ভয়ঙ্করা ! ক্রকুটী কুটিল !

হাসি বোরি বিক্রপের হাসি,

এস এস উন্মাদিনি ! হাসি খিল খিল

উচ্চ শব্দে, এস সর্বনাশি !

আনুইয়া কেশজাল, আলিঙ্গি উল্লাসে,

বাধ মোরে লো স্বৈরিণি ! কেশ-নাগপ্রাশে ।

২

হে আপদ ! হে বাগাই ! করুণ-ক্রন্দনা !

সারা পাড়া তোলপাড় করি,

আমর প্রসবা যেন গতিগী-বস্ত্রণা

এস এস ভয়াল সুন্দরি !

প্রসবাত্তে, লো ডাকিনি, আমিও হাসিয়া,

সম্পদ-সুপুত্রে লব, উৎসঙ্গে চুমিয়া !

৩

এস, এস, হে বিপদ, ধরি উর্দ্ধ কণা,

ফৌশ্ ফৌশ্ কণীর মতন !

আমি জানি, সর্প-মন্ত্র—হরি-আরাধনা,

ভাঙ্গি দিব বিবাক্ত দশন !

শিরে তোর, লো নাগিনি, করে চিক্ চিক্

ইন্দু-স্তম্ভ পবিত্রতা—অপূর্ব মাগিক !

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন ।

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ ।

(৪)

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষকালে স্বচতুর প্রধান-মন্ত্রী ডিজরেলী ভিক্টোরিয়াকে “কৈসরেহিন্দ” অর্থাৎ ভারতরাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করেন । বর্তমান সম্রাট সে সময়ে যুবরাজ অবস্থায় ভারতে বিরাজিত । তখন বোম্বাই নগরে পদার্পণাবধি দেশময় যে প্রকার ধুমধাম পড়িয়াছিল, এবং আপামরসাধারণ নানাক্রমে যে শ্রেণীর রাজভক্তি প্রকাশ দ্বারা কৃতার্থমুগ্ধ হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাহাতেই এবস্থিৎ পরামর্শের সুযোগ উপস্থিত হয় । ক্রিশিয়ার সহিত তৎকালিক গোলযোগও এরূপ উপাধি সংযোজনীর অন্ততম উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হইতে পারে ।*

ডিজরেলীর সহিত স্বর্গীয়া বৃটেনেশ্বরীর যেরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল সেরূপ আর কোন অমাত্যের সহিত কখন ঘটে নাই ; সচিববর যেমন তাঁহার বিশ্বাস ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন, তিনিও তেমনই প্রধানামাত্যের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন । সুতরাং রাজনীতিসম্বন্ধীয় একের মনোগত ভাব অন্নের নিকট প্রকাশ পাইতে কোনই বাধা ছিল না । এক শ্রেণীর লোক অনুমান করেন, রাজ্যীর সম্রাটোচিত নামের সন্ধান হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন ডিজরেলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রভুকে সম্ভাব সম্পাদনার্থ উচ্চতর উপাধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন । যাহা হউক এর্বম্প্রকার সুগৌরবান্বিত উপাধিরত্নের লোভসম্বরণ করা পুরুষপক্ষেই কঠিন, স্ত্রীলোকেরত কথাই নাই । সুতরাং আক্লাদে গদগদ ভাবে রাজ্যী প্রিয় সচিবের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন । কথাটা ক্রমে প্রচারিত হইলে বৃটেনবাসী অনেকে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা বলেন যে বাদশাহ উপাধির দ্বারা বথেচ্ছাচারিতার ভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং স্বাধীন প্রকৃতি পাশ্চাত-বৃটীশ-প্রজার

*“Mr. Disraeli was accused of ministering simply to a whim of the Sovereign whereas in fact the title was intended to impress the idea of England's suzerainty forcibly upon the minds of the native princes and upon the populations of Hindustan. The Prince of Wales's voyage to India in the winter of 1875-76 had brought the heir to the throne into personal relationship with the great Indian vassals of the British Crown, and it was felt that a further demonstration of the Queen's interest in her magnificent dependency would confirm their loyalty in the face of the many insidious attempts made by Russia to subvert it”

পৌষ ১৩১০]

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ ।

৪৩৭

উহা কখন প্রীতিকর হইতে পারে না । কিন্তু তাহাদের কথা খাটিল না, দোদ গুণ্ডাপাশ্বিত প্রাচ্যভাবের-ভাবুক রিহদীবংশসম্বৃত্ত প্রধানসচিব নানা-কলকৌশলে বহুবিধ দাগ্জাল বিস্তার সহকারে কতকগুলি অভিনব বুদ্ধির দ্বারা সকলকে পরাস্ত করতঃ পাল্লামেন্টে তৎসম্বন্ধীয় বিল পেশ করিলেন । তথায় বিস্তার তর্কবিতর্কের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বিল পাশ' হইয়া বিধিবদ্ধ হইল,—রামচন্দ্র, বুদ্ধিষ্টির, অশোক, আকবরের রাজমুকুট বিলাতে বসিয়া ভিক্টোরিয়া মন্তকে ধারণ করিলেন । বথানম্নে ইণ্ডিয়া আপিসের দ্বারা তদ্বিষয়ক বিজ্ঞাপনও অস্বদেশে প্রেরিত হইয়া প্রচারিত হইল । তৎকালের সরকারী গেজেটের সঙ্গে উহা একত্রে প্রকাশ করা হয়, তাহার অবিকল অনুলিপি নিয়ে দেওয়া গেল, ভাষা ও বর্ণবিন্যাস ঠিক মূলের মতই রহিল:—

(ভিক্টোরিয়া রাজত্বের অর্ক ৩৯ ।)

(অধ্যায় ১০)

সংযুক্ত রাজ্য ও তদবীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত অভিধান ও উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে ক্ষমতা দিবার আইন ।

এই আইন সেক্রেটারী অব ষ্টেট মহোদয়ের ১৮৭৬ খৃঃঅব্দের ২৯ শে জুন তারিখের ২৮ নং মোড়ক মধ্যে প্রেরিত ।

যে হেতুক বিগত মহারাজ তৃতীয় জর্জের চত্বারিংশৎবৎসরে গ্রেট ব্রিটন

১৮০০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় জর্জের

২২।৪.০০ বৎসর রাজত্বকালে

ও আয়ারল্যান্ডের সংযোগার্থক বিধিবদ্ধ আইনের

৬৭ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছিল যে উল্লিখিত

সংযোগের পর সংযুক্ত রাজ্য ও তাহার

অবীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় উপাধি সকল একরূপ হইবে;

মহা মহারাজ সংযুক্ত রাজ্যের মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা স্থির করিবেন ।

এবং যে হেতুক উক্ত আইন ও ১৮১১ খৃঃঅব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে

এটা ঘোষণা হয় ছাপার ভূগ, ৩২।৪.০ হইবে । এইরূপ হেলায়-অস্বায় গুরুতর সরকারী দলীলাদিও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাকে । এই কাগজ পত্র গুলি তাহার বিশেষ প্রমাণ ।

+ ১৮০১ অব্দ যে এভাবে লিখিত হইতে পারে, তাহা এই প্রথম দেখা যাইতেছে ।

প্রধান মোহর অঙ্কিত একটি রাজকীয় ঘোষণার প্রমাণ শ্রীশ্রীমতী মহারানীর বর্তমান অভিধান ও উপাধি এই মাত্র আছে যথা “বিট্টোরিয়া পরমেশ্বর-প্রসাদাৎ গ্রেটব্রিটন ও আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাজ্যের রানী ধর্মরক্ষিণী” ।

এবং যে হেতুক মহারানীর রাজত্বের ২১।২২ বৎসরে পার্লামেন্টে মহাসভায় ভারতরাজ্যের উৎকৃষ্টতর শাসনাত্মক বিধিবদ্ধ আইনের ১।৬ অধ্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল যে

ভারতবর্ষের রাজত্ব, বাহা তৎপূর্বে মহারানীর অধীন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত ছিল তাহা তদবধি মহারানীর অধিকৃত হইবে এবং ভারতবর্ষ সেই সময় হইতে মহারানীর নিজ নামে ও নিজ শাসনে থাকিবে । এবং যে হেতুক ঐ রাজত্ব এইরূপ হস্তান্তর করণের এক লক্ষণ বর্তমান অভিধান ও উপাধির দ্বারা নির্দিষ্ট করা কর্তব্য ।

অতএব বর্তমান পার্লামেন্ট সভায় সমাগত ধর্ম ও সংসারসম্বন্ধীয় লর্ড ও সাধারণ সভাগণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে ও তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে মহামহিম মহারানীর দ্বারা নিয়মিত হইল যে—

সংযুক্ত রাজ্যের প্রধান মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণাদ্বারা উপরোক্ত ভারতবর্ষের রাজত্ব হস্তান্তর করণের উল্লিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিবার নিমিত্ত সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় বর্তমান রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি মহারানীর স্বেচ্ছামত গ্রহণ করা বিহিত হইবে ।

নং ৭০ ইণ্ডিয়া আপীস লণ্ডন তাং ১৩ই জুলাই ১৮৭৬ ।

মহামান্য সেক্রেটারী অব্‌ফেটের নিকট হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে

আমি আপনকার গবর্ণমেন্টের বিদিতার্থ মহারানীর ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করিতেছি বাহাতে তাঁহার “কৈনরে হিন্দ” এই উপাধি গ্রহণ প্রচারিত হইয়াছে ।

ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রজাগণের প্রতি শ্রীশ্রীমতী মহারানীর চিরানুভূত বাৎসন্যভাব, তদীয় এই কার্য দ্বারা নিয়ম পূর্বক দৃঢ়রূপে বাক্ত হইল, তজ্জন্ত তাঁহার বিবেচনায় উপস্থিত সন্দোহও সান্তিশয় অনুকূল । অতএব আমার বাঞ্ছা এই আপনি মহারানীর ভারতবর্ষের রাজ্যব্যাপিয়া তাঁহার রাজকীয়

পৌষ, ১৩১০]

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ ।

৪৩৯

অভিধান ও উপাধির যে অতিরিক্ত উপাধি গৃহীত হইয়াছে তাহার তদীয় সদভিপ্রায়োপযোগিনী ঘোষণা করিবেন ।

‘স্বাক্ষরিত’ সালিস্বরূপে ।

শ্রীশ্রীমতী মহারানীর সভা হইতে ।

ঘোষণা পত্র ।

ভিক্টোরিয়া রাং

যে হেতুক পার্লামেন্ট মহাসভার বর্তমান অধিবেশনে “সংযুক্ত রাজ্য ও তদবীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে ক্ষমতা দিবার আইন” নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । ঐ আইনে উল্লিখিত আছে যে গ্রেটব্রিটন ও আয়ারল্যান্ড সংযোগার্থক আইনে নির্দিষ্ট হইয়াছিল যে উক্ত সংযোগের পর সংযুক্ত রাজ্য ও তদবীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধি একরূপ হইবে বাহা মহারাজ সংযুক্ত রাজ্যের মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা স্বৈচ্ছামতে স্থির করিবেন । ঐ আইনে আরও উল্লিখিত আছে যে ঐ আইন প্রমাণ ১৮ । ১ খঃ অন্ধের ১লা জানুয়ারী তারিখের প্রধান মেহরান্ধিত একটি রাজকীয় ঘোষণানুসারে সম্প্রতি অস্মদীয় নিম্নলিখিত অভিধান ও উপাধিমাত্র বিহিত যথা “ভিক্টোরিয়া পরমেশ্বর প্রসাদাৎ গ্রেটব্রিটন ও আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাজ্যের রানী ধর্মরক্ষিণী” এবং ঐ আইনে আরও উল্লিখিত আছে যে ভারত রাজ্যের উৎকৃষ্টতর শাসনার্থক আইনে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষের রাজত্ব, বাহা তৎপূর্বে অস্মদবীন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত ছিল, তাহা তদবধি অস্মদ অধিকৃত হইবে । এবং ভারতবর্ষ সেই সময় হইতে অস্মৎ নামে ও অস্মৎ-শাসনে থাকিবে এবং যে হেতুক রাজত্ব ঐ রূপ হস্তান্তর করণের এক লক্ষণ, অস্মদীয় বর্তমান অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধির দ্বারা নির্দিষ্ট করা কর্তব্য । ঐ আইনে উক্ত উল্লেখের পর নির্দিষ্ট হইয়াছে, যে সংযুক্ত রাজ্যের প্রধান মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ভারতবর্ষের রাজত্ব হস্তান্তর করণের ঐরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত সংযুক্ত রাজ্য ও তদবীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় বর্তমান রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি অস্মৎ স্বৈচ্ছামতে গ্রহণ করা বিহিত হইবে । এ প্রযুক্ত আমরা প্রিত

কৌন্সেলের উপদেশ ক্রমে স্থির ও ব্যক্ত করা উচিত বিবেচনা করিয়াছি এবং ঐ উপদেশ ক্রমে অত্র স্থির ও ব্যক্ত করিতেছি যে অদ্যাবধি সকল সময়ে অশ্বৎ অভিধান ও উপাধি সমন্বিত সকল দলিলে, কেবল সংযুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত সকল প্রকার সনন্দ, কমিশন, লেটার্সপাটেন্ট, গ্রান্ট, রীট ও নিয়োগ পত্র প্রভৃতি দলিল সকল বর্জন পূর্বক বর্তমান কালীন সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ-সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত নিম্নলিখিত উপাধি সংযোগ করা যাইবে। অর্থাৎ লাতীন ভাষায় “ইণ্ডিয়া ইম্পারেট্রিক্স” এবং ইংরাজী ভাষায় “এমপ্রেস্ অব ইণ্ডিয়া” ।

ইহা ভিন্ন অশ্বৎইচ্ছা ও অভিপ্রায় এই যে, কমিশন, সনন্দ, লেটার্সপাটেন্ট, গ্রান্ট, রীট নিয়োগ পত্র ও প্রভৃতি, পূর্ববর্জিত দলিল সমূহে উক্ত অতিরিক্ত উপাধি সংযুক্ত হইবে ।

অধিকন্তু অশ্বৎইচ্ছা ও অভিপ্রায় এই যে, যে সকল স্বর্ণ রোপা ও তাম্রময় মুদ্রা এক্ষণে সংযুক্ত রাজ্যমধ্যে নিয়ম পূর্বক প্রচলিত রহিয়াছে ও যে সকল স্বর্ণ, রোপা ও তাম্রময় মুদ্রা অদ্য কি ইহার পর অশ্বৎ আদেশানুসারে ঐরূপ অঙ্কিত হইবে, তাহা অশ্বৎ অতিরিক্ত অভিধান ও উপাধি সত্ত্বেও সংযুক্ত রাজ্য মধ্যে আইনানুগত প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইবে । অপর উক্ত সংযুক্ত রাজ্যের অধীনস্থ কোন প্রদেশে অশ্বৎ-অভিধান ও উপাধির অঙ্ক বা তাহার অংশযুক্ত যে সকল মুদ্রা অঙ্কিত ও প্রচলিত হইয়া অশ্বৎ ঘোষণানুসারে ঐ প্রদেশে নিয়ম পূর্বক প্রচলিত হইবে এবং উক্ত ঘোষণানুসারে যে সকল মুদ্রা উক্ত অতিরিক্ত উপাধি সত্ত্বেও ভিন্ন আদেশান্তর পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশের মধ্যে নিয়ম পূর্বক প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গণিত হইবে ।

উইণ্ডসোরস্থ অশ্বৎসভায় ১৮৭৬ খৃঃ অক্টে, অশ্বৎ রাজ্যের

উনচত্বারিংশ অক্টে ২৮ সে এপ্রেল তারিখে প্রচারিত হইল ।

পরমেশ্বর শ্রীশ্রীমতী মহারাজীকে রক্ষা করুন,

ভারতবর্ষের বাইস্রয় ও গবর্ণর জেনেরেলের সভার আদেশানুসারে ।

Government Central Press.

বিজ্ঞাপন ।

পলিটিকেল ।

সিমলা তাং ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৬ ।

নং ১৮৯১ পী ।

বোম্বা পত্র ।

আমি, ভারতবর্ষের বাইশয় ও গবর্ণর জেনরল, এ প্রযুক্ত এই রাজ্যের গবর্ণর, কার্য্য সম্পাদক, রাজা, সরদার, আমীর ও প্রজাগণের গোচরার্থ নিম্ন-লিখিত আইন, যাহা ১৮৭৬ খৃঃ অন্ধের ২৭শে এপ্রেল তারিখে গ্রেট ব্রিটন ও আয়ারল্যাণ্ডের ইম্পীরিএল পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া ১৮৭৬ খৃঃ অন্ধের ২৮শে এপ্রেল তারিখের শ্রীশ্রীমতী মহারানীর রাজত্বের উনচত্বারিংশৎ বৎসরে উইণ্ডসোর রাজসভার রাজকীয় ঘোষণার সহিত একত্রে মহামান্ত্র সেক্রেটারী অব্ স্টেট কর্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ অন্ধের ১৩ই জুলাই তারিখের তদীয় ৭০ নং মোড়ক মধ্যে অত্রস্থ গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা এই বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি ।

অধিকন্তু আমি আপন হস্তাক্ষর ও মোহর দ্বারা অপর সাধারণ সকলকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি যে ১৮৭৭ খৃঃ অন্ধের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নগরে একটি রাজকীয় সভা করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের উপর তাঁহার আন্তরিক সদয় ভাব প্রচার করিব, বৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারানী, বিশেষতঃ তাঁহার নিজ রাজ্যের এই বৃহৎ অংশের প্রতি আপনার অনুরাগ ও ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রজাগণের রাজভক্তি ও অনুরাগের উপর স্বকীয় বিশ্বাস প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আপনার অন্তর্গত রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।

আমার ইচ্ছা এই যে শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ভারতরাজ্যের সকল অংশ হইতে গবর্ণর, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর, প্রধান প্রধান কার্য্যসম্পাদক এবং রাজা, সরদার ও আমীরগণ, যাহাদের অবস্থানে পুরাতন বর্দ্ধনশীলতা ও অধুনাতন শ্রীসম্পন্নতা সংযুক্ত হইয়াছে এবং যাহারা এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের শোভা ও প্রতিষ্ঠায় এমন ক্ষমতাবান উপকরণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই ।

অতএব আমি এই মহৎকীর্তিগর্ভময়ীর বাপারের গুরুতানুযায়ী এবস্থত
আদেশ অবিলম্বে কৌন্সিলের আনন হইতে প্রচার করিব, যাহা মহারাণীর
প্রকৃতিমণ্ডল, মহীয়সী রাজ্ঞীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশার্থ স্বকীয় রাজভক্তিহৃদক
বে সাধারণ উৎসব করিবার বাসনা করিয়া থাকে তৎপোষক হইবে ।

(স্বাক্ষরিত, লীটন)

সিমলা তাং ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৬ ।

উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন দ্বারা কুইন ভিক্টোরিয়ার নূতন উপাধি বথোপযুক্ত
সমারোহের সহিত ভারতে বিঘোষিত হইবার সময় ও স্থান নিরূপিত হইয়া
সাম্রাজ্যের বাবতীয় রাজন্ত আমীর ওমরা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ১৮৭৭
খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রাচীন দিল্লী নগরের বিরাট দরবারে আহ্বান
করা হইল । বড়লাট লিটন বাহাদুরের আহ্বানে বথাসময়ে সকলে তথায়
উপস্থিত হইয়া ঘোষণা ব্যাপার সুসম্পন্ন করিলেন । পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্বে
হস্তিনাপুর-ক্ষেত্রে যথায় ধর্মপুত্র যুবদ্বির রাজস্ব-বজ্রের অনুষ্ঠান দ্বারা দেশ বিদেশ
হইতে সমাগত নানাশ্রেণীর মিত্র করন নৃপতিবৃন্দ কর্তৃক আর্য্যসাম্রাজ্যের
একচ্ছত্রী অধিপতিক্রমে বরিত হইয়াছিলেন সেই স্থলে বৃটেনেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার
প্রতিনিধি তাঁহাকে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীক্ৰমে বরণ করতঃ ইংরাজ রাজ-
স্বয় বস্ত্র সমাপন করিলেন ;—সুদূর ইংলণ্ডে থাকিয়া কুইন ভিক্টোরিয়া ভারত-
বর্ষের প্রাচীন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র
সর্বসমক্ষে পাঠিত হয় :—

IMPERIAL ASSEMBLAGE

DELHI CAMP

The 1st January 1877.

On the first day of November, in the year 1858, a Proclamation was issued by the Queen of England, conveying to the Princes and People of India those assurances of Her Majesty's good will which, from that day to this, they have cherished as their most precious political possession.

The promises then made by a Sovereign, whose word has never been broken, need no confirmation from my lips. Eighteen years of progressive prosperity confirm them ; and

this great assemblage is the conspicuous evidence of their fulfilment. Undisturbed in the enjoyment of their hereditary honours, protected in the prosecution of their lawful interests, both the Princes and the People of this Empire have found a full security for the future in the generosity and justice of the past.

We are now assembled to proclaim the assumption by the Queen of the Title of Empress of India; and it is my duty, as Her Representative in this Country, to explain the gracious intentions of Her Majesty, in adding that title to the style and dignity of Her ancestral Crown.

Of all Her Majesty's possessions throughout the world, possessions comprising a seventh part of the earth's surface, and three hundred millions of its inhabitants,—there is not one that She regards with deeper interest than this great and ancient Empire.

At all times, and in all places, the British Crown has had able and zealous servants, but none more illustrious than those whose wisdom and heroism have won and kept for it the dominion of India. This achievement, in which all Her Majesty's subjects, European and Native, have worthily co-operated, has also been aided by the loyalty of Her Majesty's great allies and feudatories, whose soldiers have shared with Her Armies the toils and victories of war, whose sagacious fidelity has assisted Her Government in preserving and diffusing the blessings of peace; and whose presence here today at the solemn inauguration of Her Imperial Title, attests their confidence in the beneficence of Her power, and their interest in the unity of Her Empire.

This Empire, acquired by Her Ancestors, and consolidated by Herself, The Queen regards as a glorious inheritance to be maintained and transmitted intact to Her descendants, and She recognises in the possession of it the most solemn obligation to use Her great power for the welfare of all its people, with scrupulous regard for the rights of Her feudatory Princes. For this reason, it is Her Majesty's Royal pleasure to add to the titles of Her Crown one which

shall be henceforth to all the Princes and Peoples of India the permanent symbol of its union with their interests, and its claim upon their loyal allegiance.

The successive dynasties whose rule in India the power of the British Crown has been called by Providence to replace and improve, were not unproductive of good and great Sovereigns, but the polity of their successors failed to secure the internal peace of their dominions. Strife became chronic and anarchy constantly recurrent. The weak were the prey of the strong and the strong the victims of their own passions. Thus, sapped by incessant bloodshed and shaken by intestine broils, the great House of Tamerlane crumbled to decay, and it fell at last because it had ceased to be conducive to the progress of the East.

Now, under laws which impartially protect all races and all creeds, every subject of Her Majesty may peacefully enjoy his own. The toleration of the Government permits each member of the community to follow without molestation the rules and rites of his religion. The strong hand of Imperial Power is put forth, not to crush but to protect and guide, and the results of British Rule are everywhere around us in the rapid advance of the whole country and the increasing prosperity of all its promises.

British Administrators and Faithful Officers of the Crown—It is to your continued labours that these beneficent results are chiefly due: and it is to you in the first instance, that I have now, in the name of Her Majesty, to express the gratitude and confidence of your Sovereign. Not less steadfastly than all your honoured predecessors, you have toiled for the good of this Great Empire with a persevering energy, public virtue and self-devotion, unsurpassed in history.

The doors of fame are not open to all, but the opportunity of doing good is denied to none who seek it. Rapid promotion it is not in the power of any Government to provide for its servants. But I feel assured that, in the service of the British Crown, public duty and personal devotion will ever have higher incentives than the expectation of public

honours or personal emoluments. Much of the most important and valuable work of Indian Administration, has always been, and always must be done, not by persons in prominent positions, but by those district officers on whose patient intelligence and courage and efficient operation of its whole system is essentially dependent.

I cannot give expression too emphatic to Her Majesty's grateful recognition of the admirable manner in which Her servants, both Civil and Military have performed and are performing throughout India tasks as delicate and difficult as any to which the Crown can confide to its most trusted subjects. Members of the Civil and Military services,—placed at an early age in positions of immense responsibility, submitting with cheerful devotion to a severely exacting discipline, personally exercising the most important administrative functions among populations whose language, creed and customs differ from your own,—may you ever be sustained in the firm yet gentle discharge of your arduous duties by the consciousness that, whilst you thus uphold the high character of your race, and carry out the benign precepts of your religion, you are also conferring on all other creeds and races in this country the inestimable benefits of good government.

But it is not only to the official servants of the Crown that India is indebted for the wise application of the principles of Western civilization to the steady development of her vast resources and I should ill represent the feelings of my August Mistress if, on this occasion, I failed to assure Her non-official European subjects in India the cordial satisfaction with which Her Majesty recognises and appreciates, not only their loyalty to Her Throne and Person but also the benefits which Her Indian Empire derives from their industry, their enterprise, their social energy, and civic virtue.

Wishing to increase Her opportunities of distinguishing the public services, or private worth of her subjects throughout this most important portion of Her dominions, Her

Majesty has been pleased not only to sanction a certain enlargement of the Most Exalted Order of the Star of India, and of the Order of British India, but also to institute for this purpose an entirely new order which will be called the Order of the Indian Empire.

Officers and Soldiers of the Army of India, British and Native,—The Queen recalls with pride your heroic achievements on every occasion, when, fighting side by side, you have upheld the honour of Her arms. Confident that all future occasions will find you no less efficiently united in the faithful performance of that high duty, it is to you that Her Majesty entrusted the great charge of maintaining the peace, and protecting the prosperity of Her Indian Dominions.

Volunteer Soldiers,—Your loyal and successful endeavours to render yourselves capable of acting, if necessary, with the Regular Forces, claim cordial recognition on this occasion.

Princes and Chiefs of the Empire,—which finds in your loyalty a pledge of strength, in your prosperity a source of splendour, Her Majesty thanks you for your readiness, on which She reckons, if its interests be attacked or menaced, to assist Her Government in the defence of them. In the Queen's name I cordially welcome you to Delhi, recognizing in your presence, on this great occasion, conspicuous evidence of those sentiments of attachment to the Crown of England which received from you such emphatic expression during the recent visit of the Prince of Wales to this country. Her Majesty regards Her interests as identified with yours, and it is with the wish to confirm the confidence and perpetuate the intimacy of the relations now so happily uniting the British Crown and its feudatories and allies, that Her Majesty has been graciously pleased to assume the Imperial Title we proclaim to day.

Native subjects of the Empress of India, the present conditions and the permanent interests of the Empire demand the supreme supervision and direction of their administration by English Officers trained in the principles of that polity

whose assertion is necessary to preserve the continuity of Imperial rule. It is to the wise initiative of these Statesmen that India chiefly owes that steady progress in civilization which is a condition of her political importance, and the secret of her growing strength, and it is they who must long continue to form the most important practical channel, through which arts, sciences, the culture of the West (which has given to Europe its present pre-eminence in peace and war) may freely flow towards the East for the common benefits of all its children.

But you the natives of India, whatever your race, and whatever your creed, have a recognized claim to share largely with your English fellow-subjects, according to your capacity for the task, in the administration of the country you inhabit. The claim is founded in the highest justice. It has been repeatedly affirmed by the greatest British and Indian Statesmen, and by the legislation of the Imperial Parliament. It is recognized by the Government of India, as binding on its honor, and consonant with all the aims of its policy. The Government of India, therefore, notices with satisfaction the marked improvement during the recent years in the character of the Native Public Service, especially in its higher grades.

The administration of this great Empire demands, from many of those to whom a share in it is entrusted, attributes not exclusively intellectual, qualifications to which moral and social superiority are essential, more especially, therefore, does it rest with those who, by birth, rank, and hereditary influence, are your natural leaders, to fit themselves and their children for the honourable duty which is open to them, by accepting the only education that can enable them to comprehend and practise the principles steadily maintained by the Government of the Queen their Empress.

You must all adopt as your own that highest standard of public virtue which comprises loyalty, incorruptibility, impartiality, truth, and courage. The Government of Her Majesty will then cordially welcome your co-operation in

the work of administration. For in every quarter of the globe in which its dominion is established, that Government trusts less to the strength of armies than to the willing allegiance of a contented and united people, who rally round the throne, because they recognise therein the stable condition of their permanent welfare.

It is on the gradual and enlightened participation of Her Indian subjects in the undisturbed exercise of this mild and just authority, and not upon the conquest of weaker states, or the annexation of neighbouring Territories, that her Majesty relies on the development of Her Indian Empire. Her interests and duties, however are not confined to Her own dominions. She sincerely desires to maintain the most frank and friendly relations with the Rulers of those Territories which, adjoining the frontiers of this Empire, have so long owed their independence to the sheltering shadow of its Power. But, should the repose of that Power be at any time threatened from without, the Empress of India will know how to defend Her great inheritance. No foreign enemy can now attack the British Empire in India without thereby assailing the whole civilization of the East, and the unlimited resources of Her dominions, the courageous fidelity of Her allies and feudatories, and the loyal affection of Her subjects have provided Her Majesty with ample power to repel and punish every assailant.

The presence on this occasion of the Representatives of Sovereigns who from the remotest parts of the East, have addressed to the Queen their congratulations on the event we celebrate today, significantly attests the pacific policy of the Government of India. To His Highness the Khan of Khelat, and to those Ambassadors who have travelled so far to represent on British Territory the Asiatic Allies of the Empress of India, as also to our honoured guest, His Excellency the Governor General of Goa, and to the Foreign Consular Body, I desire to offer, on behalf of Her Majesty's Indian Government, welcome to this Imperial Assemblage.

Princes and People of India,—It is now my pleasing duty to communicate to you the gracious message which the Queen, your Empress, has today addressed to you in Her own Royal and Imperial name. These are the words of the telegraphic message which I have this morning received from Her Majesty.

“We Victoria by the Grace of God of the United Kingdom, Queen, Empress of India, send through our Viceroy to all our Officers, Civil and Military, and to all Princes, Chiefs and Peoples now at Delhi assembled, our Royal and Imperial Greeting, and assure them of the deep interest and earnest affection with which we regard the people of our Indian Empire. We have witnessed with heartfelt satisfaction the reception which they have accorded to our beloved Son, and have been touched by the evidence of their loyalty and attachment to our House and Throne. We trust that the present occasion may tend to unite in bonds of yet closer affection ourselves and our subjects; that from the highest to the humblest all may feel that under our rule the great principles of liberty, equity, and justice are secured to them and that to promote their happiness, to add to their prosperity, and advance their welfare, are the ever present aims and objects of our Empire.”

You will, I am confident, appreciate those gracious words.

God save Victoria, Queen of the United kingdom and

Empress of India *

Private Secretary's Office Press—Camp Delhi, 1877.

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন । (১)

* সিপাহী যুদ্ধের অবসানে যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় সেখানির স্থর আগাগোড়া নরম ছিল ; এখানি নরম-গরম আঠার বৎসরের অভিজ্ঞতাতে রাজপুরুষগণের যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইহা তাহারই ফল । কোম্পানীর আমলে ভারতীয় রাজস্ববর্গের সহিত বৃটিশরাজের এক প্রকার সম্বন্ধ ছিল, রাজা বাস হইলে তাহা আর একরূপ দাঁড়ায়, পরে অষ্টাদশবর্ষকাল দেখিয়া শুনিয়া বিভিন্নরূপ সম্পর্কস্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হয় ; অবশেষে বিগত অতিবেক বাপারে সমুদ্রপারে অব্যর্থন কর্তৃত্ব ও বৃত্তি দেখান হইয়াছে । প্রজাদিগকেও কোম্পানি যে চক্ষে দেখিতেন,

কালিন্দী-কূলে ।

হে কালিন্দী বসে আছি আমি তব তীরে ;
 চেয়ে আছি অনিমিষে ওই নীল নীরে ;
 স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুবিমল, স্বাচ্ছ, সুমধুর,
 আকাশে সন্ধ্যার তারা ভাবিয়া মুকুর
 হেরিছে আনন ! লভি সুমন্দ বাতাস,
 ফুটিছে অফুট মৃদু কল্লোল উচ্ছ্বাস
 তোমার করুণ কণ্ঠে ! ওকি সুবাগীতি ?
 অতীতের বুকভরা বিরহের স্মৃতি
 প্রত্যেক হিল্লোনে তব ? সে নূপুর-ধ্বনি
 আজো বেজে উঠে কানে অলক্ষ্যে তেমনি
 শিহরি প্রাণের কুঞ্জ ! আশ্রয়হারা কবি
 ও হৃদে বিস্থিত হেরি রাধা রূপচ্ছবি ;
 জড়িত বিশ্বের তৃষা ; তাই তব জলে
 জীবন জুড়ান শাস্তি লভে জীব দলে ।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম ।

বিদ্রোহে তাহার বিশুদ্ধ বাতিক্রম ঘটে, অতঃপর বিদ্রোহশাস্তি হইতে আঠার বৎসরের পর্যালোচনা
 দ্বারা তাহাদের ভিতরকার আনন্দ ভাব রাজপুরুষগণ বেশ বুঝিয়া লইয়াছেন । (লেখক)

(১) লেখক এই বক্তৃতার কোন কোন অংশের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এই কারণে
 এবং বক্তৃতার বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই দীর্ঘ ইংরাজী বক্তৃতা সন্নিবেশিত করা গেল ।
 যে অংশের উপর লেখকের মন্তব্য থাকিবে তাহার ভাবার্থ বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হইবে । নঃ প্রঃ নঃ

যায়া ।

(গল্প)

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

বন্ধুনিচ্ছেদ ।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

“ক্রোধ হইতে সম্মোহ (হিতাহিত বিবেকাভাব) হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (আত্মবিস্মৃতি), স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃততুল্য হইতে হয় ।” গীতা ২।৬

প্রবোধ বাবু আসিলে নরেশ বাবু অভ্যাস বশতঃ বলিলেন—“আমুন, বমুন,” কিন্তু গম্ভীর হইয়া থাকিলেন । প্রবোধ বাবু বলিলেন “নরেশ ! আমি তোমার শত্রু, এই কি তুমি বিগ্রাস কর ?”

নরেশ । না ! আপনি আমার পরম বন্ধু ! পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ! আমার আর একটা বন্ধু শ্রামচাঁদ ।

প্রবোধ । আমি আর শ্রামচাঁদ ?

নরেশ । আপনি আমার খুব ভাল চেষ্টা করিতেছেন ! প্রজাদিগের উত্তেজনা করিতেছেন—হারামজাদা মহেশের পক্ষে মোকদ্দমার খরচ দিতেছেন । মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আমার নামে ঠকাম করিতেছেন । এইত আপনার মতবন্ধুর কাজ ! আপনি একটা পাকা লোক ।

প্রবোধ । •(আশ্চর্য্য হইয়া) নরেশ তুমি কি ক্লেপিয়াছ ?

নরেশ । •ই, আমি কিপ্ত । বনুন আমি আহম্মক, আমি গাধা । তবে, আমি গাধাই হই, কিপ্তই হই, মহেশ বা অন্ত কোন প্রজার ক্রীর জন্ত কিপ্ত হই না—গোপনে পাপ করিয়া ধর্ম্মের মুখোশ পরিয়া সাধু সাজিয়া বেড়াই না । আপনি শ্রামচাঁদের নিকট যান—তার পক্ষে নামলার ভদ্রির করুন গে—আমার কাছে কেন ?

প্রবোধ । আমি দেখিতেছি বিপদে তোমার মাথা যথার্থ ই খারাপ হইয়া গিয়াছে ।

নরেশ । আমার বাটীতে বসিয়া আমাকে যদি ফের “মাথা খারাপ বা পাগল” বলেন তাহা হইলে—আমি বলছি—আপনি আরও অপমান হইবেন—আপনি চলিয়া যান—চলিয়া যান । আপনি তার কখন আগাকে পরামর্শ দিতে আসিবেন না ।

প্রবোধ । তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে আমি দেখিতেছি । আমি চলিলাম ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:~:—

বিচারালয়ে ।

আজ মহেশের বিচার । আদালত লোকে গঙ্গাঙ্গঙ্গ করিতেছে । বাহিরে অসংখ্য প্রজা, ভিতরে ভদ্রলোকের ঠেসাঠেসি । যে সকল উকীল মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন নাই, তাঁহারাও অনেকে সামলা মাথায় দিয়া চেয়ারে বসিয়া সওয়াল জবাব শুনিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন নব্য উকীল ক্রতবেগে পেন্সিলে নোট লিখিতেছেন, যেন তাঁহারা এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত আছেন । মহেশের হাতে কড়ি,—মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গাঙ্গীর্ঘ্য । তাহার পশ্চাতে যত্ন ও সংযম—ঠিক মহেশের উকীলের পশ্চাতে—কালীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছে ।

মহেশের নামে অভিযোগ—খুন ৩০২ ধারা, অপরাধযুক্ত নরহত্যা যাহা খুন নহে ৩০৪ ধারা, এবং গুরুতর আঘাত ৩২৫ ধারা । মোকদ্দমাটি এই ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, নসিরদ্দি নামক জমিদারের লাঠিওয়াল মহেশের স্ত্রীকে আক্রমণ করিয়াছিল । মহেশ ও তাহার পিতা অনেক দিন হইতে তাহাকে খুন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল । কিন্তু নসিরদ্দি বিশেষ সতর্ক থাকাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে নাই । একদিন নসিরদ্দি রাত্ৰিতে একাকী বাটী যাইতেছিল । মহেশ ও হারাধন পথের ধারে বন হইতে বাহির হইয়া তাহাকে লাঠি মারিয়া খুন করে ।

নরেশ বাবু সরকারী উকীলের সহিত একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তিনি শুনিয়াছিলেন এই ব্যারিষ্টারের সহিত জজ সাহেবের বিশেষ মৌজদ্য আছে এবং যাহাতে জজ সাহেব মহেশকে গুরুতর দণ্ড

দেন উজ্জ্বল রাত্ৰিতে ধান। খাইবার সময় ব্যারিষ্টার সাহেব জজ সাহেবকে অনুরোধ করিবেন এবং জজ সাহেব সেই অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। সাহেবটী আইনজ্ঞ ও দক্ষ কোমিলি। মহেশের পক্ষে প্রবোধ বাবু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভাট্টি নামক একজন স্থানীয় উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র উদীয়মান প্রতিভাশালী জুদয়বান উকীল। তাঁহার সঙ্গে একজন নবীন জুনিয়র ছিলেন। সাতদিন হইতে এই বিচার চলিতেছে। হেমচন্দ্র, ব্যারিষ্টার সাহেব এবং গবর্নমেন্ট প্লীডারের সহিত একাকী যুক্তিতেছিলেন— অক্লান্ত, অদম্য, তর্ক অজয়, বাদিপক্ষ সমর্থনে নির্ভীক। সরকার বাহাদুরের পক্ষে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছিল, হেমবাবুর জেরায় তাহাদিগের সাক্ষ্য ছিল ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু মহেশ নিজেই প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করিয়াছিল;—মহেশ জীবন রক্ষার জন্তও মিথ্যা কথা কহিতে স্বীকৃত নহে। মহেশ বলিয়াছিল যে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে জমিদারের নাঠিয়ালের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত সে বন প্রকাশ করিয়াছিল। উকীল হেমবাবু পরিহার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মহেশের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে, জেরাতে তাহার কোনটী টিকে নাই, তাহার আত্মবিরোধী, পরস্পর বিসম্বাদী, অবিশ্বাস্য। তবে মহেশের নিজের একবার এই এক কথা। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যদি মহেশের স্বীকার মাত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে তাহার সমুদয় স্বীকারই বিবাস করা সম্ভব। তাহার একবারের কতকাংশ পরিত্যাগ করিয়া কতকাংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। আসামী আদাত করিয়াছিল তাহা সে নিজেই স্বীকার করে। কিন্তু সে পিতাকে মৃত্যু বা গুরুতর আদাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বনপ্রয়োগ করিয়াছিল। সুতরাং সে আইন-সম্মত ভাবে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিল। উজ্জ্বল দণ্ডবিধির ১৩০ ধারা অনুসারে তাহার কখনই দণ্ড হইতে পারে না।

- হেম বাবু বক্তৃতা করিতে করিতে বঙ্গদেশের জমীদার ও প্রজার সম্পর্ক, মামুদ পরগণার প্রজার উপর অত্যাচার, প্রজার অসহায় অবস্থা, বিশদ ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। তাহার পর আসামীর প্রতি যে অত্যাচার হইয়া আসিতেছিল—একটা সমৃদ্ধ ও সম্মানিত কৃষক পরিবার জমীদারের আমলার অত্যাচারে কিরূপে ছারখার হইল, অবশেষে বৃদ্ধ গৃহস্থামী হারাধন কিরূপে নিরপরাধে মৃত হইল, কিরূপে জমীদারের নাঠিয়ালগণ তাহাকে ধরিয়া গ্রাম্য ছেচড়াইতে ছেচড়াইতে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, হারাধনের শিশু

কল্যাণ মায়া বিরূপে লাঞ্চিত পিতার পশ্চাতে পশ্চাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িল, বিরূপে পাষণ্ড হৃদয় লাঠিয়ালগণ এই কোমল বালিকাকে নিষ্ঠুর ভাবে রাস্তায় নিক্ষেপ করিল এবং তাহার পিতাকে ধরিয়া লইয়া যাইল, কুধিরাক্ত বালিকা পথে বিরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিল এবং অবশেষে এই কৃষক বীর বিরূপে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে রক্ষা করিল হেমবাবু হৃদয়দ্রাবী ভাষাতে বর্ণনা করিলেন । অত্যাচার বর্ণনা কালে এই সমুদয় উকীলের স্বর মধ্য মধ্য ভূঁষে প্রকম্পিত হইল এবং কখন কখন স্বরভঙ্গ ও তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল । প্রোভারা অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন, এমন কি জজ সাহেব নিজেও একটু বিচলিত হইলেন । আবার অত্যাচারের প্রতি ধর্ম্ম্য ক্রোধ প্রকাশ করিবার সময় হেম বাবুর ভাষা প্রদীপ্ত বহ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল । সেই অপূর্ব বক্তৃতা এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে বর্ণনা করিবার স্থান নাই । উপসংহারে উকীল বাবু তাঁহার সমুদয় হৃদয়ের শক্তি তাঁহার ভাষাতে ঘনীভূত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“আমার মক্কেল, এই আসামী, যে কোন অপরাধ করিয়াছে তাহার লেশ মাত্র প্রমাণ নাই । সে নিজে যাহা স্বীকার করিয়াছে তাহাতে তাহা মহত্ব ও নির্দোষিতা প্রকাশ পাইতেছে, কোন অপরাধ প্রকাশ পাইতেছে না । বক্তৃতঃ সে হেয় দম্ভ বা তদ্বরের দ্বারা শোচনীয় বন্দীভাবে আনীত হইবার যোগ্য নহে, সে প্রকার যোগ্য—পূজার্ত । বিধাতার চুঁক্কেয় অভিপ্রায়ে পুঙ্খ ব্যক্তিও কখন কখন এই জগতে লাঞ্চিত হন । নতুবা এই ব্যক্তি অদ্য কেন এই স্থানে বন্দীভাবে দণ্ডায়মান তাহা আমি যথার্থই বুঝি না । এই পিতৃভক্ত স্বকরিত্র ধর্ম্মাত্মা যুবা তাঁহার পিতৃভক্তির জন্য কীমসি কাষ্ঠে দোহুল্যমান হইবে, অথবা চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হইবে, অথবা দম্ভ তদ্বরের ভোগ্য কারাবাসের যন্ত্রণাভোগ করিবে কি না তাহা বিচারকের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে । আপনারা অবগত আছেন পুরাকালে একদা এত্না নামক আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্থিত প্রজ্বলিত ধাতুনিঃস্রব, প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্তী পল্লী সকল দগ্ধ ও ভূগর্ভস্থ করিতে লাগিল । তখন কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই ভয়াকুল চিন্তে স্ব স্ব মহামূল্য বস্তু লইয়া, উদ্ধারসে পলায়ন করিতে লাগিল । কেবল আনাপিয়স ও আফ্রিনোমস নামক দুইটা যুবক নিজের সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে সঙ্কে করিয়া নিরাপদ স্থানের সন্ধানে ধাবমান হইলেন । স্বয়ং ধর্ম্ম এই সাধু-পুত্রদ্বয় ও জনক জননীকে রক্ষা করিলেন । যে দিক দিয়া তাঁহারা গমন করিয়া-
হিলেন সে দিক দিয়া শৈল নিঃস্রব গেল না । সুতরাং তাঁহারা রক্ষা পাইলেন এবং

ঐ পুত্রদ্বয়ের অমৃত পথ অন্তান্ত স্থানের দ্বারা বন্ধ হইল না। সেই পথ পুত্রদ্বয়ের
 ধর্ম্মে পূত হইয়াছিল। সেই জন্য ঐ স্থান “ধর্ম্মক্ষেত্র” নামে প্রখ্যাত হইল।
 অমিও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনাদিগের সম্মুখীন এই যুবা পিতৃভক্ত পুত্র,
 নিজের প্রাণনাশের ভয় না করিয়া, লাঞ্চিত জনককে জমিদারের বেতনভোগী
 দম্ভাদিগের হস্ত হইতে অসাধারণ বীর্ঘ্যবলে উদ্ধার করিল, তাহাকে স্বর্গে লইয়া
 যে পথে ভয়ীর সহিত গৃহে প্রত্যাপন করিয়াছিল, সেই ভূতাপ পুণ্যভূমি,
 “ধর্ম্মক্ষেত্র”—চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। আমি অসংকোচে বলিতেছি যে,
 বৃদ্ধ নিরপরাধী পিতাকে অপমান, পীড়ন, যন্ত্রণা ও শোচনীয় মৃত্যুমুখ হইতে
 রক্ষা করিবার জন্য পুত্রের কর্তব্য কার্য্য করায় যদি কাহারও কোন বিচারানয়ে দণ্ড
 হয় তাহা হইলে সেই বিচারানয় ধর্ম্মাধিকরণ নহে, তাহা ভীষণ নরক। যদি
 সংসারে পিতৃভক্তির আদর থাকে, যদি ধর্ম্মের গৌরব থাকে, তাহা হইলে কেবল
 ইহাকে বেকশ্বর খালাস করা উচিত তাহা নহে, ইহার পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণার্থ ধর্ম্ম-
 মন্দির সংস্থাপন করা উচিত।” ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত অনর্গল বক্তৃতা করিয়া হেম
 বাবু বসিলেন। শ্রেষ্ঠার বলিল “ধন্য হেম বাবু” “ধন্য মহেশ।” চাপরানীরা
 “চোপ চোপ” হাঁকিয়া দিল। কিন্তু বারান্দায় আবার “ধন্য মহেশ,”
 “ধন্য হেম বাবু” শব্দ হইল। বাহিরে অগণ্য প্রজা “জয় মহেশজীকি
 জয়—জয় উকীল বাবুকি জয়—জয় মহেশজীকি জয়—” এই বলিয়া আকাশ
 প্রতিধ্বনিত করিল। তখন মহেশের বোধ হইল যেন আবার রাত্রিতে শ্মশান
 কালীর মাঠে কৃষক সভাতে সে নিজে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছে আর প্রজারা
 “জয় মহেশজীকি জয়” বলিতেছে।

আসামীর পক্ষে সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে। ব্যারিষ্টার আবার বক্তৃতা
 করিলেন; কিন্তু হেম বাবুর যুক্তি ধ্বংস করিতে পারিলেন না। তৎপরে
 জজ সাহেব উকীল বাবুকে বলিলেন “বাবু, আপনি উল্লেখিত হইয়া আপনার
 বক্তৃতার উপসংহারে ওকালতীর দ্বারা সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আপনাকে
 এইবার সাবধান করিয়া দিয়া জমা করিলাম। নতুনা ‘আদালতের অবজ্ঞা
 করিয়াছেন’ এই অপরাধে আপনাকে দণ্ড দিতাম।” হেম বাবু উত্তর করিলেন,
 “হুজুর আমার দণ্ড হইয়া যদি এই নির্দোষী আসামীর মুক্তি হয় তাহা হইলে আমি
 কৃতজ্ঞ হইব না।” জজ সাহেব বলিলেন অন্য রাত্রি ৮টা হইয়াছে। আর
 কাজ চলিতে পারে না। সেদিন আদালত বন্ধ হইল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

—:~:—

সেবানন্দ স্বামী অনেক সন্ধান করিয়া মায়াকে পাইয়া প্রবোধ বাবুর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। মায়া ও কুমুদিনীকে প্রবোধ বাবুর স্ত্রী আশ্রয় দিলেন। প্রবোধ বাবু সপরিবারে কলিকাতার উপকণ্ঠে তাহার একটা উদ্যান ভবনে বাস করিতেছেন। স্ত্রীরাং এক্ষণে কুমুদিনী ও মায়াও সেই বাটীতে। কুমুদিনী ও মায়ার সুন্দর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া লীলা তাহাদিগকে নিজের ভগ্নীর মত ভাল বাসিয়াছিলেন। লীলা জমিদারের পত্নী, জমিদারের কন্যা, কিন্তু ধনে তাঁহার অহঙ্কার হয় নাই! তিনি গরিব লোককে দূণা করিতেন না; তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ব্রত উপাসনা দি করিতেন এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একটী গরিব লোকের সেবা না করিয়া অন্নগ্রহণ করিতেন না। মায়া ও কুমুদিনীর কষ্টে কিছু উপশম করিবার জন্য লীলা কত চেষ্টা করিতেন, কখন হিন্দু শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম কাহিনী শুনাইতেন; দ্রোপদী, সাবিত্রী, দয়মন্তী, গীতা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের পবিত্রতা, সাহস ও ধৈর্য্য বর্ণনা করিতেন; কখন বা তাহাদিগকে গান শুনাইবার জন্য প্রবোধ বাবুকে অনুরোধ করিতেন। প্রবোধ বাবুর অবসর কম হইলেও এই সমস্তই অবলম্বনের সাহসে আর জন্তু ভজন গাইতেন। কুমুদিনী ও মায়া পাশের গৃহ হইতে তাহা শ্রবণ করিত। সেই মধুর পবিত্র গান শুনিয়া মায়ার চক্ষু দিয়া জল পড়িত। লীলার আন্তরিক স্নেহে, ধর্ম্মোপদেশে, প্রবোধ বাবুর ধর্ম্ম সংসঙ্গীতে এই দুই কৃষক বাল্যেই গভীর অন্ধকারের ভিতরে একটু আলোক দেখিতে পাইল। তাহাদের বোধ হইল জগতে একজন বিপদ-ভঞ্জন আছেন, তিনি অসহায়ের সহায়, দুঃখীর সাহসনা, অন্ধের দৃষ্টি, দরিদ্রের ধন, অশান্তির শান্তি, অনাধিনীর নাথ, নিরুপায়ের উপায়, বিপন্নের সম্বল, ভব সাগরের তরী। তাহার দুইজনে বরাক্ষর পুঙ্খ প্রবোধ বাবু ভাল লোক শুনিয়াছিল মাত্র। তথাপি জমিদার বা ধনীলোক কোমল হৃদয় হইতে পারে, তাহাদের যে দুখিনীর প্রতি এত দয়া, গরিবের প্রতি এত স্নেহ হইতে পারে তাহা তাহার পুঙ্খ জানিত না। জমিদার বলিলেই মায়ার আগে মনে হইত, বড় বড় লাঠি হাতে কালাস্তক লাঠিয়াল পরিবেষ্টিত বাবু—স্বলোদর—সতত ক্রুদ্ধ, নিরন্তর ককণভাষী—জনৈকনির্দয় বাবু বসিয়া আছেন—আর ক্রমাগত “টাকা টাকা” বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে

বলিতেছেন “লাগে মার।” কিন্তু প্রবোধ বাবুকে দেখিয়া এক্ষণে মায়া ও কুমুদিনীর বোধ হইল “ভূমিদার দেবতা, দুর্ভাগ্য লোকরক্ষা করিবার জন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে ভূমি হইতে শস্ত বাহির করিবার সুবিধা দিবার জন্য মূর্ত্তকে জ্ঞান দিবার জন্য, শোকগ্রস্তকে সাহস দিবার জন্য, ভূমিদারের জন্ম।” কুমুদিনী ও মায়ার চিহ্ন বিনোদন জন্য লীলা কখন তাঁহার গাড়ি করিয়া চিড়িয়াখানায়, কখনও যাদুঘরে ইত্যাদি মনোহর স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি দুবিতে পারিতেন স্নেহপ্রাণ। ভগ্নীর, পতিপ্রাণ। কুমুদিনীর তাহা ভাল লাগিত না। তাহার লীলার সঙ্গে নির্জনে বাস করিতে ভাল বাসিত। লীলার একটি দুই বৎসরের পুত্র ছিল। মায়ার মন যখন একটু ভাল থাকিত তখন সে সেই পুত্রটী কোলে করিয়া সোহাগ করিত, চুম্বন করিত, সে দুখক আর নাই দুখক তাহাকে কত মনের কথা বলিত।

গ্রীষ্মকাল অন্ধকার রজনী, আকাশে নিশ্চল, ভারকিত। মায়া একাকিনী আলুনারিত-কেশ। প্রবোধ বাবুর বাটীতে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া উঠে নতো-মণ্ডলের দিকে। তাকাইয়া আছে। দূরস্থিত নক্ষত্রমালার সহিত মায়া সখী পাতাইয়াছিল তাই তাহাদিগকে কি বলিতেছিল—“সখীগণ! এতদিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ, তোমাদের এত ভালবাসি, তোমরা তবু কেন একদিন আমার নিকট আসিলে না। ওখান থেকে, অতদূর থেকে আমার জন্য কি তোমরা কান্দু? শুনেছি ভাল লোক মরিয়া তোমাদের কাছে যায়। আমার বাবাও তোমাদের কাছে গিয়াছেন কি, তোমরা একবার স্পষ্ট করে বল না। আমার বাবা কি তোমাদের কাছে আছেন? আমাকে তবে তোমরা ভুলে নেওনা কেন। তোমরা বাড় নাড়িছ, আমাকে তুলিয়া নিতে পারিবে না? আচ্ছা না পার, তোমরা বলিতে পার, আমার দাদা এক্ষণে কোথায়? কি করিতেছেন? তোমরা বলিতে পার আমার দাদার সঙ্গে কি আর আমার দেখা হবে?”

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল “হবে বৈকি।” মায়া চমকিয়া উঠিল—দেখিল পশ্চাতে লীলাদেবী। লীলা বলিলেন, “মায়া! বাবার প্রজ্ঞত, তোমাকে আমি খুঁজিতেছিলাম।”

মায়া। বৌ কোথায়?

লীলা। বৌ তাহার ওইবার ঘরে। সে খাইবে না। শরীর একটু সামান্য অস্থির করিয়াছে।”

মায়া। আমি আগে বৌকে দেখে আসি।

লীলা । নীল এস ।

যে ঘরে প্রবোধ বাবু বসিয়া লিখিতেছিলেন । লীলা সেই ঘরে আসিলেন ।

লীলা । কি লিখিছ ?

প্রবোধ । মোক্তার মহাশয় লিখিয়াছেন মহেশের বিচার হইয়া গিয়াছে ।
জজ সাহেব অদ্যাপি রাফ্ব দেন নাই ।

লীলা । সে কি রকম ?

প্রবোধ । তাই লিখিতেছি, জজ সাহেব রাফ্ব দিলেই যেন তাহা টেলিগ্রাফ করেন ।

লীলা । মহেশ খানাস হবে কি ?

প্রবোধ । হাকিমদিগের মন কখন কোন দিকে যায় তা বলা যায় না । খানাস হওয়াইত উচিত ।

লীলা । সে দিন নরেশ বাবুর ওখানে যাওয়ায় কোন ফল হইল না । নরেশ কেবল তোমাকে অপমান করিল ।

প্রবোধ । প্রিয়ে, অপমান কি ? অন্তের উপকারের জন্য কিছুর করা যায় তাহাতে অপমান নাই, তা'ত তুমি জান ।

লীলা । তা জানি । তবু তোমাকে তিনি যে কঠিন অন্তায় কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বুকে লাগিয়াছে ।

প্রবোধ । প্রিয়তমে, নরেশের এক্ষণে বুদ্ধিনাশ হইয়াছে ; তাহার কোন কথা এক্ষণে ধরিতে নাই । নরেশ বিপদ সাগরে পড়িয়াছে, আমি ব্যতীত তাহার একজনও নিঃস্বার্থ বন্ধু নাই । আমার কথা শুনিলে সে বোধ হয় রক্ষা পাইত কিন্তু সেদিন আমাকে যে সকল অপমানের কথা বলিতে সাহসী হইয়াছে তাহাতে সে যে আমার কথা আর এক্ষণ শুনিবে তাহা আশা হয় না ।

লীলা । তাহার কি বিপদ ?

প্রবোধ । তাহার সমুদয় জমিদারি বাহির হইয়া জাইতে পারে । অন্ত একটা চক্রান্তে পড়িয়াছে । তাহার নামে শ্রামচাঁদ একটা মিছা মোকদ্দমা করিয়াছে ।

লীলা । কি মোকদ্দমা ?

প্রবোধ । মোকদ্দমার পাপ কথা ক্রীলোকের না শুনাই ভাল ।

লীলা । যে নিজে আপনাকে নষ্ট করিবে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে ?

ঐ যে একতারা বাজাইয়া গান করিতেছে, দুনিয়া সেরানন্দ সামীজী—

একি হোম ভগবান ! তোমার বিধান !
 নাথুজন নিপীড়ন—নাভিছে পরাণে ॥
 দীন কৃষক কারণ, বৃন্নিত যে প্রাণপণ,
 ধরম কোথায় তার, চির নিরাসনে ॥
 এস এস ভাই এস, তুমি প্রাণের মহেশ—
 কোথা যাবে, কেনে সবে, সংসার শাশানে ॥
 কোথা পিতা কোথা জায়া, কোথা তোমার প্রাণের মার।
 ছাড়িয়া সবে যেতেছ কি মহাপ্রস্থানে ॥

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সেবাসন্দ স্বামী আনিয়া প্রবোধ বাবুকে বলিলেন মহেশের দীপান্তরে তরুণ হইরাছে । প্রবোধ বাবু প্রসিদ্ধ অদেশহিউয়ী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ব্যাবিষ্টার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া হাইকোর্টে আপীল করিলেন । মহেশ খালাস হইল, প্রবোধ বাবুর লোক মহেশকে প্রবোধ বাবুর বাসায় আনিয়া । দুঃখিনী কুমুদিনী ও স্নেহময়ী মায়ার সহিত মহেশের দেখা হইল । দুঃখিনীদ্বয়ের আনন্দাশ্রু অবিরল ধারায় বহিতে লাগিল । পরে, প্রবোধ বাবু মহেশকে বলিলেন, “মহেশ ! তোমাকে আমার জমিদারিতে জমি দিব, ঘর করিয়া দিব । মামুদপুর পরগণায় তোমার আর বাস করিবার প্রয়োজন নাই ।”

মহেশ । “আমার কতকগুলি কর্তব্য কাজ আছে তাহা সম্পাদন করিয়া মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিব । আমার কিরিয়া আসিতে যদি বিনয় হয় অনুগ্রহ করিয়া আমার দুঃখিনী স্ত্রী ও শোক-সন্তপ্তা মায়াকে আপনার ও আমার সহধর্মিণীর আশ্রয়ে রাখিবেন । প্রবোধ বাবু মহেশকে অনেক বুঝাইলেন । কিন্তু মহেশ তাহা বুঝিল না ।” করযোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল । প্রবোধ বাবু বলিলেন, “মহেশ, যদি তুমি এক্ষণে মামুদ পরগণায় যাও, চতুর্দিকে তোমার বিপদ । সেখানে যাইও না । তোমাকে দেখিলে প্রজাগণ আবার ফেপিয়া উঠিতে পারে । এদিকে গবর্ণমেন্ট কোল পাঠয়াইছেন । প্রজারা যদি আবার বিদ্রোহী হয়, তাহারা সিপাহির বন্দুকের গুলিতে মনে মনে মারিবে । সম্প্রতি নাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তাহাতে তোমাকে বলিতেছি, তুমি মামুদ পরগণায় এক্ষণ আর যাইও না ।

মহেশ । (কৃতান্তনিপুটে) আমাকে আপনি আর কিছু বলিবেন না । যাইবার অনুমতি দিবেন, যদি পুণ্যবল থাকে, আপনার চরণ আবার দেখিতে পাইব । অনাধিনীদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন ।” প্রবোধ বাবু আর অনুরোধ করিলেন না ।

কুমুদিনী ও মায়া অনেক কান্না কাটি করিল । মহেশ অনমনীয় । তবে প্রবোধ বাবু, লীলা, কুমুদিনী ও মায়ার অনুরোধে মহেশ প্রবোধ বাবুর বাটীতে এক সপ্তাহ মাত্র বাস করিল । কিন্তু মহেশের মনে সুখ নাই, শান্তি নাই—কি যেন সতত ভাবিতেছে । কখন কখন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত । এই সাত দিনের মধ্যে যহু, ভীম ও ষড়ানন ও মোকারিম সেখ কলিকাতায় আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল । মোকারিম বলিল, “ভয় করি না—এবার আমরা রক্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া লড়িব ।” যহু বলিল, “প্রজ্ঞাবা! যে আর যোগ দিবে তাহা বোধ হয় না, আর গুলির মুখে আমরা যে নাটি ধরিয়া লড়াই ফতে করিতে পারিব তাহাও বোধ হয় না ।”

মহেশ বলিল “নায়েব নটবর কোথায় ?—”

যহু । বলিতে পারি না ।

মোকারিম । তাহার গলায় দড়ি দিয়া, রাস্তায় রাস্তায় লইয়া যাওয়ার পর, সে যেখানেই যাইত, মেয়ে ছেনেরা পর্য্যন্ত বলিত ঐ “গলায় দড়ি যায়” তাহার পর সে কোথায় চনিয়া গিয়াছে জানি না ।”

মহেশ । তাহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করার আবশ্যক ।

ভীম । আর যা কতক দিতে হয়, আমার উপর ভার দিলেই শূরকে যা কতক দিবে দিতে পারি ।

মহেশ । ভীম আর ষড়ানন ! তোমাদের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে । তোমরা কলিকাতায় আসিয়া ভাল কর নি । পুলিশ খোঁজ পাইলেই ধরিবে ।

ষড়ানন । তার ঔষধ আছে । কিছু টাকা সঙ্গে আছে । যদি একাত্তাই ধরে দুই এক টাকা না হয় ৫১০০ দিয়া চম্পট দিব । সহজে না হয়, অন্য উপায় আছে ।

মহেশ । যহু, ভীম, ষড়ানন ! আগামী অমাবস্তার রাত্রি দুইটার সময় শ্মশানকালীর মন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে । মা কালীর আদেশ নিয়ে, বাহির হয় সেখানে বলিব । মোকারিম ! ঐ রাত্রি চারিটার সময় তোমার গ্রামের

মসজিদের পিছনে যে বন আছে সেখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

এই কথাবার্তার পর, মোকারিম, যহু, তীম, ষড়ানন, সকলেই চলিয়া গেল। সেখানে কথা হইতেছিল তাহার পাশের ঘর হইতে একটি কুশাঙ্গী তরুণী সমুদয় শুনিতোছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রজনী গভীর। মায়া নিদ্রিত। কুমুদিনী জাগিয়া আছে। সে একটি কিসের শব্দ শুনিতে পাইয়া উঠিল। দেখিল, আস্তে আস্তে মহেশ সে ঘরে প্রবেশ করিল।

মহেশ। তুমি ঘুমাও নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমরা দুইজনে ঘুমাইয়াছ। তোমরা ঘুমাইয়া থাকিতে থাকিতে, তোমাদের দুই জনের মুখ আর একবার দেখিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। মায়া কই?

কুমুদিনী। ঐ শুইয়া আছে।

মহেশ নতজানু হইয়া ভগ্নীকে দেখিল। তার পর উজ্জ্বল ভাষায় হাতজোড় করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, “মা কালি যেন এই বালিকার আর কোন বিপদ না হয়।” মহেশের চক্ষের দুই ফোটা জল মায়ার মুখের উপর পড়িল। মায়া নিদ্রিত, জানিল না।

মহেশ কুমুদিনীকে বলিল, “তুমি পাশের ঘরে এস। এখানে কথার কথায় শব্দে মায়া জাগিয়া উঠিতে পারে।”

মহেশ ও কুমুদিনী পাশের ঘরে যাইল।

কুমুদিনী কাদিয়া মহেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল “হৃদয়েশ্বর, আবাক কোথায় যাইবে—আমার আর মায়ার যে আর কেহ নাই—”

মহেশ কুমুদিনীকে বুকে টানিয়া তাহার অশ্রুপূর্ণ রাজীবলোচন চুম্বন করিল। দুইজনে কণকাল নিস্তর।

কুমুদিনী আবার বলিল। একবার এ দাসীর কথা না শুনিয়া কত বিপদে পড়েছিল। আমি তোমার পাশ পড়ি—আর প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে যেওনা, আমাদের দুজনকে অনাথিনী করে ভাসিয়ে দিওনা।

মহেশ। যাকরেন মা কালী। আমি হযত দু মাসের মধ্যে আবার ফিরে আসব।

কুমুদিনী । না না । আমরা দুজনে তোমাকে ছেড়ে দেব না—আমাতে আর মায়াতে তোমাকে ধরে রাখব—মায়া—মায়া—

মায়া অপর গৃহ হইতে নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিল—“কি বো ?”

মহেশ কুমুদিনীকে আর একবার চূপন করিয়া ক্রতবেগে চলিয়া গেল । মায়া ঐ ঘরে দৌড়িয়া আসিল ।

মায়া । বো কি হয়েছে ।

কুমুদিনী । আর কি হবে ? তোর দাদা বুঝি এবার চিরকালের জন্য চলে গেল ।

কুমুদিনী আর মায়া দুইজনে নীরবে বসিয়া পরস্পরকে ধরিয়া কাঁদিয়া রজনী অতিবাহিত করিল ।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

এদিকে মহেশ কপিকাতা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল । নিজের গ্রামে গিয়া ভদ্রাসন রাটী খুঁজিল । তাহার চিহ্নমাত্রও নাই । জমিদারের লোক মহেশের ভিটা চষিয়া এক্ষণে ধান বুনিয়াছে । মহেশ—নটবর কোথায় সন্ধান করিতে লাগিল । খোঁজ পাইল । একদিনের পথ দূরে রাজাপুর নামক পল্লীগ্রামে সে বাস করিতেছে । সে এক্ষণে কেঁটা কাটে, নামাবলী গায় দেয় এবং শিষ্যদিগকে মন্ত্রও দেয় । কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয় না । কেবল ভোল ফিরাইয়াছে মাত্র । একদিন অপরাহ্নে নটবর মাঠ দিয়া গ্রামে আসিতেছে, এমন সময়ে দেবে তাহার সম্মুখে একজন বীরপুরুষ । বীরপুরুষ বলিল, “চিনিতে পার নায়েব ?” মহেশের চেহারা কয়েক থাকার সময় হইতে এত পরিবর্তন হইয়াছে যে নটবর প্রথমে স্বার্থই তাহাকে চিনিতে পারে নাই ।

নটবর চমকাইয়া বলিল, “কেণ্ডা তুমি—হরে কুম্, কুম্, কুম্ ।”

মহেশ । আমি তোমার যম ।

নটবর ! খুন করিবি নাকি ?

মহেশ । যা করিব দেখ । এই এক গাছা লাঠি ধর—পাষও ! তুই জানিস না—সে যখন মহেশের পরিবারের হাত ধরেছিলি, তখনই তুই যমের বাড়ী গিছি।—সে, লাঠি ধর—পারিন্ত জীবন রক্ষা কর ।

নটবর । তুই আমার বাবা, আমি নিরীহ বৈষ্ণব, চৌদ্দপুরুষে আমি কখন নায়েবী করিনি । আমি নটবর নহি—আমি কৃষ্ণদাস বাবাজী—

মহেশ । কৃষ্ণদাস ! তুই মহেশের বাপ হারাধনকে খুন করিছিলি—কাছারিতে—হুকুম দিয়ে । মনে নাই ? মহেশ জীবিত থাকিতে মহেশের সতী সাধ্বী স্ত্রীকে ছুইছিলি—তাহার পিতাকে খুন করেছিলি—আর তোর একগুণও জীবনের আশা আছে ?

নটবর । তুমি আমার বাবা, আমাকে খুন করে না । আমি বৈষ্ণব, আমি নটবর নহি ।

মহেশ । মিছে ক'রে আর পাপ বাড়ান্ধিস্ কেন ? মরদের মত লাঠি ধর, না হয় ত এইরূপ লাথির ঘাতে তোকে কাঁচক বধ ক'র্নো । (মহেশ তাহাকে তাহার নাগরা জুতার এক লাথি মারিল) ।

নটবর । বাবা মহেশ । তোর—পায়—ধরি, আর মারিস না । আমি নটবর—আমাকে ক্ষমা কর—চিরকাল তোর গোলাম হ'য়ে থাকুব ।

মহেশ । লাঠি নে, তা নৈলে আবার এক লাথি ধাবি ।

নটবর অগত্যা লাঠি নিল । মহেশকে মারিতে লাগিল । মহেশ প্রথমে কেবল ঠেকাইতে লাগিল । নটবরের কান্নাতে তার কেমন যেন একটা দয়া হইতেছিল, তাই মনে করিতেছিল যে, একটা জীবহত্যা করিব কি ? হিন্দুর প্রাণ—যদি স্বর্ণাগতের হাজার অপরাধ থাকে, তবু তার ক্রন্দন শুনিলে মনটা কেমন নরম হইয়া যায় । কিন্তু হারাধনের যন্ত্রণা আর কুমুদিনীর কেশাকর্ষণ যখন মনে হইল, তখন মহেশ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “না, না, এ পাপের ক্ষমা নাই—পায়ও পরিম্ ত প্রাণ রক্ষা কর—” মহেশ প্রচণ্ডবেগে দুইবার ষষ্টি প্রহার করিল । নটবর ধরাশায়ী, মহেশের চক্ষু কপালে—“ওরে নরাধম—যা যমালয়ে” বলিয়া—যেমন ষষ্টি উত্তোলন করিয়াছে, অমনি একজন ছুটিয়া আসিয়া, তাহার লাঠি ধরিল ।

মহেশ দেখিল, সেবানন্দ স্বামী । বলিল—“ঠাকুর তুমিকেন লাঠি ধরিলে । ছাড়—”

সেবানন্দ স্বামী । না, ছাড়িব না, ক্রোধবশতঃ নরহত্যা করা মহাপাপ । ভেয়াকে সেই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত আমি আসিয়াছি ।

মহেশ । স্বামীজী কি ক'র্নলেন ?

ইতিমধ্যে আর দুই জন সন্ন্যাসী আসিয়া মহেশকে ধক্কে করিয়া কোথায়

লইয়া চলিল। সেদানন্দ সামী নিকটবর্তী জলাশয় হইতে জল আনয়ন করিয়া নট-বরের মুখে দিলেন, রক্ত ধোত করিয়া দিলেন এবং আর একজন সন্ন্যাসীর সাহায্যে নিকটবর্তী একটি কুটীরে তাহাকে লইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

নরেশ বাবু উইলের মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার ভাগিনেয়—শ্রামচাঁদ জমিদারিতে দখল পাইয়াছে। তাঁহাকে উইলে যে ২০০ টাকা দিবার মত ছিল, সে টাকা তিনি হুণায় লন নাই। মোকদ্দমার খরচার নরেশের হাতে এখন কিছু টাকা নাই। নরেশ কলিকাতায় একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাসায় বসিয়া ভাবিতেছেন। “কি আশ্চর্য্য। বিপদে স্ত্রীও কেহ নয়। আমি তাহাকে যাহা দিয়াছিলাম—টাকা গহনা লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল—এখন আর খবরও নয় না—আমার খাওয়া হইতেছে না, তাহা লিখিয়া কিছু টাকা প্রার্থাইতে পত্র লিখিলাম, উত্তর দিল না। কি সয়তানী—এতদিন বুঝি নাই। বাসা ভাড়া কম মাসের বাকী। বাজার খরচ জন্ত চাকর চাকরাণীর কাছে আর কত ধার পাওয়া যায়। সব বন্ধদের দেখলাম। যতদিন টাকা ছিল, ততদিন তারা খোসামোদ ক’রেছিল। বাবা বলেছিলেন—“নরেশ! প্রবোধের কথা শুনি।” পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম। ঐ সর্বনাশিনী স্ত্রীর কথায় প্রবোধ বাবুর সঙ্গে ক’গড়া কর্লেম। অকারণে তাকে অপমান কর্লেম। তিনি সাহসী পুরুষ হইয়া প্রতিশোধ লইলেন না। কেবল বলিলেন, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে”—অনেক দুঃখই হ—যে পিশাচী স্ত্রীর জন্ত এমন বন্ধুর কথা পায়। ঠেলিয়াছিলাম সে পিশাচী এখন কোথা?—প্রবোধ বাবুর কাছে কিছু টাকা ধার চাব? না, ম’রে গেলেও তা পার্কে না। আমি এক পয়সার মুড়ি খেয়ে থাকিব। কিন্তু চাকর চাকরাণী খাবে কি? ভিক্ষা করিতে যাব? না, না; তা পার্কে না। জমিদার ভূপেশের পুত্র ভিক্ষা ক’র্কে? না—আত্মহত্যা—রং সেও ভাল। সন্ন্যাসীটা আসে যায়—সন্ন্যাসী হই না কেন? সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আমার সংবাদ লয়। ও শ্রামচাঁদের চর নহে ত? এমন সময় একতারার সঙ্গে গুণ গুণ করে গান করিতে করিতে কে আসিতেছে—

গান ।

কেন উচাটন মন, লওরে শব্দন,
সেই কমল চরণে ।
গুরুপদেশধর, বুঝা চিন্তা আশা ছাড়,
পাবে সুখশান্তি মনে ॥
নিকাম করম কর, ভজরে পরমেশ্বর,
ভক্তিময় আরাধনে ।
সবে ডাকিছেন মাতা, এস সব স্মৃত স্মৃতা,
লইবেন কোলে তুলে,
অপরধী সন্তানে ।

—*—

স্বামী স্ত্রীর বিবাদে সোলে নিষ্পত্তি ।

শ্রীবুদ্ধ নবপ্রভা সম্পাদক মহাশয়

সম্মীপেষু ।

মহাশয় ;

“কার দোষ” বিচার করিবার জন্ত নবপ্রভার পাঠকগণের সম্মুখে মর্কন্দের নথি পেশ করিয়াছেন । মর্কন্দেরাটি বাস্তবিকই বড় সন্ধান । এ প্রকার গৃহ বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । আনি তদতিপ্রায়ে একটা বর্ণনা পত্র দাখিল করিলাম, আমি সাহিত্য আদালতের জুনিয়র উকীল । আমাদের বর্ণনা পত্র আপনার মত প্রবীণ উকীলের অনুমোদিত হইলেই চরিতার্থ হইব ।

নিবেদনমিতি ।

শ্রীঅতুল চন্দ্র সিংহ ।

মিনতি ।—

ক্ষমা কর, সতি লজ্জি, হয়েছে কসুর ।
বাঁহবারি গেছে হয়ে, সব দোষ পাঁশরিয়ে
সর্বনেশে বান্ধুয়ানা করে দাগ দূর ।
ক্ষমা কর সতি লজ্জি হয়েছে কসুর ।

২

হুটে উচিত শিক্ষা, পায়ে ধরি কর রক্ষা,
সোণার সংসার নয়, হয়ে যায় চুর ।
হুটেছে এখন চোখ, মিটেছে সাপের ঝোঁক,
আঁকেন সেলামী সব পেয়েছি প্রচুর ।
কমা কর সতি লক্ষি হয়েছে কসুর ।

৩

ছাড় ছাই বেশ ভূষা, দিনরাত মাজা ঘসা,
দিনে ভ'ল' বার দেখা মোহন মুকুর ।
গাউন বডিস ছাড়ি, পর দিবা পেড়ে সাড়ী,
অনুপের চুড়ী-গুনা ভেঙ্গে কর চুর ।
কমা কর সতি লক্ষি হয়েছে কসুর ।

৪

লাল হাতে লাল শাঁখা, কিবা শোভা হবে বীকা,
ঘোমটা টানিয়া দাও মুখে স্নমধুর ।
গিঁথিতে নিকর পর, সরম ধরম ধর,
সতী লক্ষী হয়ে আলো কর অস্ত্রপূর ।
কমা কর সতি লক্ষি হয়েছে কসুর ।

৫

হাঁই তুলে, পাশ ফিরে, বিছানার থেকে পড়ে,
বুখা ক্ষর করোনাক প্রভাত মধুর ।
ছড়া ঝারা, দীপদান, কর ফিরে অনুষ্ঠান,
হউক আবার লাভ লক্ষী সুপ্রচুর ।
কমা কর সতি লক্ষি হয়েছে কসুর ।

৬

কাজ নাই শিল্পকর্মে, ছাড়ি সব নারীবর্মে,
করোনাক জন্মটাকে বেয়াড়া বেসুর ।
গৃহস্থের ধর্ম রাখ, দয়া মায়া, সেবা শেখ,
পুণ্যাশ্রম হোক পুনঃ লক্ষীদীন পুর ।
কমা কর সতি লক্ষি হয়েছে কসুর ।

৭

লজ্জা ভর ভক্তি সেবা, জীলোকের নি পাভা,
মন দিলে শেখ সব হইবে মধুর ।
বার, ব্রত, উপবাস, বস্ত্রে পাল বার মাস,
আচার বিচার গুলা করোনাক দূর ।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর ।

৮

কল্যাণি, কল্যাণে তব হোক পুনঃ আবির্ভাব,
ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা, আনন্দ প্রচুর ।
দেখিয়া জুড়াক চোখ, দূরে থাক ছুঃখ শোক
পাত দেখি ফিরে সেই সংসার মধুর ।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ ।

মেঘদূত ।

খ । কাব্যে ভৌগোলিক বিবরণ ।

(৫) কুরুক্ষেত্র বা পাণিপতের সমভূমি ।

(i) “ব্রহ্মাবর্তং জনপদম্” “কৌরবং ক্ষেত্রং” (৫২ শ্লোক) ।

কবি এখন মেঘকে দশপুর হইতে একেবারে শত শত মাইল উত্তর পূর্বে
ব্রহ্মাবর্তে যাইতে বলিতেছেন । ব্রহ্মাবর্ত ও কুরুক্ষেত্র উভয়ই পাঠকের
সুপরিচিত । দৃশদত্তী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী দেশ, ব্রহ্মাবর্ত (মনু, ২।১৭) ;
পুনশ্চ ব্রহ্মাবর্তে, কুরুক্ষেত্র মংস্ত্র পাঞ্চাল ও শূরসেন দেশ অন্তর্গত (মনু,
২।১৯) । মহাভারত বনপর্ক ও শলাপর্কে কুরুক্ষেত্রের সীমানা অনেকটা
ব্রহ্মাবর্তের সঙ্গে মিলে । কুরুক্ষেত্র আধুনিক বাণেশ্বরের চতুর্দর্শ বেষ্টিয়া প্রায়
৪০ ক্রোশ ব্যাপ্ত । অত্যাশ্চর্য তীর্থের মধ্যে ব্রহ্মাসর বা রামহ্রদ জটব্য ; ইহা
৩৫৪৬ ফুট লম্বা ও ১৯০০ ফুট চোড়া । [Arch. Surv. India Vol. II
pp. 217-8]

(ii) “সারস্বতীনাং” (৩৫ শ্লোক) ।

সরস্বতী নদী সর্বপ্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ । আধুনিক সরস্বতী নদী সারমুর করদরাজ্যে উত্তর ইটরা (অক্ষাংশ ৩০ । ২৩, দ্রাঘিমাংশ ৭৭ । ১৯) অধাগার নিকটে দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম গহিতে স্থানেন্দ্রের পদ ধৌত করতঃ কুরুক্ষেত্রের শত ২ তীর্থ স্থানের মধ্য দিয়া যায় । তৎপরে কর্ণাল জেলার ও পাতিয়ালা করদরাজ্য পার হইয়া স্থানে স্থানে বালুকার অন্তর্ধান হওত শির্ষা ভেলায় ঝাগর নদীতে পড়িয়াছে । সরস্বতীর তটে বহু পবিত্র তীর্থ, এত তীর্থ গঙ্গা বাতীত আর কোন নদীতে নাই । মহাভারত বনপর্ক সেই সব তীর্থের নামে পূর্ণ । কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্যে প্রায় ২০০ তীর্থের নাম আছে ; সাধারণ প্রবাদ যে সরস্বতীর তীরে তিনশত ষাট (৩৬০) তীর্থ আছে ।

৬ । মধ্য হিমালয় গিরিপুঞ্জ ।

(i) “অনু-কনখলং” “জহ্নো : কন্যাং” (৫৪ শ্লোক) ।

কুরুক্ষেত্র হইতে কঞ্চল উত্তর পূর্ব, একশ মাইলের কিঞ্চিদূর দূরে । কঞ্চল, তুহতরে মায়াপুর, তুহতরে হরিদ্বার, এই ভাবে ক্রমশঃ গঙ্গার ধারে বিস্তৃত । সাধারণতঃ হরিদ্বারের নামই বিখ্যাত । কিন্তু কঞ্চলও খুব প্রাচীন ; মহাভারতে ও হরিবংশে ইহার উল্লেখ আছে । কঞ্চল ও মায়াপুর গঙ্গার ডানদিকে ; হরিদ্বার গঙ্গার বামদিকে ।

হরিদ্বারের অপর নাম গঙ্গাদ্বার । এখানে “মাতর্গঙ্গ” ত্রিধারা হইয়া শিখালিক পর্বত ঘাটি হইতে সমভূমিতে নাবিতেছেন । হরিকা পরগৌ বাটও তন্মিলে “গঙ্গাদ্বার” মন্দির এই পবিত্র স্থানকে চিহ্ন করিয়াছে । উপরিউক্ত ঘাট প্রসিদ্ধ হইলেও আকারে ছোট ; মাথার ৩৪ ফুট চৌড়া, জলে ৮৯ ফুট চৌড়া ও সর্বশুদ্ধ জল পর্য্যন্ত মোট ৩৯টি ধাপ [Arch. Surv. India, Vol. II. p. 235]

(ii) “তস্তা এব প্রভবনচলং” (৫৬ শ্লোকঃ) ।

তার পরে মেষ ক্রমশঃ উত্তর (অল্প পশ্চিম) হইয়া ক্রমশঃ উঠিতে উঠিতে গঙ্গোত্রীতে আসিবে । গঙ্গোত্রী গঙ্গার দৃষ্ট উৎপত্তি স্থান ; এইখানে উচ্চ পর্বত মালা মধ্যে প্রকাণ্ড তুহিন রাশির ভিতর হইতে মূল নদী বাহির হইয়াছে । ইহা গাড়ওয়াল প্রদেশে, হরিদ্বার হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে, ৩০।৫৯ অক্ষাংশ, ৭৮০ । ৫৯ দ্রাঘিমাংশ । গঙ্গোত্রীর উচ্চতা প্রায় ১০,৩১৯ ফুট । তথায় গঙ্গামূর্তি বুদ্ধ ২০ ফুট উচ্চ একটি মন্দির আছে ।

এখানে প্রকৃতি দেবী তাঁহার বিরাট মূর্তিতে বিদ্যমান—ছইধারে “ভূবাইরঃ গোরং” গিরি রাশি ; মধ্যে দীর্ঘ জমাট বরফ নদী ; দূরে ঘন ভূষরাবৃত্ত ওল্ল শিখরের পর শিখর ; নীচে কলকল নাদে গঙ্গাদেবী উপলখণ্ডের উপর প্রাবিভা । দৃশ্য কি মহান্ !

(iii) “চরণস্থানমর্কেন্দু নৌলেঃ” (৫৯ শ্লোক) ।

ক্রমশঃ উচ্চ উঠিয়া পর্বতের গায় শিবচরণ স্থান দেখিবে, তাহাকে শঙ্কার সহিত পারিক্রমণ করিতে কবি বলিতেছেন । এই স্থান এখনও চিহ্ন হয় নাই । ইহা কি বদরিনাথের শিখর ?

(iv) “প্রালেয়াদ্রেঃ” “হংসদ্বারম” “ক্রৌঞ্চরকুম্” (৬১ শ্লোক) ।

হিমাদ্রির উপতট ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মানস-সরোবরে হংসগণের বাইবার দ্বার ক্রৌঞ্চরকুকে প্রাপ্ত হইবে । এই ক্রৌঞ্চরকু শাস্ত্রী মহাশয় ঐতিহাসিকের সহিত চিহ্ন করিয়াছেন । (পৃঃ ৪৫) । এই চিহ্ন ঠিক বোধ হয়, কেন না হিমালয়ের এই ভাগে যতটা ঘাটি আছে তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘাটিটাই নিম্নতম, (১৬৬৭৬ ফুট উচ্চ), ও সহজগম্য । তিব্বত ও পূর্ব তুর্কিস্থান হইতে বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ অনেকটা এই ঘাটি দিয়া ভারতে যাতায়াত করে ।

হিমালয় পর্বত গিরিমালায় পরিপূর্ণ । ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদেরা হিমালয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ;—

১ । উত্তর (উঃ পশ্চিম) গিরিপুঞ্জ (Northern range) ।

২ । মধ্য গিরিপুঞ্জ (Central range) ।

৩ । পূর্ব গিরিপুঞ্জ (Eastern range) ।

সে পথ দিয়া কবি মেঘকে যাইতে বলিতেছেন, সে পথ মধ্যে গিরিপুঞ্জ ও তৎপাদদেশীয় সিওয়ালিক পুঞ্জ (Siwalic Range) ভিতর দিয়া গিয়াছে । অতঃ ছই পুঞ্জর অপেক্ষা এই গিরিমাল্য ভুলনায় কিছু কম উচ্চ হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মহত্তায় কোন অংশে নূন নহে । ইহার সর্বোচ্চ শিখর নন্দদেবী ২৫৭৪৯ ফুট উচ্চ ।

৭ । কৈলাস গিরিপুঞ্জ ।

(i) “কৈলাসস্থ” (৬২ শ্লোক) ।

“কৈলাসায়” (১১ শ্লোক) ।

হিমালয় পার হইয়া উত্তরে ও উঃ দিগে দেখা যাবে আর এক গিরি শ্রেণী

আছে । সেই শ্রেণী মানস-সরোবর হ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য গিরিপুঞ্জের সহিত অনেকটা সমান্তরাল ভাবে (parallel) গিয়াছে । উভয়ের মধ্যে শতদ্রু (Sutledge) নদী অবিত্যকার পয়ঃ নিসারণ করত প্রায় ২৮০ মাইল উত্তর পশ্চিম গিয়া পুনশ্চ দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে । এই অবিত্যকা ও গিরিপুঞ্জ কৈলাস নামে প্রসিদ্ধ । কনিংহাম সাহেবের মতে কৈলাস ৫৫০ মাইল লম্বা ও অত্যুচ্চ শিখরাবলীতে পূর্ণ । ইহার শৃঙ্গগুলি সাধারণতঃ ১৬০০০ হইতে ২০০০০ ফুটের অধিক উচ্চ । ইহার উত্তর পশ্চিমাংশ উত্তর হিমালয় গিরিপুঞ্জের সহিত মিশিয়াছে ও সেইখানে সিন্ধুনদী এক গভীর ও ভয়ঙ্কর ঘাটিতে এই পুঞ্জকে পার হইয়াছে ।

(ii) “মানসজ” (৬৬ শ্লোক) ।

“মানসোৎকা” (১১ শ্লোক) ।

“মানসং” (৮২ শ্লোক) ।

মানস সরোবর কৈলাসের সর্ব দক্ষিণ পূর্বকোণে অবস্থিত ও শতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থান । ইহার উত্তরে কৈলাস পুঞ্জ আরম্ভ । কৈলাসের শিখরে কুবের রাজধানী অলকা বিদ্যমান এই রূপ পৌরাণিক উক্তি ।

এতদ্ব্যতীত ৫৫ শ্লোকে “যমুনাসঙ্গম” অর্থাৎ প্রয়াগের উল্লেখ আছে । প্রয়াগ পাঠকের সুপরিচিত থাকায় কোন বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যকতা হয় না ।

শ্রীমদ্রোহন চক্রবর্তী ।

শ্রদ্ধা ।

পূর্ণ রৌবনের কান্তি সর্বত্র ব্যাপিয়া,
উছলিয়া পড়িতেছে ঝলকে ঝলিয়া !
অক্ষর মাধুর্য্য রেখা পেলব সুবস,
শ্রদ্ধায় করেছে বিশ্বে যেন নিরুপমা !
চরণে অরক্ত রাগ মুখে মৃদুহাসি,
চিকণ অধরে করে অমৃতের রাশি,

কটাক্ষে দামিনী বাঁধা, অঁখির সরমে
 প্রেমের তরঙ্গ দোলে নির্মল মরমে ।
 নৃত্যের সংযত কলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
 অর্ধ নৃত্য লইয়াছে চরণ গাঠিয়া,
 ভুরুর বলনী আর কুন্তলের নীলা,
 প্রসাধিত হস্তে বিধি বতনে নির্মলা;
 রূপোপরি সরলতা কমনে নীহার
 যৌবনে উচ্ছ্বাস নব, বীণার স্বকার ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী ।

কাটোয়ার পথে ।

(সত্য গল্প)

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

পরাণের কথা শেষ হইলে বাবু বলিলেন “আমরা কর্জনা মাঠের প্রায় তের আনা অংশ অতিক্রম করিয়াছি । বেলা আর অধিক নাই, বনদ দুইটা ক্লাস্ত হইয়াছে দেখিতেছি, আমাদেরও সমস্ত দিবস আহাৰাদি হয় নাই, অতএব শীঘ্রই বিশ্রাম লাভের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে ।” সেই মাঠের পথের ধারে কতকগুলো অশ্বখ বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের তলে একটা ক্ষুদ্র দোকান দেখা গেল । সে দেশে এরূপ ক্ষুদ্র দোকানকে “চটি” বলে । চটিতে মুড়ি, মুড়কী, চিড়ে, গুড়, খই, নবাত, পাটালী, বাতাসা, মোরা, চাউল, ডাউল প্রভৃতি পাওয়া যায় । রাস্তার বাম পার্শ্বে চটি এবং রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে দোকানদারের একখানি খালি ঘর ছিল, আমরা ডাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ঐ খালি ঘর খানি অধিকার করিলাম । বহুসংখ্যক পথিক একত্র না হইলে এই চটিতে প্রায় কেহই থাকিত না, কিন্তু আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া চারি জনে ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া আহাৰাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম ।

আমরা রাঢ় দেশের প্রথা মত বাহা পাক করিলাম, তাহা এই ; রাস্তা রাস্তা মোটা মোটা চাউলের ভাত, কাঁচা আমের সঙ্গে খাড়ি মণ্ডরীর লাল ডাল, বার্তাকু দধি, আলু সিদ্ধ এবং পটোল ভাজা । সমস্ত দিন আহাৰ হয় নাই, ক্ষুধায় মুকলেরই পেট জলিতেছিল, সুতরাং এই “টকো” ডালের সঙ্গে রাঢ়দেশের চাউলের ভাত খুব তৃপ্তির সহিত পেট ভরিয়া আহাৰ করিলাম । সেরূপ তৃপ্তি

অনেক সময়ে অনেক রাজার হয় কি না সন্দেহ । রাতে আমাদের কোনও বিপদ হয় না । আমরা খুব ভোরের সময় উঠি। চটি ধারে খেঁজোখো নারী ক্ষুদ্র নদীতে মুখ তাত ধুইয়া বলদ শকটে আরোহণ পূর্বক আবার গমন করিতে আরম্ভ করিলাম ।

আমরা অনেকদূর চলিয়া গেলে পর, বাবু কহিলেন “কর্জ্জণা মাঠ এখানে শেষ হইল ।” ‘কর্জ্জণার মাঠ’ শেষ হইল বটে, কিন্তু মাঠের শেষ হইল না । চারিদিক চাহিয়া দেখি—কেবল মাঠ, আর মাঠ !! চারি দিকই কেবল ধূ ধূ করিতেছে । ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, আমি বাবুকে কহিলাম “মহাশয় ! গরুর গাড়ীর ক্রমাগত হেলনে ও ছলনে আমার শরীরে ব্যথা বোধ হইতেছে, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিরদূর পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা করি ।” বাবু তাহাতে সন্মত হইয়া কহিলেন “যদি পায়ে হাঁটরা ঘাটতে কষ্ট বোধ না কর, তাহা হইলে কিছু দূর চলিয়া যাও, কিন্তু রোজ খুব ভরানক, ছাতা সঙ্গে লইয়া যাও ।” আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং পরাণ বাঙ্গদীকে আমার বায়গায় বসাইয়া দিলাম । গাড়ী হইতে নামিবার সময় ছাতা ও “গুপ্তি” সঙ্গে লইয়াছিলাম । অনেক পাঠক ও পাঠিকা হয়ত গুপ্তি কিরূপ তাহা জানেন না । বাশের বা কার্ঠের লাঠির ভিতরে খুব শাণিত পাতলা তরবারি লুকায়িত থাকে, এই তরবারিকে কিরিচ্ কহে । বাহির হইতে দেখিলে গুপ্তিকে লাঠি বলিয়াই ভ্রম হয়, বস্তুতঃ ইহা দ্বারা লাঠি এবং তরবারী এতদুভয়ের কার্যই সম্পন্ন হয় । কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আমি ঐ কিরিচ্কে খুব পরীক্ষার করিয়া এবং তাহাতে নারিকেল তৈল দিয়া মালিশ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম । এক হাতে গুপ্তি এবং আর এক হাতে ছাতা লইয়া আমি পদব্রজে চলিতে লাগিলাম । তখন আমার বয়স অল্প, চলিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল । মানুষের চলনের সঙ্গে গরুর গাড়ী কখনই চলিতে পারে না ; দেখিতে দেখিতে আমি বহুদূরে গিয়া উপস্থিত হইলাম ; গাড়ীখানা একেবারে দৃষ্টির বাহির হইয়া পড়িল । চলিতে চলিতে সম্মুখে একটা খুব বড় দীঘি দৃষ্টিপথে পুতিত হইল, সেই দীঘির পাহাড় খুব উচ্চ, ঐ পাহাড়ের চারিদিক ঘন তালগাছের শ্রেণীতে পরিপূর্ণ । এই দীঘির গর্ভ ভয়ঙ্কর স্থান, ইহাও দম্মাদিগের একটা প্রধান আড্ডা, এখানে সচরাচর পথিকেরা নিহত বা হতসর্কস্ব হইয়া থাকে । আমি দীঘির পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলাম, দীঘির এ পার হইতে দুপার সহজে নজর হয় না । পাহাড়ের নীচে নামিয়া যাবে ধারে যে সঙ্গীর্ণ পথ আছে, তাহাই অবলম্বন

করিয়া বাইতে হয়, নীচে নামিলে মন নির্জল ও ভয়ঙ্কর বোধ হয় নে, তথা হইতে ২৫ জন লোক একত্র চীৎকার করিলেও বাহিরের লোক তাহা সহজে অন্তরে পায় না । দীঘি যেমন বড় তেমনি গভীর ; গ্রীষ্মকাল বন্যতঃ, বিশেষতঃ বহুবিনয় বৃষ্টি না হওয়ায়, দীঘির প্রায় দশ আনা জল শুকাইয়া গিয়াছিল । আমি দীঘি পার হইয়া অপর পারে উঠিলাম ; ভগবানের কৃপায় দীঘির ভিতরে কোনও বিপদ উপস্থিত হয় নাই । অপর পারে উঠিয়া একবারে একটা সুবৃহৎ অশ্বখ বৃক্ষ দেখিয়া তাহারই স্নানার্থে ছায়ায় উপবেশন করিলাম । একটা গামোছার মুড়ি, মুড়কী, সন্দেশ ও পক্ক কদলী বাধা ছিল, তাহাই খুলিয়া ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । সে গুলি খাওয়া হইলে দীঘির ঘাটে নামিয়া দুইটি অঞ্জলির সাহায্যে দীঘির উত্তম সলিল পান করিলাম এবং তাহার পরে পুনরায় সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশনপূর্বক গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম । কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বোধ হইল যেন, বৃক্ষের কোনও শাখার শকুনি প্রভৃতি বৃন্দাকার পক্ষীরা বসিয়া শাখাকে সজোরে হেলাইতেছে ও দোলাইতেছে । এবং তজ্জন্ত পাতায় পাতায় ঘর্ষণ হইয়া পুনঃ পুনঃ শব্দ হইতেছে । উর্দ্ধ শাখার দিকে খুব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, বৃক্ষে একটিও পক্ষী নাই, কিন্তু একটা ভয়ানক কৃষ্ণাকৃতি এবং বিপুলদণ্ড বলবান ব্যক্তি সেই গাছের উপর হইতে নীচের দিকে নামিতেছে । তাহার মাথায় খুব ঘন কালো চুল, গলার মোটা রুদ্রাক্ষ মালা, গোপ খুব প্রকাণ্ড এবং দাড়ী খুব দীর্ঘ । তাহার হাতে বাশের মোটা লাঠি । লোকটাকে দেখিলেই ভয় উপস্থিত হয় । যাহা হউক তাহাকে নামিতে দেখিয়া, আমি অতি শীঘ্র সে স্থান পরিত্যাগ পূর্বক একটু দূরে আর একটা বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইলাম, উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, সে বৃক্ষের উপরে কোনও দৃশ্য ছিল না । দীঘির পাহাড় হইতে পলাইয়া বাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, এরূপ বলবান দৃশ্যের সম্মুখ হইতে আমি কতক্ষণ পর্যন্ত দৌড়িয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি ? এক লক্ষ্যেই এ ব্যক্তি আমাকে হস্তগত করিবে । আমি সাহসে নির্ভর করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম । দৃশ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “ওরে ! তোর নাম কি ? তুই যাবি কোথায় ? আমি বলিলাম “আমি পথিক ; কাটোয়ার দিকে বাইতেছি ।” দৃশ্য কহিল “তোকে আর কাটোয়া যেতে হবে না, এই দীঘির জলে তোকে কাটোয়া দেখাইয়া দিব । তোর মাথা কাটাইয়া এই দীঘির ভিতরে তোকে পুতিয়া রাখিব । তোর সঙ্গে কি আছে বল ?” আমি কহিলাম “আমার সঙ্গে

মুড়ি, মুড়কি আছে, আর পাকা কুলা আছে, তুই খাবি কি ?” দম্ভা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল “তোমার সঙ্গে কি আছে বল, নতুবা আমার হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চয় ।” “আমার সঙ্গে কিছু নাই” শুনিয়া ডাকাইত কহিল “ওরে ! তোমার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি, আমি এক লাঠিতেই তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব । শীঘ্র শীঘ্র টাকা বাহির করিয়া দে ; নতুবা আমার হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চয় ।” এই রূপে লোকটা মুখের দ্বারা অনেক ভয় দেখাইতে লাগিল, অনেক কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, কিন্তু একটি পদও অগ্রসর হইয়া আমার নিকটে আসিল না বা আসিতে পারিল না । আমি মনে মনে ভাবিলাম, হাতীর তুলনায় পিপোলিকা বেরূপ, এই দম্ভার তুলনায় আমি সেইরূপ, এ ব্যক্তি মনে করিলে মুহূর্তকাল মধ্যে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে ; কিন্তু তাহা না করিয়া এ ব্যক্তি কেবল মুখে ভয় দেখাইতেছে কেন ? যাহা হউক, এই লোকটার সাহস সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় জন্মিল । আমি তখন একটু নির্ভয় হইয়া ঝটিতি লাঠির ভিতর হইতে কিরিচ্ খানা বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ-পূর্বক রোদের দিকে তাহা উচ্চ করিয়া ধরলাম ; সেই শাণিত তরবারী—সুর্কি দ্বারা পরিমার্জিত এবং নারিকেল তৈলাভিষিক্ত—সেই শাণিত কিরিচ্, রোদের সম্মুখে গিয়া শত সহস্র হীরকের জ্যোতি ধারণপূর্বক দম্ভাকে চমকিত করিল । দম্ভা অবাক হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল । আমি বলিলাম “দেখ্ছিন্ ! এই শাণিত তরবারী তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে । তোমার লাঠির আঘাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে । কিন্তু এই কিরিচের আঘাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চয় ।” এই কথা কহিয়া তরবারী ঘুরাইতে লাগিলাম এবং ঘুরাইতে ঘুরাইতে দীঘির পাশাড়ের আর এক দিক দিয়া নীচে অবতরণ করিতে লাগিলাম । ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, লাঠির উপরে ভর দিয়া, দম্ভা পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অতি কষ্টে দীঘির পাশাড় হইতে নীচে নামিতেছে । আমি আরও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, লোকটা ধোঁড়া ।

ক্রমঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ।

* এই ঘটনার পরে অমুনকলন দ্বারা জানা গিয়াছিল যে, এই দম্ভা ডাকাইতি করিতে গিয়া একজন হিন্দুস্থানী দারবান কর্তৃক এরূপ প্রহারিত হইয়াছিল যে, তাহাতে এই ব্যক্তি বধ হইয়া গিয়াছিল । এখন আর ডাকাইতি করিতে না পারায়, গায়ে, মাটে, মাঠের ধারে, গাছের ডালে, লুকাইয়া থাকিয়া, পথিককে একাকী দেখিলে, ভয় দেখাইয়া টাকা কাড়িয়া লয় ।—লেখক ।

বঙ্গের শেষবীর ।

(প্রতিবাদের উত্তর ।)

“নবপ্রভা” কার্তিক সংখ্যায়, আমার লিখিত, রায় সাহেব হারাগচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় প্রণীত “বঙ্গের শেষবীর” নামক উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে । বিদ্রোহপূর্ণ হৃদয়ে বা দৈর্ঘ্য-প্রণোদিত হইয়া যে আমি এই সমালোচনা লিখিয়াছি, ইহা ধারণা করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয় । যাহারা স্থিরচিত্তে, পক্ষপাত শূন্য হইয়া শাস্ত্রীর ইতিহাস ও রক্ষিতের উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা আমার লিখিত সমালোচনার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিয়াছেন । রায় সাহেবের প্রতি জবরদস্তী করা আমার উদ্দেশ্য নহে ; সাহিত্য-জগতে সত্যকথা বলাই আমার অভিপ্রায় ।

বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর, তদীয় শূন্য সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য, রায় সাহেবের ঐকান্তিক বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক আছে, ইহাই আমার ধারণা । যতদূর বুঝিয়াছি, তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে, তাঁহার প্রত্যেক স্বর-মহরীতে এবং তাঁহার পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রায় প্রতি গ্রন্থের আকার, প্রকার, আরম্ভ ও ভঙ্গিতে, এ ভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয় । যিনি এত বড় উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাহিত্যের রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাকে অন্যের অনুকরণে প্রয়াসী দেখিলে, হৃদয়ে আঘাত লাগে । তাই, “বঙ্গের শেষবীরের” প্রতিকূল সমালোচনার অবতারণা । আমি উক্ত সমালোচনায় যাহা বলিয়াছি, গ্রন্থকারের পক্ষে অপ্রিয় হইলেও, তাহার সার সত্য ।

কিন্তু সত্য হইলে কি হয় ;—ইহাতে “বঙ্গবাসী”র সাহিত্যসমাচার-লেখক মহাশয় হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে । তিনি ‘নবপ্রভা’র সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের ও আমার প্রতি বিষম কষ্ট হইয়া, বিগত ২৮শে কার্তিকের “বঙ্গবাসী”র সাহিত্য-সমাচারে বলিয়াছেন যে “বঙ্গের শেষবীর” প্রবন্ধে একদর্শিতার একশেষ । (১) হারাগ বাবুকে পরস্বাপহারী বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াসে যুক্তিহীন জবরদস্তি মাত্র ।” হা ! অভাগিনী বঙ্গভাষা !!

কোন একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা আবশ্যক হইলে, সেই প্রবন্ধটির

আলোচ্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা উচিত । আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া, বাক্যবর্ষণ করিলে, শূন্য শিলাখণ্ড নিক্ষেপের ন্যায় তাহা সর্বথা বৃথাই হয় । আমি বাহা বলিয়াছি, ‘বঙ্গবাসীর’ লেখক তাহার কোন কথার বখানঞ্চ প্রতিবাদ না করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ-পূর্বক, তাঁহাদের সমক্ষে সমালোচককে দোষী প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, মূল ঘটনা চাপা দিয়া, কতকগুলি অসংযত ও অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন মাত্র । প্রকাশ্যে না হউক, স্বগতঃ কি একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন যে, প্রতাপাদিত্যের “পিতৃ-দ্রোহিতা” সীতারামের ‘দ্বীপ’ “প্রিয়প্রাণহস্তিতা” হইতে গৃহীত নহে ? প্রতিবাদে, প্রমাণস্বরূপ রাম রাম বসুর গ্রন্থ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে “পিতৃদ্রোহিতা” না বুঝাইয়া “পিতৃব্য-দ্রোহিতা”ই বুঝার ইহাকে সাধারণ ভাবে কোষ্ঠীর ফল বলা বাইতে পারিত । বাস্তবিকও তাহাই । তাহা না বলিয়া, পূর্ববর্তী গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কৌশলটিকে অজ্ঞাতসারে আশ্রয়সাৎ করায়, কল্পনার কি লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না ।

সে বাহা হউক, না হয় মানিলাম, রাম রাম বসুর গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার প্রতাপের “পিতৃদ্রোহিতার” অবতারণা করিয়াছেন । এখানে মনে রাখা উচিত যে, রাম রাম বসু কোষ্ঠীর ফলটি মাত্র বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসে সৃষ্ট কৌশলটি বন্ধিমচন্দ্রের নিজস্ব ; এই কৌশল উদ্ভাবনে তিনি কলঙ্কিত হনানাই বরং বশস্বী হইয়া গিয়াছেন । এইরূপে, একখানি দেশমান্য গ্রন্থে যে কৌশলটি প্রতিভার পূর্ণালোকে পূর্বেরই প্রতভাউ হইয়াছে, তাহা কি হারাণ বাবুর স্তায় একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত নহে ? যে ঘটনা প্রত্যেক বাঙ্গালা উপন্যাস-পাঠকের সুবিদিত, তাহার কি, তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, অন্য কৌশলের উদ্ভাবনে নিবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল না ?—ইহাকে কি বলিব ?—অসাবধানতা অথবা অমুসরণ ? গ্রন্থকারের মন জানে । আমি মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি প্রতাপ কর্তৃক পিতৃবাহত্যার কারণ,—তাঁহার চাকসিরি লাভে অকৃত কার্য্যতা ;—আর কিছু নহে ।

বঙ্গবাসীর লেখক বলিতেছেন—“বন্ধিম বাবু ইংরেজ রাজ সম্বন্ধীয় কথা না লিখিলেও বুদ্ধিমান ইংরেজ রাজ বিচলিত হইতেন না । হারাণ বাবু সম্বন্ধেও এই কথা । তবে একরূপ লিখিতে হইলে বা একরূপ লেখার আবশ্যকতা থাকিলে একরূপ ভাবে লেখা ভিন্ন কোন গ্রন্থকারের গত্যন্তর নাই ।”

পরিষ্কার বুদ্ধি !! একরূপ উদার মীমাংসা যদি সাহিত্য-জগতে সর্ববাদি-

পৌষ, ১৩১০]

বঙ্গের শেষবীর ।

২৭৭

সম্ভব হয়, তাহা হইলে, এখন হইতে সকলেই গ্রন্থকার হইতে পারেন । আর কাহাকেও সমালোচকের ভীষ কসাঘাত ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে না । আর কাহাকেও “যুক্তিহীন জবরদস্তীর” লাজনা ভোগ করিতে হইবে না ।

মূল প্রবন্ধে, ব্রাহ্মণের রাজ্যী প্রার্থনার কথা ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কোথায়ও করা হয় নাই । প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পাঠকরা উচিত ছিল । এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে উভয় প্রহের ভাষার সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়াছে, আমি তাহাই বলিয়াছি । শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা প্রলোভনীয় না হইলেও, “বঙ্গের শেষবীরের” অনেক স্থানেই যে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমি মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি । আমি যে সকল স্থান দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, প্রতিবাদে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই । হারাণ বাবুর মৌলিক ভাষার সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নাই ; তাহার সংপৃষ্ঠীত ভাষারই আলোচনা করিয়াছি মাত্র । অতএব, “এ পর্য্যন্ত হারাণ বাবুর ভাষার নিন্দা প্রায়ই শুনা যায় নাই” বলিয়া আক্ষেপের কোন হেতু নাই ।

বঙ্গবাসীর লেখক বলেন “সূর্য্যকান্ত বা শঙ্কর সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিমাংসা করেন নাই । সে কাজ ঐতিহাসিকের ! কবি ক্ষীরোদ প্রসাদ অবশ্য কল্পনায় একটা স্মৃতিমাংসা করিয়াছেন । হারাণ বাবুর সেরূপ একটা করা উচিত ছিল । তাহা না করিয়া তিনি পতিত হন নাই ; তবে করিতে পারিলে কৃতিত্বের বশোভাগী হইতেন ।”

যুক্তির চমৎকারিত্ব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে ? এ কথার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক । তবে, ঐতিহাসিক ও উপন্যাস-লেখকের কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি । ঐতিহাসিক বতর্কণ না একটি ঘটনা সন্তোষ-জনকরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন, ততক্ষণ তিনি গ্রন্থমধ্যে ঐ ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন না । কিন্তু এখানে উপন্যাস-লেখক নিরঙ্কুশ, — ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকও কতকাংশে নিরঙ্কুশ । মূল ঐতিহাসিক তথ্য অব্যাহত রাখিয়া তিনি স্মৃতিমাংসিত্য স্থলের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন । উপন্যাসে “কোথা হইতে আসিয়া জুটিল” বলাটা কি প্রতিভার পরিচায়ক ?

সমালোচনার অর্থ যদি স্মৃতিবাদ হয়, তাহা হইলে, “বঙ্গের শেষবীরের” সমালোচনা প্রকাশ করার জন্য নবপ্রভার সুবিধা সম্পাদক মহাশয় অপরাধী

হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । এ অধ্যয়ন সমালোচনার সেরূপ অর্থ কোন দিন শিক্ষা করে নাই, তাই তাহার এই দুঃসাহস । অদ্য এই পর্যন্ত । বিষয়ান্তরে এদিকে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল ।

শ্রীঅভয়াকিশোর ভট্টাচার্য্য ।

সাহিত্য দরবার ।

বঙ্গদর্শন—কার্ত্তিক ।

“সাহিত্য-সামগ্ৰী” । লেখক বলেন “ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ললিত-কলা ।” প্রথমতঃ ললিত-কলার এক অংশ (কাব্য) সাহিত্যের এক অংশ মাত্র । লেখক বোধ হয়, কাব্য অর্থে সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । বৃহদারতন “সাহিত্য” শব্দের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র ও সঙ্গীর্ণ করার প্রয়োজন দেখি না । লেখকের মতে জ্ঞান বা সত্য “বাক্তি বিশেষের নিজস্ব বর্জিত”, সাহিত্য (কাব্য) নিজস্ব বিশিষ্ট : ছড় জগতের জ্ঞানকে যথা সাধ্যাকর্ষণের জ্ঞানকে “নিজস্ববর্জিত” বলা যায় কিন্তু ননোবিজ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিকজ্ঞান নিজস্ববর্জিত নহে । বাহ্য অন্তর্মুখ জ্ঞান তাহা নিজস্ব বিশিষ্ট, বাহ্য বহির্মুখ জ্ঞান তাহা নিজস্ব বর্জিত । লেখকের মতে “সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে হারিয়েই সম্ভাবনা বেশী” একথাও স্বীকার করিতে পারি না । ষড় দর্শন (সারবান্ সাহিত্য) কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা কি কম স্থায়ী ? “সারবান্ সাহিত্য” ইত্যাদি বাক্যে লেখক সাহিত্য শব্দ কাব্যোত্তর বিষয়ও বুঝায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন । “সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয় ।” এখানে “সাহিত্যের” না লিখিয়া “অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যের” লিখিলে অনেকটা ঠিক হইত । ‘অনেকটা’ বলিলান তাহার কারণ, যদিও কাব্য ভাবপ্রধান, রসাত্মক দ্রব্য, তথাপি ইহার মূল জ্ঞান । ফরাসি পণ্ডিত টেন Taine দেখাইয়াছেন কোন সময়ের ললিত কলা তৎকালিক সভ্যতাটির উৎকর্ষ বা পুষ্পোদগম । সভ্যতা জ্ঞানমূলক । সুতরাং ললিত কলাও জ্ঞানমূলক । পদ্য যেন কাব্য, নাল ও মৃণাল যেন জ্ঞান । যে পরিমাণ জ্ঞান ও চিন্তা বিকশিত হইবে সেই পরিমাণে ভাব ও কাব্য ক্ষুদ্রি পাইবে । এই সচিদানন্দের জগতে “চিৎ” ও “অনন্দ” যেন দুই দেবকন্তা—নিত্য হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে পূর্ণ আনন্দে প্রহুঁতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তি (বা ভাব) উভয়ই চাহি ।

বস্তুতঃ ন তত্ৰ জ্ঞানিনোদৃষ্টে শাস্ত্রে লক্ষণ ভিন্নতা। শাস্ত্র জ্ঞানী এবং উদ্ভেদ নবো
কোন প্রভেদ দেখেন না। লেখক বলেন ;—

“মহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্ভেদ সকল শেষ হইয়া যায়। মানুষের
জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে কিন্তু সমস্ত ভাবের
কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।”

ভিক্টর হুগো (Hugo) ঐ রূপ একটা কথা বলিয়াছেন বটে। কিন্তু পুরাতন
জ্ঞান নূতন জ্ঞানে যেমন আচ্ছন্ন হয়, ললিত কলা নূতন আবিষ্কারে তেমনি
আচ্ছন্ন হয় না এ কথা সত্য বোধ হয় না। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, যে অসভ্য
উৎসবানন্দে মাতিয়া প্রথমে করতালি দিয়া লক্ষ পুর্নক তালে তালে ঢীংকার
করিয়াছিল, তাহাকে গান বাদ্য ও নৃত্যের প্রবর্তক মনে করা যাইতে পারে।
কিন্তু কলা বিদ্যার উন্নতি ক্রমে, নূতন আবিষ্কারে, সেই করতালি-লক্ষ-ঢীংকার-
ভাব আচ্ছন্ন হইয়াছে। কত ক্ষুদ্র কবির রচনা হোমারে বা রামায়ণে আচ্ছন্ন
রহিয়াছে। কত ক্ষুদ্র ইতালীর উপজ্ঞানের ভাব সেক্সপিয়ারে “আচ্ছন্ন”
হইয়াছে। তবে, ললিত কলা সম্বন্ধে লেখকের মতের প্রতিবাদ করিয়াও
আমরা তাহাকে দোষ দেই নাই। কেননা ললিত কলা সম্বন্ধে মহাজ্ঞানিগণের
মধ্যে অল্পত মতভেদ দেখিতে পাই। সাহিত্য-ভীষ্ম প্লেটো কৃষি, জুতা-নিৰ্ম্মাণ
শিল্প পর্য্যন্তকে ললিত কলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। অপর দিকে
শিল্প (Schiller) ললিত কলাকে ক্রীড়াশ্রম মনে করিয়া, ললিত কলা বা
ক্রীড়াই মানব-জীবন-সার বিবেচনা করিয়াছেন। “Only when he plays is
man really and truly man.” “Man ought only to play with
the beautiful only”—আমাদের বক্তব্য বঙ্গদর্শনের লেখক সাহিত্যকে
সঙ্গীর্ণ করিয়া সারবান্ সাহিত্য হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করাতে বঙ্গদেশের
এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছেন। উচ্চ উদার সাহিত্য জাতীয় জীবনকে
বিহিতকার্যশীল করিবে, জাতীয় চরিত্রকে উন্নত করিবে। আবার
উচ্চ জাতীয় জীবন, মহৎ চরিত্র, মহৎ কর্ম, উচ্চ জাতীয় সাহিত্য উৎপাদন
করিলে। “প্রয়োজনের” মতনে সাহিত্য-সুখা উদ্ভিত হইবে। তাই, যদি সাহি-
ত্যের উন্নতি চাহেন, দেশের প্রয়োজন কি তাহাই অনুভব করুন, অন্তরের
সহিত আলোচনা করুন, অমঙ্গলের প্রতিকারের চেষ্টা করুন। আর যদি
মুগ্ধ সংবাদ কিছু পাইয়া থাকেন, আর তাহাতে আপনার হৃদয় আনন্দে
মাতিয়া থাকে তাহা ঘোষণা করুন—সেই ঘোষণা ধনি প্রকৃত সাহিত্য—

আপনি বেহঁশ হইয়া যে অপ্ৰয়োজনীয় “নাটক নভেল কাবো” দেশ চাইয়া ফেলিতেছেন তাহা সাহিত্য নহে, তাহাতে “স্বাধীন সম্ভাবনা” নাই ।

বান্ধব । আশ্বিন কার্তিক ।

বর্তমান মাসিক পত্রের মধ্যে অবিকাংশ পত্রেরই সম্পাদক নাই ; প্রকাশক সম্পাদক নামে অভিহিত । বাহারা সব বিষয়ে মূর্খ, তাঁহারাও আপনাদিগকে মাসিক পত্রের সম্পাদক হইবার নোগ্য মনে করেন, এবং যেন “উপজ্ঞা” বলে পণ্ডিতগণের প্রবন্ধ, বাহা তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যার অতীত তাহা সমালোচনা করিবার ভার গ্রহণ করেন । ইহা আহ্লাদের বিষয়, বান্ধবের সম্পাদক আছেন । তিনি, গভীর পাণ্ডিত্য, ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার, গুণগ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি বিবিধগুণে বিভূষিত । কিন্তু আমরা হৃৎকের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, তাঁহার ভাষার অনঙ্গতার ভারে তাঁহার চিন্তা প্রায়ই মন্থরগামিনী কঢ়িৎ বা সমাচ্ছাদিত ও অদৃশ্য ।

আমরা আশা করিয়াছিলাম বয়োবৃদ্ধির সহিত রায় বাহাদুরের ভাষা ঋজুতা ও সরলতা লাভ করিবে । যে কেশব বাবুর বক্তৃতার ভাষায়, জীবনের আদ্যভাগে, অলঙ্কার ও আড়ম্বর প্রভৃতি ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর সেরিডান প্রমুখ বাগ্মীদিগের বাটগম্বা পরিচালিত হইত, সেই কেশবের বক্তৃতার ভাষায়, জীবনের অন্ত্যভাগে ব্রাইট সাহেবের শক্তিশালিনী সরলতা লাভ করিয়াছিল । রায় বাহাদুরের ভাষায় সে রূপ ক্রমোন্নতি দেখা যায় না । যাহা হউক তিনি যাহা লেখেন তাহা পাঠ্য ও আলোচ্য । কিশোর গৌরাঙ্গ, পঞ্চম অধ্যায়ের মর্ম্ম নিয়ে সঙ্কলিত হইল ।

যে সময় নবদ্বীপে নবদ্বীপ-চন্দ্র গৌরাঙ্গ ইদিত হইয়াছিলেন, সেই সময় আর তিনটি উচ্ছল জ্যোতিষ্ক বৈদ্যাস্তিক বাহুদেব, নৈয়ায়িক রত্ননাথ ও শ্রী রত্নানন্দ—নবদ্বীপের নভোমণ্ডল আলোকিত করিয়া ছিল । বাহুদেব মহেশ্বর বিশ্বাসদেবের পুত্র । তিনি পঞ্চাশ পূর্বে পায়ে বিদ্যানগর গ্রামের টোলে অধ্যাপনা করিতেন । পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন রত্ননাথ বাহুদেবের আশ্রয় লন, বাহুদেব তাঁহাকে শাস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষার জন্য নিখিলায় পাঠাইয়া লেন । শাস্ত্র দর্শনের সূত্রকর্ত্তা গৌতম । কিন্তু মিশ্রিলার গাঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রণীত চিন্তামণি গ্রন্থই তখন পঠিত হইত ।

রত্ননাথ চিন্তামণি গ্রন্থ কঠিন করিয়া নবদ্বীপে প্রভাগমন পূর্বক উক্ত গ্রন্থ অবগীর্ষন করিয়া চিন্তামণি দীর্ঘোক্তি নানক এক অপূর্বগ্রন্থ রচনা করিলেন । সমগ্র ভারত তাহাই শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইল । রত্ননাথ যেমন পুরাতন শাস্ত্র শাস্ত্র ভাষিয়া “দীর্ঘোক্তি” গ্রন্থ রচনা করেন, রত্নানন্দও সেইরূপ শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের সারার্থ সংগ্রহ করিয়া অষ্টাবিংশতিভূত নামক এক গ্রন্থ রচনা করিলেন । এই বেদান্ত-শাস্ত্র-শ্রুতির ত্রিবেণী সম্মিলন এক অনিস্কল্য শক্তির উৎস নিঃসৃত হইল । গৌরাঙ্গ সেই শক্তির উৎস ।

বঙ্গদেশে এই সময় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এ দেশে আর কখন ঘটে নাই । ভগবদ্দী ও যেমন সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের চূড়ক, গৌরাঙ্গের সময়ে নবদ্বীপ তেমনই সমুদয় ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত সার ।

সাময়িক সংবাদ ।

বঙ্গের পুনর্গঠন । ভারতগভর্নমেন্টের সেক্রেটারী মাননীয় মিঃ রিজলী বঙ্গীয় গভর্ন-মেন্টের শাসনাধীন স্থানের পুনর্গঠন প্রস্তাব করিয়া বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের প্রধান সেক্রেটারীকে এক স্মারক পত্র লিখিয়াছেন । এই দীর্ঘ পত্র ১২ ই ডিসেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা পঠ্যে জানা যায় যে বাঙ্গালার শাসন কর্তার অধীনস্থ চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ আনামের, এবং মানভূম ও সিংভূম বাতীত সমুদায় ছোট নাগপুরটি মধ্যভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে । আবার অন্য নিকৈ মধ্যভারত, হইতে, ফুলঝড় ও চন্দ্রপুর বাতীত সমুদয় মথুরপুর জেলাটি ও পাঁচটি করদ রাজ্য, এবং মালদ্বাজ হইতে গঙ্গাম, গঙ্গাম ও ভিজিগাপটম পার্শ্বতা প্রদেশ বঙ্গের শাসনাধীনে আনীত হইবে । একরূপ পরিবর্তনের তিনটি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে ।—(১) বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের শাসনের গুরুভার কতক পরিমাণ লাঘব হইবে এবং বহিঃস্থিত জেলা সমূহ সুন্দর ও সুচারু রূপে শাসিত হইতে পারিবে । (২) আসামের উন্নতির নিমিত্ত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আসমুদ্র প্রসারিত করণার্থ আসামের শাসন সীমা বৃদ্ধি করিতে হইবে ; এবং একরূপ করিলে তাহার একক স্বাধীন শাসনের সুবিধা হইবে । (৩) যে সকল জাতির মধ্যে উড়িয়া ভাষা প্রচলিত তাহাদিগকে একই শাসন কর্তার অধীনে আনিতে হইবে এবং তাহাতে মালদ্বাজ ও মধ্যভারতের শাসনকর্তাদিগের বিভিন্ন ভাষার প্রচলনের অন্তর্বিধা কিয়দংশে হ্রাস হইবে ।

মাননীয় রিজলী সাহেবের দীর্ঘ পত্রে এই তিনটি উদ্দেশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে ।

হাজারীবাগে ছাত্রাবাস । হাজারীবাগ একটা বেশ স্বাস্থ্যকর প্রদেশ । এখানে ডবলিন ইউনিভার্সিটি মিশনের একটা কালেক্স আছে কিন্তু ছাত্রাবাস নাই । যে সকল পীড়িত ছাত্র উপযুক্ত স্থানান্তাবে বিদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে না, তাহাদিগের জন্য হাজারীবাগে একটা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা চেষ্টা হইতেছে, দশজন ছাত্র পাইলেই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইবে । আহা ও বাসস্থান প্রত্যেক ছাত্রের মাত টাকা লাগিবে, ডাক্তারের খরচ

লাগিবে না । খর্ষ ও জাতি বিচার বিশেষরূপে রক্ষিত হইবে । আনানিগের বিশ্বাস যখন হাজারীবাগের সরকারী উচ্চশিক্ষিত শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গুপ্ত এবং ডবলিন ইউনিভার্সিটি মিশন কালেক্সের অধ্যক্ষ রেঃ জেঃ এ, মেরে ইহার কার্য নির্বাহ নিমিত্ত অল্পতম সভা তখন তাহার বন্দোবস্ত সুন্দর ও পরিপাটি হইবে । প্রিয়কুমার বাবুর নিকট পত্র লিখিলে নৈবিশেষ জানা বাইবে ।

শোক সংবাদ । যাহার সুন্দর ও বিভূক্ত নাট্য গীতে বঙ্গবাসী মুগ্ধ, যাহার মধু-মধুরী অগচ নির্দোষ হাসির পানের নিমিত্ত সকলে উদগ্রীব ও বাগ্র, যাহার অমৃতময়ী লেখনী নিমিত্ত নাটক কবিতা গান ও প্রবন্ধ নবপ্রভাকে দীপ্ত ও অমুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই প্রিয়দর্শন শ্রেষ্ঠ ভাঙন দ্বিজেন্দ্রের পত্নী বিরোগে আনরা মর্মান্বিত হইয়াছি । গত ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রে নানাস্থানে বিভূষিতা শ্রেষ্ঠীল। লক্ষ্মী পতি পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ডানাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন । কবির বন্ধু "রঙ্গালয়" ও "বঙ্গবতী" সম্পাদক শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে "রঙ্গালয়" বাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল ।

"একটা বড় মন্দ সমাচার দিতে হইল ! আমাদের প্রীতিভাজন, প্রিয়দর্শন সুন্দর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পত্নী-বিরোগ হইয়াছে । যিনি সদাশুখী ছিলেন, হান্তের ও বঙ্গের জ্যোৎস্নাজাল বিস্তার করিয়া যিনি আমাদের সুদাই সুখের কোমলোন্মাত করিয়া রাখিতেন, এতদিনে বুঝিবা তাহার সংসারসুখের চন্দ্রিকা দীপ্তি হ্রাস হইল । যে কখনও শোক পত্র নাই—তাহার শোক ! নিজের দুর্ভাগ্যে শোক ; সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যা সকলের ক্ষুধ ও উদাস মুখ দেখিয়া সে শোক-বহি রাবণের চিতার স্থায় অহরহ ক্রদয়ে ক্ষুজিতে থাকিবে । এ শোকের সাধনা নাই, যে বুঝিয়াছে সেই মরমে মরিয়া আছে । জগদম্বার মহাশয়ের মঙ্গল করুন ।"

যাহার হান্তনীলার নবপ্রভা হৃদয়মুখ ছিল, এক্ষণে তাহার শোকে নবপ্রভা আজ মলিনা । ভগবান শোক-সন্তপ্ত হৃদয় শাস্তি বারিতে শীতল করুন ।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ ।

অগ্রহায়ণ ১৩১০ ।

২০শে কার্তিক, ১৫ নবেম্বর । ভারতপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন ভারতবাসীকে আগমন করেন ।— ভারত সনাপতি লর্ড কিলেনের ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক অঘাত প্রাপ্ত হন ।

৩০শে কার্তিক, ১৬ই নবেম্বর । সোমালী প্রদেশের গলাদি ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয় ।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নবেম্বর । ইতালীর রাজা ও রাজ্ঞী চারবুর্গে হইয়া পোর্টস্মাউথে পৌছান ।

২রা অগ্রহায়ণ ১৮ই নবেম্বর । লর্ড কর্জন পারস্যোপসাগর ভ্রমণোপলক্ষে ৩০শে কার্তিক যাত্রা করিয়া অদ্য মক্কাতে পৌছান । এবং তথাকার সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ হয় ।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১২শে নবেম্বর । আমেরিকায় পানামা কানাল সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ।— বামডার করদ নৃপতি সারহুধল দেব (কে সি আউ, ই) র মৃত্যু হয় ।

৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেম্বর । ইতালীর রাজা ও রাজ্ঞী ইংলণ্ড পরিভ্রম করেন ।—লর্ড কর্জন পিটোরাল এবং বন্দর আন্দ্রাসে পৌছান ।

৬ই অগ্রহায়ণ ২২শে নবেম্বর । ডেমির হিসারে বিদ্রোহীগণ তুরকীসগণের সহিত যোঁরতর যুদ্ধে পরাজিত হয় ।

৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেম্বর । জোলো বোপে দুই সহস্র মুর আমেরিকাবাসী কর্তৃক নিহত হয় ।

৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নবেম্বর । মরিসসের বিশপ পইন সাহেব বোম্বের বিশপ নিযুক্ত হন ।— ইতালীতে অষ্ট্রো-জার্মান ছাত্রগণ বিষম অশান্তি ঘটাইয়াছে জানা যায় ।

৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নবেম্বর । লর্ড কর্জন বারেন প্রদেশে আগমন করেন ।

১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নবেম্বর । লর্ড কর্জন কাউব্রেত পরিদর্শন করেন ।

১৬ই অগ্রহায়ণ ২রা ডিসেম্বর । লর্ড কর্জন বুশারারে আগমন করেন ।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর । সিংহলের

নূতন শাসন কর্তা ব্রেক সিংহলের শাসন ভারগ্রহণ করেন ।—

১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর । কলিকাতার ভারতবাসী বাবুপক সভার অধিবেশন হয় ।—বন্দার ভানো প্রদেশান্তর্গত শিউঙ প্রদেশে অত্যন্ত ভূমিকম্প হয় ।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর । বিলাতে অত্যন্ত কুজ্জটিকা দেখা দেয় । জনহুলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে ।—লর্ড কর্জন পাসনীতে পৌছেন ।

২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর । বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক হাক্সট স্পেন্সার পরলোক গমন করেন ।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর । যে, বুলগেরিয়ান বিদ্রোহী দল আফ্রিকানোপল সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হয় । ভারমট যুদ্ধে মিত্রতা-যুত্রে আবদ্ধ ইলাহী নৈশ্চের নিকট মোজার সৈন্য পরাজিত হয় । সংবাদ পাওয়া যায় যে মোজার প্রধান সহায় এবং দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ আবদুল শেরি মৃত হইয়াছে । সম্ভবতঃ ইহাতে সমস্তই পরিবর্তিত হইবে । লর্ড কর্জন করাচী পৌছেন । শুনা যায় যে মোজার সৈন্য মিউডগ অধিকার করিয়াছে ।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর । লর্ড কর্জন আলোওয়ারে উপনীত হইয়া আলোয়ার মহারাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন ।—স্পেনের রাজা পর্দুপালের রাজার সহিত সাক্ষাতার্থে লিসবন আগমন করেন ।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর । বঙ্গীয় বাবুপক সভার অধিবেশন হয় । বোম্বাই প্রদেশের নূতন শাসনকর্তা লর্ড লামিংটন বিলাতে হইতে বোম্বাই আগমন করত কাছভার গ্রহণ করেন ।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪ই ডিসেম্বর । প্রেন্সারেল রয়স কলিকাতায় প্রোসডেণ্ড নির্বাচিত হন ।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর । বুয়ার জেনারেল ডিলাদী বোম্বাই পৌছেন, উদ্দেশ্য ইংরাজের সহিত অনাথ বুয়ারদিগকে সন্ধি যুত্রে আবদ্ধ করেন ।—লর্ড কর্জন আগ্রা আগমন করেন ।

নবপ্রভা ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনা ।

৩য় খণ্ড ।

কলিকাতা, মাঘ, ১৩১০

[১২৭ সংখ্যা ।

কংগ্রেস ।

[কাশীধামে আৰ্য্যদম্মরক্ষিণী সভাতে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীর বক্তৃতা ।]

“হে শিষ্যগণ—

এতদিন আমার নিকট উপদেশ পাইলে, তথাপি তোমরা বুঝিলে না যে কেবল বক্তৃতা করিয়া, হাততালি দিয়া, কোন-বিশেষ জাতির স্বত্তিবাদ বা নিন্দাবাদ করিয়া, কোন জাতি কদাপি উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই । আমি কতবার বলিয়াছি, যে যত দিন কংগ্রেস কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল মাত্র বৃথা বক্তৃতা করিবে, তত দিন আমার যে শিষ্য তাহাতে যোগ দিবে, তাহাকে আমি আমার সম্প্রদায় হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিব । যাহারা মুখে যাহা বলে কার্য্যে তাহা করে না, তাহাদিগের সরলতা আশ্চর্য্যকর । তোমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পার তাহা আমি বুঝি না ।

সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বিবেকী যে দোষ বুঝিতে পারিবে, যে তিনি গূঢ় ভাবে কংগ্রেসকে তিরস্কার করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টের ক্রটি সম্বন্ধে তিনি যাহা পরিস্কার ভাষায় বলিয়াছেন, কংগ্রেস-ওরালদিগের ক্রটি সম্বন্ধে—নিজেদিগের স্বাধীন লজ্জাকর স্বার্থপরতাবিলাস-ময় কার্য্যবিমুখতার প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, কংগ্রেস-ওরালদিগকে, যদিও প্রচ্ছন্ন তথাপি মর্মভেদী ভাষায়, তিরস্কার করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—I take it that there can be no more important national question than the question of education. তাহার কিছু পরে বলিয়াছেন—We have a sacred duty towards the poorer classes of our people. Those who have received the bene-

fits of High Education are bound to do, whatever may be in our power to extend the blessings of education, so far as may be, to the masses of our people. অর্থাৎ “দেশের দীন দরিদ্র লোকের প্রতি আমাদের এক পবিত্র অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকার্য আছে, আমাদের মধ্যে যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাদিগের নিতান্ত কর্তব্য যে তাহারা সাধারণ্যে এই মঙ্গলময় শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।”—কংগ্রেসওয়ালারা কি সাধারণ্যে দীন দরিদ্রদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন? সাধারণ্যে দূরে নাউক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিতেছেন? দুই চারি জন সাধু অকপট ব্যক্তি করিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালার অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে কি বলা যাউতে পারে? শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় বখন প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেন্টের কপটতা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কি তিনি গুঢ় ভাবে কংগ্রেসওয়ালাদিগকেও বলিতেছেন না—যে “তোমরা দেশহিতৈষিতার ভাণ করিয়া বেড়াও কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তোমাদিগকে দেখিতে পাই না? তোমরা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত ——যাহাদিগের লইয়া দেশ (The nation dwells in the cottage) তাহাদিগের শিক্ষার প্রতি, উন্নতির প্রতি কখন কটাক্ষপাতও কর না। সুতরাং তোমরা কি ভণ্ড নহ, কপট নহ?” সভাপতি মহাশয় তাহার বক্তৃতার প্রারম্ভেও প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে কংগ্রেস যে কপট নহে তাহা কার্য দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক—

If we are really sincere in our professions of democratic faith, let us prove our sincerity not merely by mellifluous phrases, but by deeds more eloquent than words. ঘোষ মহাশয় যাহা উত্থাপন মাত্র করিয়া, তিরস্কারের তিক্ত অংশ টুকু তাহার বক্তৃতাতে গুঢ় ভাবে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসস্থাপক স্পষ্ট-বক্তা বৃদ্ধ হিউম সাহেব বড় দুঃখেই জালাময়ী ভাষায় কংগ্রেসওয়ালাদিগকে বলিয়াছেন—

“তোমরা বেশবক্তৃতা কর কিন্তু কার্যে কিছুই নহ—When the congress closes, every man of you broadly speaking goes off straightway on his private business, and not one per cent of you seem to give thereafter any earnest thought or many days real work to poor India's public business. ভক্তিভাষন হিউম সাহেবের এই কথার মর্ম এই যে, “দুই চারি জন ব্যতীত, তোমরা একটা মস্ত ভণ্ডের দল। হায়! বাক্যসর্বস্ব ভণ্ডামি দ্বারা দেশের কখন কোন মঙ্গল সাধিত হইবে না।” তবুও কংগ্রেসওয়ালারা বুঝিবে না, তবুও তাহাদের দুঃখ

মাঘ, ১৩১০]

কংগ্রেস ।

৬৮৫

হইবে না, তবুত কার্যাহীন জীবন লইয়া, কংগ্রেস নগুপে রঙ্গমঞ্চ আয়োজন করিয়া, স্বার্থপরভাননীকলঙ্কিত বদন দেখাষ্টতে ক্ষান্ত হইবে না । দেখানে উল্লাস আনন্দের বিষয় কিছুই নাই, দেখানে আত্মঘাতীর গভীর নিবাদ বনৌভূত হইয়া প্রকাশিত হইবার কথা, দেখানে অনুতাপ, লজ্জায়, দুঃখের অনিরাগ অশ্রু বিগলিত হইয়া (মণ্ডপ) অশ্রুহীন হইয়া গাইবার কথা—সেইখানে বখন দেখি স্বদেশীয়গণ চিন্তাশূন্য, হৃদয়শূন্য ভাবে, লবুচেতা হইয়া আনন্দে নৃত্য করতালি-ধ্বনি করিতেছেন—তখন ছুখে লজ্জায় কোথায় মুখ ঢাকিব ! তখন বৃদ্ধ যুতরাষ্ট্র যেমন কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে, একসময়ে তাঁহার ভ্রাতৃ, নিকোদ, পাপমতি, গর্ভিত, সুপরামর্শবির পুত্রগণের বিজয়ের আশা করেন নাই ; তেমনি ভারতক্ষেত্রে মহাসমারোহপূর্ণ এই রাজনৈতিক বোর-বাগবিতণ্ডায় আমিও কখন দেশের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করি নাই । আমি সম্মানস্বৰ্ণ গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পর্যটন করিয়াছি । বঙ্গদেশে কংগ্রেসওয়াল জমিদারদিগের কাৰ্য্যাবলী বাহা দেখিয়াছি তাহাতে আর মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করি নাই । তাঁহারা নিজের প্রজাদিগের উন্নতির জন্য কি করিতেছেন ?—আমি নিজে কোনও কোনও জমিদারকে সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য একটা কার্য্য যোগ দিতে বলিয়াছিলাম । তাহাতে একজন জমিদার বলিলেন, “প্রজা শিক্ষিত হওয়া জমিদারের স্বার্থ নহে । শিক্ষিত হইলে তাহারা নিজের স্বত্ব-অধিকার-ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে, এবং এক্ষণে তাহারা যেমন অনুগত বাধা আছে, এক্ষণে তাহাদিগকে কাছারী হইতে তুলব করিলে তাহারা যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে আইসে, এক্ষণে তাহারা জরিমানা করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ভয়ে ভয়ে জমিদারকে দিয়া ফেলে, শিক্ষিত হইলে তাহারা তাহা আর তেমন করিবে না, তেমন দিবে না । বঙ্গদেশের “দেশহিষ্টবী” সম্পাদকগণের ভিত্তির প্রায়ই দেখিতে পাই যদি একজন সাহেব কোন ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে অমনি তাহারা একটা হলস্থল বাধাইয়া দেন । কিন্তু প্রজার প্রতি জমিদার যদি অত্যাচার করেন তাহা কি সংবাদপত্রে তেমন প্রকাশিত হয় । আজি কালি একটা আশা হয় । একখানি নির্ভীক, নিরপেক্ষ ১ম শ্রেণীর বাঙ্গালা সংবাদপত্রে (“বঙ্গমণ্ডল”) সে দিন দেখিলাম—“আমরা বিচার ও শাসন বিভাগ প্রভেদ করিতে চাই, কিন্তু আমাদের কত গ্রামে কত পল্লীতে জমিদারের কঠোর অত্যাচারে সহস্র সহস্র প্রজার জীর্ণ মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, চক্ষু দিয়া অশ্রু-পরিবর্তে রক্তস্রোত বহিতেছে ; তাহার প্রতিকারকে

করিবে ? সে দিকে কি আমাদের লক্ষ্য করিবার অবসর আছে ?” আমি আশীর্বাদ করি, এই সংবাদপত্র দীর্ঘজীবী হউক । আমি ভরসা করি অন্য সংবাদপত্রও জাতি নির্বিশেষে দরিদ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিতে বদ্ধ পরিকর হইবেন ।

বস্তুত দরিদ্র কুটীরবাসী আমাদের আশীশ্বল । কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে সাধারণ লোক যদি অজ্ঞতাতে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে দেশের মঙ্গলজনক বিষয়ে তাহারা উদাসীন থাকিবে । এ কথাই মধ্যে সংক্ষেপে অনেক কথা রহিয়াছে । সেই কথা কংগ্রেস এতদিন লক্ষ্য করিতেছে না বলিয়া তাহার সমুদয় কার্যই নিষ্ফল হইতেছে ।

হে শিষ্যগণ—তোমরা বড় নামে ভুলিও না । হিন্দুস্থান রিভিউ (Hindustan Review) নামক পত্রিকাতে শ্রীবুদ্ধ দাদাভাই নারোজি, শ্রীবুদ্ধ ওয়েডার্বর্ণ, শ্রীবুদ্ধ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়গণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ভাস্ক । তাঁহারা ইংরাজ সমাজ দেখিয়া দেখিয়া, ভারত যে ইংলণ্ড নহে, আয়ারল্যাণ্ড নহে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন ।—যে সকল আন্দোলন প্রণালী ইংলণ্ডে বা আয়ারল্যাণ্ডে সুফলদায়ক হয়, তাহাতে ভারতে কেবলমাত্র ইংরাজের জুতার ঠোকরের জোর আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা । তিন ব্যক্তি সাধু উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিয়া ভারতের যে প্রভূত এই অনিষ্ট করিতেছেন, হায় ! তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না । মাননীয় হিউম তাঁহার Call to Arms নামক লিপিতে আয়ারল্যাণ্ডের সহিত সর্বতঃ-পরাদীন কেবল-মাত্র-দয়াজীবী ভারতের কোনই সাদৃশ্য নাই তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন ।—আমি এত কাল যাহা বলিয়া আসিতেছি তাহা—অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে কংগ্রেসের গন্তব্য পথ কি তাহা—সুপরিচালিত চিন্তাশীল পাণ্ডিত্যভূষিত New India নামক ইংরাজি পত্র—কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া—বিশদভাবে লিখিয়াছেন । সুপ্রসিদ্ধ “বঙ্গবাসী” ও এবিসয়ে সারবান্ কথা লিখিয়া আসিতেছেন ।

যদি কংগ্রেস কার্য করিতে চাহে প্রথমত সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্ত চেষ্টা করুক । কেবল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের সত্তা নিশ্চিত ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবেক না । কংগ্রেস আমার কথা শুনিবে কি না তাহা জানি না । সংসারে বাহ্যিক প্রভূত দশ বা খ্যাতি লাভ করে তাহারা আমার মত দীন দরিদ্র দয়্যাসীর কথায় কর্ণপাত করিবে তাহা সম্ভব নহে ।

মাঘ: ১৩১০]

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা ।

৪৮৭

কিন্তু, হে শিষ্যগণ, যদি তোমরা বথার্থই আমার শিষ্য গ্রহণ করিয়া থাক, যদি তোমাদের হিন্দু ভণ্ডামি না হয়, তোমরা গীতার যে নিকাম ধর্মাত্মক শ্লোকগুলি মধ্যে মধ্যে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া থাক, যদি তাহাতে তোমাদিগের বথার্থই আস্থা হইয়া থাকে—তাহা হইলে কার্যে প্রবৃত্ত হও। আমি অদ্য যাহা সংক্ষেপ বলিলাম, দেশে কার্যে প্রচার কর—সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্ত ব্রতী হও। গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন কর। তোমরা তাহাতে শিক্ষা দেও, আর তোমাদের সন্দৃষ্টান্তের দ্বারা অন্যান্য নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক শিক্ষক আকর্ষণ কর। অবৈতনিক শিক্ষকদিগের শ্রেণীবদ্ধ কর। বাহারা বৎসরে ১ ঘণ্টা মাত্র অবৈতনিক শিক্ষা দিবেন তাহারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। বাহারা মাসের মধ্যে ১ ঘণ্টা ঐরূপ শিক্ষা দিবেন তাঁহারা ৩য় শ্রেণীর, বাহার সপ্তাহের মধ্যে ১ ঘণ্টা ঐরূপ শিক্ষা দিবেন তাঁহারা ২য় শ্রেণীর, আর বাহারা প্রতি দিন ১ ঘণ্টা করিয়া ঐরূপ অবৈতনিক শিক্ষা দিবেন তাঁহারা ১ম শ্রেণীর কর্মী হইবেন। আর বাহারা সমুদয় সময় বিনা বেতনে ঐ কার্য করিবেন তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কর্মী হইবেন। আর আর উপদেশ পরে দিব। কার্যে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে, কংগ্রেস লজ্জার মুখ অবনত করিয়া, বৃথা ঢকনিবাদ ও ধ্বজা তাগ করতঃ, তোমাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। তোমাদিগের নিয়ম এই হইবে;—১ম, বক্তৃতা করিবে না। কর্মহীন বক্তৃতাতে দেশ উৎসন্ন ঘাইতেছে। ২য়, যাহা করিবে তাহা সংবাদ পত্রে বা কোন মুদ্রিত বিবরণীতে প্রকাশ করিবে না। ৩য়, যাহা করিবে তাহা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া নিকাম ভাবে করিবে।

ওঁ হরিঃ ।

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা *

গোধূলি ।

দিনমনি অস্ত যায় যায় !

কাঞ্চন কিরণ ঘটা,

অপূর্ব সিন্দূর ছটা,

সন্ধ্যা ভালে কি মধুর ভায় !

* এই কাব্যের পূর্বার্কে "সাহিত্য" প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তরার্কে ধাত্রাবাহিক ক্রমে "নৃপপ্রভায়" প্রকাশিত হইবে।—লেখক।

এল ধীরে, গোধূলিরে অগ্রদূতী করি,
দিবার ছহিতা সন্ধ্যা, মোহিনী অপ্সরী !

২

শ্রামাদিনী আইল শরীরী !
হাব ভাব হাশ্বে ভরা, কি লাবণ্য মনোহরা,
রসময়ী নবীনা নাগরী !
রঞ্জিনী খুলিয়া দিল হাসির ফোয়ারা !
খেতাদী রজনীগন্ধা, হেসে হ'ল সারা !

৩

সুধাকর হাসিল হরষে ! —
ক্রবতারা, শুক্রতারা (সোহাগিনী বধু তারা !)
ভাসিল সে হাসির সরসে !
চন্দ্রকাস্তা কুমুদিনী, সরসীর কোলে
সোহাগে পড়িল ঢলি সে হাসিহিল্লোলে !

৪

আহা সখি সবাই সুখিনী !
হেরি চন্দ্র চন্দ্রমুখ, সবারি ভরিল বুক,
হার সুধু অভাগী ছুঃখিনী !
মনে পড়ে সে নিকুঞ্জ, সে চাঁদনি রাতি,
সুধাংশু কালরে শত তারকার বাতি !

৫

মনে পড়ে সে নিকুঞ্জবন ;
মধুর বাঁশীর সুর, ফুটিতেছে ভূর্ ভূর্,
বনতুলসীর গন্ধ প্রাণ-উন্মাদন !
বহিতেছে ঝুর্ ঝুর্ দক্ষিণা অনিল,
থেকে থেকে ডেকে উঠে বনাস্থ কোকিল !

৬

কেমনে বর্ণিব সে উল্লাস ?
চারিধারে জ্যোৎস্নারামি, মধুর বাজিছে বাঁশী,
চারিধারে সেফালীর বাস !

মাঘ, ১৩১০]

অপূর্ব ভ্রাজ্জনা ।

৪৮৯

মদন বধূর যেন সুরভি নিশ্বাস
পড়িতেছে ! অহো সখি ! সে সুখ বিলাস !

৭

কে যেন গো দিতেছে আশ্বাস,
“এখনি পাইবে তারে সদা প্রাণ চাহে বারে,”
এমনি সে সুমধুর ভাষ !
মধুর বিশ্বাসে মগ চিত্ত গেল ভরি ;
আনন্দে শিহরি উঠি, অঙ্গ ধর ধরি !

৮

আইলা গো পীতাম্বর হরি !
মাতাইয়া, কাঁপাইয়া, কাঁপাউয়া, মাতাইয়া,
কোকিল ডাকিল সখি, কুহরি, কুহরি !
আদরে সোহাগে হরি বক্ষে নিলা টানি,
তার পর কি হইল, কিছুই না জানি !

৯

কে যেন গো হরিল চেতনা !
পড়িলু অগাধ জলে, বিশ্বস্তির রসাতলে,
সুখহুদে এমনি মগনা !
আনন্দ সাগর জলে জ্ঞানের তপন
অস্ত গেল, কমলিনী মুদিল নয়ন !

১০

আনন্দের প্রশান্ত তিমিরে
চেতনা মুদিল অঁখি, যথা কলকণ্ঠ পাখী,
গীতক্লাস্তা কাস্তা সহ স্নিগ্ধ নীড়ে !
নহে ইহা বিহ্বলতা, নহে ইহা ঘুম ;
যোগীর পরাণ সম পুলকে নিঝুম !

১১

চেতনা জাগিল ধীরে ধীরে !
নাথের চরণ তলে বসিলাম কুতূহলে,
আরতির দীপ যেন দেবুর চন্দ্রে !

হেরিলাম (তখনও ছিল আধা ঘুম)
শ্রমের নিরালোকুঞ্জে সকলি নিব্বুম !

১২

চারিধারে নীরব, নীরব !
শব্দ নাই, বস্তু নাই, দুই জনে আমরাই
পান করি নেত্রপাত্রে আনন্দ আসব !
ধীরে ধীরে হইলাম এমনি তন্ময়
রাধা নাই, বিশ্ব নাই—বিশ্ব শ্রামময় !

১৩

আজিও গো ভেমনি বামিনী !
চারিধারে জ্যোৎস্না রাশি, মধুর বাজিছে বাণী,
সুমধুর শেফালী কামিনী !
মদনবধূর যেন সুরভি নিখাস
পড়িতেছে ! কোথা হরি ? কোথা শ্রীনিবাস ?

১৪

বন্ধে আজি জাগিছে লালসা !
হৃৎখে হৃৎখে গেছে শাস্তি, মলিন নলিন কাস্তি,
রাধা আজি বিক্লবা, বিবশা !
এ অশাস্তি, এ লালসা ভাল নাহি লাগে !
এস হে ত্রিভঙ্গশ্রাম, দীপ্ত অমুরাগে !

১৫

হে সুন্দর শ্রাম, অভিরাম,
ঘন নিবিড় আনন্দ, ষোগীজন ব্রহ্মানন্দ,
পূর্ণশাস্তি ! হে চির বিরাম !
এস পরম পুরুষ ! করিয়া শয়ান
তব বন্ধে রাধা আজি লভিয়ে নির্বাণ !

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন ।

মহাভারত ও রামায়ণ ।

শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র মজুমদার সুশিক্ষিত, সাহিত্যদেবী । তিনি যে উকীল হইয়াও সাহিত্যসেবা করেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় সহ্য হয় নাই । তাঁহার “মহাভারত” ও “রামায়ণ” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে* কৃতী উকীলের নিঃসন্দেহ আত্ম বিশ্বাসের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয় । তিনি যে বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত, তাহাতে তিনি কতদূর ব্যাপ্ত ছানি না । তিনি প্রচলিত রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি, রচনাকাল ও পরিণতি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা কতটা অন্তর সিদ্ধান্ত বা নিজের বিচার-তর্ক-গবেষণার ফল তাহা বুঝিবার বড় সুযোগ দেন নাই । আদিম রামায়ণ মহাভারত কি, প্রচলিত রামায়ণ মহাভারতই বা কি, তাহাও প্রবন্ধদ্বয়ে সুস্পষ্ট নহে । এই পুণ্যতত্ত্বের সমালোচনার পূর্ববর্তী লেখকের মধ্যে কেবল মাক্‌ডনালড্ ওক্রিফ্টের নাম দেখিতে পাইলাম । প্রতিপাদ্য বিষয় ও সমস্তা যেমন গুরুতর, বিষয় বাবুর যুক্তি ও তর্ক সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত, নথির বিহীন, জটিল ও অসু-বৃত্তি নিরপেক্ষ (wanting in logical sequence) লেখকের প্রতিজ্ঞা সমষ্টিতে নিবিড় সত্য নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একবারে নিগূঢ় ভাবে সংস্থিত ; আমাদের মতন অল্পপাঠকের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

(১) প্রবন্ধ দুইটি নিতান্ত আবিষ্ট চিত্রে পড়িলেও, কোন একটা বিশ্বাসমূলক ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না ; (২) এবং ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে এই প্রকার যেন মনে হয় যে, লেখক স্বয়ং মূল রামায়ণ মহাভারত, পানিনি, পানিনি পতঞ্জলি মহাভাষ্য, বেদের ব্রাহ্মণাদি সমগ্র বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী প্রভৃতি বহুবার তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন ; এবং আলোচ্য পুণ্যতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ববর্তী লেখকগণের নিকট বিশেষ স্বীকৃতি নাই । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে ভারতীয় পুণ্যতত্ত্বের আলো-চনার মোক্ষমূলর, কোলব্রুক, উইলসন, লেনেন, গোলড্‌ষ্টুক, বেবর, ডাক্তার হোগ, ডাক্তার মুলার, হার্নলি, থিব (Dr. Thibaut) জ্যাকব (Dr. Jacobi) অধ্যাপক রুমফিল্ড্, এবং ডাক্তার হুইটলি, ব্রেন্টলি, মুরের প্রভৃতি এবং প্রাচ্য-দিগের মধ্যে টেলঙ্গ, তিলক, রঙ্গাচার্য্য, ভাণ্ডারকর, কেশবদাস, ডিক্‌সিট, আর্য্য,

এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কপিল বসু ও পাটলি পুত্রের আবিষ্কার। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ; (৩) আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা প্রায়ই উল্লিখিত প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমালোচনার তাঁহাদের সহিত মতভেদ হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্তস্থাপন ও খণ্ডন করিয়াছেন ; (৪) কোন একটি বিশেষ অভিনব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, পূর্ণবর্গী বিশেষজ্ঞের (Expert authority) মতের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন ; এবিষয় মোক্ষমূলার তাঁহার Last Essay নামক পুস্তকে বলিয়াছেন “Unless Student can appeal for help to recognized authorities * * * he is apt to make brilliant discoveries which explode at the slightest touch of the specialist.” (৫) প্রতীচ্য বা প্রাচ্যপণ্ডিতরা যে সকলেই সমান অভিজ্ঞ, নির্বাচনক্ষম নহেন, ইহা লেখা বাছিয়া মাত্র ; ৬) ভারতদেবী জর্মান পণ্ডিত বেবরের মতের উপা কৌক দিয়া বিচার করিলে, অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যাকরণ ইতিহাসাদি নিতান্ত প্রাচীন না হইয়া, অধিকতর আধুনিক হইয়া যায়—বেবরের মতে ‘পানিনিও নিতান্ত আধুনিক—পানিনি যেরূপ “মহাভারত” অর্থে ভরতবংশ, এবং বৃষ্ণিষ্ঠিরাদি নাম উল্লেখ থাকিলেও তাহা আধুনিক ; কারণ

বেবরের মতে, পানিনি “কালকের ছেলে” এবং বাম্বোক্তির রামায়ণ বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ ইত্যে সংগৃহীত এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু-বুদ্ধের রূপক মাত্র ; এবং লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ জর্মান পণ্ডিতের মত প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলে, শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত অর্জুনাди সব রূপক মাত্র অর্থাৎ পক্ষ পাণ্ডব একটি পরিহাস ব্যাপারে দাড়াইয়া যায়। (৭) আমাদের দেশের লেখকগণের যে প্রকার পরিশ্রম-ক্ষমতা, পুরাতত্ত্বে যে প্রকার অনুরাগ, জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, তাহাতে অব্যবসায়ীর ‘প্রত্নতত্ত্ব’ পরম্পরার প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা, প্রচার আলোচনা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও শিলাপ্রদ ; পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কাল নির্ণয় অতিশয় জটিল, বিধিষ্ট পরিশ্রম ও গভীরজ্ঞান সাপেক্ষ ; এ বিষয় তিলক তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থ (Arctic Home in the Vedas) বাহা ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য। পূর্বে বিশেষজ্ঞের মতের সমালোচনা হউক, তাহার পর চিন্তা করিয়া নিঃস্বপ্নগবেষণার ফলে, সেই মতের খণ্ডন হউক, ইহাতে কাঙ্ক্ষারও

আপত্তি হইতে পারে না ; এই প্রকার বিধিাবস্থায় মৌলিকতা হীন বা বিগত হইয়া যায় না, বরং সরলতা বিনয় সত্যায় উজ্জ্বল হয় । হিন্দুপণ্ডিতের বিশেষত্ব

নিজের মৌলিকতার খাপন নহে। নিজের গৌরব ক্ষুদ্র করিয়া পরের গৌরব বৃদ্ধি করা। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে বিপুল চেষ্টা, যে নিজের মানমসলা বা ঢাল ভলোয়ার না থাকিলেও মৌলিক হইতে হইবে, যে স্বাধীন আকর্ষণ নিমজ্জিত ভাষাকে বাজার গরম করিবার জন্য একটা বিশিষ্ট মহাজন সাজিতে হইবে। এই কথাগুলি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইল না, আমাদের পরাধীন জাতির চরিত্রতাপরিচায়ক বিশিষ্ট গুণ বা দোষ বিজ্ঞপিত হইল মাত্র। যিনি নিজে প্রকৃত গুণবক্তৃতাশালী তিনি অন্তর গুণে বা নামোন্মেষে অভিতব বোধ করেন না। ম্যাথিউ আর্নল্ড, হার্বার্ট স্পেন্সার, অ্যান্থন ডাউডন, এমি এমার্সন ও কারলাইন, ফরাসী লেখক (M. Scherer), সেন্ট ভিভ (M. Saint Beuve) ও নিসার্ড (M. Nisard) স্বরচিত প্রবন্ধাবলিতে নিজের প্রতিপাদ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য মহাজনের মত ও অভিব্যক্তি উল্লেখ ও মহারতা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মৌলিকতা নষ্ট না হইয়া, নিজের মত সমধিক প্রচলিত হইয়াছে, সাধারণের জ্ঞান শিক্ষাসা উদ্বুদ্ধ এবং শিক্ষার পথও সুবিস্তৃত ও সহজ হইয়াছে।

লেখক “রামায়ণ” ও “মহাভারত” প্রবন্ধদ্বয়ে, কখন বা পূর্ন পরিচিত নিত্য পুণ্যতন, কখন বা পরম্পর-বিরোধী বৃত্তিগুণ, কখন বা বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সম্মুখোপাটিত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা প্রথম রামায়ণ প্রবন্ধেরই সমালোচনা করিব। লেখক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাম কখা প্রথম, হিন্দুদিগের মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না, রাম কখা প্রথমে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর বৌদ্ধ দশরথ জাতক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; জাতক গ্রন্থে রাম ও সীতা তাই ভগিনী; পরে তাঁহারা উদ্ধাহমুদ্রে আবদ্ধ হইলেন; বহু শতাব্দী পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতাব্দীতে প্রচলিত বর্মীক রামায়ণ রচিত। এই সিদ্ধান্তই ‘অবশ্য’ লেখকের নিজস্ব নহে, ইহা ভারতবিদেবী জার্মান পণ্ডিত শ্রীমান্ বেবরের এবং লক্ষ-প্রতিষ্ঠ জার্মান পণ্ডিত লেন্সেন কর্তৃক স্থাপিত। “বৌদ্ধদের দশরথ জাতকের অন্তর্গত কামোপাখ্যান বান্মীক-রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণোক্ত রাম রাক্ষসের যুদ্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরম্পর বিরোধ-বিজ্ঞাপক, রাম ও কৃষিকাষ্য প্রবর্তক বলরাম একই ব্যক্তির নাম, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ও রাম বারণের যুদ্ধ-ব্যাপার গ্রীসদেশীয় হোমর কৃত ইলিয়ড কাব্যের অন্তর্গত হেলেন হরণ ও ট্রয় যুদ্ধের অনুরূপ, বর্তমান প্রচলিত রামায়ণ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর উদ্ভব।

কানীন গ্রন্থ, শ্রীমান্ লেসেন স্পষ্টাক্ষরে শ্রীমান্ বেবুরের এই সমস্ত অভি-
প্রাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন।—

• Prof. Lessen on Weber's dissertation on the Ramayan translated from the German by J. Muir in the Indian Anti-
quary for 1874 p.p. 102 & 103 (অক্ষর কুমার দত্তের “ভারতবর্ষীয়
উপাসক সম্প্রদায়”, দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্টে, ২৬৭ পৃঃ)—“The question
whether the Ramayana was copied from Homer is entirely
meaningless. The fact seems to be that both Homer and
Valmiki have utilized a common mythological stock and
any resemblances between their works only go to prove the
theory of their common origin. It has been pointed out
by Prof Weber that in the Buddhistic Dasaratha Jataka,
Sita is represented as the wife of Rama, and the learned
Professor tells us that this must be an ancient version of
the story, for a marriage with one's sister must be considered
as primeval as Adam himself. *The late Mr. Telang was of
opinion that the Buddhists must have deliberately misrepresen-
ted the story of the Bramhanical Epic and such a perversion
is not improbable*” (Vide Mr. Tilak's Arctic Home in the
Vedas p. 349)—

বলা বাহুল্য যে বিজয় বাবু তাঁহার রামায়ণ প্রবন্ধে বেবুর, লেসেন বা টেলান্দের
নাম পর্য্যন্ত করেন নাট।—নে যুক্তিবলে, হিন্দু-পূজিত বাম্পীকি রামায়ণকে,
নিতান্ত আধুনিক প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাহার মূলে এই কয়টি
কথা আছে ;—“রাম ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের নাম বৈদিকাদি সাহিত্যে নাই,
হুতাদি গ্রন্থে নাই, পাণিনি ব্যাকরণে নাই, অথবা ১৫০ খৃঃপূ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে
নাই।” ইহার উত্তর (১) রামায়ণ ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ইহা পদ্য
রচিত হইলেও ইংরেজের epic নহে ; রামায়ণের মৌলিক ঘটনা ঐতিহাসিক ;
রামায়ণে স্পষ্টতঃ অলৌকিক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক কথা আছে স্বীকার
করি, কিন্তু সে অংশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, তাহা কেন পরিত্যক্ত হইবে ?
রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস, মুসলমান
ইতিহাসবেত্তা ফেরেশতা ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং
অনৈতিহাসিক কৃতান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া
গৃহীত হইয়া থাকে। রামায়ণই বা অনৈতিহাসিক বলিয়া একবারে পরিত্যক্ত

হইবে কেন ? — ইংরেজেরা বা জার্মানেরা রামায়ণ মহাভারতকে Epic বা মহাকাব্য বলিয়াছেন, সুতরাং চিরকাল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের কেবলমাত্র কবি কল্পনা প্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাহি । ভারতের সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই বিজ্ঞান, দর্শন, অভিযান, জ্যোতিষ পদ্যে রচিত ; সুতরাং ঐতিহাসিকও যে পদ্যে রচিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে ; রামায়ণ কাব্যসাংগে ইংরেজের Epic এর মতন হইলেও, ঐতিহাসিক মনুষ্যচরিত্র বর্ণনের সফলতায় কাব্যসাংগে অতীব সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; মেকলে, কার্নাইল্, লানহাউস ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ একপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, তাহা অনেক সময় ইংরেজী হিনাবে, কাব্য বলিয়াই প্রচীরমান হয় । রামায়ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রব্রতবৃদ্ধ সর্বজন মান্য হুম্বদর্শী তিলকের মত এখানে উদ্ধৃত হইল ; — “The main story in the Ramayan is narrated in such detail that on the face of it bears the stamp of a historic origin” (Mr. Tilak's Arctic Home in the Vedas p. 347.)

(২) সমসাময়িক গ্রন্থ বা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে রামাদির নাম উল্লেখ না থাকিলেই যে তাঁহাদের অস্তিত্ব চলিয়া যায়, এমনও নহে ; নানা কারণে, পূর্ণবিস্ময় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য দৃষ্ট হয় না এবং সমস্ত প্রস্তর লিপিরও উদ্ধার হয় নাই, সমস্ত প্রখ্যাত ঘটনাবলী এবং মহাপুরুষগণ যে প্রস্তরাদি-লিপিতে উল্লিখিত হইবে এমনও কিছু সম্ভাবনা নহে ; ভারতের প্রাচীন আর্যেরা একখানে আবদ্ধ ছিলেন না ; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থানে বাস করিয়া বিভিন্ন দেবতা বা মহাপুরুষগণের উপাসক ছিলেন ; যে গ্রন্থকার, বৈয়াকরণ বা শাস্ত্রকার, কৃষ্ণাপসক, তিনি প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক ভাবে, নিজ গ্রন্থে কৃষ্ণাদির নাম, এবং যাহারা রামোপাসক তাঁহারা রামাদির নাম নিজ গ্রন্থে বেশী উল্লেখ করিবেন, ইহাও সম্ভাবনা ; তাহার উপর ভারতীয় গ্রন্থকারদিগের যে প্রকার রীতি, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতের নিত্যস্থি বিপ্লবকারী ঐতিহাসিক ঘটনাও, ভারতীয় সাহিত্যে স্থান পায় নাই ; কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে জালেকজন্দর বা গজেনবী মহম্মদের, নাম গন্ধ নাই, সুতরাং কি বলিতে হইবে ইহারা কবিকল্পনা প্রসূত ; বঙ্গীয় সাহিত্যে বখতীয়ার খিলজির উল্লেখ নাই, সুতরাং কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ইনি মিনহাঙ্গদিনের কল্পনা প্রসূত মাত্র, তাহা যদি না হয়, তবে মিনহাঙ্গদিনের বাক্য বিশ্বাস যোগ্য

হইল কিম্বা ? আর রামায়ণের কথা অবিস্মার্য গোয়া হইল কিম্বা ? এই প্রশ্নে পাঠকগণকে বঙ্কিম বাবু অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহুতথ্য সমন্বিত, বিশিষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল “কৃষ্ণ চরিত্র” পড়িতে অনুরোধ করি। সূত্রাং দেখা গেল, রামোপাখ্যানের মূল বা উৎপত্তি বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে নিহিত নহে। যে কারণে নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম বিরোধী বৌদ্ধরা বৌদ্ধশাস্ত্র লগিতদিক্তর বা সূত্র-পিটকে, কৃষ্ণকে অমুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কারণেই হিন্দুর পূজ্য শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত করিয়াছে। লেখক বলিতেছেন “রামায়ণে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের নামে অনেক কলঙ্কের কথা ছিল বলিয়া, নূতন কবি এই সময়ে আদর্শ রাম চরিত্রে হিন্দুজাতিকে শ্রেষ্ঠতর নূতন আদর্শ দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বড় করিবার জন্যই ইহার কথা ত্রৈলোক্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।” শ্রীকৃষ্ণ তথাকথিত কলঙ্কের কথা ভাগবতে আরও হইয়া ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পরাকাষ্ঠা লাভ করে। বিশেষজ্ঞের মতে ভাগবত পুরাণ ত্রয়োদশ খণ্ডকে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ষোড়শ বা সপ্তদশ খণ্ডকে রচিত হয় ; (এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্র দ্রষ্টব্য)। উইলসন সাহেব বলেন, পুরাণদিগের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত সর্বকনিষ্ঠ—ইহার রচনা প্রণালী আজি কালি ভট্টাচার্যাদিগের রচনার মত। ইহাতে যথী মনসারও কথা আছে। সূত্রাং বিজয় বাবু যখন শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ তুলসীদাসী কৃষ্ণদাসী রামায়ণের সমীপবর্তী বা পরবর্তী হইয়া দাঁড়ায়। কারণ কৃষ্ণদাস পঞ্চদশ খণ্ডকে আবির্ভূত হন এবং আকবরের সমসাময়িক তুলসীদাসের জীবনকাল ১৫৩২ খ্রিঃ অঃ—১৬০৩ খ্রিঃ অঃ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। সূত্রাং উপরিউক্ত বৃত্তিবলে, কোন ক্রমেই প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ খণ্ডকের চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইতে পারে না। সমধিক প্রাচীন বাল্মীকি-রামায়ণে নূতন নূতন বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা রামায়ণের সংস্কৃত টীকাকার কতকাদি স্বীকার করিয়াছেন। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ৮৫ পৃষ্ঠা)। এই প্রক্ষিপ্ত হেতু ইহা প্রমাণ হইল না যে আদিম রামায়ণের মূলোপাখ্যান লুপ্ত বা বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে গুচ্ছিয়া বাছিয়া লওয়া যায় না।

বিজয় বাবু আরও বলেন, প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ প্রচলিত মহাভারতের পরে রচিত।—কিন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে মহাভারতের ভিতর রামোপাখ্যানে বাল্মীকির নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। (বনপর্ব ২৭৩-২৮১ অধ্যায়)।

নং, ১০১০]

মহাভারত ও রামায়ণ ।

৪৯৭

দোণপর্ক ১৪৩ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক, শান্তিপর্ক ৫৭ অধ্যায় ৪০ শ্লোক) — তাঁরপর সহস্ররূপ ধর্ম্মটি হিন্দুজাতির আদি ধর্ম্ম নহে। রামায়ণে উহার প্রচলনের কোন নির্দেশ নাই। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় প্রিয় পত্নী মাদ্রী তাহার চিৎকারোহণ করিয়া প্রাণভাগ করেন কিন্তু রামায়ণে দশরথের নিত্যন্ত অনুরাগ পত্নী কৌশল্যা তাহার স্বামীর অমুসরণ করেন নাই। (উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ ২৪—২৬ পৃঃ— ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে যে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী।

এখন মহাভারতের কথা ; এই মহাভারত প্রবন্ধে, লেখক এই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ;—(১) কুরুপাক্ষণ বুদ্ধ কুরুপাণ্ডব বুদ্ধ কি না, মীমাংসা করা কঠিন ; (২) নূতন মহাভারতে পুরাতন মহাভারত কতদূর রক্ষিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না (৩) “তখন নৈমিগিরপথে বসিয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে (A. D.) কোন হিন্দুপণ্ডিত মহাভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন” • •

পাণ্ডবদিগের উপাখ্যান বনবাস তপস্যাতির কথা, বিজয় বাবুর নব সংস্কৃত মহাভারতে কালোপযোগী বলিয়া সংস্কৃত ।

(৪) যাহা প্রস্তর বা তাম্রাদিতে উৎকীর্ণ হয় নাই তাহা ছিল না বা থাকিবার কোন সম্ভাবনাও নাই ; দান করিলেই তাহা মহাভারত নাম বা মহাভারতের শ্লোক সংযুক্ত হইবে এবং তাহা প্রস্তরাদিতে খোদিত হইবে ; মহারাজ হস্তীর ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের দান লিপির পূর্বে অথচ কোন লিপিতে মহাভারতের উল্লেখ নাই, সুতরাং প্রচলিত মহাভারত ৪র্থ শতাব্দীর পরবর্তী নহে ; লেখক, মহাভারত রচনাকাল নিরূপণে, তাহার এই শেষোক্ত অদ্ভুত প্রতিপত্তির উপর বিষম •

বিস্ময় দিয়াছেন। (১) ও (২) তর্কবিতর্কের মীমাংসা বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্রে দ্রষ্টব্য। বাঙ্গালী বলিয়া হয়তো বঙ্কিম বাবুর নাম কোন কোন পাঠকের নিকটে অগ্রাহ্য হইবে। তবে বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে পারি, হা হিন্দের কাছে বিলাতী সবই ভাল, বাহার ইতুক বিলাতী পণ্ডিত লাগিয়ে সিলাতী কুকুর সকলেরই সেবা করেন, দেশী প্রবন্ধ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাহাদের সুকরণ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বঙ্কিম বাবুর নাম উল্লিখিত হইল না। আমরা বঙ্কিম বাবু মহাভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ (specialist) বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। স্মৃতিতে পাই তিনি কৃষ্ণচরিত্র লিখিবার পূর্বে, ৭ বার মূল মহাভারত দানি পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণ

৩ পঞ্চপাণ্ডব সংযুক্ত মহাভারতের কাল নির্ণয়ে দেশী বিদেশী অনিকাংশ
 পণ্ডিতের সিদ্ধান্তগুলি বিশিষ্ট ভাব সমালোচনা করিয়া
 পরে বিবিধ বৃত্তি দিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সকল প্রমাণ
 খণ্ডন করা শুধু ইহলোকে গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না,
 “চন্দ্রার্কে বত্র সাক্ষিণী”—সেই অখণ্ডনীয় জ্যোতিষিক প্রমাণ বলে
 “অরনচলন” (Precession of the Equinoxes) হিসাবে, তিনি কৃষ্ণত্র
 যুক্ত সময় খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর বা খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর নিরূপণ করিয়াছেন ;
 (Vide also Mr. Telak's Orion P. 39 and Arctic Home in
 the Vedas pp 75 & 76) ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কালনির্ণয়ে,—এই জ্যোতি-
 ষিক প্রমাণ সংগ্রহ পক্ষে,—বন্দ্র সম্ভব, বঙ্কিম বাবুই অগ্রণী, আজকাল
 ভারতীয় জ্যোতিষী ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ কেংকার ও তিলক, দীক্ষিৎ প্রভৃতি এই
 পথের পথিক ।—গোলডষ্টেকর, মোক্ষমূলর, ডাক্তার মার্টিনহোপের সিদ্ধান্ত-
 পরম্পরা মিলাইয়া বঙ্কিম বাবু পাণিনির সময় খৃঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দীর
 স্থির করিয়াছেন। আবার পাণিনিতে যুধিষ্ঠির, কুন্তী, বাসুদেব ও অর্জুনের
 নাম পাণ্ডব বায় ; সুতরাং ঐষ্টের সহস্রাবিক বৎসর পূর্বে পঞ্চপাণ্ডব সংস্রষ্ট
 মহাভারত প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, দ্বিজবাবু অসীম-
 সাহসে এবং অজ্ঞের প্রমাণ বলে, হিন্দুর মীতা রামকে বান্দীকি রামায়ণ
 হইতে বৌদ্ধ “জাতকারণো” নিরূপিত করিয়াছেন, অধুনা আবার কি
 বৃত্তিবলে বা কোন্ সাহসে তিনি ঐদিব মহাভারতের অস্বিমজ্জা কৃষ্ণাশ্রিত
 পঞ্চপাণ্ডবকে আদিম মহাভারত হইতে নিরূপিত করিয়া তাহাব নবাবিদ্ভত
 মহাভারতে স্থান দিলেন তাহাও একবারে বৃত্তিতে পারিলাম না। “রামকৃষ্ণ-
 গোপাল ভাণ্ডারকার প্রদর্শন করিয়াছেন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে
 কৃষ্ণপাখ্যান হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল,” যখন কৃষ্ণ পূজিত তখন
 তদাশ্রিত অর্জুনানি সেই সঙ্গে ছিলেন, ইহাও সম্ভাবিত। “এই সমুদয়
 (পঞ্চালি মহাভাষা) পর্যালোচন করিয়া দেখিলে পতীরমান ইহা উঠে যে
 পতঞ্জলির সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে কৃষ্ণপাখ্যান
 সচরাচর প্রচলিত ছিল ; এমন কি ঐ সময়ের পূর্বে কৃষ্ণ বিষয় অবগত
 করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থে প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।
 শ্রীমান্ লেনেন পর্যালোচনা পূর্বক মহাভারতটুকু (চরিত্রাদি) কৃষ্ণপাণ্ডবের
 সুস্বক বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমান করেন ; সুতরাং নিগাণ্ডিনিসের সময় অর্থাৎ

মাঘ, ১৩১০]

রাগারিণ ও মহাভারত ।

৪৯৯

যুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এইরূপ
 বিবেচনা করেন ।” উপাসক সম্প্রদায় ২২৭-২৩০ পৃঃ (Vide also Tiluk's
 Arctic Home in the Vedas p. 69) এই প্রবন্ধ নিবন্ধ নোনাংনা ও বুদ্ধি
 নিতান্ত জড়াপট্‌কি রকম ।—লেখক একস্থানে বলিতেছেন আদিম মহাভারত
 ‘লুপ্ত’ আবার বলিতেছেন “বৈশম্পায়ন রচিত মহাভারত-কথা নইরা মহাভারত-
 সংহিতা রচিত” ; আবার বলিতেছেন “প্রাচীন বৈশম্পায়নের মহাভারত
 কি প্রকার ছিল জানি না”—অর্থাৎ আদিম মহাভারত আছে কিন্তু আগা
 পাছতলা সবই বদলাইরা গিরাছে এবং তাহাতে পরগাছা কুসার্জুন
 আসিয়া শিকড় গাড়িয়াছেন । এই সম্পর্কে একটি হাঁকো চুরীর মামলার কথা
 মনে পড়িল । মামলাটি হাঁকোচুরীর ;—হাকিম পদে ও গৌরবে ডেপুটী ;
 ভদ্রলোকের নামে হাঁকোচুরির নালিশ ;—হাকিম লোকটি ভাল ; ভদ্রলোকের
 নামে হাঁকোচুরীর নালিশ, বিদ্বান সহজে করিতে না পারিয়া সাক্ষীকে ধমকাইয়া
 বলিলেন “দাখ—বেশ ভাল করিয়া দাখ—যে হাঁকাটি চুরী গিরাছে, সে
 এই হাঁকাটি কি না ?” সে অনেকক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে দেখিয়া বলিল “হাঁ
 ছজুর সেই হাঁকাই বটে, তবে ঘোষ হচ্ছে বেন নল্‌চটা বদল কেলিয়াছে ;”
 তখন সাক্ষীটা আবার ধমক খাইয়া বলিল “ছজু, এখন দেখিতেছি চোর
 বাটা হাঁকোর খোল্টাও বদলাইরা ফেলিয়াছে ;” তখন হাকিম অতি
 রোষভরে ফের ধমক দিয়া বলিলেন “তবে এই হাঁকোটা চোর মাল হইল
 কি প্রকারে ?” তখন সাক্ষীটি অতি বিনীত ভাবে হাতঘোড় করিয়া বলিল
 “ছজুর বে চুরী করে সে কি দর পড়বে বলিয়া চুরী করে—তার পর এই
 চোরটা শেয়ানা পকো চোর—হাঁকোর নল্‌চ ও খোল্টা একবারে বেমানম
 বদলাইরা ফেলিয়াছে” । বলা বাহুল্য আসানী,—সন্দেহের গুরুত্ব, বিচারে
 খালাস পাইল ।—এখন বিজয় বাবু ধৃত, সেই কষ্টিং হিন্দু পণ্ডিত, গিনি,
 নৈমিষারণ্যে বৃনিয়া, সেই চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকাস্তুক মহাভারতখানি চুপে
 চুপে, এক রাত্রির ভিতর, নূতন লক্ষাধিক শ্লোক বেমানম বদলাইরা ফেলিলেন,
 তিনি পাঠকের বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন কি না, জানি না ।—বিজয়বাবু
 আমাদের পরমাত্মীয়, অন্তঃকর বন্ধু ; তিনি হয়ত বিষয় কার্যের গুরুভারে,
 নিতান্ত তাড়াতাড়িতে, প্রবন্ধ দুইটা লিখিয়া থাকিবেন ; কিন্তু সমালোচ্য বিষয়
 নিতান্ত গুরু বলিয়া, সমালোচনাটি—কর্তব্যের খাতিরে—কিষ্টিং তীব্র হইয়া
 পড়িল ।—আশা করি, লেখক নিজগুণে, এই মত সমালোচককে ক্ষমা

করিবেন ।—পুরাতন, বর্তমান সমালোচকের জন নিভাত হীন ; বিজয়
বাবুর প্রবন্ধ দুইটা বুদ্ধির অল্প মাত্রা সারা ভেঁটা করিয়াছে, বলিতে পারি না
ঠিক বুঝিয়াছি কি না । এক্ষেত্রে আমাদের মতন লোকের আশ্রয় বাহনীর
নহে, তবে এখন দেখিলাম “নাহিতা” এবং “মঞ্জুনী” প্রবন্ধদ্বয়কে কেবল
উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিনয় দিলেন, অথচ প্রবন্ধদ্বয় আমাদের হিন্দু ও
ব্রাহ্মের প্রচলিত প্রিয় বিশ্বাস ও ধারণাকে আঘাত করিল ; হিন্দু দেবদেবী
শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাকে ব্যতিচারে লিপ্ত করিল ; হিন্দুর গোবরময় পবিত্র
স্থতিকে ক্ষুর ও কনুচিত করিতে প্রসাসী হইল, তখন, নিজের অনামর্শ
জানিয়া, সমালোচ্য বিষয়ে নেশনৌ ধারণে অগ্রসর হইতে হইল । আশা করি
কোন যোগ্যতর ব্যক্তি সমালোচ্য বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইবেন ।
তবে বিজয়বাবু ও আমরা উভয়েই, মোক্ষমূলরের কথা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত
করিয়া বলিতে পারি—“We have stepped out (rather too boldly)
of our own domain, even at the risk of being called an
interloper, an ignoramus, for whatever accidents we may
meet with ourselves, the subject is sure to be benefited”

ও তৎসৎ ব্রহ্মপণনস্ত ।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়

কাটোয়ার পথে ।

মতা গল্প ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

—(::)—

• আমি দীর্ঘি পার হইয়া অপর পারে যাইলাম । সেখানে দাঁড়াইয়া গাড়ি
দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পরাগ বাগ্গীকে দ্রুতগতিতে আসিতে দেখিলাম ।
মুনে মনে ভাবিলাম, আমি একাকী অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি । এক্ষণে
বোধ হয় বাবু সানার অনুসন্ধান জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পরাগকে পাঠাইয়া
দিয়াছেন ; বাস্তবিক সেই অন্তই পরাগ দ্রুত আসিতেছিল । পরাগ আসিয়া
পৌঁছিলে আমি তাহাকে দৃষ্টির কথা বলিলাম ; পরাগ বাগ্গী একটা

মাঘ, ১৩১০]

কাটয়ার পথে ।

১০১

মহাবিকট ছন্ধার চাড়িয়া দস্থ্যকে ধরিতে গেল, কিন্তু অল্পনম্বর মধ্যেই সেই ক্রমবিকাশিত বদনারেঙ্গ একটা খর্জুর বনে প্রবেশ করিয়া অন্তঃস্থ হইল । আনি পরাগকে কহিলাম, বনের ভিতরে গিয়া উহার পশ্চাদ্ভাবন করা ভাল নহে, কারণ বনের ভিতরে উহাদের দল থাকিতে পারে । পরাব আমার অনুরোধে দস্থ্যর আর পশ্চাদ্ভাবন করিল না । অনেকক্ষণ পরে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে, বাবুকে সকল কথা শুধাইলাম ; আনি একাকী আনিরাছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন । আমরা আবার গাড়ী যোগে সাবধানে বাইতে লাগিলাম । সেখানে সূর্যাস্তের সময় উপস্থিত হইল, সেখানে একখানি ক্ষুদ্র চটি ছিল । সেই চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম । ভোজনের জন্য মোটা চাউলের ভাত, বিরি কলাইয়ের ডাল (তাহা এত পাতলা যে গঙ্গা যমুনার একত্র মঙ্গম বলিলেই হয়) ! বাস্তবিক দধি, পোস্ত ও লঙ্কা বাটী সহ বড়ি ভাজা এবং আলু, বেগুন ও বড়ির সহিত পুরাতন ভেঁতুলের “টক” ! সুখ থাকিলে ঘানও অমৃত বলিয়া বোধহয়, স্মরণ্য তৃপ্তি কম হয় নাই ।

সেই চটিতে সেই দিবস দুই জন পশ্বিক আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল । ইহারা গুজরাট দেশের লোক ; মুন্ডা, অনঙ্গার ও সুপারি বিক্রয় করিবার জন্য নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বর্ধমানের দিকে আসিতে-ছিল । ইহাদের এক জনের সঙ্গে তাহার সহধর্ম্মিণীও ছিল । ইহারা দুই চারিটা আসল মুন্ডা সঙ্গে রাখিয়াছিল, বাকি মুন্ডা গুলি ভেঁত (নকল) ; অনঙ্গার গুলি গিল্টির তৈয়ারী, দেখিলে খুব ভাল সোণার গহনা বলিয়া বোধ হয় । পরাগ্রামের নিরক্ষর ও নিকোঁধ লোকদিগের নিকটে গিয়া ইহারা অল্প মূল্যে ইহা বিক্রয় করে এবং তাহারা খুব আগ্রহ সহকারে এই সকল জিনিষ খরিদ করিয়া লয় । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এদেশে এখনকার দিগে এক পরসায় ২৫টা সুপারি পাওয়া যায় ; এত দূরদেশ হইতে তোমরা সুপারি বিক্রয় করিতে আসিয়াছ কেন ?” তাহারা বুলিল “আমাদের সঙ্গে ১৪ প্রকার সুপারি আছে, এই দেখ আপনাদিগকে দেখাই ।” এই বলিয়া তাহাদের এক ব্যক্তি গট্টরী খুলিয়া ১৫ প্রকার সুপারি দেখাইল । পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সুপারির তালিকা দিলাম । ১ম কাঁচা সুপারি (মায় ছোবড়া), ২য় কাঁচা সুপারি (ছোবড়া খোঁলা), ৩য় শুক সুপারি (গোটা), ৪র্থ খুব পচা ও খুব পুরাতন সুপারি (ওদের জন্য) ৫ম সুপারি কুচো, ৬ষ্ঠ খুব সূক্ষ্ম করিয়া কাটা সুপারি, ৭ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূত্রের তার কাটা

সুপারি, ৮ম অতি সূক্ষ্ম সুপারি চূর্ণ, ৯ম সুপারির আরক (জীর্ণকারক), ১০ম সুপারির মোরক্বা, ১১শ খদির ভিজান জলে, ১২শ সুপারি অগ্নিতাপে পাককরা (মাদ্রাজী লোকেরা ইহা ব্যবহার করে), ১৩শ গোলাপজলে গুজরাটের পূর্ব ছোট সুপারি সিদ্ধ, বিশেষ সুগন্ধিবুদ্ভূত । ১৪শ কচ্ছদেশের লম্বালম্বা সুপারির “আচার” (কাসন্দি), ১৫শ কাঁচা সুপারির কষায় (অল্পশূল রোগের মহৌষধ) ।

আমরা কাটোয়া হইতে বর্ধমানের ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম, দম্ভারা পশ্চিমবঙ্গে এই তিনজন লোককে নিহত করিয়াছিল । এষ্ট ভয়ানক রাহাজানীতে কোথাকার একটা পুলিশ দারোগা এবং একজন কনেষ্টেবল সম্মিলিত ছিল । গির্জার গহনাকে সোণার গহনা এবং নকল মুক্তাকে আসল মুক্তা ভানিয়া দম্ভারা ইহাদিগকে বধ করিয়াছিল । বর্ধমান মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে এই মোকদ্দমা চলিতেছিল । কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া জানিয়াছিলাম দারোগার সাত বৎসর এবং কনেষ্টেবলের তিনবৎসর কারাদণ্ডের ছকুন্, জজ সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল । তখন কলিকাতায় হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সমাচারপত্র ছিল না ; বাঙ্গালায় “সোমপ্রকাশ” ভিন্ন প্রকৃত সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র এবং “বিজ্ঞান মিহিরোদয়” ভিন্ন মাসিকপত্র ছিল না ; হিন্দু পেট্রিওট, সোমপ্রকাশ, বিজ্ঞান মিহিরোদয় এই তিন খানি পত্রে এই সম্বাদ পাঠ করিয়াছিলাম ।

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার কাটোয়া অভিমুখে বাইতে লাগিলাম । বাবু কহিলেন “যদি বিষয়া বিপদ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে অদ্য অপরাহ্নে কিম্বা সন্ধ্যান্তের কিছু পূর্বে কাটোয়া পৌঁছিতে পারিব ।” কিন্তু মধ্যাহ্নকালে, আমাদের হুঁতগাবণতঃ, আমাদের গাড়ীর একটা চাকা ভাঙ্গিয়া গেল । আমরা অনেক কষ্টে নিকটবর্তী একটা গ্রামে গেলাম, সেই ক্ষুদ্র গ্রামে একজন তান্ত্রিক সাধু ছিলেন, তাঁহারই আশ্রমে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম । তিনি অপর একখানি পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে একজন মিজি আনায়েয়া আমাদের গাড়ীর চাকো সেরামত করিয়া দিলেন । আমরা তাঁহার আশ্রমে রাত্রি বাপন করিলাম ।

রজনী সার্ক একাদশ ঘটিকার সময়, আমরা নানা কারণে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলাম, ঐ তান্ত্রিক সাধু বাস্তবিক “সাধু” নহে, সে ব্যক্তি ডাকাইতদিগের অস্ত্রতম সঙ্গী । ডাকাইত, দম্ভা ও রাহাজানেরা, চোরাই মাল ও ডাকাইতি

মাঘ. ৩১০ ।

মেঘদূত ।

৫৩

মাল ইহারই হাত দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে । বাহাইউক, পর দিবস নানা ছে
আমরা ভাগিরথীতীরবর্তী কাটোয়া নগরীতে উপনীত হইয়া নিখাস ছাড়িয়া
বাঁচিলাম । গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্বক বাবুকে কহিলাম “রাত্তার কেবল
মাঠ আর ডাকাত !! এমন দস্যুভরা দেশ আর ভ্রমণে নাই !!”

কাটোয়া নগরী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ মহকুমা ।
বাণিজ্য ও ব্যবসার জন্য ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তন্নিবনৈক্যদিগের ইহা একটি
তীর্থভূমি । এখানকার জীলোক ও পুরুষদিগের বাদ্যনা ভাষা এবং
উচ্চারণ প্রথা, কলিকাতার বাদ্যনা ইহাতে স্বতন্ত্র । কথা খুব কর্কশ । কবির
দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার “সুরধুনী” কাব্যে লিখিয়াছেন—

“কাটোয়ার কাঁঠ ভাষা কণ্টকের দার ।”

“মেয়ে বলে বনিতার ওকারে আকার ॥”

আমরা কয়েক সপ্তাহ কাল কাটোয়ায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ।
এখনকার দিনে কাটোয়া ঘাইবার অনেকটা সুবিধা হইয়াছে । কলিকাতা
হইতে ষ্টীমারে কাটোয়া যাওয়া যায় এবং বর্ধমান হইতে উটের গাড়ীতে
কাটোয়া ঘাইবার উত্তম উপায় আছে । সে সময়ে এ সকল কিছুই ছিল না ।
রেলওয়ে হইবার কথাও শুনা যাইতেছে । ভারতবিজয়ী দয়াময় বৃটিশ গবর্ণ-
মেন্টের শত দোষ আছে স্বীকার করি । কিন্তু সহস্র—লক্ষ—কোটি গুণও
আছে । বৃটিশ শাসনে দস্যুর সংখ্যা কম হইয়া আসিয়াছে, এবং সর্বত্র নির্ভয়ে
গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে, ইহা ইংরাজ শাসনের অন্ততম প্রধান গুণ ।

সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীমানন্দ মহাভারতী ।

মেঘদূত ।

পরিশিষ্ট ।

অগ্নিনাথের সময় সঠিক এখনও জানা যায় নাই । কয়েকটা কারণে
অনুমান করা যায় যে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে টীকাগুলি লিখিয়া-
ছিলেন । সময় নির্ধারণের জন্য যে যে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম টীকায়
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে অগ্রাঙ্গী সীমা নির্ধারিত হইতে পারে ।
পৃষ্ঠিকের স্রোতাবে মেঘদূতের টীকায় সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের

নাম ও যে শ্লোকের টীকায় উল্লেখ তাহার বর্ণানুযায়ী তালিকা নিম্নে দিলাম।
রঘুবংশের টীকায় ঐ রকম তালিকা শঙ্কর পাণ্ডুরাং পণ্ডিত তাহার রঘুবংশের
সংস্করণের শেবে দিয়াছেন (vol III., Index pp. 8-12) । শ্লোকীর টীকায়
যদি কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকার একবারের উক্ত উল্লেখ হইয়া থাকে তবে সেই
সংখ্যা ক্ষুদ্র বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইয়াছে ।

অঙ্গুষ্ঠা কোষ—২১ ।

অভিধানাৎ।—৮৯ অধিকারস্থত—১১২ ।

অনর [কোষ]—১ (২), ২, ৩, ৪, (৩), ৫, (৩), ৬, (২), ৭, (৩), ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩,
১৪, (২), ১৫, (২), ১৬, (৩), ১৭, (৪), ১৮, ১৯, (৩) ২০, (৩), ২১, (২) ২২ (২), ২৩, ২৪,
(২), ২৫, ২৬ (২), ২৭ (৩), ২৮ (৪), ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ (২), ৩৯, ৪০ (২),
৪১ (২), ৪২, ৪৩, (৩), ৪৪, ৪৫, (২), ৪৬, ৪৭, (৩), ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ (২), ৫২, ৫৩,
৫৪, (২), ৫৫, ৫৬, (৩), ৫৭, ৫৮, (২), ৫৯, ৬০, (৩), ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, (৩), ৬৫, ৬৬,
৬৭, ৬৮ (২), ৬৯, ৭০ (২) ৭১, ৭২, (৩) ৭৩, ৭৪, (২), ৭৫ (২), ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১ (৩), ৮২, ৮৩, ৮৪,
৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, (২), ১০৩, ১০৪, (৩), ১০৫, (২), ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০ (৩), ১১১, (২) ১১২,
১১৩ (২), ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, (২) ।

অলঙ্কার সর্গ	২৩, ৮৫ (অংকার) ।	পতাকা	১০২ ।
অশোক কল্প	৮৪ ।	পানিনীয়	২৩ ।
উচ্ছল	৩ ।	ভবভূতি	৩২ ।
উৎপল বঃ উৎপলমাল্য	১৬, ২৮, ৮৮ ।	ভাষ্য	১০৭ ।
• ঐক্যবলী	৪৬ ।	ভাষ্যকার	৫৯, ১১৩ ।
কর্ণোদয়	৯ ।	ভোজরাজ	৪০, ১০৪ ।
কামন্য (বাৎসায়ন)	৮৮ ।	বদিকার্য	৭২ ।
কালিকা	৮২, ৮৬ ।	ময়ূ	৫২ ।
• ক্ষীর স্বামিন্	৫৮, ৬২, ১১৪ ।	মালতীমাল্য	৬৭, ১০২ ।
• চন্দ্র ব্যাকরণ	২৬ ।	মালবিকাগ্নিমিত্র	২২ ।
দণ্ডি	৩, ৬, ২৬, ৮৯ ।	বাদ্য	৯ (২), ১০, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ২৩, ২৪, ৩২, (২), ৩৬, ৩৭, ৪৭, (২), ৫১, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭ (২), ১০৯, ১১১ ।
দশরূপক	৩২, ৪৩ ।	রঘুবংশ-সম্মিলনী	২১ ।
দিগনাগাচার্য	১৪ ।	রত্নরহস্য	৩০, ৮৮, ১০২ ।
নাথ	৪, ৬৯, ১০৭, ১১৬ ।	রত্নসর্গ	১০৩ ।
নিচুল	১৪ ।	রসরত্নাকর	২২, ২৪, ১০৩, ১১০ ।
নিমিত্ত নিদান	১১, ১৭, ১০১, ১০২ ।	রসাকর	৮৩, ১০৬, ১১৮ ।
• নিকরুতকার	৫০, ৮৩ ।	রস	৪, ৫৮ ।
• নৃত্য সর্গ	৩৩ ।		
ভাব	৪ ।		

মাস, ১৩১০ ।

মেঘনুত ।

১৫০৫

বাগ্‌ভট	১৩, ২০ ।	বৈষ্ণব	৩০, ৪২, ৭২ ।
বানন	৪, ৪২, ৫৩, ৮৮ ।	শব্দার্থ... ১ (২), ২, ৩, ১০, ১১ (২), ১৫,	
বিষ বা বিষপ্রকাশ	৩ (২), ৬, ৯,	১২ (২), ২১ (২) ২৩, ২৪, (২), ২৬, ২৭, ৩২.	
১২, ১৪ (২), ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৪,		৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৭,	
২৫, ৩৩, ৩৯, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৮, (২), ৫৯,		৬০, ৬১, ৬৬ (২), ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৪,	
(২), ৬০, ৬২, ৭৩, ৭৪, (৩) ৮৮, ১০২, ১১১,		৭৫, (২), ৮৪, ৮৭, ৯৪, ১০৪ (২), ১১১, ১১২,	
১১২, ১১৫, ১১৮ ।		১২০ ।	
শঙ্করহস্ত	৪৭ (২), ৫২, ৬৪, ৭৭ ।	সামুদ্রিক	৮৮ ।
শব্দত	২, ৩১, ৩৫ ।	সরস্বতালঙ্কার	১২১ ।
শ্রীচর্য	১০৭ ।	কান্দ	৩৭ ।
সংগীত রসাকর	৯২ ।	হলায়ুধ	২, ৪, ২৭, ৩৭, ১০৮ ।

উপরি উক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রানুযায়ী বাছাই করিয়া
নিম্নে দিলাম । যে নাম গুলি রঘুবংশের টীকায় নাই, তাহাতে (নু) চিহ্ন
দেওয়া গিয়াছে, ও যত বার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার নোট দেখান গিয়াছে ।

ক । অভিধান বা কোষ	বার	(৪) দশরূপক	২ ।
(১) অক্ষর কোষ (নু)	১ ।	(৫) পতাকা (নু)	১ ।
(২) অমরকোষ	১৩৭ ।	(৬) ভোজরস	২ ।
(৩) উৎপলমালা (নু)	৩৬ ।	(৭) সরস্বতালঙ্কার (নু)	১ ।
(৪) কীর্ত্তামিন্	৩ ।	গ । কবি বা কাব্য ।	
(৫) মালতীমালা (নু)	২ ।	(১) কর্ণোদয় (নু)	১ ।
(৬) ফাদব	২৪ ।	(২) নিচুল (নু)	১ ।
(৭) রত্ন (নু)	২ ।	(৩) শব্দভূতি (নু)	১ ।
(৮) বিষ বা বিষপ্রকাশ	৩৬ ।	(৪) ভাষ্য (নু)	১ ।
(৯) বৈষ্ণব	৩ ।	(৫) মালবিকাগ্নিমিত্র (নু)	১ ।
(১০) শব্দার্থ	৫০ ।	(৬) শ্রীচর্য	১ ।
(১১) শব্দত	৩ ।	ঘ । কামশাস্ত্র ।	
(১২) হলায়ুধ	৫ ।	(১) কামশাস্ত্র	১ ।
(১৩) “অভিধানাং”	১ ।	(২) মৃত্যুসংকল্প	১ ।
খ । অনঙ্গার ।		(৩) রত্নহস্ত (নু)	৩ ।
(১) মল্লভার্য সংকল্প (নু)	১ ।	(৪) রত্নসংকল্প (নু)	১ ।
(২) একাবলী (নু)	২ ।	(৫) রসরত্নাকর (নু)	৪ ।
(৩) পতি	৩ ।	(৬) রসাকর (নু)	৩ ।

(১) সজ্জীভূতাকর (নু)	১ ।	(২) টেক্সন (নু)	১ ।
ড ।		(৩) ক শিলা	১০ ।
(১) নাদ	৪ ।	(৪) চন্দ্রবাকরণ (নু)	১ ।
(২) রঘুবংশ-সজ্জীবিনী	১ ।	(৫) নিরুদ্ভাকর (নু)	২ ।
চ ।		(৬) প দিনীয়া (নু)	১ ।
(১) বিগনাগাচাৰ্য (নু)	১ ।	(৭) ভাষাকর	২ ।
(২) নায় (নু)	১ ।	(৮) বামন	৪ ।
ছ ।		ঞ ।	
(১) নিমিত্তনিধান (নু)	৪ ।	টৈদ্যকশাস্ত্র ।	
(২) সামুদ্রিক (নু)	১ ।	(১) অপোককর (?) (নু)	১ ।
জ ।		(২) মদিয়াৰ্ণব (নু)	১ ।
(১) শঙ্করহস্ত (নু)	৫ ।	ট ।	
(২) কান্দ	১ ।	স্থিতি ।	
ঝ ।		(১) মনু	১ ।
(১) অধিকার হস্ত (নু)	১ ।		

প্রবাদ আছে যে মল্লিনাথের “মাঘে মেঘে গতং বসঃ” মাঘের টীকা সঙ্কল্পনা, ও মেঘদূতের টীকা সজ্জীবিনী করিতে তাঁহার বয়স কাটিয়া যায়। উপরি উক্ত তালিকা হইতে অস্তুতঃ এইটুকু প্রকাশ যে মেঘদূতীয় টীকার পূর্বে রঘুবংশ-সজ্জীবিনী রচিত হইয়াছিল ও মেঘদূতীয় টীকা তিনি অনেক নূতন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীমঃআইন চক্রবর্তী ।

মায়া ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভজবে, মানস মন, অনাদি কাণ ।

ভক্তিভরে জীব তরে খাট অক্ষয় ॥

আনন্দ অপার তার স্বার্থ নাহিক মার

পরার্থে হৃদয় যার হস্তেছে মগন ॥

জীব ব্রহ্ম, পূজা প্রেম,——প্রেম নিকাম করম ;

নিকাম কল্পমে ভজরে, মন, ব্রহ্ম সনাতন ॥

মাঘ, ১৩১০]

মায়া ।

৫০৭

সেবানন্দ স্বামী নরেশের গৃহে প্রবেশ করিলেন । নরেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন । সেবানন্দ স্বামী বসিলেন এবং বলিলেন বৎস ! তোমার জ্ঞাত প্রবোধ বাবু এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন ।

নরেশ । আমি রাজা ভূপেশের পুত্র আমি ভিক্ষা লইব !

সেবানন্দ । ভিক্ষা নহে, হাওলাত । যখন সুবিধা হইবে তখন এটী ধন শোধ করিও । আর, যখন বাহা আবশ্যক, প্রবোধ জানিতে পারিলে তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন ।

নরেশ । আমি কি পাষণ্ড ! এই প্রবোধ বাবুকে আমি আমার গৃহে অপমান করিয়াছি । তাঁহার টাকা আমি কোন্ মুখে লইব ? আপনি টাকা ফেরত লইয়া যান ।

সেবানন্দ স্বামী । বৎস ! অভিমান ত্যাগ কর । মহামায়ার মোহে, কোন্ জীব, কোন না কোন সময়ে, না অভিভূত হয় ? প্রবোধ তোমাকে পূর্বেও যেমন ভালবাসিত এখনও তোমাকে তেমনি ভালবাসে । আর আমার গুরুজীর তোমার উপর রূপা আছে । তিনি বলিয়াছেন পরিণামে তোমার মঙ্গল হইবে ।

নরেশ । আপনার গুরুজী কে ? কোথায় থাকেন ?

সেবানন্দ স্বামী । তিনি সন্ন্যাসী, হরিদ্বারে থাকেন ।

নরেশ । আমাকে কিরূপে জানিলেন ?

সেবানন্দ । জানি না । কিন্তু তোমার বিষয় তিনি অনেক সংবাদ রাখেন ।

নরেশ । কেন ?

সেবানন্দ । গুরুজী তাহা বলেন নাই ।

নরেশ । আপনার গুরুজী যিনিই হউন, তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবেন ।

সন্ন্যাসী নরেশের হস্তে এক হাজার টাকার নোট দিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । ‘এমন’ সময় প্রবোধ বাবু আসিলেন । নরেশ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । প্রবোধ বাবু নরেশকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন ।

প্রবোধ । এই বাঁটাতে তোমার কষ্ট হইতেছে । আমার বাটাতে আইস । আমি তোমার বড় ভাই মনে রাখিও ।

নরেশের চক্ষু আর্দ্র হইল । বলিলেন “আমি নরাধম, তুমি নিজ গুণে

আমাকে ক্ষমা করিয়াছ" । প্রবোধ বাবু অনেক বলিয়া কহিয়া নরেশকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন । সেই বাটীতে একগুণে কুমুদিনী এবং মায়াও আছেন ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

হর্গে ! স্বতা চরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বতৈঃ স্বতা মতিমতীব তুভাং দদাসি ।
দারিদ্র্যহঃখভরহারিণি ! কা স্বদন্তা,
সর্কোপকারকরণার সদার্জচিন্তা ॥

মহেশ মন্দিরে ।

মহেশ অমাবস্তা রাত্রিতে তটিনী তটে, সেই শ্মশান-কালীর মাঠে আসিল । রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে । চতুর্দিক নিস্তর । কেবল মাত্র বাতাস সোঁ সোঁ করিতেছে—আর, দূরে শিবারব স্রুত হইতেছে । সে রাত্রিতে মহেশ সেই বিশাল প্রান্তরে বিরাট কৃষ্ণক-সভায় বস্তুতা করিয়া এক অপূর্ণ উত্তেজনার তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল, সেই রাত্রির কথা তাহার মনে পড়িল । সেই লোকারণ্য, সেই হাজার হাজার মশাল, কৃষ্ণকদিগের ফুর্তি—আর গগনভেদী “জয় মহেশজী কি জয়” ইত্যাদি হুঙ্কার ; আর বস্তুতার সময় নিজের পবিত্র আবিষ্ট ভাব—সব যেন কল্পনা চক্ষে দেখিতে পাইল । • এই সময়ে নিকটে কে যেন “বম্ ভোলানাথ” বলিল । তাহাতে মহেশের চমক ভাঙ্গিল । কিন্তু দেখিল, আজ সেই মাঠে জন প্রাণী নাট, সব নিস্তর—মহেশ চারিদিক আবার দেখিল । কাহাকেও দেখিতে পাইল না । তাহার পর জঙ্গলের সেই মন্দিরে গেল । একটি ক্ষীণালোকে দেখিল যে, সেই সন্ন্যাসী ধ্যানের নিমগ্ন আছেন । মহেশ সম্মুখে গিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিল । সন্ন্যাসী চম্ খুলিয়া বলিলেন “বৎস কি চাহ ?”

মহেশ । একগুণে আমি কি করিব ? আবার প্রজাবিজ্রোহের চেষ্টা করিব কি ? সন্ন্যাসী । মা কালীর আরাধনা কর ।

মহেশ সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া মা কালীর সম্মুখে আসিল । সেখানেও একটি দীপ জলিতেছে । করালবদন ভীমা চণ্ডী রণবেশে দাঁড়াইয়া যেন হাসিতেছেন । মহেশ কৃত্তান্তলিপুটে বলিল —

মাঘ, ১৩১০]

মায়ী।

“মা ! আমি আবার তোমার কাছে আসিয়াছি । আমি এক্ষণে কি করিব ? আবার কি গুঁগার গাঁর গরিব প্রজাদিগের ঘরে ঘরে ফিরিব ? আবার কি বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে দিব ? যদি আবার বিদ্রোহের আগুন জলে, তাহাতে অত্যাচার পুড়িবে, না প্রজারা পুড়িবে ? আগে যে অত্যাচার ছিল তার চেয়ে যে অত্যাচার বেড়েছে ! যদি বিদ্রোহে প্রজাদিগের কোন উপকার হবে না, তবে কেন আমাকে এ মতি দিয়াছিলে ? এই বিদ্রোহের জন্য আমার নিরপরাধী পিতার প্রাণ গেল, আমাদের পরিবারের ইজ্জত গেল, আর আমার স্ত্রী, আমার ভগ্নী এক্ষণে পথের কাঙ্গাল । মা ! তুমি নরবলি চাহিয়াছিলে, তাই কি আমার পিতার বলি হইল ? আমাকে বলি দিলে না কেন ? আমাকে বলি দিয়ে প্রজাদের কেন বাঁচাইলে না, তাহাদের দুঃখ কেন ঘুচাইলে না । আমি যে ছুঃখী-প্রজাদের কিছুই করিতে পারিলাম না ; কেবল তাহাদের মজাইলাম, তাহাদের দুঃখ বাড়াইলাম । মা, তুমি ত জান, তোমার সন্তান বিপদে ভীত নহে । মা আমাকে ব’লে দেও এক্ষণে কি করিব । বিদ্রোহ না শাস্তি ?”

মা ত কিছুই বলিলেন না । মহেশ চক্ষু নিম্নলিখিত করিয়া মা কালীকে ধ্যান করিতে লাগিল । ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইল—গাঢ় অন্ধকার হইতে একটা অগ্নিক্ষুদ্র,—তাহা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, তাহার ভিতরে অসুরমর্দিনী মূর্তি দেখিতে পাইল—

কালী করালবদনা বিনিক্ষাস্তাসিপানিনী ॥

বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।

দ্বীপচর্মপরিধানা শুকমাংসাত্তৈভরবঃ ॥

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।

“ভীষণবদনা কৃষ্ণবর্ণা দেবী অসি এবং পাশ ধারণ করিয়া বিনিক্ষাস্তা হইলেন । তিনি বিচিত্র লৌহময় ষষ্টিধারিণী এবং নরশিরমালায় বিভূষিতা, তাঁহার পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম । তিনি ক্ষীণাক্ষী হওয়ার অতি ভীষণাকৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । এই দেবীর বদনমণ্ডল অতি বিস্তৃত, এবং লোলজিহ্বা ” ।

মহেশ দেখিল এই মূর্তি আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া জলিতেছে । তাহার পর দেখিল, হাজার, হাজার ভীম দৈত্যদল কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিবৎ দেবী আচ্ছন্ন করিল । কিন্তু বারু, যেমন মেঘবারিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, রণরঙ্গিনী দেবী তেমনি অসুরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন—অসুরগণ রক্ত রমন

‘করিতে করিতে ছুটিতেছে, পড়িতেছে, মরিতেছে । ভৈরবনাদিনী আলুলায়িত কেশে অটুহাস্ত করতঃ ছিন্নমুণ্ডরাশির উপর নৃত্য করিতেছেন । মহেশ দেখিল চণ্ডীর জ্বর হইল । অখিলজগৎ প্রসন্ন ও বিক্রম-রহিত হইল, আকাশ নির্মল হইল, সরিৎ সকল স্বপ্ন মার্গে চলিতে লাগিল । দেবগণ হর্ষভরে পরিপূর্ণ হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্রাবিত করিলেন । মহেশ তাহার পর দেখিল, চণ্ডী ভুবনেশ্বরী হইয়া হাসিতেছেন । মহেশ উচ্চৈঃস্বরে মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিল । তখন ভুবনেশ্বরী মহেশকে বলিলেন—

“বৎস ! অত্যাচার স্বরূপ দৈত্যকে মঙ্গলরূপিনী শক্তি মর্দন ও নাশ করিতেছে—। অত্যাচার বাহাদের প্রাণ তাহার মরিতেছে বা মরিবে—আপাততঃ শোণিতপাত, পরে সাধুগণ স্বরূপ দেবতাগণের আনন্দ । এই জগতে নিত্য সুখাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে । কেহ বা দেব, কেহ বা দৈত্য । পরের সুখের জন্য বাহাদের জীবন, তাহার দেবতা ; অস্তের দুঃখের জন্য বাহাদের জীবন, তাহার দানব । জগতের কোন ভাল কাজই নিষ্ফল হয় না । তোমার কর্ম্ম-বীজ ফল কয়েক বৎসর পরে দেখিতে পাইবে । প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য শাসনকর্ত্তারা একটা বিধি * প্রচার করিবেন, তুমি এক্ষণে বঙ্গের প্রজাদিগের জন্য আর কিছু করিতে পারিবে না । জন্মান্তরে তুমি বঙ্গ একজন প্রধান জমিদার হইবে । জমিদার সমিতি গঠন করিবে এবং তোমার জীবনের আদর্শ দ্বারা এবং তোমার উপদেশ দ্বারা বঙ্গের জমিদারদিগের এবং প্রজাদিগের মধ্যে পিতা পুত্রের ধর্ম্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবে । তুমি এক্ষণে এই মন্দিরে যে সন্ন্যাসী রহিয়াছেন তাহার নিকট মন্ত্র লইয়া সাধনা দ্বারা পুণ্যবল সঞ্চয় কর—।”

এই কথা বলিয়া মাতা অন্তর্হিত হইলেন । যে স্বর্গীয় আলোক কুটীর-ছিল তাহা অন্ধকারে লুপ্ত হইল । মহেশ তার পর দেখিতে পাইল, আকাশে ঘন কুসুমমেষ-স্তম্ভের পিছনে মেঘস্তম্ভ ছুটিতেছে । সেই মেঘস্তম্ভ আরোহণ করিয়া দৈত্যগণ রণে প্রাবিত হইতেছে, চতুর্দিকে মার মার শব্দ মধ্যে মধ্যে বিহ্বল খেলিতেছে—মেঘ কড় কড় করিয়া ডাকিতেছে । সেই ডাক শুনিয়া মহেশ চমকিয়া উঠিল । মহেশের আবেশ ভাবিল দৈবিল মন্দির অন্ধকার । বড় হইতেছে—বাহিরে মুঘলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, মুহূমুহ মেঘ ডাকিতেছে ।

মাঘ, ৩১০]

মায়া ।

৫১১

মহেশ ভাবিল, এই ছুঃখাগে বহু ভীম ও ষড়ানন আসিবে ? এমন সময় মন্দিরে আর কয়েক জনের কথা শুনা গেল ।

• মহেশ বলিল, “তোমরা কারা” ? উত্তর হইল, “আমি যহু, — আর ভীম, আর ষড়ানন ঝড় বৃষ্টিতে বড়কষ্ট পাইয়াছি । আলো জালিবার উপায় নাই” ?

মহেশ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “সন্ন্যাসী ঠাকুর, — আশ্রিত জনকে আশ্রয় দিন” ।

সন্ন্যাসী ।—বৎস ! তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ তাহার নিকটে তোমার দক্ষিণ দিকে একটু কোলঙ্গাতে চকমকি পাথর আছে তাহা লও, দীপ জ্বাল । বৎস ! আগে দরজা বন্ধকর । মহেশ দীপ জ্বালিল । সন্ন্যাসী তাহার বুলি হইতে তিন খণ্ড কাপড় দিলেন । যহু ভীম ও ষড়ানন আর্দ্রনয়ন-ভাগ করিয়া তাহা পরিধান করিল । তাহার পর, যহু ভীম ও ষড়ানন-ও মহেশ এক্ষণে কি কর্তব্য তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল ।

ত্রয়স্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

Ophelia.

(*singing*)

And will he not come again ?

And will he not come again ?

No, no, he is dead,

Go to thy death-bed,

He never will come again.

Shakspeare.

উন্মাদিনী ।

কত দিন গেল । মহেশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । তবু কুমুদিনী ও মায়া প্রতিদিনই পথ চাহিয়া থাকে । দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাস যায়,—বৎসর ঘুরিয়া গেল, তথাপি মহেশের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না ।—রজনীতে কুমুদিনী ও মায়া হুইজনে কখন বা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, কখন বা নীরবে বসিয়া থাকে —কখন বা হুইজনে শয়ন করিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ

করিতে করিতে নিদ্রিত হয় । মায়া কখন কখন নিদ্রিত হইয়া দাদাকে
 স্বপ্নে দেখিয়া “দাদা-দাদা” বলিয়া ডাকিয়া উঠে । কুমুদিনী তাহা শুনিয়া কখন
 কখন “কে রে, মায়া” ? বলিয়া উঠে । কখন বা বলে “আর কি তিনি
 ফিরিয়া আসিবেন—আমাদের এমন কপাল কি হবে ?” মায়া বলিত “বৌ
 আমার মন বলে, দাদা আমার আসিবেন— তাঁকে আবার পাব” । তখন
 কুমুদিনী সেই বাজিকাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত বদন অশ্রু-
 পূর্ণ-লোচনে চুমন করিত, কখন কখন বলিত, “মায়া আমাদের বাড়ীতে
 সকলে বলিত, ‘তুই মানবী নহিস, তুই কোন দেবকন্তা, কান্নালের হুংগে হুংখী
 হইয়া, কুপা করিয়া কান্নালের ঘরে জন্মিয়াছিস’ । আমারও বোধ হয় তুই
 দেবী, তোর কথা অবশ্য সত্য হইবে” । তখন মায়া বলিত “আমি দেবকন্তাও
 নহি, দেবীও নহি, আমি তোমাদের মায়া” । কুমুদিনী এই কথা বারবার শুনিত
 ততবারই কাঁদিয়া ফেলিত, আর তাহাকে নিজের মেরের মত স্নেহভরে কোড়ে
 লইয়া আলিঙ্গন করিত । আমরাও বলি “মায়া! তোর মত মেরে কি আমরা
 কখন পাব ? আমাদের এই দরিদ্রের ঘর তুই কি কখন আলো করিবি ?
 আমাদের এই নির্ভর জগতে তোর আশ্রয় কবে হইবে ?”

কুমুদিনী বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মহেশের সংবাদ খুঁজিত । একদিন
 একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পাঠ করিল, “জমিদারের লাঠিয়ালগণের সহিত
 প্রজাগণের মত একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনেক লোক আহত
 হইয়াছে । জমিদারের পক্ষে দুইজন লোক খুন হইয়াছে, আর প্রজাদিগের
 মধ্যে মহেশ নামক একজন ব্যক্তি হত হইয়াছে ।” সম্পাদক টীকা করিয়াছেন
 “যতদূর জানা যায় এই সেই বিদ্রোহী অসিদ্ধ প্রজাদলপতি মহেশ” । কুমুদিনী
 এত টুকু যেমন পড়িল, অমনি তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, খবরের কাগজ
 খানি হাত হইতে পড়িয়া গেল । কুমুদিনী মায়াকে ডাকিল । প্রবোধ বাবুর
 একটা বৃদ্ধা চাকরাণীর অর ও ক্ষয়কাশী হইয়াছিল । ক্ষয়কাশী বলিয়া অল্প চাকর
 ও চাকরাণী তাহার নিকট বড় যাইত না । প্রবোধ বাবুর জী তাহার সেবা
 করিতেন, আর মায়া । যখন কুমুদিনী ডাকিল মায়া তখন সেই বৃদ্ধার গুঞ্জন
 করিতেছিল । ডাক শুনিয়া মায়া দৌড়িয়া আসিল, বলিল, “বৌ, দাদার কোন
 খবর পেয়েছ না কি ?”

কুমুদিনী । খবর পেয়েছি । কপাল ভেঙ্গেছে ।

মায়া । দাদা কি নাই ?

মাঘ, ১৩১০ ।

মায়া ।

৫৩

কুমুদিনী উঠর করিল না, কাঁদিতে লাগিল ।

মায়া আবার জিজ্ঞাসা করিল “দাদা কি স্বর্গে গিয়াছেন ?” মায়া তাহার মূর্ত্তে জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, দাদার মৃত্যুর সংবাদে আবার কি করে, সেই ভয়ে কুমুদিনী নিজের শোক হুঃখ চাপিয়া রাখিয়া অতি কষ্টে বলিলেন—

“নিশ্চিত যবর পাওয়া যায় নাই, আমার ভয় হইতেছে—”

মায়া । “ভয় কি বৌ ! দাদা স্বর্গে গেলেও সেখানে আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হবে । তবে যা’হুঃখ বিলম্বের জন্ত । কিন্তু বৌ ! দাদাকে আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করছে” । মায়া চক্ষু বুজিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল “দাদা ! তুমি যদি জীবিত থাক, আমরা গিয়া দেখা দেও—আমরা যে তোমাকে না দেখে কত কষ্ট পাচ্ছি তাতে কি তোমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না ?”

কুমুদিনী (হাস্য করিয়া) “হো হো—দাদা আসছে তোকে দেখাব, দেখাব, কি দিবি ?” বলিয়া গান করিতে লাগিল,—

(গান) ।

সে রতন করিয়া যতন, এনেছি তোরই তরে ।

সে নিধি অঞ্চলে বেঁধে, এনেছি তোরই তরে ॥

তোরই তরে তোরই তরে—

গান করিতে করিতে কুমুদিনী মায়ার মুখের গোড়ায় হাত নাড়িতে লাগিল, আবার হাত নাড়িয়া গাহিতে লাগিল ।

“কি দিবি, কি দিবি, ওরে বাছমনি, পাইয়া তাঁরে ।

সে রতন, করিয়া যতন, এনেছি ওরে তোরই তরে ॥”

কুমুদিনী হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে গান করিতে লাগিল । মায়ার মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া গিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া বলিল “তুই কে ? তুই কে !—তুই মায়া—মায়া—না, সে যে জলে ডুব মরেছে,—

গান ।

জলেতে কুবেরিলাম, কেন তুলিলে মোরে, স্বজন ।

তারে নাহি হেরে, সখিরে, মইরে, একণ যে প্রমাদ গনি” ॥

মায়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল “ও কি বৌ, ও বৌ, কি হলো—বৌ কি পাগল হল—লীলা দিদি ও দিদি—”

লীলা ক্ষতবেগে সেই ঘরে আসিলেন । কুমুদিনী মাথা দোলাইয়া বলিল “ঠিক, ঠিক—হয়েছে”—

লীলা বলিলেন “বৌ শাস্ত হও খাম” । কুমুদিনী লীলাকে দেখিয়া কঁাদিয়া করতালি দিয়া আবার গান গাহিতে লাগিল—

(গান) ।

সে কেন এলো না, সে কেন এলো না ।

প্রাণ কেন গেল না, প্রাণ কেন গেল না ॥

আঁখি ভরে তারে হেরে, কেন রে এলাম ঘরে,

দক্ষে মরিবার তরে—কেমনে সহি এ দারুণ যন্ত্রণা ॥

সইরে সে কেন এল না, সে কেন এল না ॥

লীলা । সে আসিবে, শাস্ত হও ।

কুমুদিনী । তুমি কে গা ?—লীলামণি না হীরামণি ?—জমীদারের বৌ ?
স্বাক্ষরী দূর হ দূর হ, আবার হাততালি দিয়া গান—

“প্রাণ কেন গেল না” ইত্যাদি ।

মায়ী কুমুদিনীর হাত ধরিয়া কঁাদিতে লাগিল ।

কুমুদিনী । দূর হ দূর হ । উনি কঁাদিতে পারেন, আমি কি কঁাদিতে পারি না
কঁাদিতে কঁাদিতে গান ।

“সে কেন এলো না কেন এলো না ?” ইত্যাদি ।

লীলা ও মায়ী এই পতি-প্রেমে-পাগলিনীকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । কুমুদিনী অনেক সময় চুপ করিয়া থাকে, কখন কখন মাথা নাড়ে, কখন হাসে, কখন কঁাদে, কখন গান করে ।

মায়ী কখন বোকে বাতাস করে, কখন স্নান করায়, কখন বা খাওয়ায়, কখন বা মস্তকে শীতল তৈল মর্দন করে । প্রবোধ বাবু ভাল চিকিৎসক আনাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন । চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে ইহা শোক-জনিত রোগ, শোকের বেগ থাকিতে আরোগ্য লাভের আশা কম ।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

কুমুদিনী ও মায়ীর অস্থির যখন এইরূপ তখন নগরশকে বুঝাইয়া প্রবোধ বাবু তাহার ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন । একদিন প্রাতে নরেশ বাবু ও প্রবোধ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন ।

প্রবোধ । সুন্দরবনে আমার যে লাট আছে, তাহার পাশের লাট গবর্ণমেন্ট

মাঘ, ১৩১০]

বিলি করিবেন। সুন্দরবন কমিশনার সাহেবের সহিত আমার আলোচনা আছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, লাটটীতে খুব ভাল খাল অতি অল্প আছে। যদি উচ্চ সামান্য ভেটী বাদ দিলে লোনা জল উঠিলে না। যদিও খুব উন্নত। ৮০০০ বিঘা আন্দাজ হইবে। তুমি তাহা বন্দবস্ত করিয়া লও। বন্দবস্ত করিয়া লইতে অতি সামান্য টাকা লাগিবে।—আমি এই পুস্তকখানি তোমার জন্য আনিয়াছি তাহাতে সমুদয় জানিতে পারিবে।—*

নরেশ। জঙ্গল লইব, হাসিল করিব কেমন করিয়া? হাসিল করিতে ত টাকা চাহি।—

প্রবোধ। টাকা চাহি অল্প। বিঘা প্রতি ছুই টাকা লাগিলে।

নরেশ। অর্থাৎ ১৬০০০ টাকা। আমার এক পরমা নাই।

প্রবোধ। আমার নিকট হাওলাত লও।

নরেশ। দান? শোধ দিব কি করিয়া?

প্রবোধ। শীঘ্র বিলি হইবে। এক টাকা নিরিখে। প্রথম ১০ বৎসর গবর্ণমেন্টকে কর দিতে হইবে না। প্রজারাও তোমাকে ৩ বৎসর কর দিবে না, তাহার পর আর তিন বৎসর “রসদ” তার পর পুর দস্তুর প্রতি বিঘা ১ টাকা খাজনা পাইবে। ৪র্থ বর্ষে চারি আনা নিরিখে ২০০০—৫ম বর্ষে আট আনা নিরিখে ৪০০০—৬ষ্ঠ বর্ষে বার আনা হিসাবে ৬০০০—৭ম বর্ষে পুরা দস্তুর এক টাকা নিরিখে ৮০০০ পাইবে ধর। এই চারি বৎসরে মোট ২০,০০০ টাকা হয়। তাহা হইতে ১ হাজার টাকা অনাদায় ছাড়িয়া দেও। এবং সাত বৎসর তোমার নিজ খরচ ৭০০০ টাকা ধরিয়া লও। এই ৮ আট হাজার গেল, আর ১০০০ সরঞ্জাম খরচ ধর। মোট ৯০০০ হইল। বাকী টাকা হইতে আমার ৮০০০ হাওলাত শোধ দিবে। ৩০০০ মজুত তহবিল থাকিবে। তাহাতে লাটের কাজ চলাইবে। আমার টাকার তাড়াতাড়ি নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে দশ বা বিশ বৎসরে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।—

এমন সময়ে ক্ষিপ্তা কুমুদিনী অন্তরমহন হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। নরেশ বাবুকে বলিল, “তুমি নরেশ, তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছ—তুমি আমার শ্বশুরকে খুন করেছ—বিক্ নরেশ,—বিক্ নরেশ, নরেশ—আচ্ছা মেরে ফেলি কেন?—আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস নরকে

যাবার জন্য তোদের কেন এত ইচ্ছা হয়—তুই সরতান, না সরতানের
বাচ্চা—না সরতানের পোষাপুত্র (কাঁদিয়া গীত)—

“সই, প্রাণ কেন গেল না ।

অঁখি ভোরে তারে হেরে—কেন এলাম ফিরে ঘরে,
কেন তারে দিলাম ছেড়ে—যন্ত্রণা আর সহ্য না”

(ক্রন্দন) “সইরে—সইরে—সইরে—ছি ! ছি ! ছি ! যমদূত একে
নিরে যাও । নিরে যা নরেশকে । ঐ নরককুণ্ড । ঐ জল্ছে—দাউদাউ
করে । ঐ কড়াতে তেল টগবগ্ করে ফুট্ছে । ঐ তেলে তাকে ভাজিবে ।—
ঐ দেখ্ তোঁর মতন পাণীরা ঐখানে কান্ছে । ওকে কড়াতে ফেলেদে—
ফ্যাল্ ফ্যাল্, ফেলেদে ফেলেদে, ফেলেদে, ফেলেদে—হি ! হি ! আমার স্বত্বকে
খুন করা, আমার স্বামীকে খুন করার সাজা কেন পাবি না—হো হো
(গীত) “প্রাণ কেন গেল না” ইত্যাদি ।—প্রবোধ বাবু “ঝি ঝি” বলিয়া
ডাকিতে লাগিলেন । ঝি আসিল, মায়ী আসিল । ঝি কুমুদিনীকে ভুলাইয়া
লইয়া গেল । কিন্তু মায়ী নরেশ বাবুকে বলিল, “হায় ! জমিদার, দেখ দেখ
কি করিয়াছ—। তুমিও জমিদার, প্রবোধ বাবুও জমিদার । প্রবোধ বাবু
ত কাহাকেও খুন করেন না । তাঁর অত্যাচারে কারও বৌ ঝি পাগল
হয়নি ?—ওগো, তোমার কেন এমন দুর্ন্যতি হয়েছিল ? ওমা তোমার
চোখু দিয়ে জল পড়্ছে—তুমিও কি আমাদের মত দুঃখী, আমি তোমাকে
কষ্ট দিগিছি ?—ক্ষমা কর”, এই বলিয়া মায়ী নিজের চক্ষুর জল মুছিয়া—
অন্দর মহলে গেল ।

নরেশ । আমি কি নরাধম ! এই সতী পতির জন্য পাগল, ইহাকে
কুলটা ঘোষণা করিছি, এই দেবকন্টার মত কচি মেয়েকে পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন
অভিভাবকহীন করেছি । আর আপনি শিবতুল্য লোক তথাপি আপনাকে কি
অকথা কথা বলেছি—প্রবোধ বাবু আমি বিদায় লইলাম । বনে গিয়া এই
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, তার পর যদি বেঁচে থাকি আপনার কাছে মুখ
দেখাবো”—এই বলিয়া নরেশ জঁতবেগে গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন ।

আগামী বারে সমাপ্য ।

শান্তি ।

ভারতীয় আৰ্য্যসম্ভানগণ সৰ্বদা সমুদায় কার্য্যে শান্তির অন্বেষণ করিয়া থাকেন । কি সুখকর কার্য্য, কি অতি দুঃখদায়ক ভরসঙ্কুল কর্ম্ম, সর্বত্র শান্তিকামনাই মুখ্য উদ্দেশ্য । আৰ্য্যগণ যখন কুটীরবাসী তখন তাঁহাদিগের মনে, কাজে ও বাহ্য দৃশ্যে যে শান্তি ছিল এমন তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না । তাই আমরা এত দুঃখিত ও ক্লক । আৰ্য্যঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন দেখিলে জানা যায়, তাঁহারা সংসারদুঃখ দূর করার অভিপ্রায়েই সকল কাজে শান্তি বিধান করিয়াছেন, অধুনা আনাদিগের মনে উদ্দেশ্য মাত্র আছে, বিষয়ে যে কি তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি । সে বিস্মৃতির হেতু কেবল বিরস্তর সুখাভিলাষ । আমাদিগের পূর্ব পিতামহগণের কি সুখেচ্ছা ছিল না ? ছিল, অত্যধিক ও অসঙ্গত ছিল না । সেই হেতুবশতঃ তাঁহারা অনায়াসে সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইতেন । সর্বাণ্ডে শারীরিক শান্তি, মনের শান্তি ও সর্বশেষে সংসারে শান্তি অন্বেষণ করিতেন । আমরা এখন শান্তি যে কি বস্তু এবং কিরূপ ফলপ্রদ তাহা বুঝিবার ও চেষ্টা করি না । কেবল মৌখিক শান্তির আলোচনা করি । আৰ্য্য জাতির সাংসারিক কার্য্যে দশবিধ সংস্কার আছে । প্রত্যেক সংস্কারের স্বস্তি বাচন ও শেষে শান্তি কার্য্যের বিধান আছে । এই উভয় আবার পুন্যাহ বাচন ঋদ্ধি সহ শুভ হেতু অনুষ্ঠিত হয় । দশসংস্কার করিবার তাৎপর্য্য কি ? উহা করিলে মনে, কাজে ও ব্যবহারে অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা অতি অল্পই বিদ্যমান থাকে । সুতরাং শান্তি স্বতই আসিলা উপস্থিত হয় । দশসংস্কার কি ? ১ম গর্ত্তাধান, ২য় পুংসবন, ৩য় জাতকরণ, ৪র্থ নিজ্জন্মণ, ৫ম নামকরণ, ৬ম অন্নপ্রাশন, ৭ম চূড়াকরণ, ৮ম উপনয়ন (অর্থাৎ গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক বেদাধ্যয়ন), ৯ম সমাবর্তন (পাঠসমাপনান্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্তি), ১০ম বিবাহ ।

গর্ত্তাধানের তাৎপর্য্য, গুরুশোণিতাদিক্লেদজনিত আত্মা অর্থাৎ জীবের পবিত্রতা বিধান । এই কার্য্যে পঞ্চামৃত ও পঞ্চ গব্যের ব্যবহার নিত্য প্রয়োজনীয় । অন্নমাত্রায় গোমূত্র সেবনে শারীরিক দুর্ব্বলতা নষ্ট হয় । গোমূত্রের আত্মাণে নিশ্বাস গ্রাসের দোষ বিদূরিত হইয়া থাকে । এখনকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন ইংরাজী কেনাইলের যে গুণ গোমূত্রের গুণ

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎমান্ত্র নান নহে। “হৃৎ” যে কিরূপ অমৃতময় পদার্থ তাহা কি বলিব, আজন্মমৃত্যুপর্যন্ত সুখকর, হৃদয়, আয়ুষ্কর ও পবিত্রতা-বর্ধক। “দধি”র গুণ বৈদ্যকে যাহা লেখে তদুপা নোধ হয় শারীরিক পুষ্টি সাধন সহ-মানসিক বৃত্তির উত্তেজনা করাই ইহার প্রধান গুণ। “ঘূতের” ভোজনে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের ক্ষুধা জন্মাইয়া শরীর সবল করে। “মধু” সকল কাজের ও সকল ঔষধের সহায় ও সাধক ও সর্বজীবের প্রিয় বস্তু। “শর্করা” সমুদায় ভোজ্য দ্রব্য মধ্যে সুমিষ্ট ও সুখকর। গর্তাদানের সর্ব-প্রকার বস্তু মধ্যে যদি এইগুলি প্রধান অঙ্গ বলিয়া থাকে তবে অবশ্য তাহার ব্যবহার অনিবার্য্য সূত্রায় ইহা দ্বারা গর্তাদানের দোষ পরীহার হয়; এবং জননেন্দ্রিয়ের সবলতা ও শারীরিক স্বাস্থ্য অনায়াসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে এখানে স্বস্তি ও শান্তি বিধানই এই কার্যের অনুরোধ হয়।

কেহ কেহ কহিবেন ঐ প্রথাটি অতি কুৎসিত বীভৎস ও ঘৃণাকর। আমরা তাঁহাদিগের জন্ত ইহা লিখিতেছি না। তাঁহারা এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইতে পারেন।

জাতকরণেও স্বস্তি ও শান্তির প্রয়োজন। জাতশিশুর শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে, জনক জননীরা আনন্দ বর্দ্ধন হইবে সূত্রায় এ কার্যে আনন্দ, স্বস্তি ও শান্তি কামনা করা সকলেরই অভিপ্রেত। তাই সূতিকার বস্তুপূজা। আত্মীয় স্বজনদের আগমন প্রার্থনা, অভিনন্দন ও আশীর্বাদগ্রহণ নিতান্ত কর্তব্য। স্বপত্ন্যমুবাগ্নী মিষ্টান্ন বিতরণ, তৌর্য্যত্রিকের অনুরোধ সহকৃত হলাহলীপূর্বক পুরবাসীজনের কোতুক লক্ষণ।

নিষ্ক্রমণ—নবজাত শিশু মাসত্রয় অতিক্রম করিলে চন্দ্র দর্শনের আনন্দ অনুভব করিবার অধিকারী হয়। ইহাতেও গৃহস্থের স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন—মানব সন্তান ছয় মাস অতিক্রম না করিতে পারিলে কঠিন পদার্থ ভোজন করিতে পারে না। তখন তাহার দন্তোদগম হয়। তখন যে হামা-খুড়ি দেয় বাহা সম্মুখে দেখে তাহাই মুখে দিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় তাহার সুখ ও শান্তি বিধানমানসে নান্দীমুখ ক্রিয়ার অনুরোধ কর্তব্য। ঐ কার্যে অষ্টবসুর পূজা ও নন্দদ্বারার প্রয়োজন। বস্তু মার্কণ্ডেয়াদির পূজা পূর্বক গোমুদি ঘোড়মু গাভীকার পূজা। শিশুর কল্যাণ কামনায় দেবতার অধিবাস

মাস, ১৩১০]

শান্তি ।

৫১৯

পুরঃসর তাহার অধিবাস এবং পিতৃগণের নান্দীমুখশ্রদ্ধা । অর্থাৎ আনন্দোৎসব পূরক পিণ্ডদান । যেখানে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বর্তমান থাকেন তথায় তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধনই নান্দীমুখ শ্রদ্ধা । ইহার আনুসঙ্গিক ভূতবজ্র, দেববজ্র, নৃবজ্র হইয়া থাকে । ইহাকে সূত্রাং স্বস্তি ও শান্তি অবশ্যই কহিব । নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহরূপ অবশিষ্ট সংস্কারেও নান্দীমুখাদি কার্যের অনুষ্ঠান অতাবশ্যক । স্বস্তি ও শান্তি এই সকল কার্যের প্রধান অঙ্গ ।

নামকরণে—একব্যক্তি হইতে অল্প ব্যক্তিকে পৃথক করা যায় । চূড়াকরণে, কর্ণবেধ ও কেশমণ্ডন হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা শিশুর বেশভূষার পারিপাট্য বিধান করান মুখ্য উদ্দেশ্য । পঞ্চবর্ষ অভিক্রম করিলে শিশুর সকল বিষয়েই স্পৃহা জন্মে । এই কালে তাহাকে পরিশোভিত করিতে পারিলে সকলেরই মনে স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হয় ।

প্রাত্যাহিক সংস্কারে যত প্রকার শান্তি, স্বস্তায়ন, ও কল্যাণ কামনা আছে এত আর কিছুতেই নাই । এ কার্যে বাহার কিছু লাভ নাই তাহারও দর্শন মুখ ও মনে স্বস্তি ও শান্তির উদয় হইয়া থাকে । তবে নিতান্ত অসুস্থাপরবশ হিংস্র ব্যক্তির কথা পৃথক ও সুদূরপর্যন্ত ।

আর্য্যঋষিগণ যখন সকল কার্যেই স্বস্তি ও শান্তির বিধান করিয়াছেন তখন আমরা এত অশান্তি ভোগ করি কেন ? তাহার কারণ একমাত্র হুরাকাঙ্ক্ষা । আমাদের আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা নাই । প্রবৃত্তিমার্গে মনঃসংযোগ আছে । নিবৃত্তিমার্গে দৃষ্টির লেশমাত্র দেখা যায় না । আমরা অষ্ট ঈশ্বরের প্রার্থনা করি কিন্তু উপায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে তাহার কোন চেষ্টাই করি না । তাঁহার অনুগ্রহ ও কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত কেহই কোন বস্তু পান না । এবং পাইলেও অধিকার করিতে পারেন না । আমরা প্রত্যক্ষভূত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য দেখিতেছি কিন্তু উহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে সক্ষম নহি । কেন ? তাহার উপাসনা করি না ও সকল বিষয়েই অতৃপ্ত ও অপরিণামদর্শী । অসাধ্য সাধন করিতে হইলে নিজের ক্ষমতাকে ঈশ্বরের অনুকম্পার উপরে গুস্ত করিতে হয় । যে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারে ও গুরুজীবের মঙ্গল কামনা করে তাহারই নিকট ঈশ্বর হস্তামলকবৎ প্রতীয়মান হইবেন ।

আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি । আমাদের যদি এই জ্ঞান দৃঢ় হয় তাহা হইলে তিনি আমাদের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ করেন ।



মানবের আশা চতুর্বর্গ প্রাপ্তি ; সেও নিছকের হাতে । ধর্মবল, অর্থবল, কামবল ও মোক্ষবল প্রত্যেকটি নিজ কর্মের ফলমাত্র । কর্ম কর ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হও, আপনি চতুর্বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে ।

দেখ, প্রহ্লাদ ঐশবে ধর্ম উপার্জন করিয়াছিলেন বলিয়া চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েন । ঋবও ঠাঁহার তুল্য পরাক্রমশালী । এই ছয়ের মনের উচ্চতা কতদূর তাহা কি কেহ অনুভব করিতে পারিয়াছে । “নিম্পৃহতা ও মনের উদ্যোগই স্বস্তি ও শান্তির লক্ষণ । শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার হইলেও তাঁহার মনে কুটিলতা ছিল বলিয়াই তিনি মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই । তাঁহাকে যদ্বংস ধ্বংস করিতে হইয়াছিল এবং শেষে আত্মনির্ভৃত্তি জন্য বাধ হস্তে শরাঘাতে প্রাণত্যাগ বাধ্য করিতে হইয়াছিল । ইহার শেষ সীমা স্বস্তি ও শান্তি বিধান ।

শ্রীকৃষ্ণ এই কার্যদ্বারা দেখাইলেন যে অত্যন্ত অশান্তির পরেও যদ্বারা সংসারের শান্তি হয় তাহা নিতান্ত কর্তব্য । এই হেতু বশতঃ আর্ষেরা সমুদায় কার্যের অগ্রে স্বস্তি বাচন ও শেষে শান্তি মন্ত্র পাঠ করেন । তাহার দুই একটি দেওয়া গেল যথা ।

ওঁ স্বস্তি ন ইচ্ছা বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃথা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তিনস্তাক্ষৌ
হরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতিদধাতু । ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ।

শান্তিমন্ত্র ।

ওঁ সুরাস্বামভিষিক্তস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সর্কর্ষণপ্রভুঃ ।
প্রহ্লাদশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে ॥
ওঁ কীর্ত্তির্গম্বীধৃতিমেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রমা মতিঃ ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তপ্তিষ্চ মাত্রয়ঃ ।
এতঃ স্বামভিষিক্তস্ত ধর্মপত্ন্যঃ সুসংবৃত্তাঃ ।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরিক্শঃ শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ
শান্তিঃ, বনস্পত্যয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বদেবঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ ।
বতঁএবাগতং পাপেং তত্ৰৈব প্রতিগচ্ছতু ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ।

শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে ঈশ্বরের আশ্রয়
সম্পন্ন করা হইয়াছে । তিনি আমাদের উত্তম সাধন করুন । দ্বিতীয়—

মাঘ, ১৩১০ ।

সাহিত্য দরবার ।

৫২১

ধর্মপত্নী সকলকে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাঁহারা সুসংযত হইয়া শুভ মান
করুন ।

সেই দেবমাতৃগণ কে ? অর্থাৎ ধর্মের পত্নী । এখন দেখা গেল যদি আমরা
সুখী হইতে ইচ্ছা করি ও শান্তিগাভের বাসনা করি তাহা হইলে
আমাদিগেরই অস্তঃকরণে বিরাজিত সেই ধর্মপত্নীগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিচালক
মাতৃগণ কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে । মাতা যেমন হিতকরী ও পিতা যেমন
কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মাণ্ডে তেমন আর কেহই নাই ইহা দেখান হইয়াছে ।
দেবতাবর্গ পিতৃস্থানীয় । কীৰ্ত্তি = বশঃ ; লক্ষ্মী = ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অগ্নিগাদি গুণ ;
ধৃতি = ধৈর্য্য ; মেধা = স্মরণশক্তি ; ক্রমা = পরের দোষ মার্জনা ; মতি = অস্তঃ-
করণের পরিভুক্তি ; বুদ্ধি = জ্ঞান ; লজ্জা = নিজকৃত দোষ দর্শনে কুণ্ঠিত হওয়া ;
বপুঃ = নিজ দেহের গৌরবে অদজ্ঞা প্রদর্শন ; কান্তি = নিজ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ না
হওয়া ; শান্তি = সবগুণাশ্রিত মানসিক উদার্য্য অর্থাৎ সর্বপ্রাণী ও সবে দয়া ;
ভুষ্টি = নিম্পৃহতা অর্থাৎ নিকাম ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠান । এখন দেখা গেল,
আমরা এইরূপ সদাচারের বশবর্তী হইয়া চলিলেই আমরা স্বস্তি শান্তির আশ্রয়
নইতে পারি ।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা ।

সাহিত্য দরবার ।

প্রবাসী আশ্বিন, ১৩১০ ।

প্রবাসী সচিত্র মাসিক পত্রিকা ; প্রিন্সিপ্যাল শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
এম, এ ইহার সম্পাদক । প্রবাসীকে আমরা ভালবাসি এবং রামানন্দ বাবুর
চরিত্র ও দেশোন্নয়নের উপর আমাদিগের শ্রদ্ধা আছে । তিনি, প্রবাসে
থাকিয়া বঙ্গভূমি বঙ্গভাষাকে বিস্মৃত হন নাই । ইহার জন্য রামানন্দ বাবুকে
আমরা অস্তরের সহিত অভিবাদন করি । সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালী যাহাতে আদর্শ
জীবন সুরক্ষিত করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট ; এবং তাহারই
ফলে, পশ্চিমাঞ্চলে আদর্শ বঙ্গীয় জীবনের বৃত্তান্ত প্রবাসীতে, সময়ে সময়ে,
প্রকটিত হইয়া থাকে ।

“গুজরাতি সাহিত্য” প্রবন্ধের লেখক ডাক্তার মেজর বামন দাস
বসু, উল্লিখিত প্রবন্ধে গুজরাতি ভাষায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন ।
প্রবন্ধটি দক্ষিণাত্যের “প্রজাবন্ধু” (ইংরেজী) পত্রিকায় বিখ্যেব প্রকাশিত
ইহাতে অনেক সারগর্ভ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । তবে প্রবন্ধের রচনা
ভাষায় লেখক তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই । “সাহিত্য নির্মিত” “প্র-
করা গেল” প্রভৃতি প্রয়োগ নিতান্তই ছুট এবং সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য । লেখ-
প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—“উত্তর ভারতের প্রচলিত ভাষার ভিতর গুজরা-
ভাষা বত ভিন্নজাতি ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, ভারতের
কোন ভাষা তত হয় না” ; ইহাতে যেন হঠাৎ মনে হয়, যে ভারত
গুজরাতি ভাষার প্রচলন সর্বাপেক্ষা অধিক ; বস্তুতঃ তাহা নহে :—(১)
হিন্দী ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ + পঞ্জাবী ১ কোটি ৭২ লক্ষ + দা-
মুসলমানী ৩৬ লক্ষ + সিন্ধি ২৬ লক্ষ + পশ্চিম পাহাড়ী ১৫ লক্ষ + মধ্য পাহাড়ী
লক্ষ + মাড়বারি ১১ লক্ষ—মোট হিন্দুস্থানী ১১ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের ভাষা

(২) খাস বাঙ্গলা ৪ কোটি ১৩ লক্ষ + আসামী ১৪ লক্ষ + উর্দু

৯০ লক্ষ মোট বাঙ্গলা, উর্দু ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ লোকের ভাষা—

(৩) মহারাষ্ট্রীয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ + গুজরাটী ১ কোটি + কানারী
লক্ষ + কচ্ছী ৪ লক্ষ মোট মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী, কানারী ৩ কোটি ৯১
লোকের ভাষা—

(৪) তেলুগু ১ কোটি ৯৮ লক্ষ লোকের ভাষা—

(৫) তামিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ + মালায়ালম ৫৪ লক্ষ । মোট তামি
মালায়ালম ২ কোটি ৬ লক্ষ লোকের ভাষা—(ভূদেব বাবুর সামাজিক প্রব-
২২১ পৃষ্ঠা)

কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণই গুজরাতি ভাষার অষ্টা নহেন । পার্শ্ব-
দিগেরও মাতৃভাষা গুজরাতি । তবে হিন্দু লেখকগণ বেশী সংস্কৃত, ও পার্শ্ব-
দেশকেরা বেশী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন । পার্শ্ব দাদাভাই নাতোরোজী,
গুজরাতি ভাষায় সুলেখক বলিয়া গণ্য এবং তিনিই ‘বাস্তুগোপ্তার’ পত্রিকার
সংস্থাপক এবং প্রথম সম্পাদক । বঙ্গের রাজনৈতিক অগ্রণী এবং কংগ্রেসদীরগণ
অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা করিতে ও প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম ; কিন্তু মাতৃভাষায়
এতখানি পত্র লিখিতে হইলে, গুলদর্শন উপস্থিত হয় । সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিলক

সং. ১৩৩০]

সাহিত্য দরবার ।

২৩

নরোজী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । প্রাচীন গুজরাতি কাব্য-
দিগ্ভাষা, ব্রজবুলী ; সুতরাং বঙ্গভাষার অনেকটা সমীপবর্তী । বাহারা বিদ্যা-
পতির পদাবলি ব্রজভাষার রচিত বলিয়া, বিদ্যাপতি ঠাকুরকে মৈথিল কবি-
প্রতিপন্ন করিতে অগ্রন্থর এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতিকে বিদ্যাপতি প্রভাবে বর্দ্ধিত
মনে করেন, তাঁহারা ভয়তো গুজরাতি কবি নরসিংহ, প্রেমানন্দ, দয়্যারাম,
মীরাবাই প্রভৃতিকে, “রিসফী” অথবা মিথিলা প্রদেশস্থ গীতামারির কোন
মহাকুমার অধীনে টানিয়া আনিয়া কেলিবেন । গুজরাতি ভাষা ও প্রাচীন
বঙ্গসাহিত্য আলোচনার ফলে দেখা যায় যে এক সময় সম্ভবতঃ প্রাকৃতের পরে
ব্রজভাষাই গুজরাতে হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বা কবিত্বো নিখিত ভাবাক্রমে
প্রচলিত ছিল । উত্তর পশ্চিম হইতেই আর্যেরা বাঙ্গলায় উপনিবেশ করেন ;
এই উপনিবেশ কবে আরম্ভ হইয়াছিল নির্ণয় করা সহজ নহে ; তবে জয়দেবের
(দ্বাদশ শৃষ্টাব্দ) সময় হইতে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দনাসের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গবিহার
প্রভৃতি প্রদেশে অবিকাংশ কৃষ্ণলীলাখিত সঙ্গীত পদাবলি, ব্রজভাষাতেই রচিত
হইত । এইরূপ একটা প্রত্যক্ষা নিত স্ত অসম্ভব হইবে না । উল্লিখিত প্রতিজ্ঞাতে
এরূপ সিদ্ধ হইতেছে না যে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস গোবিন্দনাস প্রভৃতির সময়ে
সাধারণ চলিত ভাষা ব্রজভাষা ছিল । পদকল্পতরুর এমন কতকগুলি কবিতা
যাছে যাহা ব্রজভাষা সংস্কৃষ্ট নহে এবং আধুনিক বাঙ্গলাভাষা নিত স্ত সন্নি-
হিতবর্তী । (এ সম্পর্ক পণ্ডিত রামগতি ঞ্জার ভের “বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য”
৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সুতরাং আধুনিক বঙ্গভাষার মূলপত্তা চণ্ডীদাসের সময় (চতুর্দশ
শৃষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ এবং পঞ্চদশশতাব্দীর কৃতিবাসী রামায়ণ ও কাম্বী-
রামদাসী মহাভারতে স্ফুট বদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিস্কৃত মনে
হইবে । গুজরাতি সাহিত্যের ক্রম বিকাশ বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির পথ অনুসরণ
করিতেছে । আদ্যকালে বাঙ্গলায় যেমন হিন্দী এবং ব্রজভাষার প্রভাব লক্ষিত
হয়, তেমনি প্রাচীন গুজরাতি সাহিত্যেও ব্রজভাষার সংস্রব স্পষ্ট — ।
আবার আধুনিক গুজরাতি ভাষা, আধুনিক পরিণত বঙ্গভাষার ভাব সম্বন্ধ
মত প্রয়োগ বাহুল্যে স্বমার্জিত ।

নবপ্রতিভা । আনন্ ১৩১০ ।

নবপ্রতিভার প্রতিষ্ঠা “ঐদেবী প্রসীদ” প্রবন্ধে প্রতিকল্পিত । ভারতবর্ষের
সাহিত্যের ইতিহাস অতি মনোহর এবং সর্বত্র ভাষায় যেন বর্ণিত হইয়াছে ।



“সঙ্গীতের আদি কোথা? গ্রীসের যখন অবপ্রাশন “হয় নাই তখনো এদেশে স
তাহার প্রমাণ সামরেন।”

সুধু ইহাই নহে। Von Bohlen [vide Das alte Indie
p. 195 (1830)], and Benefy, [vide Indien p. 299 (in
and Gruber's Encyclopoedie, vol XVII. 1840.)] উইলেন মহা
তাহাদের মতে চন্দ্র ইহাতে সপ্তস্বর (Notation) পারেন্তে ও
ইহাতে আরবে যায়। আরব ইহাতে Giudo d'arizzo কর্তৃক ইউ
রোপীতে লেখা হয়।

“অনেকে বিশ্বাস যে পাশ্চাত্য সঙ্গীত অতি হের না ইহলেও এ দেশী সঙ্গীত
নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক।”

এ বিষয়ে আমরা লেখকের সহিত একমত ইহাতে পারিলাম
১৮৭৪ সালে Calcutta Reviewতে Mr. C. B. Clarke যাহা লিখিয়া
তাহার একটু নমুনা দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন আমাদের কথা
সত্য। “I think most Europeans who take the trouble to co
them (i.e boatman's songs) with the best specimens in Sangit Sara
সার) etc. will readily credit my statement in my letter of 17 th
1873 (addressed to the director of Public Instruction) viz, that
all Hindu musicians speak with contempt and almost abhorrence
boatman's songs. I have heard many Europeans declare tha
boatmen's chants are the only music in Bengal that can properly be
music.”

ইহা ইহাতেই বুঝা যায় ইউরোপীয় সঙ্গীত কিরূপ এবং ইউরোপ
—কিরূপ সঙ্গীত রসজ্ঞ!

“পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগ-রাগিনী নাই বটে, কিন্তু তাহাতে হারমনি, কাউন্টারপইন্ট
যে সকল ব্যাপার আছে তাহা আমাদের কোথায়? এ দেশী সঙ্গীতের বিশিষ্ট লক্ষ
রাগিনী।”

উহাও ভ্রমাত্মক। “It is true that Hindu music abounds in m
but it is not void of harmony.. The following quotation from Na
work will best explain our meaning:

গান্ধার্য দশবিধঃ পৃথিবীস্থিতঃ সপ্তঃ
পূর্ণঃ সপ্তঃ তৎপ্রসঙ্গঃ বাপ্তঃ বিকৃষ্টঃ সপ্তঃ
স্বকম্বরঃ নবুৎপত্তিঃ সপ্তাঃ । তত্র রত্নঃ নাম
সৌবর্ণাদি স্বরানানেকোবে রত্ননিভাচাভে।

* The earliest mention of the names of the seven notes of the mu
scale occurs in the Vedangas—in the Upanishads স্বরাঃ সপ্তঃ স্বরাঃ । বড়
স্বরাঃ সপ্তঃ পঞ্চমঃ স্বরাঃ নিষাদঃ স্বরাঃ ইতি—বৈদিক স্বরাঃ and Siksha.

all of them are not to our present purpose ; বস্তু only serves purpose well, and its definition is as follows : বস্তু is that which is used by a combination of the sounds of all stringed instruments, instruments, and those of other kinds.—This is harmony. Vide দর্পণ and অতীত রামায়ণ । (vide Hindu Patriot, 7th Sep. 1874)

নূতন গ্রন্থ ।

(১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন চরিত । আমরা এ দুইটি গ্রন্থ উৎকৃষ্ট, জ্ঞানগর্ভ এবং সুখপাঠ্য গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি । যামোবারে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইবে ।

সাময়িক সংবাদ ।

নূতন নিয়ম । ১২ শে তারিখের ইণ্ডিয়া টি প্রকাশিত হয় যে ছয় তোলার অনধিক নর সংবাদ পত্র (রেজিষ্টার্ড) ৫ এবং বিশার অনধিক অর্ধ আনার ডাকমাস্তান লাগিবে । সভা সমিতি । পোষের মধ্যভাগে তে নানা স্থানে সভা সমিতির বৈঠক গাছিল । বোম্বাই নগরে মহানগর মহা-তি, মাস্ত্রাজে কংগ্রেস, বঙ্গে কায়স্থ-তি উৎকল সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হইয়া- । সভা সমিতি দেশের একটা কানান রা দাঁড়াইল । সভা সমিতিতে দেশের কোন শব উপকার নাই ; কেবল নিরর্থক অর্থব্যয়, অর্থক প্রময়ীকার । এই অর্থ ও প্রময় যদি দীন-দের সেবার নিয়োজিত হয়, যদি তাহাদিগের তাঁর ববিসার করে এই অর্থ উত্তম হয়, যদি দীন-দ্রব্য উৎপাদ ও প্রসারে প্রয়োগ করা- তাঁহা হইলে দীন-দ্রব্য বহু উপকার হইবে ।

নদীয়া মিউনিসিপালিটি । গত ৩০শে সেপ্টেম্বর নদীয়া মিউনিসিপালিটির কমিশনার-গের নিকট হইতে বঙ্গদেশের সর্বমুখ্য

কাড়িয়া লওয়া হয় । আবার গত পৌষ মাসে নদীয়া মিউনিসিপাল কমিশনারগণ শান্তিপুরের সহিত সমদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন । গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে কলিকাতার অধ্যক্ষের বলিয়া তোলা পারখানা করিতে ও তাহার ব্যয় নির্বাহার্থে লাটিন টাক্স বসাইতে আদেশ করেন । কিন্তু স্থানীয় লোক সকল অতি দীন করিয়া কমিশনারগণ গভর্ণমেন্টের আদেশ পালনে অসম্মত হন । তজ্জন্ত তাহাদের এই শাস্তি ।

কৃষ জাপানের যুদ্ধ । আজ কয়েকমাস হইতে কৃষ ও জাপানে কোরিয়া ও মানচুরিয়া লইয়া গোলযোগ বাধে । কৃষ এই দুই স্থানের জিত প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে চাহেন, জাপান কৃষের বিরুদ্ধাচরণ করেন । এতদিন তারের সংবাদে কখন শান্তিপ্রদর্শকের প্রস্তাবে আশাবিত ও সুখী হইতহিলাম কখন যুদ্ধ নিশ্চিত মনে করিয়া উদ্বেগ ও আতঙ্কিত হইতহিলাম । কিন্তু ২৫ শে মার্চ যুদ্ধের সুত্রপাত হইয়া গিয়াছে । এখন যুদ্ধ পরে কয় ভাগবানের হাতে ।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ ।

পৌষ, ১৩১০ ।

১লা পৌষ, ১৩ই ডিসেম্বর । গ্রীস মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী রালি পদত্যাগ করেন ।—আফ্রিকায় হট্টোন্সগণ বিদ্রোহে হঠাৎই জানা যায় ।

২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর । লর্ড কর্জন পারস্তোপসাগর ত্রণপক্ষে কলিকাতায় প্রতিনিধিত্ব করেন ।

৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর । বিঃ কিন নুতন গ্রীস মন্ত্রী সভা গঠন করেন ।

৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় ।—জেনারেল ডিলারী কর্তৃক বিশেষরূপে আবৃত্তি হইয়া আহম্মদ নগরে বন্দী ব্যারগণ ইংরেজের বশতী স্বীকারে সম্মত হইয়াছে জানা যায় ।

৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর । জেনারেল ডিলারী আফ্রিকা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ।—সিবিতে ভূমিকম্প হয় । অনেক ঘর বাড়ী পতিত হয় ও ৫টি লোকের মৃত্যু হয় ।

১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর । মহোৎসবের মহারাজা কর্তৃক কংগ্রেস সংগঠিত শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয় ।

১২ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর । বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সিনি ট্রেনের নিকটে মাল-গাড়ী ও যাত্রা গাড়ীর সংঘর্ষ হয় । অনেক যাত্রী হত ও আহত হয় ।—ইতালীর রাজনীতি-বিদ জানাডেলির মৃত্যু হয় ।

১৩ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর । কংগ্রেসের উনবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয় । শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষ সভাপতি বরিত হন ।

১৪শে পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর । মাদ্রাজে ভয়নক দড় ও মল হয় ।—উৎকল সমিতির অধিবেশন হয় । এই সমিতির উদ্দেশ্য সমগ্র উড়িষী বাসীকে একত্রিত করা ।—

১৫ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর । মতিহারীকে ১০০০ ইঞ্চি উপাধি হইয়া কাচ সমিতিতে, বেসমিতি ।—কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হয় ।—কামরোর রাজসভার সেতুপতির মৃত্যু সংবাদ জনা যায় ।—আমেরিকার চিকাগো নগরে

আইরো কুইস বিল্ডার "র বিগাড" আ. এর কালীন অগ্র সাগিরি উদ্ভাটক হয় । ১৩৩০ ৮০ শত লোকে প্রাণ হারায় ।

১৬ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর । ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় সামাজিক সমিতির সম্মেলন বৈঠক বসে ।

১৭ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী (১৯-৮) । মাদ্রাজে ভীষণ জলপ্রবনের সংবাদ আসে ।—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ডোন্ডিগাট নদীর লটুস কলিকাতায় আগমন করেন ।—কামরার রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান ও সেনাপতি লক্ষণ দাসের মৃত্যু হয় ।

২০শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী । সংবাদ আসে যে পাপনা মেলা ইতালীর দিগ্বেশ হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে ।—কুচবিহার মহারাজার মাতৃ দেবী পরলোক গমন করেন ।—বঙ্গের নীচনা পরিবর্তনের প্রতিবাদ করবার চাকর্য বৃহতী সভা হয় ।

২১শে পৌষ, ৫ই ডিসেম্বর । স্ত্রী লটুস কলিকাতা পরিভ্রমণ করেন ।

২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী । নবদ্বীপ মিউনিসিপাল কমিশনার দিগ্বেশ হস্ত হইতে মিউনিসিপাল কার্যভার নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস ভুক্ত লর্ডিং হাউস বিভাগের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে এক বৎসরের জন্য হস্ত হইল ।

২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী । ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় ।

২৬শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী । ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মিকটে ক্রালান অর্ধবপোত মৃত্যু হইয়া বহু লোকের প্রাণহানি হয় ।

২৭শে পৌষ, ১১ই জানুয়ারী । সাদর অর্ধ-হাস্তলক টাঙ্গানিয়ার শাসনকর্তার পুন পতিতা করেন ।—ব্রিটিশার নিউটনবার ডাকি সৈন্য ইংরাজ দিগ্বেশ নিকট পতিত হয় ।

৩০শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী । মাদ্রাজে ভয়নক দড় ও মল হয় ।